আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেজা খান ফাযেলে ব্রেলভী
(রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)'র

জীবন ও কারামত

মুহাম্মদ শামশুল আলম নঈমী

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেজা খান ফাযেলে ব্রেলভী
(রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)'র

জীবন ও কারামত

মুহাম্মদ শামসুল আলম নঈমী

লেখকের কথা

দ্বিতীয় সংস্করণ

সমগ্র মখলুকাতের একমাত্র সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের মহান দরবারে অসংখ্য শুকরিয়া আদায় করছি,যাঁর অফুরন্ত দয়ায় সুন্নী মুসলমানের ঘরে জন্ম গ্রহণ করে সুন্নী হিসেবে জীবন যাপন করছি। লক্ষ-কৌটি দরুদ-সালাম পেশ করছি ঐ মহান নবীর দরবারে,যাঁর উছিলায় আল্লাহ তায়ালা তাঁর হাবীবের প্রেমের অনলে বিদগ্ধ ইমামে ইশক্ব ও মুহাব্বত,রুহানী জগতের অনন্য সাধক,উপমহাদেশের ত্রানকর্তা,পরিপূর্ণ ইলমে দ্বীনের সফল ব্যক্তিত্ব কলম সম্রাট,জ্ঞানের জাহাজ,ক্ষুরধার লেখক আলা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান ফাযেলে বেরলভী (রাদ্বিয়াল্লাহ তায়ালা আনহু)'র জীবন ও কারামত নামক গ্রন্থটি নবী প্রেমিক অনুসন্ধিৎসু পাঠকদের হাতে তুলে দিতে তাওফিক দান করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ।

গ্রন্থটি পাঠক মহলে সমাধৃত হয়েছে। পাঠক মহলের কিছু ভাইয়েরা কিছু শব্দের বানান সংশোধন করা ও কিছু অস্পষ্ঠ কথা খোলাসা করে বর্ণনা করার সুপরামর্শ দিয়েছেন। আমি তাঁদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আল্লাহ্ তায়ালা তাঁদের 'জাযায়ে খায়ের' দান করুন।

প্রথম প্রকাশিত কপি শেষ হয়ে চার-পাঁচ মাস অতিবাহিত হয়ে যাওয়ায় দ্বিতীয় সংস্করণের বিশেষ প্রয়োজন হয়। সময়ের অভাব কাজের চাপে সংশোধন ও সংযোজনের কাজ আপাতত না করে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করতে পেরে আল্লাহ্র দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি। যেহেতু আলা হযরতের জীবনটা হল মহা সাগর। এ গ্রন্থে আলা হযরত সম্পর্কে বহু গুরুত্বপূর্ণ তত্ব ও তথ্য সন্নিবিষ্ট হলেও আরো অনেক কিছু সংযোজনের প্রয়োজন বোধ করছি। ইন্শা আল্লাহ্ পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন ও সংযোজনের কাজ করার আশা ব্যক্ত করছি।

আমিন,বেহুরমতে সায়্যিদিল মুরসালিন।

আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা খান ফাযেলে ব্রেলভী (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)র

জীবন ও কারামত-

মুহাম্মদ শামশুল আলম নঈমী

সহ সুপার

দক্ষিণ ধর্মপুর রহমানীয়া মুহাম্মদীয়া মাদ্‌রাসা

ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

মোবাইল নং- ০১৭১৫-৫৬৯০৭০

নিরীক্ষণ

মুহাম্মদ নেজাম উদ্দীন

সহ সভাপতি

আলা হযরত ফাউন্ডেশন, চট্টগ্রাম।

প্রথম প্রকাশকাল

রমজান ১৪৩০ হিঃ

আগষ্ট ২০০৯ইং

ভাদ্র ১৪১৬ বাংলা

দ্বিতীয় প্রকাশকাল

২০শে জুন ২০১২ইং

সর্বসত্ত্ব- লেখক

মুদ্রণে

আল-ফালাহ্ কম্পিউটার এণ্ড প্রিন্টার্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

০১৭১২-৫৮৫৩৩২

কম্পিউটার কম্পোজ ও প্রচ্ছদ

আর. কে. কম্পিউটার এণ্ড প্রিন্টার্স, আমিন শপিং সেন্টার, আন্দরকিল্লা মোড়, চট্টগ্রাম।

শুভেচ্ছা মূল্য- ১৪০ (একশত চল্লিশ টাকা) মাত্র

যাদের কাছে কৃতজ্ঞ

- হযরতুলহাজ মাওলানা সৈয়্যদ মুহাম্মদ ইলিয়াছ রেজভী সাহেব
- হযরতুলহাজ মাওলানা সৈয়্যদ মুহাম্মদ মছিহুদ্দৌলা সাহেব
- হযরত মাওলানা আজিজুল হক রেজভী সাহেব
- হযরত মাওলানা ওবায়দুন্নাছের নঈমী সাহেব
- হযরতুলহাজ মাওলানা মুহাম্মদ আসহাব উদ্দীন সাহেব
- মুহাম্মদ মুছা কন্ট্রাকটার সাহেব, সেক্রেটারী, গাউছিয়া মাদ্‌রাসা
- মুহাম্মদ আবদুল কুদ্দুস সাহেব, সেক্রেটারী, রহমানিয়া মাদ্‌রাসা
- আলহাজ্ব মুহাম্মদ শাহ্ আলম সাহেব
- আলহাজ্ব মুহাম্মদ হায়দার মিয়া সাহেব
- আলহাজ্ব হাফেজ মুহাম্মদ লোকমান সাহেব
- আলহাজ্ব মুহাম্মদ ইকবাল হোসেন সাহেব
- হাফেজ মুহাম্মদ মহিউদ্দীন আল কাদেরী
- মাওলানা জসিম উদ্দীন রেজভী
- মাওলানা কুতুব উদ্দীন আল কাদেরী
- শেখ মুহাম্মদ ফরিদুল আলম
- মাওলানা ওমর ফারুক আজমী
- মুহাম্মদ আলী ছিদ্দিকী
- মুহাম্মদ নূরুল আলম (নূরু)
- মুহাম্মদ ফারুক আজম
- মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন
- মুহাম্মদ আক্কাস উদ্দীন
- মুহাম্মদ নাছির উদ্দীন
- মুহাম্মদ আব্দুল হাকিম
- মুহাম্মদ নাজিম উদ্দীন
- মুহাম্মদ ইসমাঈল
- মাওলানা মুহাম্মদ সালাউদ্দীন
- মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম (স্কাই)
- মুহাম্মদ জাহেদুল আলম চৌধুরী
- মুহাম্মদ বখ্‌তিয়ার
- মুহাম্মদ আলমগীর (দুলাল)
- মুহাম্মদ এমদাদ

এছাড়া ও যারা উৎসাহ দিয়ে আমাকে সহযোগীতা করেছেন প্রত্যেকের কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

উৎসর্গ

খোলাফায়ে রাশেদা, আহলে বা'য়তে রাসূল, ইমামে আজম, গাইছে আজম দস্তগীর, খাজা গরীবে নওয়াজ, গাউছে ভান্ডারী, আলা হযরত, খাজা আবদুর রহমান চৌহরভী, শেরে বাংলা (রিদওয়ানুলল্লাহে তায়ালা আলাইহিম আজমাইন)র পবিত্র চরণে ও

আমার মরহুমা আম্মা ও মরহুম আব্বার আত্মার মাগফেরাত কামনায় উৎসর্গ করলাম।

পীরে তরীক্বত মুর্শিদে বরহক ইমামে আহলে সুন্নাত হযরতুলহাজ্ব আল্লামা কাজী নুরুল ইসলাম হাশেমী (মাঃ জিঃ আঃ) সাহেবের

অভিমত

মুসলিম জাহানের সুপরিচিত ব্যক্তিত্বের নাম হল আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা খান ফাযেলে ব্রেলভী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু । তিনি দুনিয়াবী ৬৮ বছর হায়াত পেয়েছেন। এ হায়াতের মধ্যে তিনি সহস্রাধিক কিতাবাদী লিখে বিশ্ব মুসলিমের কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। তিনি তাঁর প্রতিটি কিতাবের মধ্যে কোথাও না কোথাও প্রিয় নবীর শান ও মানের কথা বর্ণনা করেছেন। তাই তাঁর প্রতিটি লিখনীই হল ইশক্বে রাসূলে পরিপূর্ণ। তাঁর প্রায় কিতাবেই সুন্নী আক্বীদার কথার বর্ণনা রয়েছে বিধায় তাঁর কিতাবাদী সুন্নী মুসলমানদের জন্য মূল্যবান সম্পদ। আক্বীদার এমন কোন মাসয়ালা নেই যা তাঁর কিতাবাদীতে নেই, তাই সুন্নী আক্বীদা জানতে হলে তাঁর কিতাবাদী সংগ্রহ করে অনুশীলন করা প্রত্যেকের জন্য প্রয়োজন। পৃথিবীর এমন কোন বিষয় ছিলনা যা তিনি জানতেন না। তাই সকলেই তাঁকে জ্ঞানী নয় বরং জ্ঞান বলেছেন। আবার অনেকেই তাঁকে বিশ্বকোষ ও বলেছেন। বর্তমানে পৃথিবীতে প্রায় ৩৪টির মত বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে তাঁর ব্যক্তিসত্তার উপর গবেষণা চলতেছে। অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশের মধ্যে সকলের কাছে এখনো তাঁর পুরাপুরি পরিচিতি পৌছেনি তাই তাঁর পরিচিতির জন্য বাংলা ভাষায় একটি জীবনী গ্রন্থ রচনা করা সময়ের দাবী ছিল। আমার স্নেহাস্পদ মুহাম্মদ শামশুল আলম নঈমী সময়ের এ দাবীটুকু পুরণের উদ্দেশ্যে আলা হযরতের জীবন ও কারামতের উপর যে বইটি সংকলন করেছেন আমি উহার কিছু অংশ পড়ে খুব খুশী হয়েছি। পরিশেষে মহান প্রভূর দরবারে ফরিয়াদ- হে প্রভূ- আপনি সংকলকের পক্ষ থেকে এ খেদমতকে গ্রহণ করুন এবং ইহার উত্তম বদলা তাকে দান করুন। আমীন বেহুরমাতি সায়্যিদিল মুরসালিন। ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম।

কাজী মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম হাশেমী

জামেয়া আহমদিয়া সুন্নীয়া আলীয়ার শাইখুল হাদীস ওয়াল ফিক্‌হ শেরে মিল্লাত মুফতীয়ে আহলে সুন্নাত হযরতুলহাজ্ব আল্লামা মুফতী ওবায়দুল হক নঈমী (মাঃ জিঃ আঃ) সাহেবের

অভিমত

বিশ্ব বরেণ্য ব্যক্তিত্ব আধ্যাত্মিক জগতের অনন্য বুযুর্গ সহস্রাধিক কিতাবাদীর রচয়িতা চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দেদে আজম ইমামে আহলে সুন্নাত আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা খান ফাযেলে ব্রেলভী রাদিয়াল্লাহু আনহু ১২৭২ হিজরী ১০ই শাওয়াল রোজ শনিবার দুপরের ওয়াক্তে ভারতের উত্তর প্রদেশ ব্রেলী শরীফের সওদাগরান মহল্লায় জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি এমন একজন আশেক্বে রাসূল ছিলেন যার থেকে প্রিয় নবীর ঈশক্বো মুহাব্বতের ফুয়ারা উদ্ভাসিত হয়েছিল। যার গোটা জীবনই ছিল ঈশক্বে রাসূলে ভরপুর । ইসলামী লেবাস পরিহিত নামধারী মুসলমান বাতেল ফের্কাদের স্বরূপ উম্মোচনের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সফল আন্দোলক। প্রায় ৫৬টির ও অধিক বিষয়ে সহস্রাধিক কিতাবাদী রচনা করে বিশ্ববাসীকে অবাক করে দিয়েছেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তাঁর ছিল যথাযথ বিচরণ।

জামেয়া আহমদীয়া সুন্নীয়া আলীয়ার প্রাক্তন ছাত্র আমার স্নেহাস্পদ মুহাম্মদ শামশুল আলম নঈমী আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা খান ফাযেলে ব্রেলভীর জীবন ও কারামতের উপর যে বইটি সংকলন করেছে উহার পান্ডুলিপি দেখে ও কিয়দাংশ পড়ে খুব খুশী হয়েছি।

মহান আল্লাহ তায়ালা লেখকের পক্ষ থেকে এ প্রয়াসকে গ্রহণ করুন এবং এর উত্তম প্রতিদান দান করুন।

পরিশেষে আমি এ প্রয়াসের বহুল প্রচার কামনা করছি।

মাওলানা মুফতী ওবায়দুল হক নঈমী

জামেয়া আহমদিয়া সুন্নীয়া আলীয়ার প্রধান মুহাদ্দিস বিশিষ্ট গবেষক হযতুলহাজ আল্লামা সোলায়মান আনচারী (মাঃ জিঃ আঃ) সাহেবের

অভিমত

ইসলামের মূলধারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ইমাম চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দেদ প্রিয় নবীর অকৃত্রিম আশেক্ব সুন্নী জনতার প্রাণ স্পন্দন আলা হযরত শাহ ইমাম আহমদ রেজা খান ফাযেলে ব্রেলভী হলেন মহান আল্লাহ তায়ালার পেয়ারা রাসূলের মো'জেজা সমূহের অন্যতম একটি মো'জেজা। তিনি এমন এক সংকটময়ী সন্ধিক্ষণে আগমন করেছিলেন যখন প্রিয় নবী রাহমাতুল্লীল আলামীনের শান ও মানে চতুর্মুখী হামলা চলছিল । বিশেষ করে যখন পাক ভারত উপমহাদেশের ওহাবী, দেওবন্দী, লা-মাজহাবী ও কাদেয়ানীরা শানে রেসালতের উপর বার বার আঘাত করতেছিল। এমনকি বৃটিশদের দালালীতে নেমে তাদের আর্থিক সহায়তা নিয়ে ঈমান বিধ্বংশী কিছু বই- পুস্তক ছাপায়ে বিনামূল্যে বিতরণ করে সরলপ্রাণ মুসলমানদেরকে দ্বিধাবিভক্ত করে তাদের মূল্যবান সম্পদ ঈমান হরণ করার হীন চক্রান্তের চাল চালাচ্ছিল ঠিক তখনই আলা হযরত সরল প্রাণ মুসলকানদেরকে ভ্রান্তির ভেড়াজাল থেকে উদ্ধার করে তাদের ঈমান হেফাজত করার লক্ষে লেখা-লেখী এবং ফাযেলানা তাকরীর দ্বারা বাতিলদের মুখোশ উম্মোচন করতে শুরু করে দিলেন এবং এক্ষেত্রে তিনি ষোলআনার ষোলআনাই সফন হন। আলা হযরত ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলক হওয়ার পরও দেওবন্দীরা তাঁকে ব্রিটিশের দালাল বলে আখ্যায়িত করতেছে ইহা তাদের অহেতুক বাড়াবাড়ি এবং ইতিহাস বিকৃতিকর ঘটনা। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় মূলত দেওবন্দীরাই ব্রিটিশের দালাল ছিল। তাদের দালালীকে দামাছাপা দেয়ার জন্য তারা আলা হযরতকে ব্রিটিশের দালাল বলতেছে, ইহা অত্যন্ত অনুশোচনার বিষয় বৈই আর কিছু নয়। যালযালা, যেরো যবর ইত্যাদি কিতাবাদীর মধ্যে দেওবন্দীদের দালালীর যে চিত্র তুলে ধরা হয়েছে এখনো পর্যন্ত দেওবন্দীরা তার কোন উত্তর দিতে পারেনি। তাই মূলত দালাল তারাই। আমার স্নেহাসম্পদ মুহাম্মদ শামশুল আলম নঈমী বাংলা ভাষাভাষী মুসলিম ভাই-বোনদের কাছে এ মহান ব্যক্তিত্বের পরিচয় তুলে ধরার খেয়ালে আলা হযরতের জীবন ও কারামতের উপর যে গ্রন্থটি সংকলন করেছেন উহা দ্বারা বাঙ্গালী মুসলমানেরা আলা হযরত সম্পর্কে জানতে পারবে বলে আমি আশা করছি।

আমি এ প্রয়াসের বহুল প্রচার কামনা করছি। আমীন, বেহুরমতে সায়্যিদিল মুরসালিন ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম।

মাওলানা মুহাম্মদ সোলায়মান আনচারী

বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক ও প্রসিদ্ধ তরজমা কানযুল ঈমানের সফল অনুবাদক হযরতুলহাজ আল্লামা মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান (মাঃ জিঃ আঃ) সাহেবের

অভিমত

ইতিহাসের এক পর্যায়ে যখন এ উপমহাদেশে বহুবিধ বাতিলের নানামূখী অশুভ পদচারনা চলছিলো, একদিকে ইংরেজদের রাজনৈতিক ও সংস্কৃতিক আগ্রাসন, অন্যদিকে হিন্দু নেতৃবৃন্দের রাজনৈতিক নানা দুরভিসন্ধি, তদুপরি এ দু'অপশক্তির সাথে গোপনে আঁতাত করে ওহাবী, কাদিয়ানী, নেচারী, চাকড়ালভী, আহলে হাদীস প্রমূখ বাতিলপন্থীদের অশুভ পাঁয়তারা চলছিলো, যার ফলশ্রুতিতে উপমহাদেশের সরলপ্রাণ মানুষ ভ্রান্তি ও বিভ্রান্তির অতল সমুদ্রে তলিয়ে যাচ্ছিলো ঠিক তখনি যে মহান ইমাম তাঁর অসাধারণ জ্ঞান এবং অদম্য ঈমানী ও বেলায়তী শক্তি প্রয়োগ করে উপমহাদেশে সফল ত্রাণকর্তার ভূমিকায় অবতীর্ন হন, তিনি হলেন ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে মিয়াত, আ'লা হযরত শাহ আহমদ রেযা খাঁন বেরেলভী রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু। তিনি যথাসময়ে যথাস্থানে বাতিলের অবস্থানের বিরুদ্ধে তাঁর লেখনী ও মুনাযারাসহ সময়োচিত যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। যার ফলে সেগুলো বাতিলের স্থলে সত্যের উজ্জ্বল আলোকবর্তিকারূপে মানুষকে দিশা দান করতে থাকে, যার সুফলের কথা আজ সবাইকে এক বাক্যে স্বীকার করতে হচ্ছে।

কিন্তু অতি দুঃখের হলেও সত্য যে, ওই বাতিলগুলো আ'লা হযরতের প্রচেষ্টায় দর্মিত ও চিহ্নিত হলেও কালক্রমে তারা তাদের অব্যাহত প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকে। আমাদের বাংলাদেশেও তাদের উপস্থিতি, অবস্থান ও কর্মতৎপরতা আশংকাজনকভাবে বেড়ে চলেছে। এমতাবস্থায় আ'লা হযরতের সর্বত্র পরিচিতি তুলেধরা, তাঁর লেখনীও অবদানগুলোর কথা সবার নিকট পৌছানো এবং সবাইকে আ'লা হযরতের আদর্শে অনুপ্রাণিত করার বিকল্প পথ নেই। কিন্তু এতদিন যাবৎ আমরা প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট কিছুই করতে পারিনি বললেও অত্যুক্তি হবে না। বলাবাহুল্য আ'লা হযরত সম্পর্কে ব্যাপকভাবে প্রচার করতে হলে তাঁর বিশাল জীবনের সবদিকের বিস্তারিত বিবরণ সম্বলিত জীবনী পুস্তকের সবিশেষ প্রয়োজন, যা এ পর্যন্ত প্রকাশ করা সম্ভবপর হয়নি। এমতাবস্থায় মাওলানা মুহাম্মদ শামশুল আলম নঈমী সহ সুপার দক্ষিণ ধর্মপুর রহমানিয়া মুহাম্মদিয়া মাদ্রাসা, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম, আ'লা হযরতের জীবনী ও কারামত সংকলন করে পুস্তকাকারে প্রকাশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। এটা সত্যি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। তিনি আলোচ্য পুস্তকে আ'লা হযরত সম্পর্কে বহু গুরুত্বপূর্ণ তত্ব ও তথ্য সন্নিবিষ্ট করেছেন। আমি যতটুকু দেখেছি পুস্তকটি আ'লা হযরত সম্পর্কে জানার জন্য বাংলাভাষীদেরকে যথেষ্ট সহযোগিতা করবে।

আমি লেখককে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাচ্ছি আর পুস্তকটির বহুল প্রচার কামনা করছি।

ইতি

এম.এ.মান্নান
২০/৭/২০০৩ইং

(মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান)

সৈয়্যদ বাড়ী দরবার শরীফের সাজ্জাদানশীন পীরে তরীকত হযরতুলহাজ মাওলানা সৈয়দ মহিহুদ্দৌলা (মাঃ জিঃ আঃ) সাহেবের-

অভিমত

الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على رسوله الكريم

আলা হযরত আজীমুল বরকত ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত মুজাদ্দেদে দ্বীনো মিল্লাত শাহ মাওলানা ইমাম আহমদ রেজা খাঁন রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু ইসলামী জগতের এক অসাধরণ বট বৃক্ষের নাম। যার পরিচয় মিলে তাঁর অকৃত্রিম নবী প্রেমের মধ্যদিয়ে। বাল্যকাল হতে অন্তিম সময় পর্যন্ত তিনি সত্য সন্ধানী সকল মানুষের জন্যে অবিরাম কলম চালিয়ে সত্যও ন্যায় উদঘাটনে বিশ্বে যে অবদান রেখেছেন তা অস্বীকার করার কোন জোঁ নাই। তিনি ইসলামী বিষয়ের প্রতিটি শাখা প্রশাকায় বিচরণ করেছেন। আধুনিক বিজ্ঞানের জটিল ও কঠিন বিষয় সমুহের সমস্যার, তথ্য প্রযুক্তির ভিত্তিতে সমাধার পথ আবিস্কার করে দিয়েছেন তা বিশ্বের আধুনিক বিজ্ঞানী ও গবেষকগন অকপটে মেনেছেন ও স্বীকার করে নিয়েছেন। তাঁর জ্ঞানের পরিধি শুধুমাত্র গুটিকয়েক বিষয়ের উপর সিমীত নয়। বহুবিধ ভাষা জ্ঞানী, বিজ্ঞানী পরিপূর্ণ ইলমে দ্বীনের সফল ব্যক্তিত্ব ক্ষুরধার লিখক, অনুবাদক, গবেষক, মূফতী, মুফাসসির, কবি, সাহিত্যিক, বিশ্বনবী প্রেমিক, রুহানি জগতের অনন্য আধ্যাত্মিক সাধক ইমাম শাহ মাওলানা আহমদ রেজা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর মত মদীনার ইসলামের প্রকৃত খেদমতগারের দৃষ্টান্ত বিরল। তিনি অর্ধশতাধিক বিষয়ে দেড় সহস্রাধিক কিতাবাদীর প্রণেতা ছিলেন। তাঁর প্রণিত কিতাব মনে প্রাণে গবেষণা করলে গবেষকগন সত্যই সত্যের দিশা পাবেন। তাঁর আরবী, ফার্সি, উর্দু, পুস্ত ইত্যাদি ভাষায় লিখিত রচনাবলী বর্তমানে বিশ্বের প্রায় বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা ও অনুবাদ হচ্ছে এবং সংগঠন, সংস্থার ও ব্যক্তির প্রচেষ্টায় তাঁর বিষয় ভিত্তিক রচনাবলী আমাদের বাংলাদেশে বাংলা ভাষাবাষীদের জন্য বাংলায় অনুবাদ হয়ে আসছে ।

এরই ধারাবাহিকতায় আমার স্নেহধন্য উদিয়মান চিন্তাবিধ গবেষক দক্ষিণ ধর্মপুর রহমানিয়া মাদ্রাসার সহ সুপার মাওলানা শামসুল আলম নঈমী যে প্রয়াস চালিয়েছেন এর পরিপূর্ণ সফলতা কামনা করি। তাঁর ত্যাগ, সময়, শ্রম, যেন আল্লাহ তায়ালার দরবারে কবুল হয় এ প্রার্থনা করি। অনাগত দিনে ও যেন তাঁর এ কলমী প্রয়াস অব্যাহত থাকে আল্লাহ তায়ালা কবুল করুক আমিন।

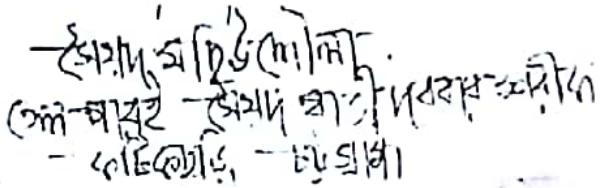

গজনীয়া রহমানিয়া সিনিয়র (ফাজিল) মাদ্‌রাসার আরবী প্রভাষক বিশিষ্ট গবেষক হযরত মাওলানা ওবায়দুন্নাছের নঈমী (মাঃ জিঃ আঃ) সাহেবের

অভিমত

কলম সম্রাট জ্ঞানের জাহাঁজ আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা খান ফাযেলে বেরলভীর জীবনটাই হল বৈচিত্রময়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের এমন কোন বিষয় ছিল না যা তিনি জানতেন না। এক কথাই বলতে গেলে সব জান্তা ও সকল বিষয়ের পারদর্শি হলেন আলা হযরত। যাঁর গোটা জীবনই হল প্রিয় নবীর সুন্নাতের নমুনা। তিনি জন্ম থেকে ওফাত পযর্ন্ত প্রিয় নবীর সকল সুন্নাতকে আকড়ে ধরে নিজ জীবনের মধ্যে প্রতিফলন ঘটিয়েছেন, মুসলমানদের স্মৃতি থেকে বিস্মৃত কতগুলো সুন্নাতকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করে নিজে পালন করেছেন এবং অপরাপর মুসলমানদেরকে তা পালন করার প্রতি আহবান জানিয়েছেন। তাঁর আমলী জীবনে পাওয়া যায় তিনি কোন দিন জমায়াত সহকারে নামাজ আদায় করা ব্যতিত নামাজ পড়েননি এমনকি কোন ফরজ নামায পাগড়ী ব্যতিত আদায় করেননি। তাই তাঁর জীবনটাই হল মুসলমানদের জন্য অনুস্মরণীয়। তাঁর বিভিন্ন জীবনী গ্রন্থে পাওয়া যায় যে, তাঁর আমলী জিন্দেগীতে প্রিয় নবীর সন্নাত পালনের গুরুত্ব দেখে অনেক বাতেলেরা সুন্নী হয়ে গেছেন। তাঁর শাদী মোবারকের অনুষ্ঠানটি ছিল পুরাপুরি প্রিয় নবীর সুন্নাত মোতাবেক। তিনি বিবাহ অনুষ্ঠানটি সুন্নাত মোতাবেক করে বর্তমান বিবাহ অনুষ্ঠানে প্রচলিত কুপ্রথার বিরোধীতা করেছেন এবং এ ধরণের কুপ্রথা থেকে বিরত থাকার জন্য মুসলমানদেরক আহবান জানিয়ে উক্ত বিষয়ে রুসুমে শাদী নামে একটি কিতাব ও লিখেছেন। এমন কি মুসলিম সমাজে প্রচলিত কতগুলো অনৈসলামিক কার্যক্রমের সংস্কার করে চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দেদ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন। আমার স্নেহাসম্পদ মুহাম্মদ শামশুল আলম নঈমী এ মহান হাস্তীর জীবন ও কারামতের উপর যে গ্রন্থটি সংকলন করেছেন উহা পড়ে বাংলা ভাষাভাষী মুসলমানেরা নিজেদের আমলী জিন্দেগী গড়নের ক্ষেত্রে উপকৃত হবে বলে আমি আশাবাদী। পরিশেষে আমি এ প্রয়াসের বহুল প্রচার কামনা করছি। আমীন।

দোয়া কামনায়

(মাওলানা মুহাম্মদ ওবায়দুন্নাছের নঈমী)

আন্‌জুমানে খোদ্দামুল মুসলেমিন ইউ, এ, ই কেন্দ্রীয় পর্ষদের সহ সভাপতি বিশিষ্ট সংগঠক
জনাব আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ আসহাব উদ্দীন সাহেব এর

অভিমত

নাহমাদুহু ওয়ানুছাল্লি ওয়া নুসাল্লিমু আলা রাসুলিহিল কারীম।

প্রিয় নবীর মো'জেজাসমূহের অন্যতম একটি মো'জেজা, সুন্নী মুসলমানদের জন্য বিশেষ রহমতস্বরূপ ১২৭২ হিজরীতে ভারতের ব্রেলী শরীফের সওদাগরান মহল্লায় যে ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটেছিল তাঁর নাম হল ইমাম আহমদ রেজা খান ফাযেলে ব্রেলভী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু। যার শিশুকাল থেকে ওফাত পর্যন্ত গোটা জীবনই হল প্রিয় নবীর সুন্নাত পালনের নমুনা।যার গোটা জীবনই হল দুশমনানে রাসূলের বিরুদ্ধে সংগ্রামী জীবন। যিনি আজীবন বাতিলের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। যখনই কোন বাতেল প্রিয় নবীর শানে আঘাত হেনেছে তখনই তিনি লেখনির মাধ্যমে উহার খন্ডন করেছেন এবং মৌখিকভাবে হুঙ্কার ছেড়ে উহার দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়ে তার কবর রচনা করেছেন। বিভিন্ন বিয়য়ে ছিল তাঁর সফল পদচারণা। তাঁর লিখিত সহস্রাধিক রচনাবলী ইসলামী জ্ঞান ভান্ডারকে করেছে সমৃদ্ধ। বাতিলদের সাথে মোকাবেলা করার ক্ষেত্রে তাঁর লিখিত রচনাবলীসমূহ সুন্নী মুসলমানদের জন্য মূল্যবান হাতিয়ার।

বাংলা ভাষাভাষী মুসলিম ভাই-বোনদের কাছে চতুদর্শ শতাব্দীর মুজাদ্দেদ আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজার পরিচয় তুলে ধরার জন্য আমার স্নেহাস্পদ মুহাম্মদ শামশুল আলম নঈমী আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজার জীবন ও কারামতের উপর জীবনী গ্রন্থটি সংকলন করার জন্য আমি আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে তাকে জানাই আন্তরিক মুবারকবাদ ও অভিবাদন।

পরিশেষে আমি এ প্রয়াসের সাফল্য ও বহুল প্রচার কামনা করছি। আমীন, বিহুরমতি সায়্যিদিল মুরসালীন ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম।

আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ আসহাব উদ্দীন

সূচীপত্র

ক্রমিক		পৃষ্ঠা
১.	প্রারম্ভিকা	১৮-১৯

প্রথম অধ্যায়

জীবন বৃত্তান্ত ও খেদমাত

৩.	আলা হযরতের আবির্ভাব।	১৯-২৪
৪.	আলা হযরত ইমাম আহমেদ রেজা খান ফাযেলে ব্রেলভীর বংশ পরিচয়।	২৪-৩১
৫.	আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা ফাযেলে ব্রেলভী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)র পরিচিতি।	৩১-৩২
৬.	আল্লা হযরত কেবলার নাম।	৩৩
৭.	আলা হযরতের জন্মের পূর্বে ও পরের কিছু কথা।	৩৩
৮.	আলা হযরত কেবলার ছোট কালের একটি ঘটনা।	৩৩
৯.	আলা হযরত কেবলার ভাই-বোন	৩৩
১০.	আলা হযরত কেবলার বাল্যজীবন	৩৪
১১.	আলা হযরত কেবলার ছোট কালের আরেকটি ঘটনা	৩৪-৩৬
১২.	বিসমিল্লাহ পাঠ	৩৬
১৩.	শৈশবেই বিদ্যার আগ্রহ	৩৬
১৪.	শৈশবেই অসাধারণ মেধাশক্তির পরিচয়	৩৬-৩৭
১৫.	শৈশবেও ভুল থেকে নিরাপদ	৩৭-৩৮
১৬.	আলা হযরতের প্রাথমিক শিক্ষক বলেছেন, তুমি কি মানুষ না জ্বীন	৩৮
১৭.	আলা হযরতের শিক্ষকমন্ডলী	৩৮-৩৯
১৮.	প্রথম নূরানী বক্তব্য	৩৯
১৯.	প্রথম লিখিত কিতাব	৪০
২০.	মদীনা শরীফ ও বাগদাদ শরীফের প্রতি সম্মান	৪০
২১.	মসজিদের প্রতি সম্মান	৪০
২২.	হাদীসে রাসলের প্রতি সম্মান প্রদর্শন	৪০-৪১
২৩.	হাদীসে রাসূলের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস	৪১-৪৩
২৪.	প্রথম ফতোয়া	৪৩
২৫.	দস্তারে ফযীলত	৪৩
২৬.	অসাধারণ স্মরণশক্তি	৪৩-৪৪
২৭.	একমাসের মধ্যে কোরান মজীদ হেফজ করেন	৪৪-৪৫
২৮.	খোদা প্রদত্ত জ্ঞান	৪৫-৪৬
২৯.	শাদী মোবারক	৪৭
৩০.	আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজার আওলাদবৃন্দ	৪৭-৪৮
৩১.	যিয়ারতে হারামাইনে শরীফাইন	৪৮-৪৯
৩২.	ধারাবাহিক সনদে হাদীস উপর থেকে (১)	৪৯-৫০

৩৩. ধারাবাহিক সনদে হাদীস উপর থেকে (২)	৫০-৫১
৩৪. ধারাবাহিক সনদে হাদীস উপর থেকে (৩)	৫১-৫২
৩৫. সনদে ফিক্‌হির বর্ণনা	৫২
৩৬. সনদ রিওয়ায়ত	৫২-৫৪
৩৭. সনদে ফিক্‌হে হানাফী	৫৪-৫৫
৩৮. বায়'য়াত ও খেলাফত	৫৫-৫৮
৩৯. অধ্যাপনা	৫৮
৪০. কতিপয় প্রসিদ্ধ ছাত্রবৃন্দ	৫৮-৬০
৪১. প্রসিদ্ধ খোলাফায়ে কেরাম	৬০-৬৩
৪২. জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় আলা হযরতের পান্ডিত্য	৬৩-৬৪
৪৩. জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় আলা হযরতের অর্জিত বিষয়ের সংখ্যা ও তালিকা	৬৪-৬৬
৪৪. আপন প্রতিভায় অর্জিত কতিপয় বিষয়ের পর্যালোচনা	৬৬-৬৯
৪৫. ধর্মীয় সংস্কারমূলক খেদমত	৬৯
৪৬. নিযামে কুদরত (খোদায়ী প্রদত্ত নীতি)	৬৯-৭১
৪৭. খাদেমে দ্বীন (দ্বীনের সেবক)	৭১-৭২
৪৮. আশেকে রাসূল	৭২-৭৬
৪৯. আলা হযরতের সাধারণ অবস্থা	৭৬
৫০. এবাদত	৭৭
৫১. নামায আদায়	৭৭
৫২. সর্বসাধারণের সাক্ষাতের সময়	৭৭
৫৩. আলা হযরত কেবলার শয়নের নিয়ম	৭৭-৭৮
৫৪. আওলাদে রাসূলের প্রতি ভক্তি	৭৮-৭৯
৫৫. আওলাদে রাসূলের প্রতি শ্রদ্ধা	৭৯-৮০
৫৬. তাজীমে মোর্শেদ	৮১
৫৭. আহার	৮১-৮২
৫৮. স্বভাব	৮২
৫৯. উদারতা ও দানশীলতা	৮২-৮৪
৬০. মুজাদ্দেদের পরিচয় ও মুজাদ্দেদে দ্বীনের তালিকা	৮৪-৯০
৬১.আলা হযরত মুজাদ্দেদ হিসেবে প্রকাশ হওয়ার কাহিনী	৯০-৯২
৬২. ইংরেজ ও তাদের আদালতের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন	৯২-১০৬
৬৩.ওহাবী ফের্কার সাথে সুন্নীদের প্রথম বহছ	১০৬-১০৮
৬৪. ইংরেজদের সাথে সৈয়্যদ আহমদের সম্পর্ক	১০৮-১১২
৬৫. ইংরেজদের খাদ্য সংগ্রহ	১১২-১১৩
৬৬. আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজার লিখিত কিতাবসমূহ	১১৩-১৩১
৬৭. আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা ফাযেলে ব্রেলভী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)'র কতিপয় গ্রন্থ পর্যালোচনা	১৩১-১৩৭

৬৮. দর্শন, জ্যোতিষ, নক্ষত্র বিদ্যা ও বিজ্ঞানে আলা হযরতের পদচারণা ১৩৭-১৩৮
৬৯. আলা হযরতের রাজনৈতিক চিন্তাধারা ১৩৮-১৩৯
৭০. আলা হযরতের উপর গবেষণা ১৩৯-১৪০
৭১. আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজার সমাজ সংস্কার ১৪০-১৪৭
৭২. আলা হযরতের ব্যাপারে গাউছে পাকের এরশাদ ১৪৭
৭৩. বাগদাদ শরীফের প্রতি আলা হযরতের তাজীম ১৪৭
৭৪. আলা হযরতের ব্যাপারে ওলমাকুল শিরমণি সৈয়্যদ আলে মুস্তফা সাহেবের এরশাদ ১৪৭-১৪৮
৭৫. আখেরী মজলিশ মোবারক ১৪৮-১৪৯
৭৬. আখেরী তাকরিরের সার সংক্ষেপ ১৪৯-১৫১
৭৭. লিখিত অছিয়তনামা ১৫১-১৫৩
৭৮. ইমামে আহলে সুন্নাত মুজাদ্দেদে দ্বীন ও মিল্লাত আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজার ইন্তেকাল ১৫৩-১৫৪
৭৯. আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা (রাদিয়াল্লাহু আনহু)'র ইন্তেকালের পর পবিত্র লাশ মোবারকের গোসল ও দাফন শরীফের বিবরণ ১৫৫-১৫৭
৮০. রাসূল পাক (ছালাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামে)'র দরবারে আলা হযরতের জন্য ইন্তেজার (অপেক্ষা) ১৫৭-১৫৯

দ্বিতীয় অধ্যায়

৮১. একনজরে ইমাম আহমদ রেজা খান ফাযেলে ব্রেলভী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ১৫৯-১৬২

তৃতীয় অধ্যায়

৮২. আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা সম্পর্কে কতিপয় জ্ঞানী ব্যক্তিদের অভিমত ১৬২-১৭২

চতুর্থ অধ্যায়

কারামত

৮৩. কারামত সম্পর্কে কিছু কথা ১৭৩-১৭৭
৮৪. সহস্রাধিক বই-পুস্তকের লেখক ১৭৭-১৭৮
৮৫. আলা হযরত কেবলা মা'দরযাত তথা জন্মলগ্ন থেকেই অলি ছিলেন ১৭৮
৮৬. শাহেন শাহে মদীনা মাহবুবে কিবরীয়া (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এরশাদ ফরমালেন, আমার আহমদ রেজা এসে গেছেন ১৭৯
৮৭. গাউছে পাকের দরবারে আলা হযরতের স্থান ১৭৯-১৮০
৮৮. গাউছে পাকের প্রতিনিধি ১৮০-১৮১
৮৯. ব্রেলী শরীফ বসে মুরাদাবাদের দু'বন্ধুর কথোপকথন বলে দেয়ার ঘটনা ১৮১-১৮২
৯০.ফীলীভেতের মাজযুব অলি হযরত চুপ শাহ্ মিয়া ও আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা ১৮২-১৮৩

৯১. আলা হযরতের প্রতি বিচলিত কবুতরের সম্মান প্রদর্শন ১৮৩-১৮৪
৯২. আলা হযরতের হাত মোবারকে তাওবা করে চল্লিশ জন ডাকাতের দস্যুতা পরিহার ১৮৪-১৮৫
৯৩. আলা হযরত ও একজন অমুসলিম জাদুকর ১৮৫-১৮৬
৯৪. আলা হযরত কেবলা মৃতকে জীবিত করলেন ১৮৬-১৮৭
৯৫. ব্রেলী শরীফের সুপ্রসিদ্ধ বুযুর্গ হযরত ধোকা শাহ আলা হযরতের দরবারে ১৮৭-১৮৮
৯৬. আলা হযরত কেবলা এক স্থানে বসে অন্য স্থানের খবর রাখতেন ১৮৮-১৮৯
৯৭. আলা হযরত ২৬ দিন খাবার না খাওয়ার ঘটনা ১৮৯-১৯১
৯৮. আলা হযরত কেবলার অদৃশ্যের জ্ঞান ১৯১-১৯৩
৯৯. আলা হযরতের প্রেমাবেগের স্থান মজদুর শাহজাদার স্থান ১৯৩-১৯৫
১০০. ট্রেন থেমে যাওয়ার আশ্চার্যজনক ঘটনা ১৯৫-১৯৭
১০১. অংক শাস্ত্রের ব্যাপারে এক আশ্চার্যজনক ঘটনা ১৯৭-১৯৯
১০২. আল্লাহ্ ওয়ালারাই আল্লাহর নূর দ্বারা দেখেন ১৯৯-২০১
১০৩. আম খান পাতা গণনার প্রয়োজন নেই ২০১
১০৪. মেঝ সাহেবজাদীকে ইন্তেকালের সুসংবাদ ২০১-২০২
১০৫. না আমার প্লেগ রোগ হয়েছে না হবে ২০২-২০৩
১০৬. চোখের ব্যথা চলে গেল ২০৩-২০৪
১০৭. আশরফী মিয়া ও আলা হযরত কেবলার কাশফ ২০৪-২০৫
১০৮. সৈয়্যদজাদার হুঁশ আসা ২০৫
১০৯. গোলাম মহিউদ্দীনের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করা ২০৫-২০৬
১১০. নাস্তা করে যান ট্রেন পাবেন ২০৬-২০৭
১১১. মুজাদ্দেদে আজমের প্রতি অজগর সাপের সম্মান ২০৭-২০৮
১১২.আলা হযরত কেবলার মাধ্যমে ভযসল পুরের হযরত গাজী কামাল শাহ (আলাইহির রাহমা)'র পরিচিতি ২০৮-২০৯
১১৩. রামপুরের নবাব সাহেবের স্ত্রী মৃত্যুবরণের ভবিষ্যৎবাণী ২০৯-২১০
১১৪. মুজাদ্দেদের সকল সময় কর্মে নিমগ্ন ২১০
১১৫. মনের সন্দেহ দূরিভূত করলেন ২১০-২১১
১১৬. হাজী আলী বখ্শ সাহেবকে আলা হযরতের ভবিষ্যৎবাণী ২১১-২১২
১১৭. স্বপ্নের খবর জানার আশ্চার্যজনক ঘটনা ২১৩
১১৮. হযরত শাহজী মিয়া বলেছেন আপনার অংশ এখানে নয় আলা হযরতের নিকট ২১৩-২১৪
১১৯. আমজাদ আলী ফাঁসী হতে মুক্ত হলেন ২১৪-২১৫
১২০. সংকট দূরকারী দর্শন ২১৫-২১৬
১২১. তৎক্ষনাত বৃষ্টি পাত হতে লাগল ২১৬-২১৭
১২২. একজন বৃদ্ধা মহিলার ফরিয়াদ কবুল করা ২১৭-২১৮
১২৩. মনের কথা জেনে ফেললেন ২১৮
১২৪. আলা হযরতের কাশ্ফ এবং ইমামুল মুহাদ্দেসীনের বেছাল ২১৮-২১৯
১২৫. মায়া পরিবর্তন হয়ে গেল ২১৯-২২০

১২৬. আলা হযরত কেবলা প্রতি বৃহস্পতিবার ব্রেলী শরীফের আপন নিবাস থেকে মদীনা মোনাওয়ারা উপস্থিত হতেন ২২০-২২১
১২৭. আলা হযরত কেবলাকে প্রিয় নবীর রওজার সোনারী জালীর সামনে দেখার ব্যাপারে কুতবে মদীনা হযরত জিয়াউদ্দীন আহমদ আল মাদানী আল ক্বাদেরী রেজভীর স্বাক্ষ্য ২২১
১২৮. নাম না জেনে নাম বলে দেয়ার ঘটনা ২২২
১২৯. ২৪ ঘন্টা পূর্বে না করায়ে ২ ঘন্টা পূর্বে ট্রেনের টিকেট রিজার্ভেশন করার ঘটনা। ২২২-২২৩
১৩০. দেরী হওয়া সত্ত্বেও আপনজনদের সাথে হজ্বে যেতে পারার ঘটনা। ২২৩-২২৪
১৩১. আলা হযরতের জন্য কূপের পানি উপরে উঠে গেল। ২২৪-২২৫
১৩২. একটি বরকতময় সিকি (২৫ পয়সা) ২২৫
১৩৩. রাসূলে পাকের সরাসরি দর্শন লাভ। ২২৫-২৩১
১৩৪. খোদার কসম জাঁহাজ ডুববে না। ২৩১-২৩২
১৩৫. ইন্তেকালের ছয় বছর পূর্বে ইশারায় এবং চার মাস ২২ দিন পূর্বে সরাসরি ইন্তেকালের সংবাদ দিলেন। ২৩২-২৩৩
১৩৬. আলা হযরত কেবলা কখন ইন্তেকাল ফরমাবেন তা তিনি জানতেন। ২৩৫
১৩৭. কুত্বুল এরশাদ আলা হযরতের ইন্তেকালের পর তার লাশ মোবারক ফেরেস্তাদের কাঁদে দেখার সুসংবাদ। ২৩৬
১৩৮. এ হাজী আমি মরার পরও আমার পশ্চাদদেশ ছাড়বে না। ২৩৬-২৩৮
১৩৯. অযিফার সিন্দুক থেকে টাকা ও স্বর্ণালংকার দিতেন। ২৩৮-২৩৯

পঞ্চম অধ্যায়

১৪০. শাজরা শরীফ ২৩৯-২৪২
১৪১. দো'য়ায়ে আলা হযরত ২৪৩-২৪৪

পরিশিষ্ট

১৪২. সিলসিলায়ে ক্বাদেরীয়া বারকাতিয়া রেজভীয়া নূরীয়ার মাশায়েখদের নাম, ওফাতের তারিখ ও দাফনের স্থান। ২৪৪-২৪৬
১৪৩. গ্রন্থপঞ্জী ২৪৭-২৪৮

প্রারম্ভিকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

নাহমাদুহু ওয়ানুছাল্লি ওয়ানুসাল্লিমু আলা রাসুলিহিল কারিম।

পরম করুণাময় দয়ার আধার অনুপম অনুকম্পানিধি মহান রাব্বুল আলামীন মুক্তিকামী মানবসমাজের কল্যাণে যুগে যুগে অসংখ্য নবী ও রাসূল প্রেরণ পূর্বক মুক্তি পথের সন্ধান দিয়েছেন। সবশেষে মহান আল্লাহ তায়ালার প্রিয়তম হাবীব, মানবতার কান্ডারী, সাইয়্যেদুল মুরসালীন রাহমাতুল্লিল আলামীন (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম) মুক্তির সুমহান দিশারী হিসেবে এ নশ্বর ধরণীতে শুভাগমন করে গোটা বিশ্ববাসীকে আলোকিত করেছেন। রাসূলে পাক মানবতার বৈষম্যের মূলে কুঠারাঘাত করে সকলকে সাম্যের বন্ধনে আবদ্ধ করলেন। অতঃপর খোলাফায়ে রাশেদা ও সাহাবায়ে কেরামগণ প্রিয় নবীর অনুপম আদর্শ, অনুসরণ করে শান্তি পথের পাথেয় লাভ করে মুক্তি ও শান্তি পাগল মানুষকে ধন্য করেছেন। তাদের পরে তা'বেয়ীন, তাবয়ে তা'বেয়ীন ও মুজতাহেদীনে কেরামগণ নবী ও সাহাবায়ে কেরামের আদর্শ, পথ ও মত অনুকরণ ও বাস্তবায়ন করে শান্তিকামী মানবতার জন্য বে-নজীর দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। যুগ-পরম্পরায় এ নিয়ম মুসলিম উম্মাহর মধ্যে চলে আসছে এবং কিয়ামত অবধি চলতে থাকবে। অনন্তর আউলিয়ায়ে কেরাম সুফী দরবেশগণ প্রিয় নবী ও সাহাবায়ে কেরামের সুমহান আদর্শ অনুসরণ করে শান্তি ও নাজাতের সঠিক মত ও পথ প্রাপ্তির ধারাকে দুনিয়ায় অব্যাহত রেখেছেন। এক কথায় তাঁদের সুমহান প্রয়াসে ইসলামী আন্দোলন ও ইসলাম বিস্তৃতির ধারা গতিশীল রয়েছে।

কালের বিবর্তনে সময়ের আবর্তনে মুসলিম উম্মাহ যখন নবী, খোলাফায়ে, রাশেদা, সাহাবায়ে কেরাম, মুজ্তাহেদীনে এজাম, আউলিয়ায়ে কেরাম ও সলফে সালেহীনদের নিয়ম-নীতি, ইসলামী আদর্শ ও প্রিয় নবীর সুন্নাতের অনুসরণ বাদ দিয়ে ইহুদী-নাছারা ও ইসলাম বিদ্বেষীদের নিয়ম-নীতি তথা ভদ্র বেশী বর্বরতা, সভ্যতারূপী পাশবিকতা, প্রগতিরূপী অশ্লীলতা, আধুনিকতারূপী বেহায়াপনা ও নগ্নতার খপ্পরে পড়ে তাদের ঘৃণিত আদর্শ গ্রহণ করে মানুষের মাঝে দূরত্ব ও বৈষম্যতার বীজ বপন করে তা মানবসমাজে বিস্তার করতে লাগল। বিশেষ করে যখন মুসলমান নামধারী বাতেলেরা ইহুদী-নাছারার মদদপুষ্ট হয়ে প্রিয় নবীর শানে মারাত্মক আঘাত করতেছিল ঠিক এমন এক নাজুক মুহূর্তে জ্ঞানের অধিরাজ, কলম সম্রাট সাচ্চা আশেক্বে রাসূল ইমামে আহলে সুন্নাত মুজাদ্দেদে দ্বীন ও মিল্লাত হযরত ইমাম আহমদ রেজা খান ফাযেলে ব্রেলভী ১২৭২ হিজরীতে নশ্বর ধরনীতে আগমন করলেন। তিনি পৃথিবীতে তাশরীফ এনে দুনিয়াবাসীকে ধন্য করলেন। তিনি কোরান-হাদীস, ইসলামী জ্ঞান শিক্ষা, ইসলামী আন্দোলন, ক্ষুরধার লেখনী ও বিভিন্ন ধরণের সংস্কার কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে ইসলামের মূলধারা তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের রূপরেখাকে বাস্তবায়নের মাধ্যমে অনন্য অবদান রাখলেন। এর পাশাপাশি প্রিয় নবীর অনুপম আদর্শ বাস্তবায়ণ ও মুসলিম উম্মাহর বিস্মৃত মহানবীর অনেক

সুন্নাতকে নিজ জীবনে প্রতিফলন ঘটিয়ে মুসলিম জাতিকে প্রিয় নবীর সুন্নাতের গুরুত্ব, তাৎপর্য ও মহানুভবতা দিয়ে তা অনুসরণ করে নিজ নিজ জীবনে প্রতিফলন করার প্রতি আহবান জানান। সকল বিষয়ে ছিল তাঁর সফল বিচরণ। সহস্রাধিক কিতাবাদী রচনা ও সংস্কারমূলক কাজ করে গোটা বিশ্বের মধ্যে তিনি আলোড়ন সৃষ্টি করেন। পাশাপাশি আধ্যাত্মিক জগতেরও তিনি প্রাণপুরুষ ছিলেন। যার পরিচিতি পৃথিবীব্যাপী পরিব্যাপ্ত। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তাঁর সম্পর্কে গবেষণা চলছে, সে তুলনায় আমাদের দেশের মধ্যে তাঁর পরিচিতি কম হয়েছে। তাঁর সম্পর্কে কম গবেষণা চলতেছে তাঁর জীবনীর উপর বিভিন্ন জন বাংলা ভাষায় বিভিন্ন জীবনী গ্রন্থ লেখলেও পরিপূর্ণ জীবনের কথা ঐ গ্রন্থাবলীতে আলোচিত হয়নি। বিশেষ করে কারামাতের উপর কোন বই বের না হওয়ার কারণে আলা হযরত সম্পর্কে অনেকে অনবহিত। তাই অনেক দিন থেকে এ বিষয়ে কিছু লেখে মুসলিম ভাই-বোনদেরকে উপহার দিতে আমার মনে উদয় হলেও বিভিন্ন ব্যস্ততার কারণে তা সম্ভব হয়নি। অবশেষে শত ব্যস্ততার মাঝেও এ প্রয়াস সম্পন্ন করার জন্য তাওফীক দেওয়ার কারণে মহান প্রভূর দরবারে অসংখ্য শুকরিয়ার নজরানা পেশ করছি। আর জীবন ও কারামতের তথ্য সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে বেশীর ভাগ উর্দু ও আরবী ভাষার বই-পুস্তক থেকে সংকলন করেছি বিধায় নানা ভুল-ভ্রান্তি থেকে যাওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। সুহৃদয় পাঠকবৃন্দ এ ব্যাপারে আপনাদের ভাল পরামর্শ পরবর্তী সংস্করণে অবশ্যই সংযোজন করা হবে। পরিশেষে মহান আল্লাহ তায়ালার দরবারে ফরিয়াদ তিনি যেন আমার পক্ষ থেকে এ খেদমত কবুল করেন এবং ইহাকে আমার ও আমার মা-বাবার নাজাতের উসিলা করে দেন। আমীন! বেহুরমতে সায়্যেদিল মুরসালিন। ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

প্রথম অধ্যায়
জীবন বৃত্তান্ত ও খেদমাত

আ'লা হযরতের আবির্ভাব ঃ

যদি আমরা ইসলামী ইতিহাসের সোনালী অধ্যায়গুলো ধারাবাহিকভাবে পর্যবেক্ষণ করি এবং ইসলামী আন্দোলনের অধ্যায়গুলো অনুধাবন করতে সচেষ্ট হই, তাহলে দিবালোকের ন্যায় আমাদের সামনে সুস্পষ্ঠরূপে পরিস্ফুটিত হয়ে উঠবে যে, পৃথিবীতে যখনই কোন খোদাদ্রোহী শক্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, মহান আল্লাহ সে শক্তিকে দমাতে তাঁর কোন না কোন প্রিয় বান্দাকে তখনই প্রেরণ করেছেন, যিনি দৃঢ়তার সাথে ধুলিস্যাৎ করে দিয়েছেন ওই ভ্রান্ত শক্তির অপতৎপরতা। যেমন বলা যায়, হযরত নূহ আলাইহিস সালাম এর কওমের অপশক্তিকে দমাতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যেমন হযরত নূহ আলাইহিস সালামকে প্রেরণ করেছেন তেমন কওমে লুওতের মন্দ কাজের শক্তিকে উৎখাত করতে হযরত লুত আলাইহিস সালামকে প্রেরণ করেছেন। যখন নমরুদের অপশক্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠল ঠিক তখন বিধাতা পরম করুণাময় দয়ার আধার অনুপম অনুকম্পা নিধি মহান আল্লাহ তা'য়ালা মুসলিম জাতির পিতা হযরত ইব্রাহিম খলীলুল্লাহ আলাইহিস সালামকে তার

মোকাবেলা করার জন্য ধরাধামে প্রেরণ করলেন। আবার যখন ফেরাউন খোদা দাবী করে তার অপশক্তি বিস্তার করতে লাগল তখন খালেক ও মালেক খোদা তায়ালা হযরত মুসা কলিমুল্লাহ আলাইহিস সালামকে প্রেরণ করে ফেরাউনী খোদাদ্রোহী অপশক্তিকে ধূলোয় মিশিয়ে দিলেন। এভাবে বিপদগ্রস্থ, দিশেহারা, পথভ্রষ্ট মানবজাতির পথপ্রদর্শনের জন্য কখনো পাঠালেন ঈসা আলাইহিস সালামকে আবার কখনো অন্যান্য নবীদেরকে, কখনো তাঁর মাকবুল বান্দাদেরকে। ইসলামী নবজাগরণের ধারাবাহিকতা আদিকাল থেকে চলে আসল। আবার যখন পৃথিবী পূনরায় পাপ সাগরে নিমজ্জিত, অন্যায়, অত্যাচার, ব্যভিচার ও অনাচারে মানবতার নামে অমানবতা ও বর্বরতা চলছিল, নিপীড়িত, নিগৃহীত ও অত্যাচারিতের ক্রন্দনরোল আকাশে বাতাসে যখন ধ্বনিত হচ্ছিল। সমাজের দূর্বল শ্রেণী কৃতদাস প্রথায় যখন নিস্পেষিত হচ্ছিল, অজ্ঞতার ঘোর অন্ধকারে মানবতা যখন ভূ-লুণ্ঠিত হতে লাগল। আল্লাহর নেয়ামত কন্যা সন্তানের জন্মকে পাপ মনে করে কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দিয়ে সর্বকালের নিকৃষ্টতম, ঘৃণিত রেকর্ড সৃষ্টির প্রতিযোগিতা চলছিল, ঠিক ওই সঙ্কটময়ী সন্ধিক্ষণে মহান পালনকর্তা সর্বস্রষ্টা, সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা, পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় খোদা তা'য়ালা অন্ধকারে নিমজ্জিত মানবতাকে আলোর পথে ফিরিয়ে আনতে ধরণীতে প্রেরণ করলেন রাহমাতুল্লীল আলামীন, সায়্যিদুল মুরসালীন, শাফিয়্যুল মুযনাবিন, খাতামুন্নাবিয়্যিন, মুক্তির দিশারী, মুক্তির কান্ডারী, আমাকে আপনাকে তাড়ানে ওয়ালা নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামকে। যার শুভাগমনে পৃথিবীব্যাপী মানবতার এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন দেখা গেল। যার তাশরীফ আনায়নে আকাশ, বাতাস, চন্দ্র, সূর্য, গাছপালা তরুলতা, জীবজন্তু, পক্ষীকুল এক কথায় খোদার খোদায়ীত্ব খুশী হয়ে বলে উঠেছিল 'আহলান সাহলান মারহাবা ইয়া রাসুলাল্লাহ।' যার আবির্ভাবে ধরাধামে ফিরে এলো শান্তি, সাম্য মৈত্রী। মানুষ ঐক্য ও বন্ধুত্যের দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সকল প্রকার ভেদাভেদ ভুলে গেল। বিশ্বব্যাপী শান্তির আবহাওয়া প্রবাহিত হতে লাগল। এভাবে যখন ইয়াযিদী ফেৎনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল তখন ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর মাত্র ৭২ জন সঙ্গী নিয়ে ইয়াযিদী শক্তির অপতৎপরতার মোকাবেলা করে বিশ্ববাসীকে চিরস্মরণীয় শিক্ষা দিয়ে গেলেন। এভাবে যখন খারেজী, রাফেজী, শিয়া, মোতাজেনা, বাতেল দলগুলো তাদের বাতেল আক্বীদা পৃথিবীব্যাপী বিস্তার করে স্বরলপ্রাণ মুসলমানদের মূল্যবান সম্পদ ঈমানকে হরণ করার অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছিল এবং মুসলিম শাসকরা বিলাসিতায় লিপ্ত হয়েছিল, মুসলমানরা ছিল নিছক নামের কাজে অনৈসলামিক কর্মকান্ডে বিভোর হয়ে ইসলামকে প্রায় মেরেই ফেলেছিল ঠিক সে সন্ধিক্ষণে মুসলমানকে রক্ষা করার জন্য ইসলামকে পুনরুজ্জীবন দান করার জন্য মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মহিউদ্দীন উপাধীতে ভূষিত করে সুলতানুল আউলিয়া পীরানে পীর দস্তগীর হযরত শেখ সৈয়্যদ আব্দুল কাদের জিলানী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু কে (৪৭১হিঃ-৫৬১হিঃ) এ পৃথিবীতে প্রেরণ করলেন। অনুরূপভাবে হিন্দুস্থানের জমিনে মহান আল্লাহ তা'য়ালা ও রাসুলের প্রতি ঈমান আনা থেকে বিমুখ হয়ে ভারতবাসীরা যখন একাধিক দেব-দেবীর পূজায় মত্ত হয়েছিল

তখনই বিধাতার নির্দেশে প্রিয় নবীর ইশারায় ভারতবর্ষে প্রেরণ করা হয়েছিল সুলতানুল হিন্দ আতাউর রাসূল কুতবুল মাশায়েখ, খাজায়ে খাজেগা, খাজা গরীবে নওয়াজ মঈনুদ্দীনো মিল্লাত, মঈনুদ্দীন হাসান সানজীরী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে। যিনি খোদা প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বলীয়ান হয়ে পৃত্তিরাজের মতো প্রতাপশালী রাজাকে পরাস্ত করেছিলেন। প্রসিদ্ধ যুগী জয়পালকে মুসলমান করেছিলেন এবং ভারতবর্ষে ইসলামী দীপ্ত লাল মশাল জ্বালিয়েছিলেন। আবার ভারতবর্ষের প্রতাপশালী বাদশা সম্রাট আকবর যখন দ্বীনে ইলাহী কায়েমের মাধ্যমে মুসলমানদের প্রিয় সম্পদ ঈমানের বাতি নির্বাপিত করার হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হল এবং মহান ইসলাম ধর্মে পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের অপচেষ্টা চালাল তখন তার বিরুদ্ধে হুঙ্কার দিয়ে উঠল হযরত মোজাদ্দেদে আলফে সানীর ঈমানী তরবারী। যা শয়তানী শক্তির সাথে জিহাদ করে আকবরের প্রচলনকৃত আকবরী দ্বীনকে চিরতরে নিস্তব্ধ করে দিল। এ কাজ করেছিলেন হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানী শেখ আহমদ ফারুকী সেরহিন্দী (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)।

হিন্দুস্তানের জমিনে হযরত মোজাদ্দেদে আলফেসানী দুনিয়া থেকে তাশরীফ নেয়ার পর সেরহিন্দে আপন মাজার শরীফে আরাম ফরমাচ্ছেন। তাঁর ওফাতের পর বেশী সময় অতিবাহিত হয়নি, সেরহিন্দ শরীফ থেকে ইসলামের যে লাল সূর্য পৃথিবীকে আলোকিত করে তুলেছিল তার আলোকচ্ছটা এখনও বিলীন হয়নি এরই মাঝে সম্রাট আকবরের দ্বীনে এলাহীর চেয়েও মারাত্মক, ভয়ানক, লোমহর্ষক ফেৎনা গজে উঠতে আরম্ভ করল। এ ফেৎনা মৌলিকভাবে তৌহিদ ও রেসালতের আশ্রয় নিয়ে মহান আল্লাহ তায়ালা ও রাসুলে আকরম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের শানে এমন অশালীনভাবে বেয়াদবী শুরু করল যা আবু জেহেল, আবু লাহাবের কুফুরী ও মুসাইলামাতুল কাযযাবের নবুয়াতের দাবীর চেয়েও অতি ভয়ঙ্কর ছিল। আবু জেহেল, আবু লাহাব তো আল্লাহ ও রাসূলকে মানেনি কিন্তু আল্লাহ মিথ্যা বলতে পারে বলে দাবী করেনি, আর মুসাইলামা নিজেকে নবুয়তের অংশীদার বলে দাবী করেছিল, কিন্তু এ ফেৎনা প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামকে হিংস্র জীবজন্তুর সাথে তুলনা করতে শুরু করল। ফেৎনাবাজরা তাদের আক্বীদার কথাগুলো এমনভাবে প্রচার করতে লাগল যা শুনলে শরীরের প্রতিটি লোম খাড়া হয়ে যায়। রাসূল প্রেমিকরা প্রিয় নবীকে ইয়া রাসূলাল্লাহ বলে ডাকলে ওই রাসূল প্রেমিকদেরকে মুশরিক বলে আখ্যায়িত করছে ফেৎনাবাজরা। আশেকে রাসূলরা তাঁদের প্রাণ প্রিয় রাসূল এর শানে মিলাদ মাহফিল ক্বায়েম করলে একে হিন্দুদের পূজার সাথে তুলনা করছিল। হিন্দু পূজার প্রসাদ খাওয়াকে বৈধ এবং মিলাদুন্নবীর তবরুককে হারাম বলছিল, প্রিয় নবীর রওজা শরীফের উদ্দেশ্যে সফর করাকে শিরক বলে ফতোয়া দিচ্ছিল, সে ফেৎনার কুখ্যাত নাম হলো ওহাবী ফেৎনা। আরবের যে প্রদেশের জন্য প্রিয়নবী দোয়া করেননি, যে প্রদেশ থেকে শয়তানের শিং বের হবে বলে প্রিয় নবী ঘোষণা করেছেন, সে অভিশপ্ত নজদ প্রদেশ থেকে মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী হতে ওহাবী ফেৎনা শুরু হয়েছিল। পাক ভারতে ওহাবী ফেৎনা ছিলনা। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের মদদপুষ্ট হয়ে তথাকথিত আমীরুল মো'মেনীন, তথাকথিত শহীদ,

ভন্ড পীর সৈয়্যদ আহমদ রায় ব্রেলভী হজ্ব পালন করার নাম দিয়ে তথাকথিত সৌদি আরবে গিয়ে মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাবের দোসরদের সাথে যোগাযোগ করে মারাত্মক ওহাবী ফেৎনাকে আমদানী করে এনে তার একনিষ্ট অনুসারী ইসমাঈল দেহলভীকে সাথে নিয়ে যখন ওহাবী ফেৎনার ঈমান বিধ্বংসী আক্বীদাগুলো পাক ভারতের মুসলমানদের মাঝে প্রচার করতে শুরু করল তখন প্রথম দিকে মুসলমানেরা তার আক্বীদা বর্জন করে তাদেরকে ঘৃণা করতে লাগল। কিন্তু বুদ্ধিমান ইসমাঈল দেহলভীর বুদ্ধিতে সৈয়্যদ আহমদ রায় ব্রেলভী পীর সেজে গেল এবং প্রথমে ইসমাঈল দেহলভী মুরীদ হলো। পাক ভারত উপমহাদেশের সরলপ্রাণ মুসলমানরা নবী প্রেমিক, অলি ভক্ত, পীর ভক্ত ছিল। যখন সৈয়্যদ আহমদ ওহাবী আক্বীদা প্রচার করার স্বার্থে ইসমাঈল দেহলভীর বুদ্ধিতে পীর সেজে নিজেকে জাহের করল তখন সরলপ্রাণ মুসলমানেরা তাকে বাস্তবে পীর ভেবে ফয়েজ হাসেল করার আশায় তার সান্নিধ্যে যেতে শুরু করল। সরলতার সুযোগ বুঝে সৈয়্যদ আহমদ তাদেরকে মুরীদ করতে শুরু করল। এভাবে যখন তার অনেক মুরীদ হলো তখন সে তার মুরীদানদেরকে ওহাবী আন্দোলনের মধ্যে শামিল করে পূর্ণভাবে শক্তিধর হয়ে ওহাবী ফেৎনার ঈমান বিনষ্টকারী আক্বীদাসমূহ ওয়াজ নসীহতের মাধ্যমে প্রচার করতে লাগল। যেহেতু সৈয়্যদ আহমদ তেমন উচ্চ শিক্ষিত ছিলনা এবং লেখালেখির যোগ্যতাও তার কাছে ছিলনা, তাই তার বক্তব্যগুলো ধারাবাহিকভাবে সাজিয়ে লিপিবদ্ধ করে বৃটিশ শাসকের আর্থিক সহযোগিতায় কিতাব আকারে ছাপিয়ে ছিরাতে মুস্তাক্বীম নাম দিয়ে বিনামূল্যে মানুষের হাতে হাতে পৌছিয়ে দিয়ে ওহাবী আক্বীদা প্রচার করতে ছিল। উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত 'ছিরাতে মুস্তাক্বীমে' আল্লাহ তায়ালার শানে বেয়াদবী করা হয়েছে আর প্রিয় নবীর শানে লিখা হয়েছে যে, নামাযের মধ্যে যদি প্রিয় নবীর খেয়াল আসে তাহলে নবীর খেয়ালের চেয়ে নবীর জায়গায় গরু-গাধা ও খচ্চরের খেয়াল করা উত্তম। নাউজুবিল্লাহ! এ ধরনের মারাত্মক কথা আবু জেহেল, আবু লাহাবও বলার দুঃসাহস পায়নি, কিন্তু সুন্নাতের লেবাস পরে ধোঁকাবাজ ভন্ড পীর সেজে সৈয়্যদ আহমদ তা বলার সাহস করেছে। আর তার একনিষ্ট মুরীদ মৌলভী ইসমাঈল দেহলভী "তাক্বীয়াতুল ঈমান" রচনা করেছে, বলতে গেলে যা মূলতঃ ওহাবী ফেৎনার মূলহোতা মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদীর লিখিত "কিতাবুত তাওহীদের" অনুবাদ। যে তাক্বীয়াতুল ঈমানের মধ্যে ইসমাঈল দেহলভী সত্তরটির মত কুফুরী কথা লিখেছে যা পড়লে শরীর শির শির করে উঠে। উক্ত তাক্বীয়াতুল ঈমান গ্রন্থে যে সত্তরটি কুফুরী কথা লিখা হয়েছে তন্মধ্য থেকে একটি হল-

নবী করিম মরে পঁচে মাটির সাথে মিশে গেছেন। নাউজুবিল্লাহ! এদিকে পিরিঙ্গিবাজ ইংরেজদের আশ্রয় প্রশ্রয়ে মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ইমাম মাহদী বলে দাবী করল, তারপর দাবী করল সে প্রেরিত ঈসা। এর পরে সে নিজেকে আল্লাহর প্রেরিত নবী ও রাসূল বলে ঘোষণা করে রাসূলের শানে কুঠারাঘাত করল।

দেওবন্দ মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা তার বিরচিত "তাহযীরুন্নাস" গ্রন্থের ৩য় পৃষ্ঠায় লিখেছে রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম অন্যান্য সকল নবীদের শেষে এসেছেন, এ

কারণেই তিনি জনগণের কাছে শেষ নবী কিন্তু শেষ নবী হওয়ায় তাঁর কোন বিশেষত্ব নেই। সে একথা লিখে আমাদের প্রিয় নবীর খতমে নুবুয়তকে অস্বীকার করল। আশরফ আলী থানবী তার লিখিত ছোট পুস্তিকা "হিফজুল ঈমানের" ৮ম পৃষ্ঠায় প্রিয় নবীর ইলমে গায়েব সম্বন্ধে লিখেছে, নবীর কাছে যদি ইলমে গায়ব থাকে তাহলে এরূপ ইলমে গায়বতো প্রত্যেক শিশু, পাগল, এমনকি সমস্ত পশুপাখি ও হিংস্র জন্তু সমূহেরও আছে। (নাউজুবিল্লাহে মিন জালিক) খলিল আহমদ আম্বেটভী তার বিরচিত " বরাহেনে ক্বাতিয়া" গ্রন্থের ৫৫ পৃষ্ঠায় প্রিয়নবীর ইলমে গায়ব সর্ম্পকে মন্তব্য করতে গিয়ে লিখেছে, শয়তান এবং মালাকুল মাওত এর ইলম হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম এর জ্ঞানের চেয়ে বেশী। রশিদ আহমদ গানগুহীর ছাত্র মৌলভী হোসেনের লিখিত "বুলগাতুলজীয়ন" গ্রন্থে লিখেছে আমি স্বপ্নে নবী করিমকে দেখি তিনি আমাকে পুলসিরাতের উপরে নিয়ে গেছেন, কিছুদুর পার হয়ে দেখি নবী করিম পুলসিরাত থেকে নীচে পড়ে যাচ্ছেন, আমি হুজুরকে পতন থেকে রক্ষা করি। "এমকানে কিজব" পুস্তিকায় আল্লাহর শানে লিখা হয়েছে, আল্লাহ মিথ্যা বলতে পারেন (নাউজুবিল্লাহ) এভাবে ফতোয়ায়ে রশীদায়া, বেহস্তি জেওর ইত্যাদি কিতাব সমূহেও মারাত্মক ধরনের কথাবার্তা প্রিয়নবীর শানে লিখা হয়েছে। এছাড়া আরো লিখা হয়েছে নবীজির মর্যাদা বড় ভাইয়ের তুল্য, নবীজির মর্যাদা চামারের চেয়েও নিকৃষ্ট, মিলাদ-কিয়াম কৃষ্ণলীলার গান। ইমাম আবু হানিফা ও অন্যান্য ইমামদের তাকলীদ (অনুসরণ) করা শিরক ও কুফরী। ওহাবীরা যখন ইংরেজদের মদদপুষ্ট হয়ে তাদের আর্থিক সহযোগিতায় বড় বড় ওহাবী মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করে পিরিঙ্গিদের অর্থানুকূল্যে ঈমান বিধ্বংসী ওহাবী মওদুদিবাদী কিতাবসমূহের এসব জঘন্য উক্তি লিখে ছাপিয়ে বিনামূল্যে প্রচার করা হচ্ছিল এমন এক ঘনঘোর অমানিশা যখন উপমহাদেশকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল ঠিক এমন এক যুগ সন্ধিক্ষণে আল্লাহর রহমত স্বরূপ, আল্লাহর প্রদত্ত ক্ষমতায় ক্ষমতাবান হয়ে প্রিয়নবীর ঈশকে মুহাব্বতের সূরা পান করে ভারত উপমহাদেশের উত্তর প্রদেশের বাঁশ ব্রেলীতে আবির্ভূত হলেন চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদে আজম শরীয়তে মুহাম্মদীয়ার প্রচারক, ইমামে আহ্লে সুন্নাত আ'লা হযরত আজীমুল বরকত, আক্বায়ে নিয়ামত, দরিয়ায়ে রহমত, হেদায়ত পথ প্রদর্শনের চিত্র, আরেফে শরীয়ত ও তরীকত জ্ঞান-বিজ্ঞানের অতল সাগর, তাজেদারে বেলায়ত, হাক্বিক্বত মারফতের সমূদ্রের ডুবুরি, জমীনবাসীদের জন্য হুজ্জত, দ্বীন ও মিল্লাতের আলোকবর্তিকা, নবী ও রাসূলদের উত্তরসূরী, ফোকাহা ও মুজতাহেদীনদের চেরাগ, আল্লাহর নিদর্শনসমূহের একটি নিদর্শন, রাসূলের মো'জেজাসমূহের একটি মো'জেজা হযরতুল আল্লামা হাফেজ ক্বারী মুফতী হাকীম আলহাজ্ব আশ শাহ আবদুল মুস্তফা মুহাম্মদ আহমদ রেজা খান সাহেব ফাযেলে ব্রেলভী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু। আলা হযরত কেবলা যখন আবির্ভাব করলেন, তখন পৃথিবীতে এত বেশী ফেৎনা বিরাজ করছিল যার বিবরণ দিতে গেলে একটা পুস্তক হয়ে যাবে। অতি সংক্ষেপে বলতে গেলে বলা যায়- এক দিকে মানুষের শোষণকারী ব্রিটিশ শাসন অন্যদিকে ইসলামী পোষাক পরিধান করে ব্রিটিশের পালিত মানুষরূপী কুকুর, সুন্নাতী লেবাসে ইহুদী-খ্রীষ্টানদের এজেন্ট, একযোগ হয়ে

ঈমান বিধ্বংসী কাজ চলছিল। আলা হযরত কেবলা তাদের জন্য কহরে এলাহির বিজলী বনে আবির্ভূত হলেন। তিনি তাঁর সংস্কারমূলক কর্মকান্ডের মাধ্যমে দ্বীনে হানিফকে দ্বীপ্তমান এবং রাসূলের মৃত সুন্নাতসমূহকে জীবিত করলেন যা তাঁর লেখনি দ্বারা প্রমাণিত।

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেজা খান ফাযেলে ব্রেলভী রাদিয়াল্লাহু আনহুর বংশ পরিচয়।

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেজা খান ফাযেলে ব্রেলভী রাদিয়াল্লাহু আনহুর বংশীয় শাজরা সম্পর্কে আলোচনা করলে দেখা যায় যে, তিনি পাক ভারতের ব্রেলভীতে জন্মগ্রহণ করেছেন কিন্তু তাঁর পূর্ব পুরুষগণ ভারতের ছিলেন না বরং আফগানিস্তানের কান্দাহারের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর পূর্ব পুরুষদের আলোচনা করতে গেলে সর্বাগ্রে যার আলোচনা করতে হবে তিনি হচ্ছেন হযরত মাওলানা শাহ সা'ঈদ উল্লাহ খান সাহেব। যিনি কান্দাহরের এক যুগ শ্রেষ্ঠ আলিম ও বুযুর্গ ব্যক্তি ছিলেন, তিনি সেখানকার এক সম্ভ্রান্ত পাঠান গোত্রের বংশধর।

আ'লা হযরত কেবলার বংশীয় শাজরা নিম্নরূপঃ

হযরত মাওলানা সাঈদুল্লাহ খান সাহেব

↓

হযরত মাওলানা সা'য়াদত ইয়ার খান সাহেব (উজীর মুহাম্মদ শাহ)

↓

হযরত আজম খান সাহেব | হযরত মুয়াজ্জম খান সাহেব | হযরত মুকাররম খান সাহেব

↓

তাঁর দু' স্ত্রী

↓

প্রথম স্ত্রী হতে
হযরত হাফেজ কাজেম আলী খান

দ্বিতীয় স্ত্রী হতে
চারজন সাহেব জাদী যাদের নাম উল্লেখ নেই

↓

তাঁর তিন স্ত্রী

↓

প্রথম স্ত্রী হতে
* ইমামুল ওলামা মাওলানা রেজা আলী খান সাহেব
* রঈসুল হোকামা হাকীম তক্বী আলী খান সাহেব
* জীনত বেগম ওরফে মুতী বেগম

দ্বিতীয় স্ত্রী হতে
* বদরুন নেসা
* সদরুন নেসা
* কমরুন নেসা

তৃতীয় স্ত্রী হতে
* হযরত জাফর আলী খান সাহেব

ইমামুল ওলামা মাওলানা রেজা আলী খান সাহেব
(আ'লা হযরত কেবলার দাদাজান)

↓

তাঁর দু' স্ত্রী

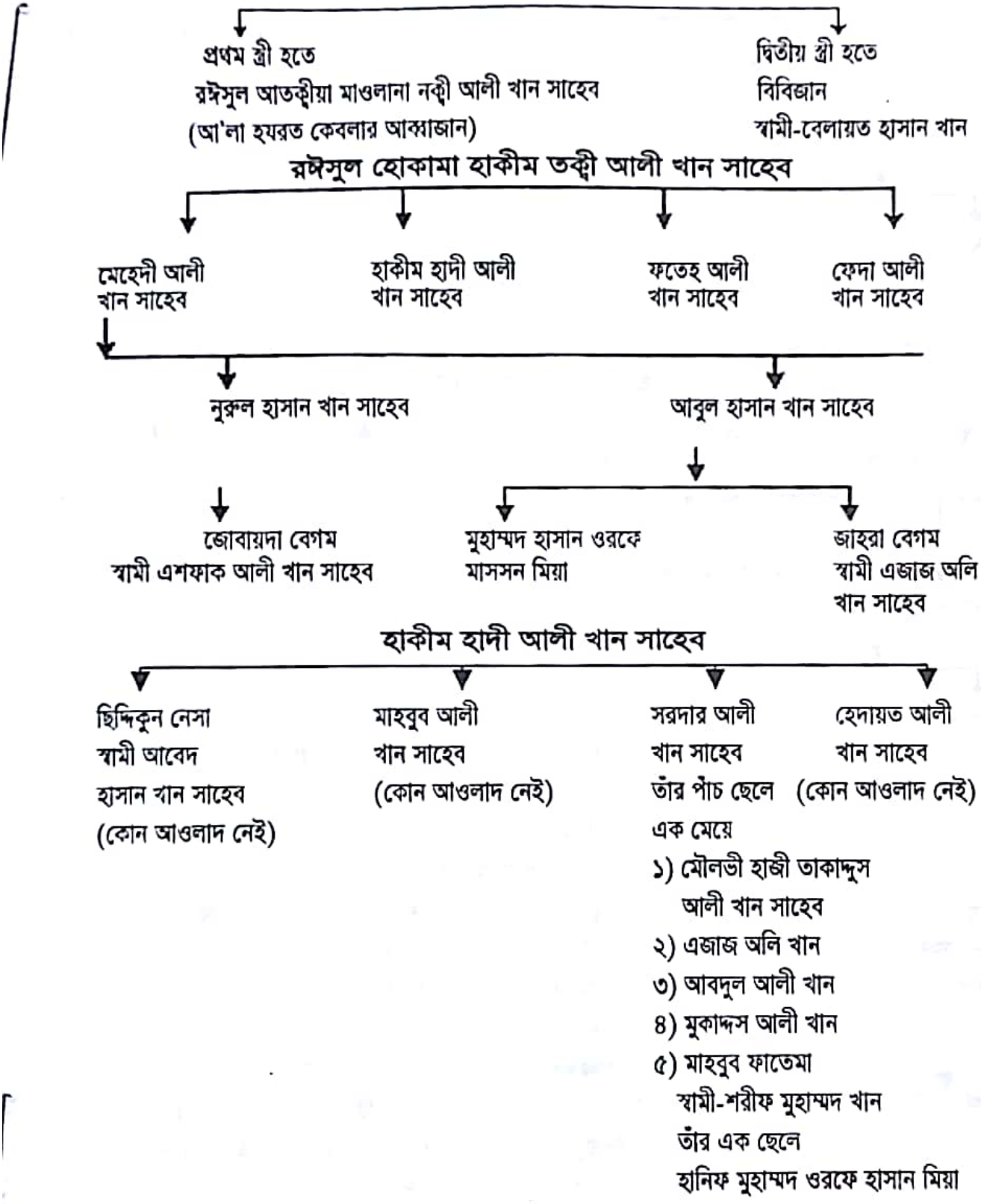
প্রথম স্ত্রী হতে
রঈসুল আতক্বীয়া মাওলানা নক্বী আলী খান সাহেব
(আ'লা হযরত কেবলার আব্বাজান)
দ্বিতীয় স্ত্রী হতে
বিবিজান
স্বামী-বেলায়ত হাসান খান
রঈসুল হোকামা হাকীম তক্বী আলী খান সাহেব
মেহেদী আলী খান সাহেব
হাকীম হাদী আলী খান সাহেব
ফতেহ আলী খান সাহেব
ফেদা আলী খান সাহেব
নুরুল হাসান খান সাহেব
আবুল হাসান খান সাহেব
জোবায়দা বেগম
স্বামী এশফাক আলী খান সাহেব
মুহাম্মদ হাসান ওরফে মাসসন মিয়া
জাহরা বেগম
স্বামী এজাজ অলি খান সাহেব
হাকীম হাদী আলী খান সাহেব
ছিদ্দিকুন নেসা
স্বামী আবেদ হাসান খান সাহেব
(কোন আওলাদ নেই)
মাহবুব আলী খান সাহেব
(কোন আওলাদ নেই)
সরদার আলী খান সাহেব
তাঁর পাঁচ ছেলে
এক মেয়ে
১) মৌলভী হাজী তাকাদ্দুস আলী খান সাহেব
২) এজাজ অলি খান
৩) আবদুল আলী খান
৪) মুকাদ্দস আলী খান
৫) মাহবুব ফাতেমা
স্বামী-শরীফ মুহাম্মদ খান
তাঁর এক ছেলে
হানিফ মুহাম্মদ ওরফে হাসান মিয়া
হেদায়ত আলী খান সাহেব
(কোন আওলাদ নেই)
ফতেহ আলী খান সাহেব
ফরহাত আলী খান সাহেব
(কোন আওলাদ নেই)
এমদাদ আলী খান সাহেব
আসগর আলী খান সাহেব
(কোন আওলাদ নেই)
মেয়ে
মেয়ে
মেয়ে
মেয়ে

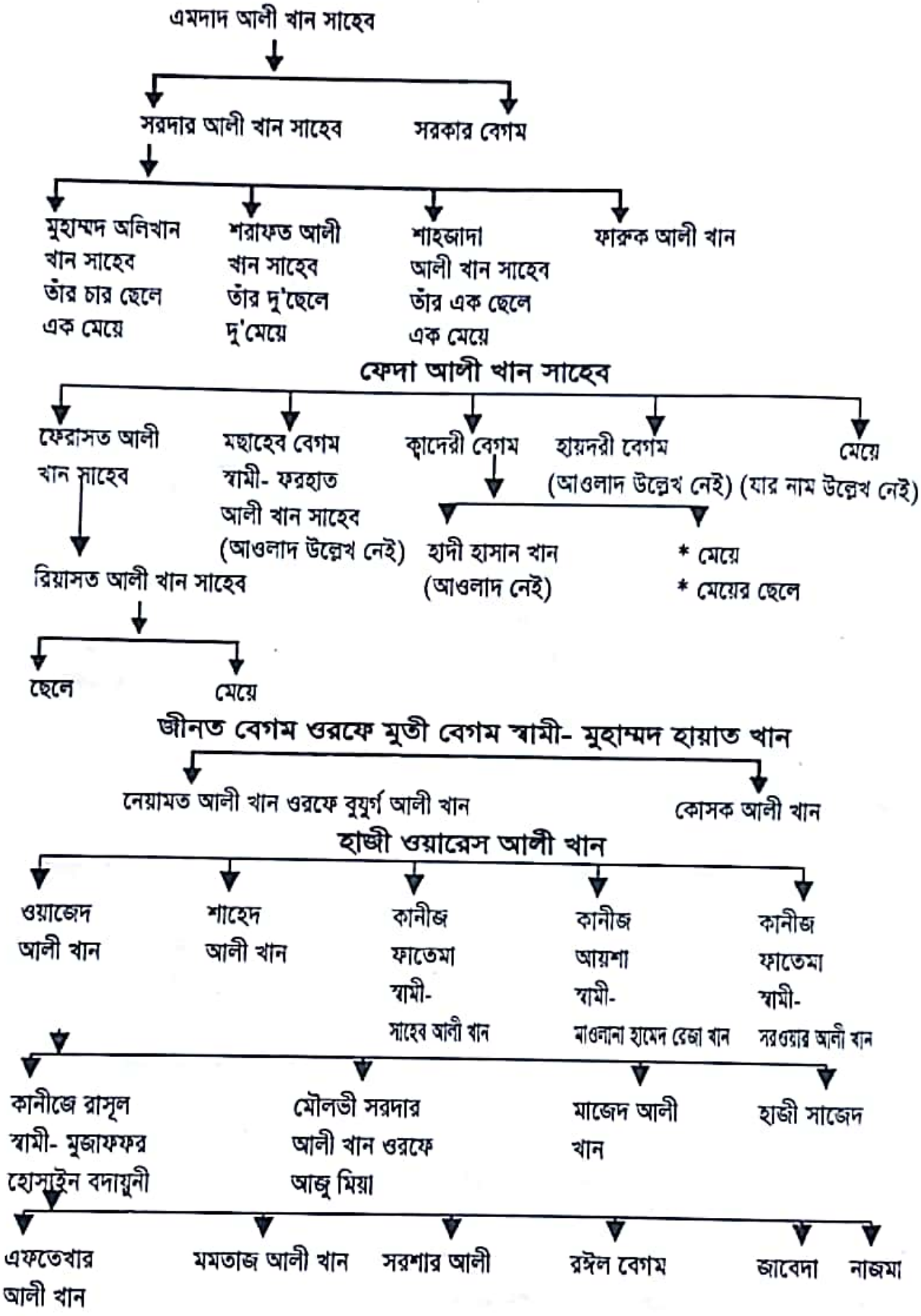
এমদাদ আলী খান সাহেব
সরদার আলী খান সাহেব
সরকার বেগম
মুহাম্মদ অলিখান খান সাহেব তাঁর চার ছেলে এক মেয়ে
শরাফত আলী খান সাহেব তাঁর দু'ছেলে দু'মেয়ে
শাহজাদা আলী খান সাহেব তাঁর এক ছেলে এক মেয়ে
ফারুক আলী খান
ফেদা আলী খান সাহেব
ফেরাসত আলী খান সাহেব
মছাহেব বেগম স্বামী- ফরহাত আলী খান সাহেব (আওলাদ উল্লেখ নেই)
কাদেরী বেগম
হায়দরী বেগম (আওলাদ উল্লেখ নেই)
মেয়ে (যার নাম উল্লেখ নেই)
রিয়াসত আলী খান সাহেব
হাদী হাসান খান (আওলাদ নেই)
* মেয়ে
* মেয়ের ছেলে
ছেলে
মেয়ে
জীনত বেগম ওরফে মুতী বেগম স্বামী- মুহাম্মদ হায়াত খান
নেয়ামত আলী খান ওরফে বুযুর্গ আলী খান
কোসক আলী খান
হাজী ওয়ারেস আলী খান
ওয়াজেদ আলী খান
শাহেদ আলী খান
কানীজ ফাতেমা স্বামী- সাহেব আলী খান
কানীজ আয়শা স্বামী- মাওলানা হামেদ রেজা খান
কানীজ ফাতেমা স্বামী- সরওয়ার আলী খান
কানীজে রাসূল স্বামী- মুজাফফর হোসাইন বদায়ুনী
মৌলভী সরদার আলী খান ওরফে আজু মিয়া
মাজেদ আলী খান
হাজী সাজেদ
এফতেখার আলী খান
মমতাজ আলী খান
সরশার আলী
রঈল বেগম
জাবেদা
নাজমা

আসফন্দ ইয়ার বেকের বড় সাহেব জাদী হোসাইনী খানমের সাথে আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেজার শ্রদ্ধেয় আব্বাজান রঈসুল আতক্বীয়া মাওলানা নক্বী আলী খান সাহেবের সাথে বিবাহ হয়।

সুতরাং আলা হযরতের আম্মাজানের নাম হল হোসাইনী খানম আর নানাজানের নাম হল আসফন্দ ইয়ার বেক।

রঈসুল আতক্বীয়া মাওলানা নক্বী আলী খান সাহেবের আওলাদদের শাজরা নিম্নরূপঃ

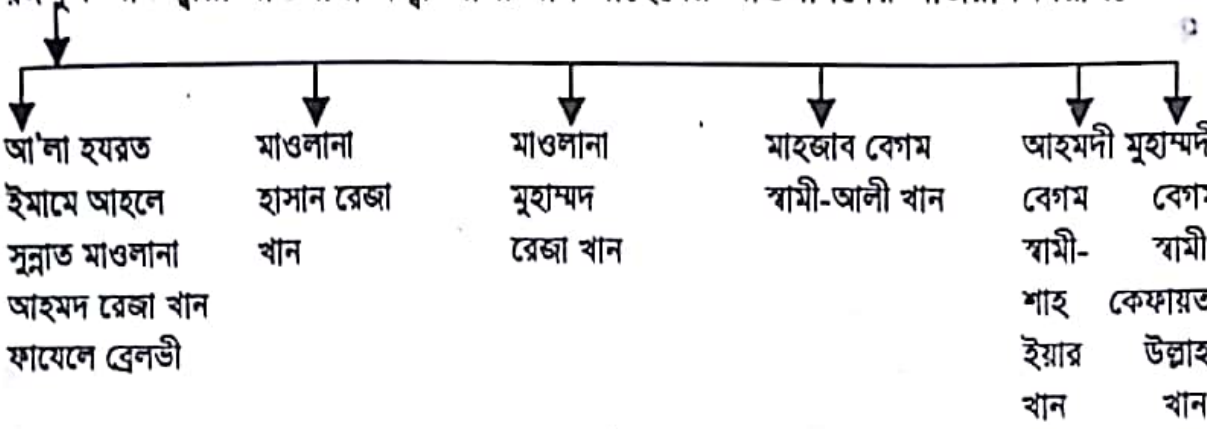

নিম্নে আ'লা হযরত কেবলার কয়েকজন পূর্বপুরুষের জীবনী সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনা করা গেলঃ

হযরত মাওলানা শাহ সা'ঈদ উল্লাহ খানঃ

যুগশ্রেষ্ঠ আলেমে দ্বীন ও বুযুর্গ ব্যক্তি হযরত মাওলানা শাহ সা'ঈদ উল্লাহ খান সাহেব আফগানিস্তানের কান্দাহারের অধিবাসী। তিনি তখনকার সময়ে তথাকার আলেমদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। মুঘল আমলে তিনি সুলতান মুহাম্মদ শাহ নাদের এবং নাসির শাহের সাথে লাহোরে আগমন করেন। আর লাহোরে তিনি পরপর কয়েকটি সম্মানিত আসনে আসীন ছিলেন। লাহোরের শীষমহল তাঁরই জায়গীর তথা বাদশাহ্ ও প্রশাসক কর্তৃক প্রাপ্ত মহল ছিলো। এরপর তিনি দিল্লী গমন করেন। সেখানেও তিনি সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত হয়ে রণ বীরত্ব উপাধি লাভ করেন। আ'লা হযরত কেবলা সে স্বনামধন্য পুরুষেরই বংশধর ছিলেন। তাঁর পূর্বপুরুষের প্রত্যেকেই তাঁদের যুগে জ্ঞান ও আমলের মূর্তপ্রতীক ছিলেন। তাঁদের অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ আলেম ও অলি ছিলেন যাদের পথপ্রদর্শনের আলো দ্বারা তৎকালীন ও তৎপরবর্তী প্রতিটি মুসলিম সমাজ বিশেষভাবে আলোকিত হয়ে আসছে।

হযরত মাওলানা সা'আদাত ইয়ার খান ঃ

হযরত মাওলানা শাহ সা'ঈদুল্লাহ খান সাহেবের সাহেবজাদা হযরত মুহাম্মদ সাআদাত ইয়ার খান সাহেবকে একটি যুদ্ধ জয়ী করার জন্য মোঘল শাসকের পক্ষ হতে রাওহিল কান্ড প্রেরণ করা হয়েছিল। তিনি ওখানে গিয়ে যুদ্ধোত্তর জয়ী বেশে ফেরার পর তাঁকে ব্রেলভীর সোবেদার বানোনার জন্য শাহী ফরমান আসল কিন্তু তিনি এরপর বেশী দিন দুনিয়াতে থাকতে পারেননি মাওলায়ে হাকীক্বীর ডাকে লাব্বায়েক বলে দুনিয়া থেকে চিরবিদায় নিলেন।

মাওলানা মুহাম্মদ আযম খান সাহেবঃ

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ সাআদাত ইয়ার খান সাহেবের সাহেবজাদা মাওলানা আযম খান সাহেব অনেক বড় সরকারী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। যার মাসিক বেতন তৎকালীন আয়ে এক হাজারের চেয়ে কম ছিল না। তিনি বেলভী তাশরীফ এনে দুনিয়াবী কাজকর্ম পরিত্যাগ করে মহল্লায়ে সিমারানে অবস্থান করলেন। ওখানে শাহাজাদার তাকিয়া তথা শাহজাদার একটি বালিশ রয়েছে যা তাঁর নামেই প্রসিদ্ধ। তিনি ওখানেই ইন্তেকাল করেছেন এবং ওখানে তাঁর মাজার শরীফ রয়েছে। তিনি কামেল অলি ছিলেন, তাঁর অনেক কারামত রয়েছে। তৎমধ্য থেকে অতি সুপ্রসিদ্ধ একটি কারামত উল্লেখ করা গেল-

কারামতঃ তাঁর শাহজাদা হযরত মাওলানা হাফেজ কাযেম আলী খান সাহেব বদায়ুন শহরের তহসিলদার ছিলেন। তিনি প্রতি বৃহস্পতিবার তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতাকে সালাম করার জন্য হাজের হতেন। একবার শীতের মৌসুমে পিতাকে দেখার ও সালাম করার জন্য যখন হাজের হলেন তখন তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতাকে দেখলেন। তিনি এ মৌসুমে আগুনের কিনারায় তাশরিফ নিলেন অথচ তাঁর শরীরে শীত পোষাক নেই। শাহজাদা তৎমূহুর্তে তাঁর পরিধেয় অত্যন্ত দামী পশমী চাদর নিজ শরীর থেকে খুলে শ্রদ্ধেয় পিতা শাহ সাহেবের কাঁধে তুলে দিলেন। কিন্তু শ্রদ্ধেয় শাহ সাহেব উক্ত চাদরখানা হাতে নিয়ে জলন্ত আগুনের মধ্যে ফেলে দিলেন। এ ঘটনা দেখে শাহজাদা সাহেব মনে মনে ধারণা করলেন, যদি এমন হত যে, চাদরখানা আগুনে না পুড়ে অন্য কাউকে দিয়ে দিত তা হলে উপকারে আসতো। এদিকে শাহজাদা সাহেব মনে মনে ধারণা করলেন ঐদিকে শাহ সাহেব শাহজাদার মনের খবর জেনে আগুনে হাত প্রবেশ করায়ে ওখান থেকে পশমী চাদরখানা বের করে ফেলে দিলেন এবং শাহজাদাকে লক্ষ্য করে বললেন, অধমের এখানে ধোয়ার কাজ করোনা অর্থাৎ তোমার পশমী কাপড়ের দামী চাদরখানা আমি আগুনে দিয়ে ধৌত করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে দিয়েছি। শাহজাদা সাহেব চাদরখানা নিয়ে দেখলেন উক্ত চাদরে আগুনের কোন প্রভাব পড়েনি অর্থাৎ আগুন উক্ত চাদরখানার একটি পশমও পুড়েনি। সুবহানাল্লাহ!

এ কারামত থেকে বুঝা যায় হযরত মাওলানা আযম খান সাহেব কত বড় কামেল অলি ছিলেন।

হযরত মাওলানা হাফেজ কাযেম আলী খান সাহেব ঃ

হযরত মাওলানা শাহ মুহাম্মদ আযম খান সাহেবের শাহজাদা হযরত মাওলানা হাফেজ কাযেম আলী খান সাহেব ছিলেন বদায়ুন শহরের সরকারী তহসিলদার (খাজনা আদায়কারী) দু'শত অশ্বারোহী ফৌজ তাঁর খেদমতে সর্বদা নিয়োজিত থাকত। মোঘল শাসন ও ইংরেজদের মাঝে যে বিশৃংখলা ও জটিলতা সৃষ্টি হয়েছিল তিনি সব সময় উহা দূরীভূত করার চেষ্টা করতেন। এ কারণে তিনি কলকাতা পর্যন্তও তাশরীফ নিয়েছিলেন।

হযরত মাওলানা শাহ রেজা আলী খান সাহেব ঃ

হযরত হাফেজ কাযেম আলী খান সাহেবের স্বনামধন্য শাহজাদা তৎকালীন যুগের কুতুব মাওলানা শাহ রেজা আলী খান সাহেব স্বীয় যুগের তুলনাহীন আলেমেদ্বীন ও অলিয়ে কামেল

ছিলেন। আ'লা হযরত কেবলার খান্দানের মধ্যে তাঁর সময় থেকেই শাসনভারের রং পরিবর্তন হয়ে দরবেশী তথা আধ্যাত্মিকতার ফুল পরিস্ফুটিত হয়ে উঠে। তাঁর পূর্বের বুযুর্গদের অবস্থা ছিল তাঁরা প্রথমে সরকারী গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হতেন। পরিশেষে উহা থেকে পৃথক হয়ে এবাদত বন্দেগীতে নিয়োজিত হয়ে যেতেন। কিন্তু এ ধারাবাহিকতা হযরত রেজা আলী খান সাহেব পর্যন্ত এসে সমাপ্ত হয়ে গেল। অতএব তিনি দুনিয়াবী হুকুমতের কোন পদ গ্রহণ না করে শুরু থেকেই ধার্মিকতা, তাকওয়া, দরবেশী ও সূফী দর্শনের জীবন যাপন করতে লাগলেন। তিনি টোওনক শহরের মৌলভী খলিলুর রহমান থেকে বিভিন্ন বিষয়ে বিদ্যা অর্জন করে বাইশ বছরে সনদ লাভ করেন। তাঁর জ্ঞানের প্রসিদ্ধি গোটা হিন্দুস্তানের দূর দূরান্ত পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করেছিল। তিনি অনেক তাত্ত্বিক বক্তব্য পেশ করতেন যা সহসাত মানুষকে বিমোহিত করে ফেলত। প্রাঞ্জল ভাষায় কথা বলা, সালাম দেয়া, ধার্মিকতা, অল্পতুষ্টি , জ্ঞানচর্চা ও বিনয়ী তাঁর বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি আধ্যাত্মিক জগতের কত বড় ব্যক্তিত্ব ছিলেন তা বুঝার জন্য তাঁর অসংখ্য কারামত থেকে দু'একটি কারামত বর্ণনা করা গেল।

কারামতঃ

হুজ্জাতুল ইসলাম মুরশেদুল আজম শাহজাদায়ে আ'লা হযরত মাওলানা আলহাজ্ব আশ্ শাহ মুহাম্মদ হামেদ রেজা খান সাহেব (আলাইহির রাহমাতু ওয়ার রিদওয়ান) কুতবে দাওরা হযরত মাওলানা শাহ রেজা আলী খান সাহেবের কামালাত ও কারামাত বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, হযরত মাওলানা রেজা আলী খান সাহেব একদা ফাল্গুন মাসে অনুষ্ঠিত হিন্দুদের একটি উৎসবের দিনে সিতারাম গলির দিকে গমণ করলেন। যেহেতু হিন্দুদের উৎসবের দিন ছিল তাই একটি হিন্দু নারী- যে পেশায় বাজারের নর্তকী ছিল, সে তার ঘর থেকে হযরত শাহ সাহেবের উপর রং নিক্ষেপ করল। এ ঘটনা সর্ব সাধারণের চলাচলের রাস্তায় ঘটেছিল। যখন কিছু মুসলমান উক্ত ঘটনাকে দেখল তৎক্ষনাত তারা একত্রিত হয়ে ঐ নর্তকী মহিলার ঘরের সামনে গিয়ে তার সাথে কঠোর আচরণ করতে চাইল কিন্তু হযরত শাহ সাহেব তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, ভাই আপনারা তাকে কেন শ্বাসাতে চাচ্ছেন সেতো আমার উপর রং দিয়েছেন এর বদলায় খোদা তাকে রং দেবেন। শাহ সাহেব কেবলা এ কথা বলতে না বলতেই ঐ নর্তকী শঙ্খিতাবস্থায় হযরত শাহ সাহেব কেবলার কদমে ঝুকে পড়লেন এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন আর ঐ সময়ে সে হযরত শাহ সাহেবের হাত মোবারকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন।

কারামতঃ

জনাব ওয়ারেস আলী খান সাহেব সওদাগরান মহল্লায় থাকতেন। একদা সে হযরত মাওলানা শাহ রেজা আলী খান সাহেবের খেদমতে হাজের হয়ে তাঁর থেকে কর্জ হিসেবে কিছু টাকা নিলেন, জনাব ওয়ারেস আলী খান সাহেব যেহেতু যুবক ছিলেন সেহেতু টাকা ধার নেয়ার সময় শাহ সাহেব তাকে বললেন, ওয়ারেস আলী খান তুমি এ টাকা অপচয় করবে না, অশোভন কাজে ব্যয় করবে না। সে অপচয় করবে না বলে স্বীকার করল এবং শাহ সাহেবের নিকট থেকে চলে গেল। ঐ দিনেই সে উক্ত টাকা নিয়ে একজন নর্তকীর

কাছে গেল। যখন ঐ নর্তকীর ঘরের সিঁড়ি পর্যন্ত গেল তখন সে দেখতে পেল ওখানে হযরত শাহ সাহেবের লাঠি ও ছাতা রাখা হয়েছে। এগুলো দেখে সে ওখান থেকে উল্টো পায়ে ফিরে আসল। দ্বিতীয় নর্তকীর ঘরে গেল ওখানেও একই দৃশ্য দেখতে পেল, ওখান থেকে ফিরে আসল। এবার তৃতীয় আরেক নর্তকীর ঘরে গেল সেখানেও একই দৃশ্য দেখতে পেল এবং সেখান থেকে ফিরে এসে অবশেষে শাহ সাহেবের খেদমতে হাজির হয়ে খাটিভাবে তওবা করল।

ইন্তেকালঃ

কুতবে দাওরা হযরত মাওলানা রেজা আলী খান সাহেব ২রা জমাদিউল উখরা ১২৮৬ হিজরীতে ইন্তেকাল ফরমায়েছেন।

আরেফ বিল্লাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম নক্বী আলী খান সাহেবঃ

তৎকালীন সময়ের কুতুব হযরত মাওলানা শাহ রেজা আলী খান সাহেবের শাহজাদা হলেন লেখক সম্রাট মুনাজেরীনদের সুলতান হযরত আল্লামা মুফতী নক্বী আলী খান সাহেব (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)।

জন্মঃ হযরত আল্লামা নক্বী আলী খান সাহেব মহল্লায়ে জহীরা ব্রেলী শরীফে রমজান মাসের এক তারিখ ১২৪৬ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেন।

লেখাপড়া ঃ

হযরত মাওলানা মুফতী শাহ নক্বী আলী খান সাহেব তার শ্রদ্ধেয় পিতা তখনকার সময়ের কুতুব হযরত মাওলানা শাহ রেজা আলী খান সাহেবের নিকট থেকেই জাহেরী ও বাতেনী যাবতীয় জ্ঞানার্জন করেন।

ব্যক্তিত্বঃ

তিনি ছিলেন স্বীয় যুগের সুখ্যাতিসম্পন্ন জ্ঞানী, বিখ্যাত পন্ডিত, সুগভীর ও সুদুরপ্রসারী চিন্তাবিদ, সুক্ষদর্শিতা, অনন্য লেখক ও সফল তর্কবীদ। তাঁর সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য এটাই যে, আল্লাহ তায়ালা তাকে রাসূলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মিল্লাতের খেদমত, গোলামী ও রাসূলে পাকের দুশমনদেরকে ঘৃণা ও তাদের প্রতি কঠোরতা প্রদর্শনের জন্য সৃষ্টি করেছেন।

দ্বীনি খেদমতঃ

লেখাপড়ার সমাপ্তিলগ্নে সনদ লাভ করার পর ফতোয়া প্রদান ও জমিদারী এ দুটি কাজ তাঁকে অর্পন করা হলো। তিনি ফতোয়া প্রদান ব্যতীত ছোট বড় মোট ২৫টি কিতাব রচনা করেছেন। তন্মধ্যে নিম্নোক্ত কয়েকটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

১) সুরুরুর কুলুব ফি যিকরিল মাহবুব ২) জাওয়াহেরুল বয়ান ফি আসরারির আহকাম ৩) আল কালামুল আওযাহ ফি তাফসীরে সুরায়ে আলাম নাশরাহ। এগুলো এমন কিতাব যার প্রতিটি লাইনে রাসূলে পাকের রেসালতের মর্যাদা ও ইশ্‌কে রাসূলের ঝর্ণা ফুলে উঠছে এ ধরনের অনুভব হবে। কিতাবগুলো পড়লে অন্তর রাসূলের ইশ্‌কে ভরে উঠতে ও চোখ মুহাব্বতের মধ্যে কান্নাসজল হতে দৃষ্টিগোচর হবে।

আল্লামা নক্বী আলী খান দেশের স্বনামধন্য ব্যক্তি ছিলেন। হিন্দুস্তানের ভাল আলিমদের মধ্যে অন্যতম একজন হিসেবে পরিগণিত হতেন। তিনি পরিচিত হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, তিনি মুজাদ্দেদে আজম আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা খান (রাদিয়াল্লাহু আনহুর) পিতা তাঁর শিক্ষক ও তাঁকে লালন পালন করেছেন।

বায়'য়াত, খেলাফত ও হাদীসের সনদ লাভঃ

হযরত আল্লামা মুফতী শাহ নক্বী আলী খান সাহেব ১২৯৪ হিজরীতে মারেহারা শরীফ গমন করে তখনকার কুতুব শেখে কামেল হযরত শাহ আলে রাসূল রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর মুরীদ হলেন এবং পীরে মুর্শিদ কেবলা একই মজলিসে তাঁকে খেলাফত দান করেন। হযরত মুফতী নক্বী আলী খান সাহেব ১২৯৫ হিজরীতে পবিত্র হারামাইনে শরীফাইনে যিয়ারত করেন এবং হযরত সৈয়্যদ আহমদ দেহলান ও অন্যান্য ওলামায়ে কেরাম থেকে হাদীসের সনদ লাভ করেন।

বেছাল মোবারক ঃ রঈসুল আতক্বীয়া মুফতী নক্বী আলী খান সাহেবের শেষ বয়সে বাতেলেরা তাঁর উপর যাদু করল কিন্তু তাঁর আধ্যাত্মিক ক্ষমতার কারণে যাদুর প্রভাব কোন কাজ করতে পারল না, পরে আবার যাদু করল এবার কিছুটা যাদুর প্রভাব তাঁর উপর পড়ল। এমতাবস্থায়, চার বছর পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন। অবশেষে জিলক্বদ মাসের শেষ তারিখ ১২৯৭ হিজরী মোতাবেক ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ইন্তেকাল ফরমান। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন।

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেজা ফাযেলে ব্রেলভী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)'র পরিচিতিঃ

জন্মঃ

কলমের অধিরাজ, জ্ঞানের অতল সাগর, জ্ঞানের বিশ্বকোষ, নবী রাসূলদের উত্তরসূরী,হাক্বীক্বত-মারফতের সমূদ্রের ডুবুরি, দ্বীনো-মিল্লাতের উজ্জ্বল প্রদ্বীপ,ফিক্বাহবিদ ও হাদীসবেত্তাদের উজ্জ্বল রবি, রাসূলে পাকের মো'জেজা সমূহের অন্যতম একটি মো'জেজা, তাজেদারে বেলায়ত, পয়করে আহলে সুন্নাত, ইমামে আহলে সুন্নাত, হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দেদে আজম, আপন যুগের ইমামে আজম, স্বীয় যুগের অনন্য ব্যক্তিত্ব, যমানার গৌরব, জগৎ প্রেমের বহমান প্রাণ, দ্বীন দুনিয়ার জ্ঞান রহস্যের প্রকাশক, মুহাব্বতে হাক্বীক্বীর তারজুমা, রোগ্ন চোখের নয়নরঞ্জনকারী, ব্যথাতুর মনে শান্তনা দানকারী, গরীব দরদী, আর্ত মানবতার ত্রাণকর্তা, নবীর সুন্নাত কায়েমকারী, অসহায়দের কান্ডারী, কান্তার মরু পারকারী, অন্যায়ের রোধক, ন্যায়ের পথ প্রদায়ক, গরীবের অভিস্না পূর্ণকারী, রাসূলে পাকের আশেক, গাউছে পাকের নায়েব, হযরতুলহাজ্ব আল্লামা মাওলানা হাফেজ ক্বারী মুফতী হাকীম আশ্ শাহ আবদুল মুস্তফা মুহাম্মদ আহমদ রেজা খান সাহেব ফাযেলে ব্রেলভী (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) ব্রেলী শরীফের জহীরা মহল্লায় (যা প্রথমে তাঁর পিতৃপুরুষ বিশেষতঃ তাঁর দাদাজান হযরত আল্লামা শাহ মুহাম্মদ রেজা আলী খাঁন সাহেবের অবস্থান স্থল ছিল) ১০ শাওয়ালুল মুকাররম ১২৭২ হিজরী, রোজ-শনিবার জোহর ওয়াক্ত মোতাবেক) ১৪ জুন ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দ অনুযায়ী ১১ জৈষ্ঠ্য চান্দ্র মাসের দ্বিতীয়ার্ধ ১৯১৩ বিক্রমী

বৎসর রোজ শনিবার জোহরের সময়ে সম্ভ্রান্ত বংশে ইমামুল আতক্বীয়ার অভাব শূণ্য পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। আ'লা হযরত কেবলা নিজেই প্রসিদ্ধ আবজাদ হিসাবানুযায়ী কোরানে কারীমের নিম্নোক্ত আয়াত তাঁর জন্মসাল জ্ঞাপক বলে বর্ণনা করেছেন-আয়াতটি হচ্ছে-

اولئك كتب فى قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه

(উলা-ইকা কাতাবা ফী কুলুবিহিমুল ঈমানা ওয়া আইয়্যাদাহুম বিরূহিম মিনহু)

অর্থাৎ এরা হচ্ছে ঐ সব লোক, যাদের অন্তরগুলোতে আল্লাহ ঈমান অঙ্কিত করে দিয়েছেন এবং তাঁর নিকট থেকে জিব্রাঈল আমীন দ্বারা তাদের সাহায্য করেছেন। (সূরা মুজাদালাহ, আয়াত নং-২২, পারা নং-২৮)

উক্ত আয়াতে কারীমার মর্মার্থ বাস্তবে আলা হযরতের জীবনে প্রতিফলিত হয়েছে। তাইতো তিনি বলেছেন, আমার হৃদয়কে যদি দু'ভাগ করা হয় তাহলে একভাগে থাকবে লা-ইলাহা ইল্লালা অপর ভাগে থাকবে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। আলা হযরত কেবলার জন্ম সাল হলো ১২৭২ হিজরী। এখন নিম্নে আয়াতে কারীমাটির আবজাদ হিসাব করে ১২৭২ হিজরী বের করে দেখানো হলঃ

اولئك كتب فى قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه

اولئك = ৫৮ ا = ১ و = ৬ ل = ৩০ ء = ১ ك = ২০ ৫৮	كتب = ৪২২ ك = ২০ ت = ৪০০ ب = ২ ৪২২	فى = ৯০ ف = ৮০ ى = ১০ ৯০	قلوبهم = ১৮৩ ق = ১০০ ل = ৩০ و = ৬ ب = ২ ه = ৫ م = ৪০ ১৮৩	الايمان = ১৩২ ا = ১ ل = ৩০ ى = ১০ م = ৪০ ا = ১ ن = ৫০ ১৩২

وايدهم = ৭৬ و = ৬ ا = ১ ى = ১০ د = ৪ ه = ৫ م = ৪০ ৭৬	بروح = ২১৬ ب = ২ ر = ২০০ و = ৬ ح = ৮ ২১৬	منه = ৯৫ م = ৪০ ن = ৫০ ه = ৫ ৯৫

৫৮+৪২২+৯০+১৮৩+১৩২+৭৬+২১৬+৯৫ = ১২৭২ হিজরী

আ'লা হযরত কেবলার নাম ঃ

আ'লা হযরত কেবলার আযানী নাম হল মুহাম্মদ তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতা আহমদ মিয়া বলে তাঁকে ডাকতেন তাঁর বুযুর্গ দাদা তাঁর নাম রাখলেন আহমদ রেজা। তাঁর শ্রদ্ধেয়া আম্মাজান পরম স্নেহের সাথে তাঁকে আম্মান মিয়া বলে সম্বোধন করতেন। আ'লা হযরত কেবলা নিজেই তাঁর নামের পূর্বে আবদুল মুস্তফা, মুস্তফা (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামে)'র গোলাম সংযোজন করতেন। তাঁর তারিখি নাম হল আল মুখ্‌তার অর্থাৎ আল মুখ্‌তার শব্দের আবজাদ সংখ্যা বের করলে ১২৭২ হিজরী হয়, যাতে আলা হযরত কেবলা জন্ম গ্রহণ করেছেন।

আ'লা হযরতের জন্মের পূর্বে ও পরের কিছু কথাঃ

আ'লা হযরত কেবলা দুনিয়াতে তাশরীফ আনার পূর্বে তাঁর বুযুর্গ পিতা আল্লামা মুফতী শাহ নক্বী আলী খান সাহেব একটি চিত্তাকর্ষক স্বপ্ন দেখলেন। সকালে তাঁর পিতা কুতবে যমান হযরত মাওলানা শাহ রেজা আলী খান সাহেবের নিকট উক্ত স্বপ্ন বর্ণনা করলে তিনি এর ব্যাখ্যা দিয়ে বললেন, তোমার ঘরে এমন এক পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করবে, যে নিজ গুণাবলী ও যোগ্যতা দ্বারা পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম সর্বত্রই সুপরিচিত হবে এবং মারেফতের সমুদ্র প্রবাহিত করে জ্ঞান পিপাসুদের পিপাসা নিবারণ করবে।

আ'লা হযরতের জন্মের পর তাঁর শ্রদ্ধেয় দাদা কুতবে যমান হযরত মাওলানা শাহ রেজা আলী খান সাহেব তাঁকে কোলে নিয়ে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন এ সন্তান একজন দেশবরেণ্য, পৃথিবী বিখ্যাত, সুখ্যাতিসম্পন্ন ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী আলিম হবে।

আ'লা হযরত কেবলার জন্মের পর তাঁর আক্বীক্বার তারিখে রঈসুল আতক্বীয়া মাওলানা নক্বী আলী খান সাহেবকে স্বপ্নে সুসংবাদ দেয়া হয় যে, তোমার এ সন্তান একজন সুখ্যাতি সম্পন্ন জ্ঞানী, গুণী ও আরিফ বিল্লাহ হবে।

আ'লা হযরত কেবলার ছোট কালের একটি ঘটনাঃ একদিন আ'লা হযরত কেবলার ঘরের দরজায় এসে এক অপরিচিত ব্যক্তি আহবান করলেন তাঁর আহবান শুনে আলা হযরত কেবলা বাইরে আসলেন। এসে দেখলেন, এক বুযুর্গ ব্যক্তি। তিনি তাঁকে সম্বোধন করে বললেন, "আসুন" আ'লা হযরত তাঁর নিকটে গেলে লোকটি তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করলেন, "তুমি একজন দেশ বরেণ্য প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন হবে।"

আ'লা হযরত কেবলার ভাই-বোন ঃ

রঈসুল আতক্বীয়া হযরত নক্বী আলী খান সাহেবের তিন ছেলে ও তিন মেয়ে ছিল অর্থাৎ আ'লা হযরত কেবলার ভাই-বোন মোট ছয়জন ছিল। তিন বোনের মধ্যে ছোট বোন যুবতী অবস্থায় ইন্তেকাল ফরমান আর বাকী দু' বোন ছিল আলা হযরত কেবলার বড় অর্থাৎ আ'লা হযরত কেবলা দু' বোনের ছোট ছিলেন কিন্তু ভাইদের মধ্যে বড় ছিলেন। তবে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত আলা হযরত কেবলাকে সম্মানের মধ্যে সবচেয়ে বড় করেছেন। ছোট বড় সকলেই তাঁকে এক সমান সম্মান করতেন। আ'লা হযরত কেবলার শ্রদ্ধেয় পিতা যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন পর্যন্ত তিনি নিজেই আ'লা হযরত কেবলার প্রতিটি প্রয়োজনের প্রতি

সজাগ দৃষ্টি রাখতেন। এমনকি তাঁর বিশেষ খাবার ও পোষাকাদি নিজে এন্তেজাম করে দিতেন। প্রায় ৫৩ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল ফরমান। আ'লা হযরত কেবলার প্রাথমিক জীবনেই পিতার ছায়া মাথা হতে উঠে গেল এবং ভাইদের মাঝে বড় হওয়ার কারণে এলাকার সকল কাজ আ'লা হযরত কেবলার হাতে অর্পণ করা হলো। এলাকার জমিদারীর কাজ এক দু' সপ্তাহ বা এক দু' বছর পর্যন্ত করলেন। যেহেতু এলাকার তহসীলদারীত্বের কাজ তাঁর স্বভাবের বিপরীত ছিল বিধায় শ্রদ্ধেয়া মাতার মর্জি অনুযায়ী সকল এলাকার তহসীলদারীর কাজ স্বীয় মেঝো ভাই মৌলভী হাসান রেজার হাতে অর্পন করে তিনি উহা হতে এমনভাবে দায়িত্বমুক্ত হলেন যে, উহার প্রতি আর কখনো ফিরে তাকাননি।

আ'লা হযরত কেবলার বাল্যজীবনঃ

আ'লা হযরত কেবলা ছোটকাল থেকেই অন্যান্য বাচ্চাদের সাথে খেলাধূলা করতেন না। মহল্লার বাচ্চারা কখনো ঘরে এসে খেলতেন আ'লা হযরত কেবলা তাদের সাথে খেলায় শরীক হতেন না বরং তাঁদের দিকে তাকায়ে থাকতেন। বাচ্চাদের মাঝে কাগজের ঘুড়ি উড়ানোর প্রচলন ছিল। তিনি ঘুড়িও উড়াতেন না। যদি কারো কোন ঘুড়ি সূতা থেকে ছুটে তাঁর ঘরের উপর পতিত হত তখন তিনি তা নিয়ে তাঁর ঘরের খাটের নিচে রেখে দিতেন। তাঁর পিতা ঘুমানোর জন্য যখন বিছানায় যেতেন তখন পালঙ্কের নিচে ঘুড়ি দেখে জিজ্ঞাসা করতেন এখানে ঘুড়ি কে রেখেছে? উত্তরে বলা হতো আম্মান মিয়া (আ'লা হযরত কেবলার ডাক নাম) উত্তর শুনে তাঁর পিতা বলতেন, সে তো নিজে ঘুড়ি উড়ায় না আমাকে উড়ানোর জন্য রেখে দিয়েছে নাকি। হ্যাঁ আ'লা হযরত কেবলাকে তো আল্লাহ তায়ালা খেলাধুলার জন্য সৃষ্টি করেননি। বরং তাঁকে দ্বীনের খেদমতের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে তাইতো তিনি কোন দিন খেলা করেননি। শিশুকালের মধ্যেই তাঁর ললাটে সৌভাগ্যশালীতার চিহ্ন সুস্পষ্ট ছিল। আর প্রকৃত অর্থে বলা যায় যে,যে বাচ্চা প্রাথমিক অবস্থায় এত ভাগ্যবান ও আশাপ্রদ সেতো ভবিষ্যতে জ্ঞানে গুণে, মান মর্যাদায় রবি হয়ে দীপ্তি ছড়াবেই।

আ'লা হযরত কেবলার ছোটকালের আরেকটি ঘটনা ঃ

ব্রেলী শরীফের একটি মসজিদে মাজযুব বশির উদ্দীন সাহেব থাকতেন। যে কোন মানুষ তাঁর কাছে যেত তিনি তাকে মন্দ কথা বলতেন। আলা হযরত কেবলার মনে তাঁর সাথে দেখা করার আগ্রহ সৃষ্টি হল। একদা তিনি তাঁর নিকট গেলেন, গিয়ে বিছানায় বসে গেলেন। বশির উদ্দীন সাহেব পনের বিশ মিনিট ধরে তাঁর প্রতি গভীর দৃষ্টিতে থাকায়ে রইলেন। তৎপর জিজ্ঞেস করলেন তুমি রেজা আলী সাহেবের কি হও? তিনি উত্তর দিলেন, আমি উনার পৌত্র। ইহা শুনে তিনি বললেন, তাড়াতাড়ি উঠুন এবং চৌকির প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, এখানে তাশরীফ রাখুন।

ইসলামী নিদর্শনাদীর হেফাজত ও রক্ষণাবেক্ষণের যে বর্ণনাদী তাঁর ইতিহাসের সাথে সংশ্লিষ্ট উহার সূচনাও তাঁর বাল্যকাল থেকেই হয়েছে।

একদিন শিক্ষক মহোদয় বাচ্চাদেরকে পড়াচ্ছেন। একজন বাচ্চা এসে সালাম দিলেন। উস্ত-াদ মহোদয় সালামের জবাবে বললেন, জীতে রহো (জীবিত থাক) তৎক্ষনাত হযরত ইমাম

আহমদ রেজা ফাযেলে ব্রেলভী উস্তাদের খেদমতে আরজ করে বললেন, এটাতো সালামের জবাব হয়নি। শিক্ষক মহোদয় জিজ্ঞাসা করলেন, উহার জবাব কি হবে? আ'লা হযরত আরজ করলেন, উহার জবাব ওয়ালাইকুমুস সালাম হবে। ইহা শুনে উস্তাদ অনেক খুশী হলেন এবং তাঁর জন্য অনেক দোয়া করলেন।

পবিত্র রমজান মাস ছিল, আ'লা হযরত কেবলা প্রথম রোযা রাখলেন। তাঁর ইফতারের জন্য বিভিন্ন রকমের ইফতারী তৈয়ার করা হল। ঐ ইফতারীর মধ্যে ফিরনীও ছিল। ঐ বছর রমজান মাসে অসহ্য গরম পড়ছিল। শ্রদ্ধেয় পিতা তাঁকে নিয়ে একটি ঘরে তাশরীফ নিলেন, যেখানে ফিরনী রাখা হয়েছে। শ্রদ্ধেয় পিতা বললেন, ফিরনী নিয়ে খাও। আলা হযরত কেবলা আবেদন করলেন, আমিতো রোযা রেখেছি কিভাবে খাব? শ্রদ্ধেয় পিতা বললেন, বাচ্চাদের রোযা এভাবে হয়। আচ্ছা আমি দরজা বন্ধ করে দিচ্ছি তুমি খাও, কেউ দেখবে না। কেউ জানবে না। চুপে চুপে খেয়ে নাও। তিনি উত্তরে বললেন, যার হুকুমে রোযা রেখেছি তিনি তো দেখতেছেন। একথা শুনে পিতা মহোদয়ের চোখ থেকে পানি বের হয়ে গেল। দরজা খোলে কক্ষ থেকে তাঁকে বাহিরে নিয়ে আসলেন। খোদার শোকরিয়া আদায় করলেন। এজন্য যে, এ বাচ্চা কখনো খোদার হুকুমের বরখেলাপ করবে না।

যিনি চরম ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায়, কমজুরী ও কম বয়সে প্রত্যেকটি ফরয তাঁর উপর ফরয হওয়ার পূর্বে পূর্ণভাবে আদায় করেছেন।

রোযা রাখার ব্যাপারে না তিনি তাঁর বড়দের থেকে শুনেছেন না তাঁর সমবয়সীরা তাঁকে বলেছেন। তাঁর সমবয়সীরা বলেন, আমরা তাঁকে কখনো রোযা কাযা করতে দেখেনি।

এক বছর হযরত কেবলার পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলী পেকে গিয়েছিল। উহা অপারেশন করার জন্য তৎকালীন ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ সার্জন যাকে মারাত্মক অপারেশনের জন্য নেয়া হত তার নাম ছিল মাওলা বক্স। তাকে এনে আ'লা হযরত কেবলার বৃদ্ধাঙ্গুলী অপারেশন করা হল। তিনি অপারেশন করে ব্যান্ডেজ করে আবেদন করলেন, হুজুর যদি নড়াচড়া না করেন তাহলে এ জখম দশ বার দিনের মধ্যে শুকিয়ে যাবে। ব্যতিক্রম হলে শুকাতে বেশী সময় লাগবে। তিনি এ কথা বলে চলে গেলেন। আ'লা হযরত কেবলা বললেন এটা কিভাবে সম্ভব- মসজিদে হাজির হয়ে জমাতে শরীক হব না? না এটা অসম্ভব। যখন জোহরের ওয়াক্ত হল তখন তিনি অযু করলেন দাঁড়াতে পারতেছেন না বসে বসে ঘরের দরজায় চলে আসলেন। এ অবস্থা দেখে লোকেরা চেয়ার এনে তাঁকে উহার উপর বসায়ে মসজিদে নিয়ে আসলেন। এ সময় মহল্লাবাসী ও তাঁর পরিবারের লোকেরা এ সিদ্ধান্ত নিল যে, মাগরিবের ওয়াক্ত ছাড়া প্রত্যেক আযানের পর আমাদের থেকে চারজন শক্তিশালী ব্যক্তি চেয়ার নিয়ে তাঁর কক্ষে গিয়ে তাঁকে খাটের উপর থেকে চেয়ারে বসায়ে মসজিদে নিয়ে মেহরাবের কাছে বসাবে আর মাগরিবের সময় ওয়াক্ত অনুসারে হাজির হয়ে চেয়ারে বসায়ে নিয়ে আসবে। এ ধারাবাহিকতা প্রায় এক মাস পর্যন্ত নিয়মিত ভাবে চলতে লাগল। যখন জখম ভাল হল এবং তিনি নিজে চলার উপযুক্ত হলেন তখন এ ধারাবাহিকতা শেষ হল। ঘটনা বর্ণনাকারী হযরত মাওলানা হাসনাইন রেজা খান সাহেব বলেন, যে চার ব্যক্তি আলা হযরত কেবলাকে চেয়ারে

বসায়ে মসজিদে নিয়ে আসত তন্মধ্যে আমি একজন ছিলাম এবং আমি এ আমলকে নিজের মুক্তির বড় মাধ্যম হিসাবে মনে করি। নামাযতো নামাযই, উহার জমাত পরিত্যাগ করা শরয়ী কোন ওযর ছাড়া জায়েয নেই। আলা হযরত কেবলার সমবয়সী এবং তাঁর থেকে বয়সে বড় এমন কতিপয় ব্যক্তিদের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, তিনি সূচনা থেকেই জামাত সহকারে নামায আদায় করার খুবই পাবন্দ ছিলেন। এমনকি বালেগ হওয়ার পূর্বেই তিনি আসহাবে তারতীবে দাখিল হয়ে ওফাত পর্যন্ত সাহেবে তারতীবই রইলেন। অর্থাৎ পাঁচ ওয়াক্ত নামায জমাত সহকারে আদায় করতেন।

বিসমিল্লাহ্ পাঠ ঃ

তাঁর বিসমিল্লাহ্ পাঠ তথা প্রাথমিক শিক্ষা কত বছর বয়সে হয়েছিল তা সম্পর্কে সঠিক কোন তথ্য পাওয়া যায় না, যৎকিঞ্চিত জানা যায় তাও অপ্রতুল, তবে এতটুকু জানা যায় যে, তিনি ৪ বৎসর বয়সে পবিত্র কুরআনূল করিমের পাঠ শেষ করেছিলেন। কিছু ব্যক্তিদের ধারণা যে, তিন বৎসর বয়সে কুরআন শরীফের নাজেরা শেষ করেছিলেন।

শৈশবেই বিদ্যার আগ্রহঃ

বাচ্চারা সাধারণত শিক্ষার প্রতি তেমন মনোযোগী হয় না যতটুকু খেলাধুলার প্রতি হয়। আ'লা হযরত ছিলেন এর ব্যতিক্রম । তিনি খেলাধুলার প্রতি মন না দিয়ে পড়া লেখার প্রতি বেশী আগ্রহী ছিলেন। তিনি স্বআগ্রহে প্রতিদিন পড়ার জন্য শিক্ষক মহোদয়ের নিকট যেতেন। এমনকি জুমাবারেও পড়ার জন্য যেতে চাইলেন কিন্তু পিতা মহোদয়ের বুঝানোর কারণে গেলেন না। আর বুঝে নিলেন এ দিন বড়ই গুরুত্বপূর্ণ দিন। তাই এ দিন ছাড়া বাকী ৬দিন পড়া উচিত। তাইতো মনীষীরা বলেছেন, আ'লা হযরতের জীবনটাই বৈচিত্রময়।

শৈশবেই অসাধারণ মেধা শক্তির পরিচয় ঃ

তাঁর পান্ডিত্যের গভীরতা যে অসাধারণ পরিচয় বহন করে তা নিম্নের একটি ঘটনা থেকে দিবালোকের ন্যায় প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁর শিক্ষক মহোদয় নিয়ম মোতাবেক বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম পড়ানোর পর আলিফ, বা তা ছা যেভাবে পড়ানো হয় সেভাবে পড়ালেন, আ'লা হযরত কেবলাও তাঁর মুখে মুখে পড়ছিলেন। যখন লাম-আলিফ পর্যন্ত আসল তখন তিনি উচ্চারণ না করে চুপ করে বসে রইলেন। উস্তাদজী বললেন, মিয়া বলো, লাম-আলিফ। এবার আ'লা হযরত কেবলা আরজ করলেন, হুজুর এ দুটা বর্ণ তো পড়েছি, আলিফ ও পড়েছি লাম ও পড়েছি। এটা দ্বিতীয়বার পড়বো কেন। ঐ সময় আলা হযরতের পিতামহ কুতবে ওয়াক্ত হযরত মাওলানা শাহ রেজা আলী খান সাহেব বললেন, বৎস! উস্তাদজীর কথা অনুসরণ কর যা বলেন তা পড়। তিনি পিতামহের এ আদেশ পেয়ে বিচলিত হলেন এবং পিতামহের দিকে তাকালেন। পিতামহের সবকিছু বুঝতে আর দেরী হলো না। পিতামহ মনে মনে ভাবলেন, বাচ্চার সন্দেহ হচ্ছে যে, এগুলোতো একাকী হরফের বর্ণনা এখানে যৌগিক বর্ণের আলোচনা কিভাবে আসল? অথচ এ বর্ণদ্বয়তো পৃথক পৃথক ভাবে পূর্বে পড়েছি। যদিও বাচ্চার বয়সের দিক থেকে এ গুঢ় রহস্য প্রকাশ করা অনুপযোগী। যুগ শ্রেষ্ঠ আল্লামা শ্রদ্ধেয় পিতামহ নূরে বাতেনী দ্বারা বুঝে নিলেন, এ ছেলে ভবিষ্যতে কিছু হতে

যাচ্ছে এ কারণে তাঁর সামনে ঐ গুঢ় রহস্যের কথা প্রকাশ করা উপযুক্ত মনে করে পিতামহ উত্তর দিলেন, প্রিয় বৎস! তোমার প্রশ্ন যথার্থ। তুমি প্রথমে যে আলিফ পড়েছিলে, প্রকৃতপক্ষে তা ছিল হামজা,আর এটাই হলো প্রকৃত আলিফ। যেহেতু আলিফ সর্বদা সাকিন হয়ে থাকে এবং তা দ্বারা কোন শব্দ আরম্ভ করা যায় না। সেহেতু এখানে লাম এর সাথে আলিফকে সংযুক্ত করে এর উচ্চারণ দেখানো হয়েছে। এটা শুনে আলা হযরত পিতামহকে দ্বিতীয় প্রশ্ন করলেন, যদি আলিফকে উচ্চারণ করার জন অন্য অক্ষরের সাহায্য নিতে হয় তাহলে যে কোন একটি হরফের সাথে মিলালেতো হয়ে যেতো, এত দূরে এসে লামের সাথে সংযুক্ত করার বৈশিষ্ট্যইবা কি? প্রশ্নটি শুনে পিতামহ মহোদয় স্নেহভরে তাকে জড়িয়ে ধরলেন এবং আন্তরিকভাবে দোয়া করলেন, আর বললেন, প্রিয় বৎস! আলিফ ও লামের মাঝে দৃশ্যত ও ভিতরগত উভয় দিক দিয়ে পারস্পরিক বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। লেখার সময় উভয়টির মধ্যে বাহ্যিক সাদৃশ্য তো রয়েছে, যেমন লেখার সময় লেখতে হয়. الف আর لام তদুপরি উচ্চারণগত সম্পর্ক হলো "আলিফ" শব্দের মধ্যবর্তী বর্ণ হলো লাম, আর লাম শব্দের মধ্যবর্তী অক্ষর হলো আলিফ। অর্থাৎ আলিফ উচ্চারণ করার সময় মধ্যবর্তী অক্ষর লাম উচ্চারণ করতে হয় আর লাম উচ্চারণ করার সময় মধ্যবর্তী অক্ষর আলিফ উচ্চারণ করতে হয়। মধ্যবর্তী বর্ণ মিল থাকার বিশেষত্বটি আলিফ ও লাম ছাড়া অন্য কোন হরফের মধ্যে নেই বিধায় এতদূর এসে লামের সাথে আলিফকে যুক্ত করে দেখানো হয়েছে।

তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতামহ যদিও লাম আলিফকে যুক্ত করার কারণ বর্ণনা করেছেন কিন্তু কথা বলতে গেলে তিনি কথায় কথায় সব কিছু বলে দিয়েছেন। অর্থাৎ আলা হযরত যে ভবিষ্যতে একজন কলম সম্রাট দেশ বরেণ্য ও যুগশ্রেষ্ঠ আলেম হবে তিনি সবকিছু কথায় কথায় বলে দিয়েছেন, যা পরবর্তীতে প্রকাশ পেয়েছে এবং সকলে দেখেছে যে, শরীয়তের মধ্যে তিনি হযরত সৈয়্যদেনা ইমামে আজম আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহু আনহুর পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন আর তরীকতের ক্ষেত্রে হযরত সৈয়্যদেনা গাউছুল আজম শেখ আবদুল কাদের জিলানী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সম্মানিত প্রতিনিধি ছিলেন।

<u>শৈশবেও ভুল থেকে নিরাপদ ঃ</u>

আ'লা হযরত কেবলার পবিত্র ঘরে এক মৌলভী সাহেব কিছু বাচ্চাদেরকে পড়াতেন, আলা হযরতও তাঁর কাছে পবিত্র কুরআনুল কারীম পড়তেন। একদিন মৌলভী সাহেব কোরানের কোন এক আয়াতের একটি শব্দ বার বার আলা হযরতকে বলতেছিলেন, কিন্তু আলা হযরতের মুখ দিয়ে ঐ শব্দ বের হচ্ছিল না। উস্তাদজী ঐ শব্দে জবর বলতেন কিন্তু তিনি জের পড়তেছেন। এ অবস্থা তাঁর পিতামহ দেখে থাকে তাঁর কাছে ডাকলেন এবং কোরান শরীফ নিলেন এবং ভাল করে দেখে বুঝলেন, এখানে লেখক থেকে এভাবে ভুল হয়ে গেছে জেরের জায়গায় জবর লেখা হয়েছে। আরবী ব্যাকরণ মোতাবেক ঐখানে জেরই হবে, তবুও সন্দেহ দূর হওয়ার জন্য তিনি আরেকটি কোরান আনলেন এবং এটা খুলে দেখলেন ঠিকই ঐখানে জের রয়েছে। তাঁর পিতামহ মৌলভী সাহেবকে বললেন এখানে জেরই হবে প্রিন্টিং ভুল হওয়ার কারণে জবর হয়ে গেছে বাচ্চা ঠিকই পড়েছে। এরপর তিনি তাঁর

বরকতময় কলম দ্বারা জের করে দিলেন। তৎপর আ'লা হযরতকে জিজ্ঞেস করলেন, মৌলভী সাহেব তোমাকে যেভাবে বলতেছেন তুমি সেভাবে পড়তেছনা কেন? আলা হযরত উত্তর দিলেন, আমি চেষ্টা করেছি ঐ রকম পড়তে কিন্তু আমার মুখ দিয়ে বের হচ্ছিল না। অর্থাৎ আমি শব্দটিকে জবর দিয়ে পড়তে চেষ্টা করার পরও আমার মুখ থেকে জের বের হচ্ছে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তায়ালা ছোট কাল থেকেই তাঁর জবানকে হেফাযত করেছেন।

আ'লা হযরতের প্রাথমিক শিক্ষক বলেছেন,তুমি কি মানুষ না জ্বীন ঃ

আ'লা হযরত নিজেই বর্ণনা করেছেন, আমার সম্মানিত উস্তাদ যার থেকে আমি কোরানে কারীম সহ প্রাথমিক কিতাব পড়েছি। তিনি যখন আমাকে পাঠ দান করতেন তখন আমি এক, দু' বার দেখে কিতাব বন্ধ করে দিতাম। আবার যখন সবক শুনতেন তখন আমি হুবহু সবক আদায় করতাম। প্রতিদিন সবক আদায়ের এ অবস্থা দেখে উস্তাদজী খুব আশ্চর্য হয়ে যেতেন। একদিন তিনি আমাকে বললেন, আম্মান মিয়া আমি কাউকে বলবো না, তুমি আমাকে এ কথা বলো যে, হাকীক্বাতান তুমি কি মানুষ না জ্বীন? আমার পড়াতে দেরী লাগে কিন্তু তোমার মুখস্ত করতে দেরী লাগে না। উত্তরে আমি বললাম, হুজুর! আল্লাহ তায়ালার অসংখ্য শোকর এ জন্য যে, তিনি আমাকে মানুষ করে পাঠিয়েছেন।

আ'লা হযরতের শিক্ষকমন্ডলীঃ

তাঁর শিক্ষকদের তালিকা খুব সংক্ষিপ্ত। তিনি প্রথমে মক্তবের হুজুর থেকে কোরানে পাক ও প্রাথমিক উর্দু পড়েছেন। তাঁর পর নাহু, ছরফ, উর্দু, ফার্সী ও প্রাথমিক আরবী শিক্ষা হযরত মাওলানা মির্জা গোলাম কাদের বেক থেকে অর্জন করেছেন। যিনি তাঁর পিতার ঘনিষ্ট বন্ধু, মুত্ত্বাকী ও পরহেজগার লোক ছিলেন। তিনি যখন প্রাথমিক পাঠ্য কিতাবের পাঠশেষ করলেন, তখন তাঁর পিতা মহোদয় তাঁর শিক্ষার দায়-দায়িত্ব নিজেই নিয়ে নিয়েছেন। তাঁর পিতা রঈসুল আতক্বীয়া হযরত মাওলানা শাহ নক্বী আলী খান সাহেব একজন প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন, মুফতী, লেখক ও গবেষক ছিলেন। তিনি হিন্দুস্তানের শীর্ষ স্থানীয় আলেমদের অন্যতম একজন হিসেবে পরিগণিত হতেন। আবার তিনি বংশ পরম্পরায় ব্রেলীর জমিদারও ছিলেন। আলা হযরতের প্রতি তাঁর পিতার বিশেষ মনোযোগ থাকার কারণে তিনি অল্প দিনের মধ্যেই অভাবনীয় উন্নতি লাভ করেছেন। তাঁর পিতার নিকট শিক্ষা গ্রহণকালে তাঁর ফুফা জনাব শেখ ফজল হাসানের আহবানে তিনি রামপুর গিয়েছিলেন। তাঁর ফুফা তাঁকে জোর করে রামপুরে কয়েকদিন রেখে দিয়েছিলেন। কিন্তু সত্য সন্ধানী, জ্ঞান আহরক আলা হযরত এ কয়দিন জ্ঞান অর্জন থেকে বিরত থাকেননি। তিনি সেখানে বাহরুল উলুম আল্লামা আবদুল আলী সাহেবের নিকট সরহে সুগমনি ও গণিতশাস্ত্রের কিছু সবক পড়েছেন। তাঁর ফুফা জনাব শেখ ফজল হাসান সাহেব ব্রেলীর বাসিন্দা ছিলেন। তিনি রামপুরের ডাক পোষ্টের বড় অফিসার ছিলেন। আর তিনি আলহাজ্ব নওয়াব কলব আলী সাহেবের বিশেষ ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যতম একজন ছিলেন। তিনি নওয়াব সাহেবকে আলা হযরতের বিস্ময়কর মেধার কথা পূর্বেই বলে দিয়েছেন। তিনি আলা হযরতকে নওয়াব সাহেবের

সম্মুখে পেশ করলেন। তিনি তাঁর সাথে কথা বলে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, এ বাচ্চা খুবই মেধাবী এবং আশাপ্রদ। তিনি এ আশা প্রকাশ করলেন যে, এ বাচ্চা রামপুরে অবস্থান করে বাহরুল উলুম মাওলানা আবদুল আলী সাহেব ও মাওলানা আবদুল হক সাহেব খায়রাবাদী থেকে শিক্ষা অর্জন করুক। কিন্তু পিতা ব্রেলীতে চলে আসতে আদেশ দেয়ার কারণে তিনি রামপুর থেকে পূনরায় ব্রেলীতে চলে আসলেন। তাঁর পর তিনি যার থেকে শিক্ষার্জন করেন তিনি হলেন, তাজেদারে মারেহেরা হযরত মাওলানা সৈয়্যদ শাহ আবুল হোসাইন আহমদ নূরী মিয়া সাহেব। এর পর যার থেকে শিক্ষার্জন করেন তিনি হলেন আওলাদে রাসূল তাজেদারে তরীক্বত, কুতবে যমান স্বীয় মুর্শিদে বরহক হযরত মাওলানা সৈয়্যদ শাহ আলে রাসূল মারেহারভী।

তাঁর শ্রদ্ধাস্পদ শিক্ষকমন্ডলীর নাম ধারাবাহিকভাবে নিম্নে পেশ করা হলো।

১) মক্তবের উস্তাদ মহোদয়।
২) হযরত মাওলানা মির্জা গোলাম ক্বাদের বেগ (ওফাঃ১৩০১হিঃ/১৮৮৩খ্রিঃ)
৩) শ্রদ্ধেয় পিতা রঈসুল আতক্বীয়া হযরত মাওলানা শাহ নক্বী আলী খান সাহেব। (ওফাঃ ১২৯৭হিঃ/১৮৭৯খ্রিঃ)
৪) বাহরুল উলুম মাওলানা আবদুল আলী সাহেব। (ওফাঃ ১৩০৩ হিঃ/১৮৮৫খ্রিঃ)
৫) আপন মুর্শিদ কেবলা আওলাদে রাসূল তাজেদারে তরীক্বত মাওলানা সৈয়্যদ শাহ আলে রাসূল মারেহারভী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) (ওফাঃ ১২৯৬হিঃ/১৮৭৮ খ্রিঃ)
৬) তাজুল উলামা, রাসূল ফোদলা আওলাদে রাসূল হযরত সৈয়্যদ শাহ আবুল হোসাইন আহমদ আন্ নূরী মিয়া মারেহারভী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) (ওফাঃ ১৩২৪হিঃ/১৯০৬খ্রিঃ)

উপরোক্ত ছয়জন মহতারাম হাস্তীরাই হলেন আলা হযরত কেবলার উস্তাদ। আর ঐ ছয়ের সম্পর্ক ঐ বরকতময় সত্তার সাথে যাকে শাহেন শাহে হিন্দুস্তান, মুর্শিদে মুর্শেদা, খাজায়ে খাজেগা আতায়ে রাসূল, নায়েবে রাসূল সৈয়্যদেনা মুর্শেদেনা মাওলানা সৈয়্যদ শাহ খাজা মঈন উদ্দীন হাসান চিশতী আজমীরি গরীবে নওয়াজ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলা হয়। এ ছয়জন ছাড়া তিনি আর কারো সামনে শিষ্টাচারের সাথে হাটু গেড়ে বসেননি। হুজুর পুরনূর মাহিয়ে ফিসকো ফুজুর তাজেদারে আহলে সুনান শাহজাদায়ে আলা হযরত ইমামে আউলিয়ায়ে উম্মত মুর্শিদে বরহক আশেকে মাওজুদে মাতলক মুফতীয়ে আজম হিন্দ মাওলানা আশ শাহ শেখ মোস্তফা রেজা খান সাহেব নূরী বর্ণনা করেন, আলা হযরত কেবলার লিখিত বিবরণে সংশোধন ও তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতামহ ছাড়া আর কেউ করেননি।

প্রথম নূরানী বক্তব্যঃ

মাত্র ছয় বছর বয়সে রবিউল আউয়াল শরীফের মাসে মিম্বরে তাশরীফ রেখে বিশাল জনসমুদ্রের সামনে মিলাদুন্নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের বিষয়ের উপর দু' ঘন্টা নূরানী আলোচনা করেছেন। এটা তাঁর প্রথম তাকরীর।

প্রথম লিখিত কিতাবঃ

তিনি যখন ৮ বৎসর বয়সে উপনীত হন তখন তিনি খাজা নিজামুদ্দীন মাহবুবে এলাহির খলিফা খাজা আবু হাব্বান সিরাজুদ্দীন ওসমান আন নেজামী আস চিশতী আল আওদাহির আরবী ব্যাকরণের উপর লিখিত প্রসিদ্ধ নাহুর কিতাব হেদায়াতুন নাহু পড়ছিলেন, আর উহা পড়ে তিনি উহার একটি ব্যাখ্যা গ্রন্থ লেখেন যা আরবী ভাষায় লেখা হয়েছিল, আর উহাই তাঁর প্রথম রচিত কিতাব। উল্লেখ্য যে, হেদায়াতুন নাহু কিতাবটি পৃথিবীর সব মুসলিম রাষ্ট্রের ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ানো হয়। আমাদের দেশের মধ্যে বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক দাখিল ৮ম,৯ম,১০ম, ও আলিম শ্রেণীর জন্য নির্বাচন করে সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

মদীনা শরীফ ও বাগদাদ শরীফের প্রতি সম্মানঃ

তিনি যখন জানতে পারলেন, ভারত থেকে মদীনা শরীফ এ দিকে তখন থেকে তিনি ইন্তে কাল পর্যন্ত কোন দিন মদীনা শরীফের দিকে পা টেনে বসেননি। আর তাঁর বয়স যখন মাত্র ছয় বছর তখন তিনি জানতে পারলেন বাগদাদ শরীফ এ দিকে সেদিন থেকে জীবনে কোন দিন বাগদাদ শরীফের দিকে পা টেনে বসেননি, সুবহানাল্লাহ! এটাই সাচ্চা আশেকে রাসুল ও আশেকে গাউছে আজমের নিদর্শন। এটাইতো প্রকৃত আদব।

মসজিদের প্রতি সম্মানঃ

আলা হযরত ছিলেন প্রিয় নবীর সুন্নাত পালনের উত্তম মডেল। যার গোটা জীবনটাই প্রিয় নবীর সুন্নাতে ভরপুর ছিল। তিনি জীবনের প্রতিটি মূহূর্ত পেয়ারা রাসুলের সুন্নাত অনুযায়ী অতিবাহিত করেন। তাঁর জীবনে কোন দিন সুন্নাতে মুয়াক্কাদা তো আছেই সুন্নাতে জায়েদার পরিপন্থি ও কোন কাজ সংঘটিত হয়নি। পৃথিবীর বুকে ইমামে আজম আবু হানিফা, বড় পীর গাউছে আজম দস্তগীর ও খাজা গরীবে নওয়াজ আজমীরী সানজীরীর পরে যে পবিত্র সত্তা প্রিয় নবীর সুন্নাতের পরিপূর্ণ পাবন্দ ছিলেন তিনি হলেন আলা হযরত। উল্লেখ্য যে, সুলতানুল হিন্দ, আতাউর রাসুল, নায়েবে মুস্তফা, আউলাদে রাসূল কুতবুল মাশায়েখ গরীবের কান্ডারী অসহায়দের সহায়, নিঃস্বদের দাতা খাজায়ে খাজেগা খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী আজমীরীর বয়স যখন ৫৩ বৎসর তখনও তিনি বিবাহ করেননি। ঐ বয়সে একদিন তিনি প্রিয় নবীর দীদারে ধন্য হলেন। প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে এরশাদ ফরমালেন, হে মঈন উদ্দিন তুমিতো আমার দ্বীনের সাহায্যকারী। আমার দ্বীনের সাহায্যকারী হয়েও এখনো পর্যন্ত আমার একটি সুন্নাত আদায় করতেছ না। আর সে সুন্নাতটি হল বিবাহ করা। এরপর খাজা গরীবে নওয়াজ সুন্নাত আদায়ের জন্য ৫৩ বৎসর বয়সে বিবাহ করলেন। এটাইতো আশেকে রাসুলদের শান যাদের জীবনের প্রতিটি কাজ সুন্নাত অনুযায়ী হয়ে থাকে। যাদের জীবনের প্রতিটি কাজ আল্লাহ ও তদ্বীয় রাসুলের সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষে সম্পাদিত হয়ে থাকে। দুনিয়াবি কোন ভোগ বিলাসের জন্য নয়। যেমন খাজা গরীবে নওয়াজ বিবাহ করলেন প্রিয় নবীর সুন্নাত আদায়ের জন্য। দুনিয়াবী তৃপ্তি হাসেলের জন্য নয়। খাজা গরীবে নওয়াজের পরে শতভাগ সুন্নাত যিনি আদায় করেছেন

তিনি হলেন চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দেদে আজম যুগের ইমামে আজম আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা ফাযেলে ব্রেলভী রাদিয়াল্লাহু আনহু। কিতাবে আছে যে, পবিত্র কাবা শরীফের তাজীমার্থে ওখানে গমনকারী ব্যক্তিরা বের হওয়ার সময় পবিত্র খানায়ে কাবাকে সামনে রেখে ওখান থেকে বের হতে হবে। পৃথিবীর অন্যান্য মসজিদের বেলায় এ ধরনের কোন হুকুম নেই। কিন্তু আলা হযরতের আমল দেখুন, তিনি মসজিদে প্রবেশের সময় সুন্নাত মোতাবেক ডান পা দিয়ে মসজিদে প্রবেশ করতেন, আর বের হওয়ার সময় সুন্নাত মোতাবেক বাম পা দিয়ে বের হতেন তবে মসজিদের তাজীমের জন্য মসজিদকে সামনে রেখে বের হতেন। সুবহানাল্লাহ! আলা হযরত ছিলেন আদবের খনী, যা তাঁর আমল দেখে বুঝা যায়।

এক বছর আলা হযরত এতেকাফ অবস্থায় স্বীয় মসজিদে অবস্থান করছিলেন, তখন ছিল শীতকাল তিনি রাত্রে এশারের নামায আদায়ের জন্য অযু করতে যাচ্ছিলেন। একতো শীতকাল আবার ঐ সময় লাগাতার মুশলধারে বৃষ্টি পড়ছিল। তাই তিনি বৃষ্টির কারণে মসজিদ থেকে বের হয়ে অযু করতে পারছিলেন না। কারণ বসার এমন কোন স্থান নেই যেখানে বসে অযু করবেন। তাই তিনি লেপ বিছায়ে মসজিদে অযু করলেন। কিন্তু অযুর ব্যবহৃত এক ফোটা পানিও মসজিদে পড়তে দিলেন না। আর পুরা রাত মসজিদে ঝাড়ু দিলেন। কারণ সে রাতে প্রবল বর্ষন ও প্রবল হাওয়া প্রবাহিত হয়েছিল তাই তিনি পুরা রাতই জেগে জেগে কাটিয়ে দিলেন।

হাদীসে রাসূলের প্রতি সম্মান প্রদর্শনঃ

তিনি হাদীসের কিতাবসমূহকে খুব তাজীম সহকারে ধরতেন। হাদীসের কিতাবের উপর অন্য কোন কিতাব রাখতেন না। যখন হাদীস শরীফ পড়াতেন বা উহার ব্যাখ্যা করতেন ঐ সময় কেউ কথা-বার্তা বললে তখন তিনি রেগে যেতেন। আর হাদীস শরীফ পড়ানোর সময় তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়াতেন। তিনি হাদীস শরীফ দাঁড়িয়ে পড়ানোর কারণ হচ্ছে তিনি একদিন ছাত্রদেরকে হাদীস শরীফ পড়াচ্ছিলেন ঐ সময় সরকারে দো' আলম নূরে মুজাস্‌সম তাজেদারে মদীনা সুরুরে কলব ও সিনা রাহমাতুল্লীল আলামীন শাফীয়ুল মুজনেবীন হযরত আহমদ মুজতবা মুহাম্মদ মুস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাশরীফ আনলেন। আলা হযরত রাদিয়াল্লাহু আনহু বসে বসে হাদীস শরীফের পাঠ দিচ্ছিলেন, রাসুলে পাক তাশরীফ আনার কারণে তিনি রাসূলের তাজীমার্থে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং ঐ দিন থেকে তিনি হাদীস শরীফ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়াতেন। সুবহানাল্লাহ! উনিইতো সত্যিকার খাটি আশেকে রাসূল যিনি রাসূলে পাকের হাদীস শরীফ পড়ানোর সময় খোদ রাসূলে কারীম তাশরীফ আনেন।

হাদীসে রাসূলের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ঃ

১৮৭৮ সালে আ'লা হযরত কেবলা স্বীয় পিতা-মাতার সাথে যিয়ারতে হারামাইনে শরীফাইনে যান। তখন বিমানের কোন ব্যবস্থা ছিল না বিধায় পানির জাহাজে করে যেতে

হতো। তিনি পানির জাহাজে উঠার সময় ঐ দোয়া পাঠ করলেন যা প্রিয় নবী এরশাদ ফরমায়েছেন। আলা হযরত পিতা-মাতার সাথে হারামাইনে শরীফাইনের যিয়ারত সম্পন্ন করার পর ওখান থেকে ভারতের উদ্দেশ্যে ফিরে আসছিলেন। তিনি জাহাজে উঠার সময় পুনরায় হাদীস শরীফে বর্ণিত দোয়া পাঠ করে জাহাজে উঠলেন। আলা হযরত কেবলা নিজেই বর্ণনা করেছেন যে, আসার পথে আমাদের জাহাজ যখন মাঝ দরিয়ায় পৌছল তখন ভারী তুফান শুরু হলো এ তুফান লাগাতার তিন দিন পর্যন্ত চললো, যাত্রীরা কাফন পরিধান করে ফেললো, সকলে বাচার আশা ছেড়ে দিল। আমার শ্রদ্ধেয়া আম্মার দূর্ভাবনা দেখে অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমার মুখ থেকে বের হয়ে গেল, আম্মাজান আপনি নিশ্চিত থাকুন। খোদার কসম এ জাহাজ ডুববে না। তিনি বলেন, আমি এ কসম করেছি হাদীসে রাসূলের উপর পরিপূর্ণ আস্থাবান হয়ে। কারণ এটা ঐ হাদীস ছিল যাতে জাহাজে উঠার সময় ডুবে যাওয়া থেকে নিরাপদ থাকার দোয়া রয়েছে। সুতরাং রাসূলে পাকের হাদীস শরীফের উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাসী ও আস্থাশীল হয়ে আমি খোদার কসম করেছি। আর রাসূলে পাকের হাদীস শরীফ যে সত্য এর উপর আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। আলহামদুলিল্লাহ! যে তুফান তিনদিন চলছিল, উহা দু'ঘন্টার মধ্যে বন্ধ হয়ে গেল।

এক বৎসর ব্রেলী শরীফে প্লেগ রোগ অধিকহারে বেড়ে গিয়েছিল। একদিন আমার দাঁতের মাড়ী ফুলে গিয়েছিল, আর উহা এমন হারে বেড়ে গিয়েছিল যদ্বরুন মুখ ও জিহ্বা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেছে। গায়ে অনেক জ্বর ছিল, আর কানের পিছনে ফোঁড়া উঠেছিল। চিকিৎসার জন্য ডাক্তার আসল। ডাক্তার সাহেব গভীরভাবে সাত আট ঘন্টা দেখে বলল, ইহা ঐ রোগ। এটা ঐ রোগ অর্থাৎ প্লেগ রোগ। আমি কথা বলতে পারছিলাম না বিধায় ডাক্তারের কথার কোন উত্তর দিতে পারলাম না। অথচ আমি ভাল ভাবেই জানতাম যে, ডাক্তার ভুল বলতেছে। না আমার প্লেগ আছে না ইনশাল্লাহুল আজিজ প্লেগ রোগ হবে। কারণ আমি প্লেগ রোগীকে দেখে ঐ দোয়াই পড়েছি যা সৈয়্যদে আলম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম এরশাদ ফরমায়েছেন। রাসূলে পাকের এরশাদ হলো-যে ব্যক্তি কোন বিপদগ্রস্থকে দেখে এ দোয়া পাঠ করবে সে ঐ বিপদ থেকে নিরাপদ থাকবে। ঐ দোয়াটি হলো- الحمد لله الذى عافانى مما ابتلاك به وفضلنى على كثير ممن خلق تفضيلا-

(আলহামদু লিল্লাহিল লাজি আ'ফানি মিম্মা ইবতালাকা বিহি ওয়ফাদ্দালানী আলা কাসিরিম মিম্মান খালাকা তাফদীলা) আলা হযরত কেবলা নিজেই এরশাদ ফরমান, যে কোন রোগীকে, যে কোন বিপদগ্রস্থ ব্যক্তিকে দেখে আমি এ দোয়া পড়েছি। আলহামদুলিল্লাহ! আজ পর্যন্ত আমি ঐ সব রোগ ও বিপদ থেকে নিরাপদ রয়েছি। আর আল্লাহর সাহায্যে আমি সর্বদা নিরাপদ থাকবো। আর আমি প্লেগ রোগ হয়নি বলেছি, রাসূলে কারীমের হাদীস শরীফের উপর নিশ্চিন্ত হওয়ার কারণে, শেষ পর্যন্ত তিনি ঐ রোগ থেকে সুস্থ্য হয়ে গেলেন। কিভাবে সুস্থ হলেন তা কারামাতের বিবরণের মধ্যে সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে।

একবার অধিক কিতাব অনুশীলনের কারণে তাঁর চোখে ব্যথা শুরু হয়ে গেল। একজন চক্ষু ডাক্তার এসে ভাল করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর বলল বেশী কিতাব দেখার কারণে চোখের মধ্যে শুষ্কতা এসে গেছে। সুতরাং আপনি পনের দিন কোন কিতাব পড়বেন না।

আলা হযরত এ ব্যাপারে বলেছেন, আমি ডাক্তারের কথার প্রতি গুরুত্বও দিলাম না। এরপর আমি একজন শুষ্ক দৃষ্টি ওয়ালা মানুষকে দেখে ঐ দোয়াটিই পাঠ করে প্রিয় নবীর এরশাদে পাকের উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাসী হলাম। ১৩১৬ হিজরীতে আর একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসকের সামনে এ কথার আলোচনা করা হলো। তিনি বললেন, চার বৎসরের মধ্যে চোখ থেকে পানি বের হবে। রাসূলে পাকের হাদীসের প্রতি আস্থা থাকার কারণে আমি ডাক্তারের কথায় অস্তির হলাম না। আলহামদুলিল্লাহ! ত্রিশ বছরের অধিক আমি নিয়মিতভাবে কিতাব অধ্যয়ন করে আসছি। আলা হযরত কেবলা বলেন, আমি ইহা এজন্য বর্ণনা করেছি যে, রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের চিরস্থায়ী ও অবশিষ্ট মোজেজা, যা আজ পর্যন্ত চক্ষু অবলোকন করতেছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত ঈমানদাররা দেখতে পাবে। সুবহানাল্লাহ! এরকমই ছিল রাসূলে কারীমের হাদীসে পাকের প্রতি আ'লা হযরত কেবলার প্রগাঢ় বিশ্বাস।

প্রথম ফতোয়া ঃ

তাঁর বয়স যখন আট বৎসর তখন তিনি ফরায়েজের একটি মাস্য়ালা লিখে আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন।

দস্তারে ফযীলত ঃ

আলা হযরত কেবলা ১৪ শাবান, ১২৮৬ হিজরী মোতাবেক ১৩ বৎসর ১০ মাস ও ৫ দিনের মধ্যে শেষ শিক্ষা বর্ষের সনদ লাভ করে দস্তারে ফজীলত হাসেল করেন। এক জায়গায় তিনি নিজেই বলেছেন- মধ্য শাবান তথা শাবান মাসের ১৪ তারিখ ১২৮৬ হিজরীতে ১৮৬৯ সালে সিলেবাসভুক্ত কিতাবের পাঠ সমাপ্ত করি আর ঐ সময় আমি ১৩ বৎসর ১০মাস ও ৫ দিনের একজন তরুন আর ঐ তারিখেই আমার উপর নামায ফরজ হলো এবং আমি শরীয়তের বিধি-বিধান পালনের দিকে মনোযোগী হলাম। তিনি যেদিন শেষ বর্ষের সনদ হাসেল করে দস্তারবন্দী হলেন, ঐ দিনে রাদাআত তথা স্তন্যপান সম্বন্ধে একটি মাসয়ালার জবাব লিখেন। প্রশ্নটা ছিল যদি মহিলার দুধ নাকের মাধ্যমে বাচ্চার কণ্ঠনালীতে পৌছে তাহলে দুধপান সাব্যস্ত হবে কিনা।

তিনি প্রশ্নটির উত্তরে লিখেন, যদি মুখ বা নাক দিয়ে মহিলার দুধ বাচ্চার পেটে পৌছে তাহলে উহা দ্বারা রাদাআত প্রমাণিত হবে।

শ্রদ্ধেয় পিতা মাসয়ালাটার জবাব দেখে ঐ দিন থেকে ফতোয়া প্রদানের কাজ তাঁর উপর অর্পন করলেন। তিনি ঐ দিন থেকে ইন্তেকাল পর্যন্ত ঐ ফতোয়ার কাজ সুন্দররূপে আঞ্জাম দিয়েছেন। এক জায়গায় তিনি বলেছেন, আল্লাহ তায়ালার অশেষ কৃপায় আমি ১৩ বৎসর বয়স থেকেই লিখিতাকারে ফতোয়া লিখে ১০ শাবান ১৩৩৬ হিজরী মোতাবেক ১৯১৭ সাল পর্যন্ত এ ফকীর ফতোয়া লিখার দায়িত্ব পালন করেছি এবং আল্লাহর দয়ায় পুরো ৫০ বৎসরই ফতোয়া লিখার কাজ করেছি। ফকীর এ নিয়ামতের শোকরিয়া কিভাবে আদায় করবো।

অসাধারণ স্মরণশক্তিঃ

তাঁর স্মরণ শক্তি এতো বেশী শক্তিশালী ছিল যে, মাদরাসায় উস্তাদ মহোদয় থেকে যখন সবক পড়তেন তখন এক, দু' বার দেখে কিতাব বন্ধ করে দিতেন। আর উস্তাদজী যখন

সবক শুনতেন তখন হুবহু বলে দিতেন। তাঁর স্মরণশক্তি ও সবক শুনানোর এ অবস্থা দেখে শিক্ষক মহোদয় আশ্চর্য হয়ে যেতেন।

মাওলানা এহসান হোসাইন সাহেব বর্ণনা করেন, আমি প্রাথমিক আরবী শিক্ষায় আলা হযরতের সহপাঠি ছিলাম। প্রথম থেকেই তাঁর স্মৃতিশক্তির এ অবস্থা ছিল যে, তিনি কিতাবের এক চতুর্থাংশ উস্তাদ মহোদয় থেকে পড়তেন আর বাকী অংশটুকু নিজেই মুখস্ত করে উস্তাদকে শুনাতেন।

তাজকারা-এ-নূরী কিতাবের মধ্যে স্বয়ং আলা হযরতের এ বর্ণনা লিখা হয়েছে যে, কিছু অনবিহিত ব্যক্তিরা আমার নামের সাথে হাফেজ লিখে দেন অথচ আমি হাফেজে কোরান নই। হাঁ যদি কোন হাফেজ সাহেব কোরানে কারীমের এক এক রুকু আমাকে পড়ে শুনান এবং দ্বিতীয়বার আমার থেকে শুনেন তাহলে তা অবশ্যই হবে।

এক মাসের মধ্যে কোরান মাজীদ হেফজ করাঃ

একদিন এক ব্যক্তি আলা হযরত কেবলার খেদমতে ডাক যোগে একটি চিঠি প্রেরণ করেন ঐ চিঠিতে আলা হযরতের সম্মানসূচক বিভিন্ন উপাধির সাথে হাফেজও লিখে দিয়েছেন অথচ আলা হযরত ঐ সময় পর্যন্ত হাফেজ ছিলেন না। মুনাজেরে আজম হিন্দ শেরে বীশীয়া-ই-আহলে সুন্নাত হযরত মাওলানা মৌলভী হাফেজ ক্বারী মুফতী হাকীম আলহাজ্ব আশ্ শাহ আবুল ফাতাহ ওবায়দুর রেজা মুহাম্মদ হাশমত আলী খান সাহেব রেজভী মুজাদ্দেদী লক্ষ্ণৌভী বর্ণনা করেন যে, আমি ঐ সময় আলা হযরতের খেদমতে উপস্থিত ছিলাম।

উক্ত চিঠিখানা শুনে আলা হযরত কেবলার চোখের পানি এসে গেল, আর এরশাদ ফরমালেন, আমি এতে ভয় করতেছি যে, আমার হাশর যেন ঐ সব মানুষের সাথে না হয় যাদের ব্যাপারে কোরানে আজীমের মধ্যে আল্লাহ তায়ালা ফরমায়েছেন-

"যখন ঐ সব মানুষের পরিচয়ের ক্ষেত্রে এমন প্রশংসা করা হয় যা তাঁর মধ্যে নেই তখন তারা নিজেদের এ ধরণের প্রশংসাকে পছন্দ করে"। জৈনক ব্যক্তি না জেনে আমার প্রশংসায় হাফেজ লিখেছেন। সুতরাং কোরান হেফজ করা আমার জন্য জরুরী। ঐ ঘটনাটি ২৯ শে শাবানে মুয়াজ্জমে হয়েছিল। আলা হযরত কেবলা পরের দিন থেকে কোরানে পাক হেফজ করা শুরু করে দিলেন। যার সময় এশারের অযু করার পর থেকে এশারের জমায়াত কায়েম হওয়া পর্যন্ত নির্ধারিত ছিল। এ সংক্ষিপ্ত সময়ে কোরানে পাক হেফজ করার অনন্য পদ্ধতি নিম্নরূপ।

ফিকহশাস্ত্রের প্রসিদ্ধ কিতাব বাহারে শরীয়ত এর লেখক সদরুশ শরীয়াহ বদরুত তরীক্বা হযরত আল্লামা মাওলানা মৌলভী হাকীম শাহ আবুল উলা আমজাদ আলী রেজভী আনসারী আজমী সাহেব কোরান মাজীদ তিলাওয়াত করতেন, আর আলা হযরত শুনতেন এরপর জমায়াত কায়েম হলে আলা হযরত কেবলা ইমামতি করতেন, সদরুশ শরীয়া থেকে যা শুনতেন তা তারাবীর নামাযে শুনাতেন কখনো এক পারা কখনো দেড় পারা। প্রতিদিন এভাবে করলেন। পরিশেষে রমযানুল মোবারকের ২৭ তারিখ গোটা কোরানে পাক হেফজ

করে ফেললেন। এভাবে এক মাসের কম সময়ের মধ্যে হাফেজে কোরান হয়ে গেলেন। আর রমযানুল মোবারকের ২৭ তারিখ রাত্রে তারাবীর নামাযে কোরানে আজীম তেলাওয়াত করে খতম দিলেন। এরপর এরশাদ ফরমালেন সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য! আমি কালামে পাক ধারাবাহিকভাবে মুখস্ত করে নিয়েছি। আর এটা এ জন্য যে, যাতে খোদার বান্দাদের বলা ভুল না হয়। অর্থাৎ কতিপয় বান্দারা না জেনে আমার কাছে চিঠি লেখার সময় আমার নামের পূর্বে হাফেজ লেখেন, আমি ঐ সব খোদার বান্দাদের লেখার বাস্তবায়ন করেছি। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় তো এটাই যে, তিনি এশারের নামাযের জন্য অযু করার পর থেকে এশারের নামাযের জমায়াত কায়েম হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এ সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে প্রতিদিন এক বা দেড় পারা না পড়ে কেবল মুখ থেকে শুনে মুখস্ত করা সত্ত্বেও বিভিন্ন ফতোয়া লিখা ও শরীয়তের মাসয়ালা বর্ণনা করা, খোদা ও রাসুল (জাল্লাজালালুহু, ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর পূতঃপবিত্র এরশাদ শুনানো ইত্যাদি প্রতিদিনের ধর্মীয় কাজকর্মের মধ্যে কোন প্রকার কোন অসুবিধা হয়নি। সব কাজই নিয়ম মাপিক আঞ্জাম দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ! এটাকেই তো বলা হয় খোদা ও তদ্বীয় রাসুল প্রদত্ত জ্ঞান। এ কারণেরই তো ইসলামী গবেষকরা তাঁকে আলা হযরত উপাধিতে ভূষিত করেছেন এবং মহা মনীষীরা বলেছেন, আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা হলেন ইসলামী বিশ্বকোষ।

খোদাপ্রদত্ত জ্ঞান ঃ

সম্ভবত তাঁর বয়স যখন দশ বৎসর হয়েছিল তখন তিনি তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতার কাছে প্রসিদ্ধ কিতাব মুসাল্লেমুস সবুত অধ্যয়ন করতেছিলেন। তাঁর পিতা উক্ত কিতাবের জটিল কিছু মাসয়ালায় কিছু প্রশ্ন করে টীকায় উহার জবাব লিখেছেন। আলা হযরত উক্ত কিতাবটি পড়ার সময় তাঁর পিতার কৃত প্রশ্নের জবাব দিলেন এবং কিতাবের উদ্ধৃতির এমন বিশ্লেষণ করলেন যা দেখলে শুরু থেকে কোন প্রশ্নরই উদ্ভব হয় না। তাঁর পিতা একদিন তাঁকে কিতাবটি পড়াচ্ছিলেন, এমতাবস্থায় তাঁর দৃষ্টি ঐ টীকার উপর পড়ল, যা আলা হযরত লিখেছেন। তিনি গভীরভাবে উহা চাইলেন এবং এতো বেশী খুশী হলেন। যার ফলে তিনি উঠে আলা হযরতকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং বললেন আহমদ রেজা তুমি আমার থেকে পড়তেছনা বরং পড়াতেছ।

এটাই আলা হযরতের প্রতি খোদা প্রদত্ত জ্ঞান- যা হুজুর নবীয়ে করীম রাউফুর রহীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম আপন সাচ্চা নায়েবকে জন্ম হতেই স্বীয় এলমের সাচ্চা উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিয়েছেন। যার সাক্ষ্য ব্রেলী শরীফের রবি চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদে আজম- যিনি হুজুর পুরনূর শাফেয়ে ইয়ামুন নূসূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের সত্যিকার শিক্ষা ও নূরে শরীয়ত দ্বারা জগতকে উজ্জ্বল ও আলোকিত করেছেন।

মালিকুল ওলামা জনাব মাওলানা জাফরুদ্দীন বিহারী সাহেব কেবলা বলেছেন, আলা হযরত কেবলা একবার পীলীভেতে তাশরীফ নিয়েছেন, আমিও তাঁর সাথে ছিলাম। তিনি ওখানে হযরত মাওলানা অছি আহমদ মুহাদ্দেসে সুরুতী সাহেবের মেহমান হলেন। তাঁরা কথোপকথন করতেছিলেন, কথার মাঝে ফতোয়ার প্রসিদ্ধ কিতাব উকুদুদ দুরিরয়া ফি

তানকিহে ফাতাওয়ায়িল হামেদিয়াহ সম্পর্কে আলোচনা হলো, হযরত মুহাদ্দেস সুরুতী সাহেব বললেন, উক্ত কিতাবটি আমার লাইব্রেরীতে রয়েছে। আলা হযরতের লাইব্রেরীতে পর্যাপ্ত কিতাব ছিল, তিনি প্রতি বৎসর নতুন নতুন কিতাব সংগ্রহ করতেন। কিন্তু ঐ সময় পর্যন্ত তিনি উল্লেখিত কিতাবটি সংগ্রহ করেননি। আলা হযরত ফরমালেন আমি উক্ত কিতাবটি দেখিনি, তবে হাঁ আমি যাওয়ার সময় আমাকে আপনার লাইব্রেরী থেকে উক্ত কিতাবটি দেবেন। হযরত মোহাদ্দেসে সুরুতী সাহেব খুশী মনে গ্রহণ করলেন। তিনি লাইব্রেরী থেকে কিতাবটি এনে আলা হযরতের খেদমতে পেশ করলেন, সাথে একথা বললেন যে, আপনি কিতাবটি দেখার পর আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন। কারণ আপনার লাইব্রেরীতে অনেক কিতাব রয়েছে, সে তুলনায় আমার কাছে এ সামান্য কিতাব আছে যা থেকে ফতোয়া দিয়ে থাকি। আলা হযরত বললেন, ঠিক আছে দেখার পর পাঠিয়ে দেব।
আলা হযরত ঐ দিন ব্রেলী শরীফ চলে আসার ইচ্ছা করলেন, কিন্তু তাঁর একজন প্রাণ উৎসর্গকারী মুরীদ তাঁকে দাওয়াত করলেন, যার ফলে তিনি তার ঘরে থেকে গেলেন। আলা হযরত রাত্রে উল্লেখিত দুখন্ড বিশিষ্ট কিতাবটি দেখে নিলেন। পরের দিন জোহরের নামায পড়ে ব্রেলী শরীফ ফিরে আসার জন্য গাড়ীর টিকেট করলেন। মালপত্র গোছানো হচ্ছিল, তিনি মালপত্রের সাথে উক্ত কিতাবটি না রেখে আল্লামা জাফরুদ্দীন বিহারীকে লক্ষ্য করে বললেন, এ কিতাবটি মুহাদ্দেস সাহেবকে দিয়ে আসুন। আল্লামা জাফরুদ্দীন সাহেব বলেন, আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম, কারণ তিনি কিতাবটি নিয়েছেন ব্রেলী শরীফ নিয়ে যাওয়ার জন্য, এখন তিনি কিতাবটি সাথে করে না নিয়ে ফিরিয়ে দিচ্ছেন কেন? আমার মনে এ ধরনের প্রশ্নের উদয় হলেও জিজ্ঞাসা করার সাহস হলো না। নির্দেশ মোতাবেক আমি কিতাবটি নিয়ে মুহাদ্দেস সাহেবের খেদমতে উপস্থিত হলাম, এবং তাঁকে কিতাবটি পেশ করলাম তিনি কারণ জানতে চাইলে আমি আলা হযরতের এরশাদ শুনায়ে দিলাম। তিনি আলা হযরতের সাথে দেখা করার জন্য এবং ট্রেন ষ্টেশন পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে বের হচ্ছিলেন। আমার হাত থেকে কিতাবটি নিলেন এবং আমার সাথে বের হলেন। তিনি আলা হযরতের কাছে এসে ফরমালেন, আমিতো কিতাবটি দেখার পর আমার কাছে পাঠিয়ে দেয়ার কথা বলেছিলাম। কিন্তু বুঝতে পারছিনা আপনি কিতাবটি সাথে না নিয়ে আমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন কেন? আলা হযরত ফরমালেন আমার উদ্দেশ্য তো নিয়ে যাওয়ার ছিল। যদি গতকাল চলে যেতাম তাহলে সাথে করে নিয়ে যেতাম। গতকাল যাওয়া হলো না বিধায় গত রাত্রে এবং আজ সকালে গোটা কিতাব পড়েছি, এখন আর নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন হবে না। তাই আপনার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি। হযরত মুহাদ্দেস সুরুতী সাহেব ফরমালেন, একবার দেখে নেয়াই কি যথেষ্ট? উত্তরে আলা হযরত ফরমালেন, আল্লাহর মেহেরবানীতে আশা করি দু'তিন মাস পর্যন্ত যেখান থেকে এবারতের প্রয়োজন হবে সেখান থেকে এবারত লিখে ফতোয়া লিখে দেব। আর বিষয়বস্তু তো ইনশাআল্লাহ ইন্তেকাল পর্যন্ত খেয়াল থাকবে। এর থেকে বুঝা যায় আলা হযরত কেবলার স্মৃতিশক্তি কি রকম বিস্ময়কর ও অসাধারণ ছিল।

শাদী মোবারক ঃ

শিক্ষা জীবন পরিপূর্ণ হওয়ার পর আলা হযরত কেবলার বিবাহ করার সময় আসল। ১২৯১ হিজরীতে তিনি যখন ১৯ বৎসরে পদার্পণ করলেন তখন তাঁর বিবাহের জন্য পাত্রী খোঁজা হলো। তাঁর ফুফা হযরত শেখ ফজল হোসাইন সাহেবের মেঝো সাহেবজাদী এরশাদ বেগম সাহেবাকে তাঁর পাত্রী হিসাবে ঠিক করা হলো। কোন এক মোবারক দিনে আক্‌দে মাসনুন অনুষ্ঠিত হল। তাঁর এ শাদী মোবারক মুসলিম জাহানের জন্য একটি শরয়ী নমূনা ছিল। যার মধ্যে আহ্‌কামে শরীয়াহ ও সূনানে নববীয়ার পরিপূর্ণ সন্নিবেশন ছিল। যারা এ শাদীয়ে মোবারক দেখেছেন তারা বলেন, শরীয়তের আদেশানুবর্তীতা হলে এ রকমই হবে। তাঁর স্ত্রী এরশাদ বেগম সাহেবা শরীয়তের আহকামের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতেন। নামায রোজার খুব পাবন্দ ছিলেন। উত্তম চরিত্রের অধিকারীনি ছিলেন। অতিথিদের আতিথিয়তার ত্রুটি করতেন না। আলা হযরতের দরবারে সবসময় মেহমানদের ভীড় থাকত। তিনি মেহমানদের সব কাজ চুপচাপ ও ধৈর্য্যের সাথে আঞ্জাম দিতেন, কখনো গড়িমসি করতেন না। আবার সব সময় আলা হযরতের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। তাঁর সেবা যত্ন করতেন। আলা হযরতের জরুরী খেদমত তিনি নিজ হাতেই আঞ্জাম দিতেন। বিশেষ করে আলা হযরত কেবলা মাথায় তেল দিতেন, ঐ কাজটা তাঁর স্ত্রী নিজেই করতেন। আলা হযরত লেখা লেখিতে ব্যস্ত থাকলে তিনি তেল নিয়ে প্রায় ২০ মিনিটি বা আধা ঘন্টা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকতেন। এরপর তিনি আলা হযরত কেবলার মাথায় এমনভাবে তেল মালিশ করতেন যাতে তাঁর লেখনির মধ্যে কোন ব্যাঘাত ঘটত না। আলা হযরত কেবলার মাথায় তেল লাগানোর এ কাজটি তাঁর ইন্তেকাল পর্যন্ত করেছেন। পৃথিবীর বুকে আদর্শবান স্ত্রীদের মধ্যে আলা হযরতের স্ত্রী এরশাদ বেগম অন্যতম একজন ছিলেন। যার জীবন থেকে মুসলিম স্ত্রীরা আদর্শ শিক্ষা অর্জন করা উচিত।

আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজার আওলাদবৃন্দঃ

আলা হযরত কেবলার ছেলে ও মেয়ে মোট সাত জন ছিল যথাঃ

১. হুজ্জাতুল ইসলাম মাওলানা হামেদ রেজা খান।
২. মুস্তফায়ী বেগম
৩. কানীজ হাসান
৪. কানীজ হোসাইন
৫. কানীজ হাসনাইন
৬. মুফতীয়ে আজম হিন্দ মাওলানা মুস্তফা রেজা খান
৭. মরতুদায়ী বেগম

নিম্নে আওলাদদের শাজরা দেয়া গেল ঃ

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত হামেদ রেজা খান সাহেব

* হযরত ইব্রাহীম রেজা খান * উম্মে কুলসুম * কানীজ ছোগরা * হাম্মাদ রেজা খান * রাবেয়া * সালমা

হযরত ইব্রাহীম রেজা খান

* হযরত রায়হান রেজা * হযরত আখতার রেজা * হযরত মন্নান রেজা * হযরত কমরুর রেজা

সরফরাজ বেগম * সেরতাজ বেগম * দীলশাদ বেগম

হযরত রায়হান রেজা

হযরত সুবহান রেজা * হযরত আন্‌জুমন রেজা * হযরত তাওক্বীর রেজা

* হযরত তাওছীফ রেজা * হযরত তসলিম রেজা

মুফতীয়ে আজম হিন্দ হযরত মুস্তফা রেজা খান সাহেব

নেগারে ফাতেমা * আনওয়ারে ফাতেমা * বরকাতী বেগম * রাবেয়া বেগম

* হাজেরা বেগম * শাকেরা বেগম

মুস্তফায়ী বেগম, স্বামী-শাহেদ আলী খান

* আজু বিবি, স্বামী-সরদার আলী খান ওরফে আজ্জু মিয়া

কানীজ হাসান, স্বামী- হামীদুল্লাহ খান

* আতীকুল্লাহ খান * রিফয়াত বেগম

কানীজ হোসাইন স্বামী-হাকীম হোসাইন রেজা খান

*মরতুজা রেজা খান * ইদ্রিস রেজা খান * জরজিস রেজা খান

কানীজ হাসনাইন

* শামীম বানু স্বামী-জরজিস রেজা খান

মরতুদায়ী বেগম, স্বামী-মজীদুল্লাহ খান

* রঈস মিয়া * সাঈদ মিয়া * ফরীদ মিয়া * মুজতবায়ী বেগম * মুকতদায়ী বেগম

যিয়ারতে হারামাইনে শরীফাইন ঃ

ইমামে আহলে সুন্নাত মুজাদ্দেদে দ্বীনো মিল্লাত আলা হযরত শাহ ইমাম আহমদ রেজা খান ফাযেলে ব্রেলভী আলাহির রাহমাতু ওয়ার রিদওয়ান ১২৯৫ হিজরীতে ২৩ বছর বয়সে তাঁর পিতা-মাতার সাথে প্রথমবার হজ্জ ও যিয়ারতে মদীনায়ে মুনাওয়ারা করেছেন। ১৩২৩ হিজরীতে দ্বিতীয়বার হজ্জ ও যিয়ারতের সময় তাঁর সাথে যারা ছিলেন তাঁরা হচ্ছেন, যথাক্রমে তাঁর সাহেবজাদাদ্বয়, তাঁর ভাতিজা হযরত শাহ মাওলানা মুহাম্মদ রেজা খান

সাহেব, সুলতানুল ওয়ায়েজীন মাওলানা শাহ আবদুল আহমদ ফীলীভেতী সাহেব ও মুহাদ্দেসে সুরুতী সাহেবের সাহেবজাদা সাহেব।

তথায় নায়েবে রাসূল গাউছে পাকের প্রতিনিধি চৌদ্দশত শতাব্দীর মুজাদ্দেদে আজম আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে অগনিত কারামাত ও ঘটনাবলী প্রকাশিত হয়েছে। সেখানকার হাজার হাজার মানুষ আলা হযরত কেবলায়ে আলমের মুরীদ হয়েছেন। মক্কায়ে মোকাররমার অসংখ্য আলেম আর মদীনায়ে মুনাওয়ারার অনেক মাশায়েখে এজাম আলা হযরত কেবলাকে বিভিন্ন সম্মানজনক উপাধিতে ভূষিত করেছেন এবং আলা হযরত থেকে খেলাফত, অনুমতি ও বিভিন্ন বিষয়ের সনদ গ্রহণ করেছেন। যদি ঐ সবের বিশদ ব্যাখ্যা দেখতে চান তাহলে হারামাইন শরীফাইনের মধ্যে আলা হযরত কেবলার এবং তাঁর সাহেবজাদার লিখিত কিতাবাদী বিশেষতঃ

১) আল্ এজাজাতুল মাতিনাহ লি ওলামায়ে বক্কা ওয়াল মাদীনা।

২) আদ্ দাউলাতুল মাক্কীয়্যাহ বিল মাদ্দাতিল গায়বিয়্যাহ ইত্যাদি দেখুন। উহা থেকে কিছু বুঝতে পারবেন।

আলা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত মুজাদ্দেদে দ্বীন ও মিল্লাত ইমামে এশক ও মুহাব্বত শাইখুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন ইমাম আহমদ রেজা ফাযেলে ব্রেলভী (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)র সনদে হাদীস ও সনদে রেওয়ায়ত নিম্নে পেশ করা হল, যা অত্যন্ত জামে (পরিপূরক) ঃ

(১) ধারাবাহিক সনদে হাদীস উপর থেকে-

১. হুজুর নবীয়ে আকরম নূরে মুজাসসম শফীয়ে আজম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)।

২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস

৩. হযরত সুফিয়ান ইবনে আমর ইবনে দীনার

৪. হযরত সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা

৫. হযরত আবদুর রহমান ইবনে বশর ইবনুল হাকম

৬. হযরত আবু হামেদ আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহ্য়া ইবনে বেলাল আল বাজ্জার

৭. হযরত আবু তাহের মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ মাহ্মশ আজ জায়াদী

৮. হযরত আবু ছালেহ আহমদ ইবনে আবদুল মালিক আল্ মুয়াজ্জেন

৯. হযরত আবু সাঈদ ইসমাঈল ইবনে আবু ছালেহ্ আহমদ ইবনে আবদুল মালিক নিশাপূরী

১০. হযরত হাফেজ আবুল ফরজ আবদুর রহমান ইবনে আলী আল্ জুবী

১১. হযরত আবুল ফাতাহ মুহাম্মদ ইবনে ইব্রাহীম আল্ কুবরা আল মাইদুমী

১২. শেখ শামশুদ্দীন আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আদ্ তাদমীরী

১৩. শেখুল ফজল আবদুর রহীম ইবনে হোসাইন আল ইরাকী

১৪. শেখুশ্ শেহাব আবুল ফজল আহমদ ইবনে হাজর আস্কালানী
১৫. শেখ শামশুদ্দীন সাখাভী আল কাহেরী
১৬. শেখ ওজীহুদ্দীন আবদুর রহমান ইবনে ইব্রাহীম ঔলুভী
১৭. শেখ মুহাম্মদ আফলাহ্ আরমনী
১৮. শেখ আবদুল ওহাব ইবনে ফতহীল্লাহ্ বুরুজী
১৯. সৈয়্যদ আবদুল ওহাব আল মুত্তাক্বী
২০. শেখ আবদুল হক মুহাদ্দেসে দেহলভী
২১. শেখ আবুর রেজা ইবনে ইসমাঈল দেহলভী (শেখ আবদুল হকের দৌহিত্র)
২২. সৈয়্যদ মুবারক ফখরুদ্দীণ বিলগারামী
২৩. সৈয়্যদ তোফাইল মুহাম্মদ আতরুলভী
২৪. সৈয়দ শাহ হামজাহ ইবনে সৈয়্যদ আলে মুহাম্মদ বিলগারামী হাসানী আল্ ওয়ামেতী
২৫. সৈয়্যদ আলে আহমদ আচ্ছে মিয়া মারেহারভী
২৬. সৈয়্যদ আলে রাসূল মারেহারভী
২৭. ইমাম আহমদ রেজা আল ব্রেলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম

(২) ধারাবাহিক সনদে হাদীস উপর থেকে-

১. হুজুরে আকরম নূরে মুজাসসাম শফীয়ে আজম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম
২. হযরত আবু কাবুস মাওলা আবদিল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস
৩. হযরত সুফিয়ান ইবনে আমর ইবনে দীনার
৪. হযরত সুফিয়ান ইবনে ওয়াইনাহ
৫. হযরত আবদুর রহমান ইবনে বশর ইবনিল হাকম
৬. হযরত আবু হামেদ আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহয়া ইবনে বেলাল আল বাজ্জার
৭. হযরত আবু তাহের মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ মাহ্মশ আজ জায়াদী
৮. হযরত আবু ছালেহ আহমদ ইবনে আবদিল মালিক আল্ মুয়াজ্জেন
৯. হযরত আবু সাঈদ ইসমাঈল ইবনে আবু ছালেহ আহমদ ইবনে আবদিল মালিক নিশাপুরী
১০. হযরত হাফেজ আবুল ফরজ আবদির রহমান ইবনে আলী আল জুজী
১১. হযরত আবুল ফরজ আবদিল লতীফ ইবনে আবদিল মালআম আল হারানী
১২. হযরত আবুল ফাতাহ মুহাম্মদ ইবনে ইব্রাহীম আল্ কুব্রা আল মাইদমী
১৩. শেখ শামশুদ্দীন আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আদ তাদমীরী
১৪. শেখ জয়নুদ্দীন আবদির রাহীম ইব্নিল হোসাইন আল্ ইরাকী
১৫. শেখ আবুল ফাতাহ্ মুহাম্মদ ইবনো আবু বকর ইবনোল হোসাইন আল্ মারাগী
১৬. শেখ সৈয়্যদ ইব্রাহীম এলতাজী

১৭. শেখ আহমদ মুজী আল ওয়াহ্‌রানী
১৮. শেখ সাঈদ ইবনে মুহাম্মদ আল মুকীররী
১৯. শেখ সাঈদ ইবনে ইব্রাহীম আল হাযায়েরী
২০. শেখ ইয়াহ্‌য়া ইবনে মুহাম্মদ শাদী
২১. শেখ আবদুল্লাহ ইবনে সালেম আল বসরী
২২. শেখ সৈয়্যদ ওমর
২৩. হযরত শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দেসে দেহলভী
২৪. হযরত সৈয়্যদ আলে রাসূল আহমদী মারেহারভী
২৫. হযরত ইমাম আহমদ রেজা আল ব্রেলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম।

(৩) ধারাবাহিক সনদে হাদীস উপর থেকে-

১. হুজুরে আকরম নবীয়ে রহমতে আলম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াচ্ছাল্লাম)
২. হযরত আবু কাবুস মাওলা আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল্ আস
৩. হযরত সুফিয়ান ইবনে আমর ইবনে দীনার
৪. হযরত সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা
৫. হযরত আবদুর রহমান ইবনে বশর ইবনুল হাকম
৬. হযরত আবু হামেদ আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহ্‌য়া ইবনে বেলাল আল বাজ্জার
৭. হযরত আবু তাহের মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ মাহ্‌মশ আজ্ জায়াদী
৮. হযরত আবু ছালেহ আহমদ ইবনে আবদুল মালিক আল মুয়াজ্জেন
৯. হযরত আবু সাঈদ ইসমাঈল ইবনে আবু ছালেহ আহমদ ইবনে আবদুল মালিক নিশাপুরী
১০. হযরত হাফেজ আবুল ফরজ আবদুর রহমান ইবনে আলী আল জুজী
১১. হযরত আবুল ফরজ আবদুল লতীফ ইবনে আবদুল মুলআম আল হেরানী
১২. হযরত আবুল ফাতাহ মুহাম্মদ ইবনে ইব্রাহীম আল কোবরা আল মাইদমী
১৩. শেখ শামশুদ্দীন আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আহমেদ আদ্ তাদমীরী
১৪. শেখুল ফজল আবদুর রাহীম ইবনে হোসাইন আল ইরাকী
১৫. শেখুস শিহাব আবুল ফজল আহমদ ইবনে হাজর আসকালানী
১৬. শেখুল ইসলাম আশরাফ জাকারিয়া ইবনে মুহাম্মদ আল আনসারী
১৭. শেখ আবুল খায়ের ইবনে আমুস আর রশীদী
১৮. শেখ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল আজীজ
১৯. শেখ আহমদ ইবনে মুহাম্মদ আল আনসারী
২০. শেখ আবুল খায়ের ইবনে আমুস আর রশীদী
২১. শেখ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল আজীজ
২২. শেখ আহমদ ইবনে মুহাম্মদ আদ দমীয়াতী (পরিচিত) ইবনে আবদুল গনী

২৩. শেখ মাওলানা আহমদ হাসান আস সূফী মুরাদাবাদী
২৪. হযরত সৈয়্যদ শাহ্ আবুল হোসাইন আন্ নূরী মারেহারভী
২৫. হযরত ইমাম আহমদ রেজা আল ব্রেলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম।

সনদে ফিক্হির বর্ণনা ঃ

ধারাবাহিকভাবে উপর থেকে সনদে হাদীস উপস্থাপন করার সাথে সাথে আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজার একটি সনদের রিওয়ায়তও পেশ করা হচ্ছে যা ৫৪ জনের মাধ্যমে ইমামে আজম আবু হানিফা নোমান বিন সাবেতের সাথে মিলে ইমামুল মুজতাহেদীন হযরত ইব্রাহীম নখী পর্যন্ত পৌঁছেছে। এ সনদের একটি বৈশিষ্ট্য এ যে, এর মধ্যে ইতিহাস, মুকামে রিওয়ায়তের বিস্তারিত আলোচনা বিদ্যমান রয়েছে। কখন, কোথায় ও কার থেকে রিওয়ায়ত তার পুরাপুরি উল্লেখ রয়েছে। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য এ যে, সৈয়্যদ আলে রাসূল আহমদী মারেহারভীর পর সকল শেখরা হানাফী মাজহাবলম্বী। আর এ সনদের কোথাও আমবা'না, কোথাও আখ্বারানা আবার কোথাও আন শব্দের উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু সংক্ষিপ্ত ও সহজের প্রতি দৃষ্টিপাত করে সবগুলোকে আন দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে সংক্ষিপ্তভাবে উহাকে উল্লেখ করা হয়েছে তবে এ হাদীসের বিস্তারিত সনদ "সুরুরুল ঈদ ফি হল্লিদ দোয়ায়ে বাদে সালাতিল ঈদ" পুস্তিকার মধ্যে উল্লেখ রয়েছে। যা আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা রিওয়ায়ত করেছেন। এ রিসালাটি আল আতায়াযুন নববীয়্যা ফিল ফাতাওয়ায়ির রেজভীয়্যার তৃতীয় খন্ডের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে।

সনদ রিওয়ায়ত নিম্নরূপঃ

কালাল ইমাম আহমদ রেজা আল্ ব্রেলভী
আন আবদির রহমান আস সেরাজ্জা আল মক্কী হানাফী (মুফতী শহরে মক্কা)
আন জামাল ইবনে আবদিল্লাহ ইবনে ওমর আল মক্কী
আন আশ্ শেখুল আযল আবেদ আস সিনদী
আন আম্মিহি মুহাম্মদ হোসাইন আল আনসারী
আন আশ্ শেখ আবদিল খালেক ইবনে আলী আল মাজাজী
আন আশ্ শেখ মুহাম্মদ ইবনে আলা উদ্দীন আল মাজাজী
আন আহমদ আল নখলী
আন মুহাম্মদ আল চাহেলী
আন সালেম আস সনুলী
আন আন নাজমুল গায়তী
আন আল হাফেজ জাকারিয়া আল আনসারী
আন আল হাফেজ ইবনে হাজর আল আসকালানী
আন আবি আবদিল্লাহ আল জায়ীরী
আন কাওয়ামুদ্দীন আল এতকানী

আন আল বোরহানী আহমদ ইবনে সায়াদ ইবনে মুহাম্মদ আল বুখারী ওয়াল হুসসামুন সাপতাক্বী
আন হাফিজিদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে নসর আল বুখারী (হাফিজুদ্দীন আল কবীর)
আন আল ইমাম মুহাম্মদ ইবনে আবদিস সাত্তার আল কিরদরী
আন আমরাবনিল কারীম আল ওয়ারসকী
আন আবদির রহমান ইবনে মুহাম্মদ ইবনিল হোসাইন ইবনে মুহাম্মদ (আল ইমাম ফখরুল কুজাত আল এরশাবন্দী)
আন আবদিল্লাহ আন জুওজনী
আন আবি জায়েদ আদ্ দবুসী
আন আবি জাফর আল আসতারুশনী
আন আস সৈয়্যদ আলিল রাসূল আল মারেহারভী
আন আশ্ শাহ্ আবদিল আজিজ আল মুহাদ্দেস আদ্ দেহলভী আন আবিহি
আন আশ্ শেখ তাজুদ্দীন আল কলরী মুফতী আল হানাফী
আন আশ্ শেখ হাসান আল আজমী
আন আশ্ শেখ খাইরিদ্দীন আর রসলী
আন আশ্ শেখ মুহাম্মদ ইবনে সিরাজিদ্দীন আল হানুতী
আন আহমদ ইবনে আশ্ শিবলী
আন ইব্রাহীম আল ফারুকী (কিতাবুল ফয়েজ এর লেখক)
আন আমিনিদ্দীন ইয়াহয়া ইবনে মুহাম্মদ আল আফসারী
আন আশ্ শেখ মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ আল বুখারী আল হানাফী
আন আশ্ শেখ হাফিজিদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী আন বুখারী আত্ তাহেরী
আন আল ইমাম সদরিশ শরীয়া (শরহে বেকায়ার লেখক)
আন জাদ্দীহি তাজিশ শরীয়া
আন ওয়ালেদিহি জামালিদ্দীন আল মাহবুবী
আন মুহাম্মদ ইবনে আবি বকর আল বুখারী আল মারূপ বে-ইমাম জাদাহ্
আন শামশীল আয়িম্মা আল জানজারী
আন আবি আলী আন নসকী ইমামুল হালওয়ানী
আন আবি আলী
আন আবি আলী আল হোসাইন ইবনে হাজর আন নসকী
আন আবি বকর মুহাম্মদ ইবনিল ফজল আল বুখারী
আন আবি মুহাম্মদ আবদিল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইয়াকুব আল হারেসী আস সনদমুনী
আন আবদিল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবি হাফস আল কবীর
আন আবিহি
আন মুহাম্মদ ইবনিল হাসান আশ্ শায়রানী

আখ্‌বারানা আবু হানিফা
আন হাম্মাদ
আন ইব্রাহীম আন নখী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম।

যখন ১২৯৫ হিজরী/১৮৭৮ খ্রীঃ প্রথমবার হজ্জে যান তখন এ ছাড়া আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা হারামাইনে শরীফাইনে যে সমস্ত জ্ঞানগুনী বুযুর্গ ব্যক্তিদের থেকে তাফসীর, হাদীস, ফিক্‌হ, উছুলে ফিক্‌হ এর সনদ লাভ করেন তাঁরা হলেন যথা-মুফতীয়ে শাফীয়া শেখ সৈয়্যদ আহমদ যায়নী দাহলান মক্কী (মৃঃ১২৯৯ হিঃ/১৮৮১ খ্রীঃ)
মুফতীয়ে হানাফী শেখ আবদুর রহমান সিরাজ (মৃঃ১৩০১/১৮৮৩ খ্রীঃ) উক্ত সফর মোবারকে হেরম শরীফের মধ্যে একদিন মাগরিবের নামাযের পর যখন বসলেন, তখন ইমামে শাফীয়া শেখ হোসাইন ইবনে ছালেহ সাহেব (মৃঃ ১৩০২হিঃ/১৮৮৪খ্রীঃ) কোন রূপ পরিচয় ব্যতিরেখে আলা হযরতের কাছে গিয়ে তাঁর হাত ধরে তাঁকে তাঁর ঘরে নিয়ে গেলেন এবং দীর্ঘক্ষণ যাবত তিনি তাঁর কপালের দিকে তাকিয়ে এরশাদ ফরমালেন- নিশ্চয় আমি এ কপালের মধ্যে আল্লাহর নূর অবলোকন করতেছি। এরপর তিনি তাঁকে সিহাহ সিত্তা শরীফের এজাজত দান করলেন।

সনদে ফিক্‌হে হানাফী ঃ

এ সনদের বৈশিষ্ট্য এ যে, এ সনদের সকল উস্তাদ ও মাশায়েকগণ হানাফী। যা আল আতায়ায়ুন নববীয়্যা ফিল ফাতাওয়ায়ির রেজভীয়্যার প্রথম খন্ডের প্রথম পৃষ্ঠায় রয়েছে।

সনদে ফিক্‌হে হানাফী নিম্নরূপঃ

আন নাবিয়্যিল কারীমিল আমিন আলাইহিস সালাত ওয়াত তাস্‌লীম
হযর আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ
হযরত আলকামা
হযরত আল আসওয়াদ
হযরত ইব্রাহীম
হযরত হাম্মাদ
হযরত ইমামে আজম আবু হানিফা
হযরত আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইবনিল হাসান আশ্‌ শায়বানী
শেখ আহমদ ইবনে হাফ্‌স (যিনি আবু হাফস আল কবীর নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন)
শেখ আবদুল্লাহ ইবনে আবি হাফস আল বুখারী
ইমাম আবু আবদিল্লাহ আস্‌ সনদমুনী
শেখ আবু বকর মুহাম্মদ ইবনিল ফজল আল বুখারী
শেখ আলকাজী আবু আলী আন নসকী
ইমাম শামশুল আয়িম্মা আল হালওয়ানী
ইমাম ফখরুল ইসলাম আল বজদভী
ইমাম বোরহানুদ্দীন (হেদায়া শরীফের লেখক)

ইমাম আবদুস সাত্তার ইবনে মুহাম্মদ আল কিরদরী
শেখ জালালুদ্দীন আল কবীর
শেখ আবদুল আজীজ আল বুখারী
শেখ সৈয়্যদ জালালুদ্দীন আল বুখারী
শেখ আলাউদ্দীন আস সিরানী
শেখ আস সিরাজ ক্বারী আল হেদায়া
শেখুল কামাল ইবনুল হুম্মাম (ফতহুল কদীরের লেখক)
শেখ সরিউদ্দীন আবদুল্লা ইবনিশ শোহ্না
শেখ আহমদ ইবনে ইউনুচ আস সাল্বী
শেখ মুহাম্মদ শেখ আবদুল্লাহ শেখ মুহাম্মদ শেখ আহমদ
ইবনো আবদিল্লাহ আল খারীরী ইবনে আহমদ আল মাহবী
আল মসীরী আল হামুভী
শেখ হাসান শেখুশ শামস শেখ আলী শেখ ওমর
আশ শারামবুলালী আল হানাফী আল মুক্তাকী ইবনে নজীম (সাহেবে নুরুল ইজা)
শেখ আহমদ শোবরী
শেখ ইসমাঈল ইবনো আবদিল গনী আন নাবলাল (সাহেবে শরহোর দুরুর ওয়াল গরুর)
শেখ আদুল গনী ইবনো ইসমাঈল ইবনো আবদিল গনী আন নাবলসী (সাহেবে আল হাকীকাতুন নদীয়্যা)
শেখ ইসমাঈল ইবনো আবদিল্লাহ্ (যিনি আলী জাদা আল বুখারী নামে প্রসাদ্ধি)
শেখ আবদুল ক্বাদের ইবনে খলীল
শেখ ইউছুপ ইবনো মুহাম্মদ ইবনো আলা উদ্দীন আল মিয্জাজী
শেখ মুহাম্মদ আবেদ আল আনসারী আল মদনী
শেখ জামাল ইবনো আবদল্লিাহ ইবনে ওমর (মুফতী মক্কা শরীফ)
শেখ আবদুর রহমান আস সিরাজ ইবনে শেখ আবদিল্লাহ্ আস সিরাজ ইবনে শেখ আবদিল্লাহ আস সিরাজ (মুফতী মক্কায়ে মুকাররামা)
ইমাম আহমদ রেজা আল ব্রেলী
(রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম আজমায়ীন)

বায়'য়াত ও খেলাফতঃ

জমাদিউল উলা ১২৯৪ হিজরীতে আলা হযরত একদিন দুপুর বেলা কাঁদতে কাঁদতে শুয়ে গেলেন। কারণ দুপুর বেলা কায়লুলা করা তথা কিছু শুয়ে বিশ্রাম নেয়া প্রিয় নবী হুজুর রাসূলে আকরম নূরে মুজাসসাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের সুন্নাত। এ সুন্নাত পালন করা আলা হযরতের খান্দানের মধ্যে এখনও প্রচলন রয়েছে। আলা হযরত কেবলাও সারা জীবন এ সুন্নাত পালন করেছেন। তিনি যখন শুয়ে পড়লেন তখন তাঁর একটু

নিদ্রা আসল। ঐ নিদ্রার মধ্যে তিনি তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতামহ হযরত মাওলানা রেজা আলী খান সাহেবকে স্বপ্নে দেখলেন। তাঁর দাদা তাঁর কাছে তাশরীফ এনে তাঁকে সম্বোধন করে এরশাদ ফরমালেন, অনতিবিলম্বে ঐ ব্যক্তি আসছেন, যিনি তোমার এ ব্যথার ঔষধ দেবেন। অতঃপর ঐ ঘটনার দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিন তাজুল ফহুল হযরত মাওলানা আবদুল কাদের বদায়ুনী সাহেব বদায়ুন থেকে ব্রেলীতে তাশরীফ আনলেন। আলা হযরত কেবলা তাঁর সাথে বায়'য়াত হওয়ার পরামর্শ করলেন। তিনি তাঁকে বললেন, অতিসত্ত্বর মারেহেরা শরীফ গিয়ে বায়'য়াত হওয়া উচিত। এরপর আলা হযরত তাঁর শ্রদ্ধেয় আব্বাজান হযরত নক্বী আলী খান ও তাজুল ফহুল হযরত আবদুল কাদের বদায়ুনী এ তিন ব্যক্তি মারেহেরা শরীফ তাশরীফ নিলেন, তাঁরা যখন আস্তানায়ে আলীয়া বরকাতীয়ায় উপস্থিত হলেন তখন ঐখানকার সাজ্জাদানশীন হযরত সৈয়্যদেনা মাওলানা শাহ আলে রাসূল মারেহারভীর সাথে আলা হযরত কেবলা ও তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতার প্রথম সাক্ষাত হলো। তিনি আলা হযরত কেবলাকে দেখে যা বলেছেন, তা হচ্ছে, আসুন! আমি তো কয়েকদিন ধরে আপনার অপেক্ষায় রয়েছি। আলা হযরত ও তাঁর পিতা মহোদয় তাঁর হাতে বায়'য়াত হলেন। বায়'য়াত হতে না হতেই মোর্শেদে বরহক সমস্ত সিলসিলার এজাজত দান করে খেলাফতের তাজ আলা হযরত কেবলার মাথায় স্বীয় বরকতময় হাত দিয়ে পরিয়েদিলেন। এটা এমন যাতনা যার জন্য আলা হযরত কেবলা কাঁদতেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর থেকে ঐ যাতনা দূরিভূত করে দিলেন। শরীয়তের শিক্ষা পিতা মহোদয় থেকে মিলেছে আর তরীক্বতের পরিপূর্ণতা মোর্শেদে কামেল দান করেছেন। ঐ সময় আলা হযরত শরীয়ত ও তরীক্বত উভয়ের ইমাম হয়ে গেলেন। মোর্শেদে বরহক আলা হযরতকে খেলাফতের তাজ পরিধান করায়ে একটি ছোট বক্স দান করলেন যা অযিফার সিন্দুক নামে প্রসিদ্ধ ছিল। আর এর সাথে সাথে ঐ সব অযিফার অনুমতি ও প্রদান করলেন। ঐ সময় যে সমস্ত মুরীদ ওখানে উপস্থিত ছিলেন তাঁরা হযরত সৈয়্যদুনা আলে রাসূলের খেদমতে আরজ করলেন- হুজুর! এ বাচ্চার উপর এমন দান যে, মুরীদ হওয়ার সাথে সাথেই সমস্ত সিলসিলার এজাজত ও খেলাফত দান করলেন। অথচ আমরা জানি আপনার এখানে খেলাফত পেতে হলে অনেক সাধনা করতে হয় কিন্তু এ বাচ্চা কোন প্রকার সাধনা, ও সিল্লা করা ব্যতীত খেলাফত পেয়ে গেলেন এর হেকমতটা কি? মুরীদদের এ কথা শুনে হযরত সৈয়্যদুনা আলে রাসূল এরশাদ ফরমালেন, হে মুরীদরা- তোমরা আলা হযরত সম্বন্ধে কি জান? অন্যান্যরা এখানে এসে সাধনা করে খেলাফত পাওয়ার জন্য নিজেকে তৈয়ার করে কিন্তু আলা হযরত সম্পুন্ন তৈয়ার হয়ে এসেছেন। তাঁর কেবল নিসবতের প্রয়োজন ছিল। এখানে এসে তাও পুরা হয়ে গেল। তিনি এ কথা বলে কাঁদতে লাগলেন আর এরশাদ ফরমালেন। কিয়ামতের দিবসে রাব্বুল ইজ্জত জাল্লা জাল্লালুহু এরশাদ ফরমাবেন যে, আলে রাসূল তুমি দুনিয়া থেকে আমার জন্য কি নিয়ে এসেছ। আল্লাহ তায়ালা যখন একথা বলবেন তখন আমি আহমদ রেজাকে পেশ করে আবেদন করবো হে খোদা আমি তোমার জন্য দুনিয়া থেকে আহমদ রেজাকে নিয়ে এসেছি। উল্লেখ্য যে, মারেহেরা শরীফের আইটা নামক জেলার এক ছোট শহরের মধ্যে হযরত

সৈয়্যদুনা আলে রাসূলের সম্মানিত খান্দানের বুযুর্গ ব্যক্তিরা বিলগেরাম শরীফ থেকে এসে আবাদ হয়েছেন। এরা হাসানী হোসাইনী উভয় দিক দিয়ে আওলাদে রাসূল। হযরত গাউছে আজম দস্তগীর আবদুল ক্বাদের জিলানী (রাদিয়াল্লাহু আনহুর) বংশধর ছিলেন। আর তরীক্বতের দিক দিয়েও ক্বাদেরী ছিলেন। আলা হযরতের মোর্শেদ কেবলা হযরত সৈয়্যদেনা শাহ আলে রাসূল ও ঐ সা'দাতদের অন্যতম একজন। তিনি তৎকালীন আউলিয়ায়ে কেরামদের মধ্যে পরিগণিত হতেন। বদায়ুনুনের ওলামায়ে কেরামও ঐ খান্দানে বায়'য়াত হয়েছেন। আর ব্রেলীর ওলামায়ে কেরামও ঐ দামানে পাকের গোলামীর উপর গর্ব করতেন।

আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা ফাযেলে ব্রেলভী আপন মোর্শেদে তরীক্বতের প্রশংসায় একটি দীর্ঘ নাত লিখেছেন উহার একটি পংক্তি নিম্নে পেশ করা হলো-

"খোশা দিলে কে দেহানদশ ওয়ালায়ে আলে রাসুল
খোশা সরে কে কোনানদশ ফেদায়ে আলে রাসুল"

আলা হযরত কেবলা যে সব সিলসিলায়ে তরীক্বতের ইজাযত ও খিলাফত লাভ করেন ঐ সব তরীক্বার তালিকা নিম্নে দেয়া হলো-

১) ক্বাদেরিয়া বরকাতিয়া জদীদাহ
২) ক্বাদেরিয়া আবাইয়্যাহ্ ক্বাদীমিয়্যা
৩) কাদেরিয়া উহদলিয়া
৪) ক্বাদেরিয়া রায্যাকিয়া
৫) ক্বাদেরিয়া মুনাওয়ারিয়্যাহ
৬) চিশতিয়া নিজামিয়্যাহ ক্বাদীমাহ
৭) চিশতিয়া মাহবুবিয়্যাহ জদীদাহ
৮) সোহরাওয়াদিয়্যাহ ওয়াহেদিয়া
৯) সোহরাওয়াদিয়্যাহ ফদলিয়াহ
১০) নক্বশবন্দীযাহ আলা ইয়্যাহ সিদ্দীক্বিয়্যাহ
১১) নক্বশবন্দীয়াহ্ আলা ইয়্যাহ আলভিয়া
১২) বদীইয়্যাহ
১৩) উলুভিয়া মনামিয়্যাহ ইত্যাদি

উল্লেখিত সিলসিলাহগুলোর ইজাযত ছাড়াও আলা হযরত কেবলা চার মোসাফাহা এর সনদও লাভ করেন। উক্ত মোসাফাহগুলো নিম্নরূপঃ

১) মোসাফাহাতুল জ্বিন্নীয়াহ্/ হোসাইনিয়্যাহ
২) মোসাফাহাতুল খিযরিয়্যাহ্
৩) মোসাফাহাতুল মোয়াম্মারিয়্যাহ
৪) মোসাফাহাতুল মানামিয়্যাহ

এসব মোসাফাহাহ্ ও ইজাজত ছাড়া আলা হযরত কেবলার নিম্নলিখিত যিকির অযিফা ও আমল ইত্যাদির ইজাজতও হাসিল ছিল। যথা-

১) খাওয়াসসুল কোরান
২) আসমা-ই-ইলাহিয়্যাহ
৩) দালা-ইলুল খায়রাত
৪) হিসনে হাসীন
৫) হিযবুল বাহার
৬) হিযবুল বার
৭) হিযবুল নসর
৮) হিযযুল আমীরীন
৯) হিরযুল ইয়ামানী
১০) দো'য়া-ই-মোগ্নী
১১) দো'য়া -ই-হায়দরী
১২) দো'য়া -ই-আজরাইলী
১৩) দো'য়া -ই-সুরিয়ানী
১৪) ক্বসীদায়ে গাউছিয়া
১৫) কসীদায়ে বোরদা
১৬) সালাতুল আসরার

অধ্যাপনা ঃ

আলা হযরত কেবলা (প্রাতিষ্ঠানিক) শিক্ষা সমাপ্তির পর কিছু কাল শিক্ষাদানে লিপ্ত ছিলেন। তৎপর বিভিন্ন বিষয়ে লেখা-লেখি ও ফতোয়া লিখায় সর্বদা ব্যস্ত থাকতেন। এ প্রসংগে তিনি লিখেছেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য, এ ফকীরের ১৩ বছর ১০ মাস ৫ দিন বয়সে শিক্ষা সমাপ্ত হয় এবং আমি দস্তারে ফযীলত লাভ করি, আর যেদিন আমার শিক্ষা সমাপ্ত হয় এবং শেষ বর্ষের সনদ লাভ করি সেদিনই আমার উপর নামায ফরয হয় এবং আমি শরীয়তের বিধানাবলী পালনের প্রতি মনোযোগী হই। এরপর কয়েকবছর ছাত্রদের পাঠদান করি। তাঁর উক্ত লিখাটি দ্বারা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, তিনি শিক্ষা সমাপ্ত করার পরপরই ছাত্রদেরকে পাঠদানে রত ছিলেন। অনন্তর লেখা-লেখি ফতোয়া রচনা ও অন্যান্য শরয়ী কাজে ব্যস্ততার কারণে তিনি পাঠদানের ধারা বজায় রাখতে পারেননি। যার ফলে হিজরী ১৩২২/১৯০৪ সালে তাঁর নিজ হাতে গড়া মান্যার-ই-ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনার দায়িত্বভার স্বীয় মেঝো ভাই জনাব মাওলানা হাসান রেজা খান সাহেবকে দিয়ে দেন।

<u>কতিপয় প্রসিদ্ধ ছাত্রবৃন্দ ঃ</u>

আলা হযরত কেবলা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপ্ত করার পর পাঠদান, ফতোয়া রচনা ও বিভিন্ন বিষয়ে লেখা-লেখির প্রতি মনোযোগ দিলেন, কিন্তু প্রাথমিক অবস্থায় অধ্যাপনার দিকে বেশী

আগ্রহী ছিলেন। কেননা ব্রেলী শরীফে সুন্নীদের কোন মাদরাসা ছিলনা। কেবল আলা হযরত কেবলার একক সত্তাই সকল জ্ঞান পিপাসু ও ওলামাদের কেন্দ্রস্থল ছিল। যখন তাঁর সুখ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লো তখন ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ ও অন্যান্য দেশ থেকে জ্ঞান পিপাসু ব্যক্তিরা তাঁর খেদমতে হাজির হয়ে বিভিন্ন বিষয়ে পান্ডিত্য অর্জন করে যমানার প্রসিদ্ধ ব্যক্তিরূপে যশোঃখ্যাতি লাভ করতে লাগলেন। বারেগাহে রেজভীয়া একটি আজীমুসশান দরবার যাতে আলা হযরত কেবলা আল্লাহর ওয়াস্তে পাঠদানের খেদমতের আঞ্জাম দিতেন। কিন্তু তাঁর শিক্ষা নিকেতনটি তখনো অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ন্যায় রেজিষ্টারভুক্ত না হওয়ায় উহাতে যে সমস্ত ছাত্ররা ভর্তি হতেন কিংবা উহা হতে শিক্ষা সমাপ্ত করে যে সমস্ত আলেম বের হতেন তাঁদের নাম পরিগণনার জন্য কোন ব্যবস্থা না থাকায় আলা হযরতের অসংখ্য ছাত্রদের নাম সঠিকভাবে জানা যায় না। পাঠকদের জেনে রাখার জন্য নিম্নে কতিপয় প্রসিদ্ধ ছাত্রদের নাম পেশ করা গেলঃ

১. হযরত মাওলানা হাসান রেজা খান (আলা হযরতের মেঝো ভাই)
২. হুজ্জাতুল ইসলাম মাওলানা হামেদ রেজা খান (আলা হযরতের বড় সাহেবজাদা)
৩. সুলতানুল মোনাজেরীন মাওলানা সৈয়্যদ আহমদ আশরাফ কসুসী
৪. মুহাদ্দেসে আজম হিন্দ মাওলানা সৈয়্যদ মুহাম্মদ জিলানী কসুসী
৫.মালিকুল ওলামা মাওলানা সৈয়দ যাফরুদ্দীন ফাযেলে বিহারী
৬.মুলতানুল ওয়ায়েজীন মাওলানা আবদুল আহাদ ফীলিভেতী
৭.হযরত মাওলানা হাসনাইন রেজা খান (আলা হযরতের ভাতীজা)
৮.হযরত মাওলানা নওয়াব আহমদ খান ব্রেলভী
৯.হযরত মাওলানা সৈয়্যদ আমীর আহমদ ব্রেলভী
১০. হযরত মাওলানা হাফেজ ইক্কিনুদ্দীন ব্রেলভী
১১. হযরত মাওলানা সৈয়্যদ হাফেজ আবদুল করীম ব্রেলভী
১২. হযরত মাওলানা হাজী সৈয়্যদ নূর আহমদ (বাঙাল)
১৩. হযরত মাওলানা মুনাওয়ার হোসাইন ব্রেলভী
১৪. হযরত মাওলানা ওয়াজুদ্দীন (দফ্য়ে যেগে জাগের রচয়িতা)
১৫. হযরত মাওলানা সৈয়্যদ আবদুর রশীদ আজীমাবাদী
১৬. হযরত মাওলানা সৈয়্যদ শাহ গোলাম মুহাম্মদ বিহারী
১৭. হযরত মাওলানা সৈয়্যদ হাকীম গাউছ ব্রেলভী
১৮. হযরত মাওলানা নওয়াব মির্জা ব্রেলভী রাহিমাহুমুল্লাহু তায়ালা ওয়ারেদওয়ানুহু আলাল ওয়াছেলিনা মিনহুম ইলাল হক
১৯. হযরত মাওলানা ওয়ায়েজুদ্দীন চাটগামী (চটগ্রাম বাংলাদেশ)
২০. হযরত মাওলানা সুলতানুদ্দীন সিলহেটী (সিলেট বাংলাদেশ)
২১. ফখরুল আসফিয়া হযরত মাওলানা শাহ মুহাম্মদ রেজা খান সাহেব ব্রেলভী (অলো হযরতের ছোট ভাই)

২২. শাহজাদায়ে আলা হযরত মুফতীয়ে আজম হিন্দ হযরত আল্লামা আলহাজ আশ্ শাহ মুহাম্মদ আবুল বারকাত মুহিউদ্দীন জিলানী মুস্তফা রেজা খান সাহেব নূরী ব্রেলভী ।

২৩. ঈদুল ইসলাম হযরত মাওলানা শাহ মুফতী আবদুস সালাম সাহেব রেজভী জবলপুরী।

২৪. মুহাদ্দেসে আজম হিন্দ হযরত আল্লামা মাওলানা শাহ সৈয়্যদ মুহাম্মদ আশ্রাফ সাহেব আশরফী জিলানী কুসুসী।

২৫. উস্তাজুল উলামা হযরত আল্লামা শাহ মুফতী এজাজ অলি খান সাহেব রেজভী ব্রেলভী ।

২৬. তাজুল মাশায়েখ হযরত আল্লামা মুফতী শাহ আবদুল বাক্বী বোরহানুল হক সাহেব রেজভী জবলপুরী।

২৭. কুতুবে ওয়াক্ত হযরত মাওলানা শাহ রহীম বখশ সাহেব রেজভী আরভী।

২৮. পীরে তরীক্বত হযরত মাওলানা শাহ সুফী কলন্দর আলী সাহেব সহ্রুরী সিয়ালকুটী।

২৯. আলেমে বেবদন মাওলানা শাহ মুফতী মুহাম্মদ হাশমত আলী সাহেব রেজভী ব্রেলভী (শময়ে হেদায়েত এর রচয়িতা)

৩০. সদরুশ শরীয়াহ মাওলানা আমজাদ আলী আজমী সাহেব (বাহরে শরীয়তের প্রণেতা)।

প্রসিদ্ধ খোলাফায়ে কেরাম ঃ

হুজুর আলা হযরত কেবলা নিম্নলিখিত সালাসিলে আলেয়ার ইজাজত ও খেলাফত দান করতেন।

১. সিলাসিলায়ে আলীয়া ক্বাদেরীয়া বরকাতীয়া আবায়িয়্যাহ কদীমা
২. সিলাসিলায়ে আলীয়া ক্বাদেরীয়া জদীদা
৩. সিলাসিলায়ে আলীয়া ক্বাদেরীয়া আবদলীয়্যাহ
৪. সিলাসিলায়ে আলীয়া ক্বাদেরীয়া মুনাওয়ারিয়্যাহ
৫. সিলাসিলায়ে আলীয়া ক্বাদেরীয়া রায্যাকীয়্যাহ
৬. সিলাসিলায়ে আলীয়া চিশতীয়ায়ে নেজামীয়্যাহ কদীমিয়্যাহ
৭. সিলাসিলায়ে আলীয়া চিশতীয়া মাহবুবিয়্যাহ জাদীদাহ
৮. সিলাসিলায়ে আলীয়া সোহ্রাওয়াদিয়্যাহ কদলীয়্যাহ
৯. সিলাসিলায়ে আলীয়া সোহ্রাওয়াদিয়্যাহ উহাদিয়্যাহ
১০. সিলাসিলায়ে আলীয়া সিদ্দীক্বিয়্যাহ আলাভিয়্যাহ
১১. সিলাসিলায়ে আলীয়া আলাভিয়্যাহ নক্বশ্বন্দীয়্যাহ আলা-ইয়্যাহ
১২. সিলাসিলায়ে আলীয়া বদিইয়্যাহ
১৩. সিলাসিলায়ে আলীয়া আলাভিয়্যাহ মানামিয়্যাহ

হারামাইন শরীফাইন, আফ্রিকা, হিন্দুস্তান ও অন্যান্য দেশের যে সমস্ত আকাবেরে ওলামায়ে ইসলাম ও হামীয়ানে দ্বীন হুজুর আলা হযরত রাদিয়াল্লাহ তায়ালা আনহু থেকে ইজাজত ও খেলাফত লাভ করেছেন তৎমধ্য থেকে কতিপয় প্রসিদ্ধ খলীফাদের পবিত্র নাম আল ইজাজাতুল মতীনাহ ও আল ইসতিমদাদ থেকে সংকলন করে নিম্নে উপস্থাপন করা গেল।

১. মাজমাউল ফাদায়েল মানবাউল ফাওয়াদেল আলেমে কামেল মাওলানা সৈয়্যদ মুহাম্মদ আবদুল হাই ইবনে সৈয়্যদ আবদুল কবীর কাহ্তানী হাসানী ইদ্রিস ফারসী মুহাদ্দেস বেলাদে মাগরীব আফ্রিকা।
২. রঈসুল ওলামা সাবেক মুফতীয়ে হানাফীয়্যাহ মাওলানা শেখ ছালেহ কামাল মক্কী।
৩. ফাদেলে জলীল মাওলানা সৈয়্যদ ইসমাঈল মক্কী মুহাফেজ কুবুবখানা হেরেম শরীফ।
৪. ছাহেবে ছিদ্ক ও ছাফা মাওলানা সৈয়্যদ মুস্তফা ইবনে মাওলানা সৈয়্যদ খলীল মক্কী।
৫. হযরত মাওলানা সৈয়্যদ আবুল হোসাইন মুহাম্মদ মির্জোক্কী আমীনুল ফতোয়া মক্কী।
৬. হযরত মাওলানা সৈয়্যদ আসআদ দেহান মক্কী।
৭. হযরত মাওলানা শেখ আবদুর রহমান শেখ দেহান মক্কী।
৮. ফাদেলে এগানা মাওলানা শেখ মুহাম্মদ আবেদ হোসাইন মক্কী মুফতীয়ে মালেকিয়্যাহ
৯. হযরত মাওলানা শেখ আলী ইবনে হোসাইন মক্কী।
১০. হযরত মাওলানা শেখ জামাল ইবনে মুহাম্মদ আমীর মক্কী।
১১. হযরত মাওলানা শেখ আবদুল্লাহ ইবনে মাওলানা শেখ আহমদ আবুল খায়র মিরদাদ মক্কী।
১২. হযরত মাওলানা সৈয়্যদ আবদুল্লাহ দেহলান মক্কী।
১৩. হযরত মাওলানা শেখ বকর রফী মক্কী।
১৪. হযরত মাওলানা শেখ হাসান আজীমি।
১৫. হযরত মাওলানা সৈয়্যদ আলাবিব ইবনে হাসান আল কাফ হাদরমী।
১৬. হযরত মাওলানা সৈয়্যদ আলেম ইবনে আবদে রাউস বা-আলাকী হাদরমী।
১৭. হযরত মাওলানা সৈয়্যদ আবু বকর ইবনে সালেম বা-আলাব্বী হাদরমী।
১৮. হযরত মাওলানা সৈয়্যদ মুহাম্মদ ইবনে ওসমান দেহলান মক্কী।
১৯. হযরত মাওলানা শেখ মুহাম্মদ ইউছুপ মুর্দারিস মাদ্রাসায়ে রহমতুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী।
২০. হযরত মাওলানা শেখ আব্দুল কাদের কিরদী মক্কী।

২১. হযরত মাওলানা শেখ আবদুল্লাহ ফরীদ ইবনে মাওলানা আবদুল কাদের কিরদী মক্কী।
২২. হযরত মাওলানা সৈয়্যদ ওমর ইবনে সৈয়্যদ আবু বকর মক্কী।
২৩. হযরত মাওলানা শেখ আহমদ হাদরাভী মক্কী।
২৪. হযরত মাওলানা সৈয়্যদ মামুন বরমী মদনী।
২৫. শেখুদ দালায়েল হযরত মাওলানা সৈয়্যদ মুহাম্মদ সাঈদ মদনী।
২৬. হযরত মাওলানা শেখ ইবনে হামদান মদনী।
২৭. ফাদালে রব্বানী মাওলানা জিয়াউদ্দীন আহমদ মুহাজেরে মদনী।
২৮. আলা হযরতের বড় সাহেবজাদা হুজ্জাতুল ইসলাম মাওলানা হামেদ রেজা খান ব্রেলী ।
২৯. আলা হযরতের ছোট সাহেবজাদা মুফ্তীয়ে আজম হিন্দ মুস্তফা রেজা খান ব্রেলী ।
৩০. হযরত সদরুশ শরীয়াহ হাতামুল ফোকাহা মাওলানা আমজাদ আলী আজমী। (বাহরে শরিয়ত এর লেখক)।
৩১. সদরুল আফাযেল উস্তাজুল ওলামা মাওলানা সৈয়্যদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী। (তাফসীরে খাযায়েনুল এরফান এর লেখক)।
৩২. শেখুল মুহাদ্দেসীন মাওলানা সৈয়্যদ দীদার আলী মুহাদ্দেসে লাহুরী।
৩৩. মুবাল্লেগে আজম মাওলানা আবদুল আলীম সিদ্দীক্বি রেজভী মিরীঠি (আল্লামা শাহ আহমদ নূরানী সাহেব রহমাতুল্লাহি আলায়হির পিতা)
৩৪. ফকীহে আজম মাওলানা আবু ইউছুপ মুহাম্মদ শরীফ কোটলভী পাঞ্জাব।
৩৫. হামীয়ে সুন্নাত মাওলানা মুহাম্মদ আবদুস সালাম জবলপুরী।
৩৬. সুলতানুল ওয়ায়েজীন মাওলানা আবদুল আহাদ ফীলিভেতী।
৩৭. ফাজেলে কামেল মাওলানা রহীম বখ্শ আরভী শাহ-আবাদী।
৩৮. মুফতী আই-এম-ফি মাওলানা বোরহানুল হক জবলপুরী।
৩৯. আলেমে নবীল মাওলানা হাসনাইন রেজা ব্রেলী ।
৪০. ফাজেলে জলীল মাওলানা হাসনাইন রেজা ব্রেলী ।
৪১. নাসেবে সুন্নীয়ত মাওলানা হাজী লাল হোসাইন মুহাম্মদ মদারসী।
৪২. মাওলানা আহমদ মুখতার সিদ্দীক্বি মিরীঠি।
৪৩. আলেমে হক্কানী মাওলানা সৈয়্যদ ফতেহ আলী শাহ কারোটাহ সৈয়্যদানে পাঞ্জাব।
৪৪. মালিকুল ওলামা মাওলানা সৈয়্যদ জাফরুদ্দীন বিহারী।
৪৫. মুনাজেরে আজম মুজহেরে আলা হযরত মাওলানা শাহ হাশমত আলী লক্ষ্মৌভী।
৪৬. মাওলানা আবু মুহাম্মদ ইমামুদ্দীন কোটলী সিয়ালকোট পাঞ্জাব। রাহমাতুল্লাহে তায়ালা ওয়ারিদওয়ানুহু আলাল ওয়ামেলালা মিনহুম ইলাল হক্ব)
৪৭. মহাদ্দেসে আজম পাকিস্তান ছাহেবে কাশফ ও কারামাত হযরত মাওলানা সর্দার আহমদ লাইয়ালপুরী (পাকিস্তান) যিনি পীরে তরীক্বত গাউছে জমান কুতবে ওয়াক্ত

খাজা হাফেজ ক্বারী সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ কেবলায়ে আলমের উস্তাদ ছিলেন।

৪৮. কুতবে মদীনা ছাহেবে কাশফ ও কারামাত হযরত মাওলানা জিয়া উদ্দীন মদনী।

৪৯. শেখুত তাসাউফ হযরত মাওলানা শাহ সৈয়্যদ মাহমুদ জান সাহেব নূরী জাম চৌদুপুরী।

৫০. শেরে বীশীয়া-ই-আহলে সুন্নাতে আউয়াল হযরত আল্লামা আলহাজ আশ শাহ মুহাম্মদ হেদায়ত রাসূল সাহেব রেজভী লক্ষ্মৌভী ছুম্মা রামপুরী।

৫১. ফখরে খান্দানে শেরীয়া হযরত আল্লামা শাহ হাকীম হাবীবুর রহমান খান সাহেব রেজভী শেরে ফীলিভেতী।

৫২. উস্তাজুল হুফফাজ হযরত মাওলানা শাহ হাফেজ ইয়াকুব আলী খান সাহেব রেজভী ফীলিভেতী।

৫৩. হামীয়ে মিল্লাত হযরত আল্লামা মাওলানা শাহ আবু সিরাজ আবদুল হক সাহেব শম্‌সী রেজভী ফীলিভেতী।

৫৪. কুতুবে জমান হযরত মাওলানা শাহ খাজা আহমদ হোসাইন সাহেব নক্বশবন্ধী আমরুহুবী।

৫৫. মুফাসেরে আজম হিন্দ হযরত আল্লামা মাওলানা শাহ মুহাম্মদ ইব্রাহীম রেজা খান সাহেব জিলানী মিয়া (আলা হযরতের দৌহিত্র)

৫৬. ইয়াদগারে সলফ শাহজাদায়ে শেখুল মাশায়েখ হযরত আল্লামা মাওলানা আবুল বারকাত সৈয়্যদ আহমদ সাহেব চিশ্‌তী আলওরী।

৫৭. জুবদাতুল আরেফীন হযরত আল্লামা মাওলানা শাহ আবুল হাসনাত সৈয়্যদ মুহাম্মদ সাহেব চিশতী আলওরী (শাহজাদায়ে শেখুল মাশায়েখ)

৫৮. শেখুল হাদীস হযরত আল্লামা মাওলানা শাহ মুফতী গোলাম জান সাহেব রেজভী হাজারভী।

<u>জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় আলা হযরতের পান্ডিত্য ঃ</u>

আলা হযরত আহমদ রেজা বিভিন্ন উস্তাদ বিশেষত আপন পিতা তাজুল ওলামা খাতামুল মুহাক্কেকীন হযরত মাওলানা শাহ নক্বী আলী খান মুহাদ্দেসে ব্রেলভী রাদিয়াল্লাহ আনহু থেকে একুশটি বিষয়ের পারদর্শিতা অর্জন করেন। আর কোন শিক্ষক ব্যতীত খোদাপ্রদত্ত আপন প্রকৃতিগত প্রতিভার মাধ্যমে ৩৪টি বিদ্যার পারদর্শিতা লাভ করেন। বর্তমান গবেষণা মোতাবেক ইমাম আহমদ রেজা ১০৫টি বিষয়ে পান্ডিত্য লাভ করার প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি ৫৫টি বিষয়ের উপর বিভিন্ন ভাষায় কিতাব রচনা করেছেন। তিনি যে ৫৫টি বিষয়ের উপর কিতাব লিখেছেন, ঐ ৫৫টি বিষয়ের একটি তালিকা তৈরী করে মক্কা শরীফের মুফতী শেখ সৈয়্যদ ইসমাইল খলিল মক্কীর কাছে পেশ করেছিলেন এবং এগুলোর অনুমতি সনদও লাভ করেছিলেন। এ সনদের পান্ডুলিপি ৬ই সফর ১৩২৪ হিজরী/১৯০৬

খ্রীঃ প্রস্তুত হয়। যার আবজাদী (সংখ্যাতাত্ত্বিক) নাম (আল ইজাযাতুর রাদাভীয়্যাহ লি মাবজলী মক্কাতাল বহীয়্যাহ)।

এ ৫৫ প্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যাপারে আ'লা হযরত নিজেই লিখেছেন যে, আল্লাহর আশ্রয়! আমি এসব কথা অহংকারভরে এবং অনর্থক নিজের যশোঃখ্যাতির জন্য বর্ণনা করিনি বরং আমার প্রতি দয়ালু খোদার প্রদত্ত অনুগ্রহের বর্ণনা করেছি মাত্র।

যারা আশ্রাফ আলী থানবীকে হাকীমুল উম্মত হাকীমুল উম্মত বলতে বলতে হুশ হারিয়ে ফেলে এবং বিশাল সংখ্যক কিতাবের রচয়িতা বলে তাকে সমাজে বিরাটভাবে তুলে ধরতে চায়, তাদের জানার জন্যই আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজার এ জ্ঞান শাখার সংখ্যা তুলে ধরা অপরিহার্য মনে করি।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় আ'লা হযরতের অর্জিত বিষয়ের সংখ্যা ও তালিকা নিম্নরূপ ঃ

১. ইলমে কোরআন
২. ইলমে হাদীস
৩. ইলমে তাফসীর
৪. ইলমে উসূলে হাদীস
৫. ফিকাহে হানাফী
৬. কিকহ (সব মযহাবের)
৭. ইলমে উসূলে ফিকহ
৮. ইলমে আকাইদ ওয়াল কালাম
৯. ইলমে মায়ানী
১০. ইলমে বয়ান
১১. ইলমে বাদী (বাগ্মিতা তথা ভাষার অলংকার শাস্ত্র)
১২. ইলমে নাহু
১৩. ইলমে সরফ
১৪. ইলমে মানতিক্ব
১৫. ইলমে জদল মহায্যর
১৬. ইলমে তাকসীর
১৭. ইলমে হাইয়্যাত (জ্যোতির্বিদ্যা)
১৮. ইলমে হিসাব (গণিত শাস্ত্র)
১৯. ইলমে হিন্দাসা (জ্যামিতি)
২০. ইলমে মুনাযারা (বিতর্কবিদ্যা)
২১. ইলমে ফালসাফা

উপরোক্ত একুশ প্রকার জ্ঞান সম্পর্কে তিনি লিখেন, "এ একুশ প্রকার জ্ঞান আমি আমার সম্মানিত পিতা থেকে অর্জন করেছি।" এরপর তিনি নিম্নলিখিত বিষয়গুলো উল্লেখ করেন ঃ

২২. ইলমে ক্বিরাত
২৩. ইলমে তাজবীদ
২৪. ইলমে তাসাউফ (সূফীতত্ত্ব)
২৫. ইলমে মুলুক (তরীক্বত জগতে পদচারণ)
২৬. ইলমে আখলাক
২৭. আসমায়ে রিজাল (হাদীসের রাবীদের জীবনী শাস্ত্র)
২৮. ইলমে সিয়ার
২৯. ইলমে তারিখ (ইতিহাস)
৩০. ইলমুল লূগাত (অভিধান শাস্ত্র)
৩১. ইলমুল আদব, সব বিষয়ের সাহিত্য (আরবী, উর্দু, ফার্সী)

উপরোক্ত দশ প্রকার জ্ঞান সম্পর্কে তিনি লিখেছেন যে, "আমি কোন শিক্ষক থেকে এ সকল বিষয়ে পড়িনি, তারপরও সুদক্ষ সুভীজ্ঞ ওলামায়ে কেরাম থেকে এ সকল বিষয়ে আমার সনদ রয়েছে।"

অনন্তর তিনি নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বর্ণনা করেন ঃ

৩২. এ্যারিসমাতীক্বী
৩৩. যবরও মোক্বাবালাহ
৩৪. হিসাবে সিত্তানী
৩৫. লগারিদম (Logaritham)
৩৬. ইলমে আওকীত (সময় নির্ধারণ বিদ্যা)
৩৭. মুনাযারা ও মারায়াহ
৩৮. ইলমূল আকর
৩৯. যীজাত
৪০. মুসাল্লাসে কুরভী
৪১. মুসাল্লাসে মোসাত্তাহ
৪২. হাইয়াতে জাদীদাহ
৪৩. মুরাব্বাআত
৪৪. ইলমে জুফর
৪৫. ইলমে যায়েরজাহ
৪৬. আরবী পদ্য
৪৭. ফার্সী পদ্য
৪৮. হিন্দী পদ্য
৪৯. আরবী গদ্য
৫০. ফার্সী গদ্য
৫১. হিন্দী গদ্য

৫২. কেতাবত বা লিখন পদ্ধতি
৫৩. খত্তেনাসতালীক পদ্ধতির লিখন
৫৪. ইলমুল ফরাইজ
৫৫. তাজবীদ সহকারে পঠন।

প্রথমে উল্লেখিত একুশ প্রকার জ্ঞান ব্যতীত অবশিষ্ট ৩৪ প্রকার জ্ঞান তিনি আপন প্রকৃতিগত প্রতিভার মাধ্যমে অর্জন করেন।

আপন প্রতিভায় অর্জিত কতিপয় বিষয়ের পর্যালোচনা ঃ

আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা রাদিয়াল্লাহু আনহু ইলমে কোরআন ইলমে তাফসীর, ইলমে হাদীসের ও ইলমে ফিকহ এ সুদক্ষ সুভীজ্ঞ বিশেষজ্ঞ তো ছিলেন, এছাড়া ইলমে তাওক্বীতে (সময় নির্ধারণ বিদ্যার) ও এমন পারদর্শি ছিলেন যে, তিনি দিনে সূর্য দেখে আর রজনীতে তারকা দেখে ঘড়ির সময় মিলাতেন। সময় সম্পূন্ন সঠিক হতো। এক মিনিট ও এদিক-ওদিক হতো না।

যেহেতু ইলমে তাওক্বীতের লিখিত স্বতন্ত্র কোন কিতাব ছিলনা। ঐ কারণে যখন কতিপয় জ্ঞান পিপাসু আলেম ইলমে তাওক্বীত শিখার জন্য আলা হযরতের খেদমতে এসে আবেদন করলেন তখন আলা হযরত কেব্‌লা তাদেরকে পড়াতে আরম্ভ করলেন আর ঐ ইলমের কিতাবী কোন রেফারেন্স না থাকায় তিনি মুখে কায়েদা (উক্ত বিষয়ের নিয়ম-কানুন) লিখাতেন আর ছাত্ররা লিখে নিতেন। উক্ত ইলম অর্জনকারী ছাত্রদের মধ্যে মালিকুল ওলামা হযরত মাওলানা যাফরুদ্দীন বিহারীও ছিলেন। তিনি পড়ার সময় উক্ত বিষয়ের কায়েদাগুলো লিখে একত্র করে "তাওজীহুল তাওক্বীত" নাম দিয়ে কিতাবাকারে প্রকাশ করেছেন।

ইলমে জুফর (ইহা এমন এক প্রকার বিদ্যা যা দ্বারা অদৃশ্যের অবস্থা সম্পর্কে জানা যায়। ইহা ইমাম জাফর সাদিক রাদিয়াল্লাহু আনহ সম্পর্কীয়) এ বিষয়েও আলা হযরত বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেন। ১২৯৪ হিজরীতে হযরত মাওলানা সৈয়্যদ শাহ আবুল হোসাইন নূরী মিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু আলোচনা প্রসঙ্গে "বুদ্দুহুন" এর একটি কায়েদা বলেছেন। এরপর আলা হযরত আপন প্রতিভার মাধ্যমে অনুশীলন করে উক্ত বিষয়ে পরিপূর্ণ দক্ষতা অর্জন করেন। এমন কি যখন তিনি হজ্বে বায়তুল্লাহ ও যিয়ারতে রাওজাতিল মুস্ত-ফার জন্য পবিত্র মক্কায় তাশরীফ নেন তখন ওখানে হযরত মাওলানা আবদুর রহমান সম্পর্কে জানতে পারলেন যে, তিনিও এ বিষয়ে জ্ঞান রাখেন। ঘটনাচক্রে আলা হযরতের সাথে মাওলানা আবদুর রহমানের দেখা হলে, তাদের মাঝে ইলমে জুফরের বিষয়ে আলোচনা হয়। যার ফলাফল এ হয়েছিল যে, মাওলানা আবদুর রহমান ইলমে জুফুর সম্পর্কে যা জানতো তা ছাড়াও আরো অনেক অজানার ছিল। যা অজানা ছিল তা তিনি আলা হযরত থেকে জেনে নিলেন। এ বিষয়ে আলা হযরতের নৈপুন্যতা দেখে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, তৎকালীন যুগে উক্ত বিষয়ে আলা হযরত শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিলেন।

ইলমে রিয়াযী বা গণিতশাস্ত্রেও আলা হযরতের পরিপূর্ণ দক্ষতা ছিল। গণিতশাস্ত্রে আলা হযরতের পান্ডিত্যের ব্যাপারে একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। ১৩২৯ হিজরী মোতাবেক

১৯১১ খ্রীঃ আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ভাইস চ্যান্সেলর ডঃ জিয়াউদ্দীন সাহেব রামপুর (ইউপি) হতে প্রকাশিত দবদবা-ই-সিকান্দরী নামক পত্রিকায় চতুর্ভূজ সংক্রান্ত একটি প্রশ্ন প্রচার করেন। আলা হযরতের কিছু ভক্ত উক্ত পত্রিকাটি আলা হযরতকে দেখালে তিনি সাথে সাথে উক্ত প্রশ্নের সমাধান দিয়ে অন্য একটি চতুর্ভূজ সংক্রান্ত প্রশ্ন ছুড়ে মারেন। ডঃ স্যার জিয়াউদ্দীন তার প্রচারিত প্রশ্নের সমাধান দেখে হতবাক হয়ে যান। একজন আরবী জানা আলেম কি করে এ বিদ্যা অর্জন করলেন। এ ঘটনার পর স্যার জিয়া উদ্দীন আলা হযরতের ভক্ত হয়ে পড়েন।

এ বিষয়ে আরো একটি ঘটনা উল্লেখ করার মত। গণিত সংক্রান্ত একটি বিষয়ের সমাধানের জন্য স্যার জিয়া উদ্দীন খুব পেরেশান হয়ে পড়েন। তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের অংকের প্রফেসর বিশ্ববিখ্যাত অংকবিদ যাদবকে এ ব্যাপারে সমাধান দিতে বললে যাদব অপারগতা প্রকাশ করলেন। সমাধান না পেয়ে শেষ পর্যন্ত সমাধান আনার জন্য তিনি জার্মান যাওয়ার প্রস্তুতি নিলেন। তিনি তার বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামী বিভাগের প্রফেসর সুলাইমান আশরাফের সাথে উক্ত বিষয়ে আলোচনা করলে, সুলাইমান আশরাফ তাকে জার্মান না গিয়ে ব্রেলী শরীফে গিয়ে আলা হযরতের সাথে দেখা করে তার থেকে সমাধান নেয়ার পরামর্শ দিলেন। তিনি বললেন, আমি গণিত শাস্ত্রে পারদর্শিতা অর্জন করেছি এ বিষয়ে উচুমানের ডিগ্রী নিয়েছি। এরপরও আমি এ জটিল সমস্যার সমাধান করতে পারলাম না এবং বিখ্যাত গণিতবীদ যাদবও পারলনা। উপায়ান্তর না দেখে জার্মান গিয়ে সমাধান আনার জন্য প্রস্তুতিও করে ফেলেছি। অথচ আপনি বলছেন ইমাম আহমদ রেজার কাছে গিয়ে উক্ত গণিত সংক্রান্ত বিষয়টি সমাধান নিতে। আমি আপনার পরামর্শ শুনে অবাক হচ্ছি এ জন্য যে, ইমাম আহমদ রেজা তো একজন আরবী বিষয়ে পারদর্শি আলেম তিনি কিভাবে গণিতের জটিল সমস্যাটির সমাধান করবেন। শেষ পর্যন্ত প্রফেসর সুলাইমান আশরাফ জোর আবদার করে তাকে ব্রেলী শরীফে নিয়ে এসে আলা হযরতের সাথে দেখা করলেন। স্যার জিয়াউদ্দীন আলা হযরতের খেদমতে অংকটি পেশ করলেন। আলা হযরত নিমিষের মধ্যে উক্ত অংকের সমাধান পেশ করেছেন। এতে স্যার জিয়া উদ্দীন বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পড়েন। এবং বলেন, ইলমে লাদুনীর কথা এতোদিন শুনেছি আজ বাস্তবে দেখলাম ইলমে লাদুনী কি। এরপর স্যার জিয়া উদ্দীন আলা হযরতের ভক্ত হয়ে পড়েন। এবং দাড়ি রেখে শরীয়তের পাবন্দ হয়ে গেলেন। গণিতশাস্ত্রে আলা হযরতের এ পারদর্শিতার বিষয়টি আমি কারামাত অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি।

"ইলমে তারিখ" ইহা এমন একটি বিদ্যা যা দ্বারা কোন নামের আবজাদ (সংখ্যাতাত্ত্বিক) হিসাব বের করলে উহা কত সালে হয়েছে তার ঐতিহাসিক তারিখ বের হয়ে যায়। গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা কিছু কিছু ব্যক্তিত্ব এ বিষয়ে পারদর্শি হলেও তাদের সংখ্যা ছিল অপ্রতুল। আবার বিশ্বের অনেক দেশে এ বিষয়টি জানে এমন ব্যক্তি খোঁজে পাওয়া ও মুশকিল ছিল। আবার কোন কোন দেশে এ বিষয় বিলুপ্তও হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তৎকালীন যুগে এ বিষয়ের উপর পারদর্শিতা অর্জন করে পৃথিবীতে আলোড়ন সৃষ্টি

করেছিলেন যিনি তিনি আর কেউ নন। তিনি হলেন হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দেদে আজম ইমামে ইশক ও মুহাব্বত ইমাম আহমদ রেজা ফাযেলে ব্রেলভী। তিনি উক্ত বিষয়ের প্রতি মনোনীবেশ করে তাঁর লিখিত প্রায় পাঁচ-ছয়শত কিতাবের ঐতিহাসিক নাম রেখেছেন। যে নামের আবজাদ সংখ্যা বের করলে উহা কত হিজরীতে লিখেছেন তা বের হয়ে আসবে।

কোন কোন সময় তার ভক্তদের কারো সন্তান হলে ঐ সন্তানের ঐতিহাসিক নাম দেয়ার জন্য আলা হযরতের কাছে আসতেন। আলা হযরত তৎক্ষণাত তাদের বংশের নামের সাথে মিলিয়ে এমন নাম বলে দিতেন পরবর্তীতে উক্ত নামের আবজাদ সংখ্যা বের করলে তা ঐতিহাসিক হয়ে যেত। ইউরোপের প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক আইজ্যাক নিউটন জমিন নড়াচড়া করে এ বিষয়ের উপর একটি বই লিখেছেন। আলা হযরত নিউটনের যুক্তিগুলো ঠিক নয় এ মর্মে তার বইয়ের খন্ডন করে একটি কিতাব লিখেছেন যার মাধ্যমে তিনি প্রমাণ করেছেন যে, জমিন কখনো নড়াচড়া করে না বরং স্থির থাকে। তিনি উক্ত কিতাবটির নাম রেখেছেন "ফাওজে মুবীন দর রদ্দে হরকতে জমিন" উক্ত কিতাবটি কখন লিখেছেন এর আবজাদী হিসাব করলে বের হয়ে আসে ১৩৩৮ হিজরী। অর্থাৎ আলা হযরত উক্ত কিতাবটি ১৩৩৮ হিজরীতে লিখেছেন।

সৈয়্যদ আইয়ুব আলী ব্রেলভী সাহেব বর্ণনা করেন যে, প্রত্যেক জুমার নামাযের পর একটি সমাবেশ হতো। ঐ সমাবেশের মধ্যমণি হিসাবে তাশরীফ রাখতেন আলা হযরত কেবলা। লোকেরা বিভিন্ন ধরনের মাস্‌লা-মাসায়েলও বিভিন্ন রকমের ওয়াজীফা সম্পর্কে আলা হযরতকে প্রশ্ন করতেন, আলা হযরত উত্তর প্রদান করতেন। একবার এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন হুজুর আমার জন্য ইসমে আজম কি? আলা হযরত এরশাদ ফরমালেন, প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য ইসমে আযম পৃথক পৃথক রয়েছে। এরপর তিনি উপস্থিত লোকদের একদিকে দৃষ্টিপাত করে এরশাদ ফরমালেন। আপনার জন্য ইছমে আযম এটাই। আপনার জন্য ইছমে আযম এটাই। সৈয়্যদ আইয়ুব আলী বলেন, এরপর আলা হযরত কেবলা আমার প্রতি নজর দিলেন এবং আমাকে লক্ষ্য করে এরশাদ ফরমালেন- আপনি (ইয়া লতীফু ইয়া আল্লাহ) পড়বেন। আপনার জন্য ইছমে আজম এটাই। এর পর তিনি ইছমে আযম বের করার নিয়ম বললেন, যাতে নিজের জন্য অথবা অন্যের জন্য ইছমে আযম বের করতে কোন কষ্ট না হয়। আলা হযরত এরশাদ ফরমালেন, যার নাম যেটা হবে সে ঐ নামের হুরুফগুলোর আবজাদ সংখ্যা বের করে যোগ করবে। যোগফল যত হবে উহার সাথে মিলে এমন একটি বা দুটি আল্লাহ তায়ালার নাম নিয়ে উহার হুরুফগুলোর আবজাদ সংখ্যা বের করবে। নামের আবজাদ সংখ্যা যা বের হয়েছে উহার সাথে আল্লাহর যে নামের আবজাদ সংখ্যা মিলবে আল্লাহ তায়ালার ঐ নামই হবে তার জন্য ইছমে আযম। সংখ্যা যত বের হবে সে প্রত্যেক দিন ঐ সংখ্যার ডবল ইছমে আযম পাঠ করবে, তার জন্য উপকার হবে। সহজে বোধগম্য হওয়ার জন্য আলা হযরত দৃষ্টান্ত দিয়ে বললেন, যেমন- ধরুন, আইয়ুব আলী- উহার আবজাদ সংখ্যা হচ্ছে ১২৯ আর আল্লাহ তায়ালার নাম (লাতীফু) এর আবজাদ সংখ্যা ও ১২৯ সুতরাং সৈয়্যদ আইয়ুব আলী সাহেব প্রত্যেক দিন ১২৯ এর ডবল

তথা ২৫৮ বার ইয়া লাতীফু পড়বেন। সৈয়্যদ আইয়ুব আলী বলতেছেন, এরপর থেকে আমি প্রত্যেকদিন ২৫৮ বার (ইয়া লাতীফু) পড়তাম।

ধর্মীয় সংস্কারমূলক খেদমত ঃ

ইসলাম বিদ্বেষীদের মূলোৎপাটন ঃ মহান রাব্বুল আলামীন স্বীয় কুদরতী হাতে আলা হযরতকে নির্ভেজাল ইসলামী তীক্ষ্ণবুদ্ধি দান করেছেন। তার সাথে সুস্থ্য মস্তিস্ক, সু-ধার স্মৃতি শক্তি, উদারমন, নিখুত প্রকৃতি, প্রবল বিচক্ষণতা, বিরল মেধা, জাহেরী ও বাতেনী ইন্দ্রিয়শক্তি এমনভাবে দান করেছেন যা সাধারণ মানুষের গুণাবলী থেকে সুউচ্চ ছিল। প্রবল বিচক্ষণতার পাশাপাশি সাহসীকতা ও তাঁর মাঝে বিদ্যমান ছিল। এসব গুণের সমাহার তাঁর মাঝে এজন্যে দেয়া হয়েছে যাতে তিনি মুজাদ্দেদের দায়িত্ব উন্নত পদ্ধতিতে বড় সাহসীকতার সাথে আঞ্জাম দিতে পারেন এ কারণে তিনি মুজাদ্দেদের দায়িত্ব এমনভাবে আঞ্জাম দিয়েছেন যার দ্বারা তিনি প্রিয় নবীর অনেক মৃত সুন্নাতকে জিন্দা করেছেন, ফিতনা বাজদের ফিতনার কবর রচনা করেছেন। তিনি ইসলাম বিদ্ধেষী ও নবী বিদ্ধেষীদের বিরুদ্ধে এমন কলমী যুদ্ধ করেছেন যা ফিতনা বাজদের ফিতনায় সাজানো বাগানে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে।

নিযামে কুদরত ঃ (খোদায়ী প্রদত্ত নীতি) আলা হযরত কেবলার মেঝো ভাই হযরত মাওলানা হাসান রেজা খান এলাকার তহসীলদারের কাজের পাশাপাশি আলা হযরত কেবলার এমন খেদমতের আঞ্জাম দিয়েছেন যার দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে বিরল। তিনি একসাথে তহসীলদারের কাজ করতেন আবার আলা হযরত কেবলার ঘরের সবকিছু দেখাশুনা করতেন। যার ফলে আলা হযরত ঘরের দায়-দায়িত্ব থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হয়ে কেবল ফতোয়ার জবাব ও লেখা-লেখির মধ্যেই লিপ্ত রইলেন। এ দায়িত্ব তিনি আজীবন পালন করেছেন। কখনো কোনো অবস্থাতেই তা বন্ধ ছিলনা। সর্বদা দ্বীনের খেদমতে আত্মনিয়োগ করেন। দ্বীনি খেদমতের পাশাপাশি যদি একটু সময় পেতেন তাহলে তিনি নিজের কোন জরুরী কাজ করতেন। পরিবারের জরুরীয়তের প্রতি দৃষ্টিপাতও করতেন না। আসলে একথা অকপটে স্বীকার করতে হবে যে, মহান আল্লাহ তায়ালা আলা হযরতের জীম্মাদারীতে দ্বীনের খেদমতই সোপর্দ করেছেন। যার ফলে তিনি দুনিয়ারী লোভ-লালসা থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত ছিলেন। দুনিয়ারী জরুরতের প্রতি তিনি ভ্রুক্ষেপও করেননি। আসলে যদি তিনি চাইতেন তাহলে দুনিয়াতে অনেক দালান-কোটা নির্মাণ করতে পারতেন। কিন্তু না তিনি এদিকে দৃষ্টিপাত ও করেননি।

আলা হযরতের দু'জন মেয়ের বিবাহের সময় হলো এবং দুনিয়াবী প্রচলিত রীতি নীতি অনুসারে তাদের বিবাহের পাত্র ঠিক হলো কেবল বিবাহের তারিখ নির্ধারণের ব্যাপার বাকী রইল। আলা হযরত কেবলার মেঝো ভাই মাওলানা হাসান রেজা খান আলা হযরতের খেদমতে উপস্থিত হয়ে আবেদন করলেন। ভাইজান (সম্বন্ধি) জাহী আহমদুল্লাহ খান সাহেব বিবাহের প্রস্তাব এনেছেন। তিনি আপনার থেকে বিবাহের তারিখ নির্ধারণ করতে চান। আমার প্রস্তাব হলো- আমি একসাথে দু'মেয়ের বিবাহ দিতে চাই। মাওলানা হাসান রেজা

খান সাহেবের এ কথা শুনে আলা হযরত বললেন, এক মেয়ের বিবাহ সহজ কথা নয় অথচ তুমি প্রস্তাব দিতেছ দু'মেয়েকে এক সাথে বিবাহ দেবার। মেয়ের বিবাহে মানুষেরা অনেক কিছু তৈয়ার করে। তুমি বিবাহের কিছু প্রয়োজনীয় সামান তৈয়ার না করে আমার কাছে বিবাহের তারিখ নির্ধারণ করতে এসেছ।

মাওলানা হাসান রেজা খান সাহেব আরজ করলেন- বিবাহের প্রয়োজনীয় সামান তৈয়ারীর ব্যাপারে আপনি ভাবীজানকে জিজ্ঞাসা করুন। একথা শুনে আলা হযরত স্ত্রীর নিকট তাশরীফ নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন- বিবাহের জন্যে কি কি সামান তৈয়ার হয়েছে আর কি কি সামগ্রী দরকার। বিবি সাহেবা আরজ করলেন- বিবাহের সব সামগ্রী সংগ্রহ করা হয়েছে। দু'মেয়ের বিবাহের উপহার সামগ্রীও তৈয়ার হয়েছে। বারাতের (বরযাত্রীদের) খাবারের সামানও তৈয়ার হয়েছে। শুধু তারিখের দেরী। আপনি বিবাহের তারিখটা নির্ধারণ করে দিলে আমরা বিবাহ অনুষ্ঠানের আয়োজনটা করতে পারি। আলা হযরত কেবলা যখন বিবি সাহেবার মুখ থেকে একথা শুনলেন তখন তার চেহেরায়ে পাকে খুশীর আভা পরিস্ফুটিত হলো। তিনি আনন্দচিত্তে বললেন- হাসান মিয়া তুমি আমাকে দুনিয়াবী ঝামেলা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে রেখেছ। আমার দু'মেয়ের বিবাহ আমি তাদের বাবা হয়েও এ ব্যাপারে কিছু জানি না। এ ব্যাপারে তুমি আমাকে চিন্তা করতেও দিলে না। বিবাহে কি কি উপহার দেয়া হবে, ঐগুলো কোথা থেকে সংগ্রহ করা হবে, বরযাত্রীদের জন্য কি কি খাবার দেয়া হবে। একথা বলে আলা হযরত এরশাদ ফরমালেন- হাসান মিয়া! আমি দ্বীনের যা খেদমাত করতেছি- আল্লাহর হুকুমে উহার অংশীদার তুমিও হবে কারণ, তুমি আমাকে দ্বীনি খেদমাতের জন্য দুনিয়া থেকে আজাদ করে দিয়েছ। একথা শুনে মাওলানা হাসান রেজা সাহেব কেঁদে ফেললেন। কিছুক্ষণ পর নিজেকে সামলিয়ে নিলেন এবং আলা হযরতের সাথে পরামর্শ করে বিবাহের তারিখ নির্ধারণ করলেন। তারপর দু'মেয়ের বিবাহ হল। মাওলানা হাসান রেজা খান সাহেবের এ কাজ তাঁর ইন্তেকাল পর্যন্ত বহাল রাখলেন। মাওলানা হাসান রেজা খান সাহেব আলা হযরত কেবলার লেখা-লেখির জন্য কলম পর্যন্ত তৈয়ার করে দিতেন। অর্থাৎ তিনি প্রতি সপ্তাহে দু'টি কলম তৈয়ার করে উহা আলা হযরতের কলমদানিতে রেখে আসতেন। আর কলমদানি থেকে ঘর্ষিত কলম নিজে নিয়ে আসতেন। আলা হযরত কেবলার এতো সময় কোথায় যে লিখা ছেড়ে কলম তৈয়ার করবেন। আলা হযরত কেবলা লিখতে লিখতে যদি কলমের এক পার্শ্ব ঘষে যেতো তাহলে তিনি অপর তীক্ষ্ণ প্রান্ত দিয়ে লিখতেন যাতে বিষয়ের মধ্যে কোন বিঘ্নতা না ঘটে। আলা হযরত কেবলার দু'সাহেবজাদা ও পাঁচ সাহেবজাদী ছিল। মাওলানা হাসান রেজা খান সাহেব আলা হযরত কেবলার এক সাহেবজাদাকে বিবাহ করায়েছেন আর তিন সাহেবজাদীর বিবাহ দিয়েছেন। তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁর স্থলে আলা হযরত কেবলার ছোট ভাই মৌলভী মুহাম্মদ রেজা খান সাহেব আসীন হলেন। তিনি মাওলানা হাসান রেজা খান সাহেবের মতো আলা হযরতের যাবতীয় খেদমাতের আঞ্জাম দেন। তিনিও আলা হযরত কেবলার এক সাহেবজাদাকে বিবাহ করান এবং দু'সাহেবজাদীর বিবাহ দেন। সুবহানাল্লাহ! প্রকৃত ভাই

বললে এদেরকে বলা হবে। যাদের কথা ইতিহাসের পাতায় ক্বিয়ামত পর্যন্ত স্বর্ণাক্ষরে লিখা থাকবে।

খাদেমে দ্বীন ঃ (দ্বীনের সেবক) মহান রাব্বুল আলামীন সুবহানাহু ওয়াতায়ালা সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাব পবিত্র কোরানে করীমে এরশাদ ফরমান-

لاتجد قوما يومنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا ابائهم او ابنائهم او اخوانهم اوعشيرتهم اولئك كتب فى قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه-

অর্থাৎ "হে আমার মাহবুব! আপনি পাবেন না ঐসব লোককে, যারা দৃঢ় বিশ্বাস রাখে আল্লাহ ও শেষ দিনের উপর এমনি যে, তারা বন্ধুত্ব রাখে ঐ সব লোকের সাথে, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিরুদ্ধাচারণ করেছে, যদিও তারা তাদের পিতা অথবা পুত্র অথবা ভাই কিংবা নিজ জাতি-গোত্রের লোক হয়। এরা হচ্ছে ঐ সব লোক, যাদের অন্তরগুলোতে আল্লাহ ঈমান অঙ্কিত করে দিয়েছেন এবং তাঁর নিকট থেকে জিব্রাঈল আমীন দ্বারা তাদের সাহায্য করেছেন। (সূরা মুজাদালাহ, আয়াত নং-২২, পারা নং-২৮)

উপরোক্ত আয়াতে কারীমায় রাব্বুল ইজ্জত আপন প্রিয় বান্দাদের স্বভাব এভাবে তাদের চিহ্ন সহকারে বর্ণনা ফরমায়েছেন। আল্লাহর মাহবুব বান্দাদের স্বভাব এ যে, তাঁরা আল্লাহ ও তদ্বীয় রাসূলের শানে অবমাননাকারী বান্দাদের থেকে পৃথক থাকে এবং তাদের থেকে আলাদা থাকার ঘোষণাও করতে থাকেন যাতে সরল প্রাণ মুসলমানরা তাদের থেকে বেচে থাকতে পারেন। যদি তারা খোদা-রাসূলের দুশমনদের থেকে দুরে থাকেন তাহলে তারাও ঐ সুসংবাদের হকদার হয়ে যাবেন যা আল্লাহ তায়ালা আপন প্রিয় বান্দাদের ব্যাপারে প্রদান করেছেন। আর উক্ত আয়াতের সুসংবাদ হলো দুনিয়াতে ঈমানের সাথে থাকবে এবং অদৃশ্য থেকে খোদায়ী সাহায্য পাবেন। উক্ত আয়াতের لاتجد থেকে عشيرتهم পর্যন্ত অংশটুকু খোদা তা'য়ালার মাহবুব বান্দাদের নিশানা। উক্ত নিশানাকে আলা হযরত কেবলা স্বীয় জীবনের অভিসন্ধি বানিয়েছেন। তাঁর গোটা জীবনের পরিকল্পনা হলো তাঁর রচিত কিতাবাদী। আল্লাহ তায়ালা স্বীয় মাহবুব বান্দাদের যে নিশানার কথা বলেছেন, আলা হযরতের প্রত্যেকটা কিতাবই উহার সাক্ষ্য। কারণ তাঁর প্রতিটি কিতাবের কোন না কোন জায়গায় শানে রেসালতের বর্ণনা দিয়েছেন এবং রাসূলের শানে অবমাননাকারীদের নিন্দা করেছেন। অতএব হে মুসলিম ভাইয়েরা আপনারা যাদের মাঝে এ নিদর্শন পাবেন তাদের সাথে থাকবেন তাদেরকে অনুসরণ করবেন। তাদের আদর্শে আদর্শিত হবেন। তাদের চরিত্রে চরিত্রবান হবেন। তাদের মুহাব্বতকে অন্তরের গোপন মণিকোঠায় স্থান দিবেন। তাহলে আপনারাও ঈমানদার ও অদৃশ্যের সাহায্যের সুসংবাদ পাবেন। এখন একটু আলা হযরতের জীবনের প্রতি তাকান। তিনি আজীবন এক মুহূর্তের জন্যও উক্ত আয়াতে কারীমার উদ্দেশ্যের বাহিরে যাননি। তিনি সারা জীবন দ্বীনকে চমকায়েছেন এবং দ্বীনের দুশমনদের থেকে দ্বীনে ইসলামকে বাঁচায়েছেন। এক কথায় বলতে গেলে তার গোটা জীবনই হলো উক্ত আয়াতের তাফসীর। উল্লেখিত আয়াতে কারীমাকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগ হল لاتجد থেকে عشيرتهم পর্যন্ত, যাতে আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় বান্দাদের সংক্ষিপ্ত

জীবনালোচনা করেছেন। যার মধ্যে আলা হযরতের জীবন দিবালোকের ন্যায় চমকাচ্ছে। দ্বিতীয় ভাগ হল- اولئك كتب থেকে بروح منه পর্যন্ত। যাতে আল্লাহ তায়ালা তাঁর খাস বান্দাদের জন্য সুসংবাদ প্রদান করেছেন। এটা আমাদের জন্য অন্যতম সুখবর যে, উক্ত আয়াতের দ্বিতীয় অংশটা, আলা হযরতের জন্ম তারিখের সাথে মিলে গেছে। অর্থাৎ اولئك كتب থেকে بروح منه পর্যন্ত আয়াতাংশটির ابجد (আবজাদ)-সংখ্যাতাত্ত্বিক সংখ্যা বের করলে হবে ১২৭২ আর আ'লা হযরতের জন্ম ও হলো ১২৭২ হিজরী। সুতরাং উক্ত আয়াতাংশের اشارة النص (ইশরাতুন্ নস) হলো আলা হযরতের জন্ম।

আশেকে রাসূল ঃ

হাদীস শরীফে রয়েছে- لا ايمان لمن لا محبة له। "আলা লা ঈমানা লিমান লা মুহাব্বতালা" অর্থাৎ- তার ঈমান পরিপূর্ণ নয় যার অন্তরে মুহাব্বত নেই। উহার ব্যাখ্যায় খোদ সরকারে দো'আলম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম এরশাদ ফরমায়েছেন- لا يومن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين "লা ইয়োমিনু আহাদুকুম হাত্তা আকুনা আহাব্বা ইলাইহে মিন ওয়ালেদিহি ওয়া ওয়ালদিহি ওয়ান্নাসে আজমাইন" অর্থাৎ-তোমাদের মধ্যে ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ ঈমানদার হবে না যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার পিতা, তার সন্তান ও সকল মানুষ থেকে প্রিয় হব না। (বুখারী শরীফ, কিতাবুন ঈমান) অর্থাৎ একজন ঈমানদার হওয়ার জন্য পূর্বশর্ত হলো নবী প্রেম। সুতরাং যার অন্তরে নবীর প্রেম নেই সে কখনো ঈমানদার হতে পারে না।

আলা হযরতের সারা জীবন তাঁর প্রতিটি লেখনি, প্রতিটি আলোচনায় এটাই প্রকাশ পেয়েছে। অর্থাৎ তিনি সর্বাগ্রে নবীপ্রেমকেই স্থান দিয়েছেন। তিনি প্রায়ই এরশাদ ফরমাতেন- সরকারে দো'আলামের গোলামী ছাড়া সকল ইবাদত, সব রিয়াজত বেকার। তাঁর দৃষ্টিতে রাসূলে পাকের শানে অবমাননাকারী ব্যক্তি খেলনার ষাড়ের মতো- সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পথ চলার পরও সন্ধ্যায় ঐ জায়গায় মিলে যেখান থেকে সকালে পথ চলা আরম্ভ করেছে। সরকারে রেসালত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের ইশক্বই হলো ঈমানের নাম। অতএব যার কাছে রাসূলের ইশক্ব ও মুহাব্বত নেই তার কাছে ঈমানও নেই।

আলা হযরত কেবলা আজীবন রাসূলে পাকের শান ও মানের কথা বলেছেন এবং আল্লাহর প্রিয় রাসূল ও আউলিয়াদের শানে যারা অবমাননা করে তাদের বিরুদ্ধে মৌখিক ও কলমী যুদ্ধে আজীবন সংগ্রাম করেছেন। এমনকি ইন্তেকালের পরে একজন মুমিনের প্রথম ঠিকানা হলো- কবর। সে কবর কিভাবে তৈয়ার করবে, কতটুকু গভীর করবে উক্ত বিষয়ে তিনি নিজেই অছিয়ত করেছেন। তার আবেগপূর্ণ অছিয়তটি বর্ণনা করার পুর্বে একটি হাদীস শরীফের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করছি যা প্রতিটি মুমিনের জন্য দরকার। হাদীস শরীফে রয়েছে- যখন মানুষ মারা যায় তখন প্রিয়ভাজন ও নিকটাত্মীয়রা তাকে গোসল-কাফন পরায়ে জানাযার নামায পড়ে, কবরস্তানে দাফন করে আসে। কবরে দাফন করার পর হিসাব শুরু হয়। আল্লাহ তায়ালার নির্ধারিত দু'জন ফেরেস্তা মুনকার ও নকীর কবরে এসে মৃত ব্যক্তি থেকে হিসাব নেয়া শুরু করে।

আমাদের আক্বা-মাওলা সরুরে দ্বীন ও দুনিয়া ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের উপর আমাদের প্রাণ উৎসর্গ। তিনি জানতেন আমার উম্মতদের কবরের মধ্যে হিসাব নেয়া হবে। তাই প্রশ্ন কি হবে- তিনি তাও বলেছেন এবং উক্ত প্রশ্নের জবাব কি হবে তাও এরশাদ ফরমায়েছেন।

সম্মানিত সুন্নি মুসলিম জনতা! বর্তমান পৃথিবীতে যদি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে পরীক্ষার্থীকে প্রশ্ন পত্র দেখানো হয় তাহলে প্রশ্নপত্র আউট হয়েছে এ অজুহাতে উক্ত প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে পরীক্ষা নেয়া হয়না, বরং ঐ প্রশ্নপত্র বাজেয়াপ্ত করে নতুন প্রশ্নপত্র তৈয়ার করে উহার মাধ্যমে পরীক্ষা নেয়া হয়। অথচ আমাদের পরীক্ষাটা হবে মৃত্যুর পর কিন্তু প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম আমাদের প্রতি এতই দয়া করেছেন যে, পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে প্রশ্নপত্রও তৈয়ার করে দিয়েছেন এবং প্রশ্নের উত্তর কি হবে তাও বলে দিয়েছেন। এরপর যে ব্যক্তি উক্ত পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নেবে না তার মতো হতভাগা আর কে হতে পারে?

এখন প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের এরশাদে পাক শুনুন- কবরের মধ্যে ফেরেস্তা প্রথম যে প্রশ্নটা করবেন তা হলো- (মান রাব্বুকা) আপনার রব কে? মুমিন ব্যক্তি উক্ত প্রশ্নের উত্তরে বলবেন-(রাব্বিয়াল্লাহু) আমার রব আল্লাহ। দ্বিতীয় প্রশ্ন করবে- (মা দ্বীনোকা) আপনার দ্বীন কি? মুমিন ব্যক্তি উত্তর দেবেন (দ্বীনিয়াল ইসলাম) আমার দ্বীন হল ইসলাম। তৃতীয় প্রশ্ন হবে- (মা-কুন্তা তাকুলো ফি হক্কে হাজার রাজুল) এ ব্যক্তির ব্যাপারে তোমার খেয়াল কি? অর্থাৎ রাসূলুল্লাহু ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের ব্যাপারে আপনার আক্বীদা কি? (বুখারী শরীফ ১ম খন্ড ১৭৮ পৃষ্ঠা)। উপরোক্ত তৃতীয় প্রশ্নের মধ্যে একটা শব্দ হাজা রয়েছে, যা নিকটবর্তী বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করার জন্য ব্যবহৃত হয়। সুতরাং উহা দ্বারা এ কথাই বুঝা যায় যে, প্রতিটি মৃত ব্যক্তি রাসূলে পাকের জিয়ারত লাভে ধন্য হবেন। উহা দ্বারা এটাও প্রমাণিত হয় যে, আমাদের প্রিয় নবী হাজের-নাজের সব জায়গায় উপস্থিত সবকিছু দেখেন। উহা দ্বারা একথাও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আমাদের প্রিয় নবী হলেন জিন্দা নবী কারণ জিন্দা না হলে তিনি কবরে উপস্থিত হবেন কিভাবে। উহা দ্বারা একথাও প্রতীয়মান হয় যে, একই সময়ে হাজারো ব্যক্তিকে কবরে রাখা হলে প্রিয় নবী একই মুহূর্তে সবার কবরে উপস্থিত হন। বর্তমান তথ্য প্রযুক্তির যুগে যদি কেউ উহা অস্বীকার করে তাহলে তার মতো নিরেট অযমুর্খ আর কেউ হতে পারে না। তাকে একজন আনাড়ী ছাড়া আর কিছুই বলা যাবে না। প্রিয় নবী একই সময়ে অনেক জায়গায় উপস্থিত হতে পারেন এবং সবকিছু অবলোকন করতে পারেন এটা আমাদের আক্বীদা আমাদের ঈমান। আমাদের আক্বীদার স্বপক্ষে কোরান, হাদীসের প্রমাণ তো আছেই। এছাড়া সর্বসাধারণের বোধগম্যের জন্য বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগের মানুষের আবিস্কৃত টেলিভিশনই যথেষ্ট। কারণ টেলিভিশন ষ্টেশনে একজন উপস্থাপক যদি কথা বলেন, তাহলে যার ঘরে টেলিভিশন রয়েছে সে ঘরে বসে ঐ উপস্থাপকের ছবি ও দেখেন এবং তার কথাও শুনতে

পান। যদি বস্তুবাদের এতো শক্তি থাকে তাহলে আধ্যাত্মিকতার শক্তি কতটুকু হতে পারে পাঠক মহোদয়গণ আপনারাই চিন্তা করুন।

অস্বীকারকারীরা শয়তানের শক্তিকে মেনে নেয় এবং উহাকে সব জায়গায় উপস্থিত বলেও মেনে নেয় কিন্তু রাহবার-এ-দো'আলম হাদীয়ে আজম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামকে কেবল কবরের মধ্যে সীমাবদ্ধ মনে করে এটা বড়ই আক্ষেপের বিষয় আল্লাহ তায়ালা তাদের হেদায়ত নসীব করুন এবং প্রিয়-নবীকে সব জায়গায় হাজের ও নাজের বুঝার তাওফীক দান করুন। আমাদের আক্বীদাহ হলো- প্রিয় নবী দৃশ্যত মদীনায় তাশরীফ ফরমালেও বাস্তবে প্রত্যেক মুমিনের অন্তরে দ্বীপ্তিবিচ্ছুরক হিসাবে রয়েছেন যা আশেকে রাসূলরাই অবলোকন করতেছেন। ঐ আশেকে রাসূলদের মধ্যে নিখুত আশেক্ব আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা খান ফাযেলে ব্রেলভী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর কথাই বলছিলাম। এখন এ সাচ্ছা আশেক্বের কথা শুনুন- যখন তাঁর ইন্তেকালের সময় নিকটবর্তী হলো- তখন তিনি এরশাদ ফরমালেন, হে আমার প্রিয়ভাজনরা- আমার ইন্তেকালের সময় হয়েছে। যখন আমার শরীর থেকে রুহ বের হয়ে যাবে তখন তোমরা আমার জন্য এতো গভীর করে কবর খনন করবে যাতে আমি আহমদ রেজা দাঁড়াতে পারি। প্রিয়ভাজনরা আবেদন করলেন, হুজুর কবরতো এতোটুকু গভীর হওয়া উচিত যাতে মৃত ব্যক্তি উঠে বসতে পারে। কিন্তু আপনি এতবড় একজন শরীয়তের অনুসারী ব্যক্তিত্ব হয়েও এ ধরনের অছিয়ত করতেছেন কেন? উত্তরে আলা হযরত বললেন, শরীয়তের ফয়সালা অনুযায়ী তোমাদের কথা বরাবর ঠিক আছে। কিন্তু আমি হাদীস শরীফে পড়েছি- কবরের মধ্যে রাসূলে আকরম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম তাশরীফ আনবেন। নবীর প্রতি আমার ভালবাসা এটা সমর্থন করে না যে, নবীয়ে পাক ছাহেবে লাউলাক আমার কবরে তাশরীফ আনবেন আর আমি আহমদ রেজা কবরে বসে থাকবো? না বাবা- তোমরা এ ধরনের করো না। বরং তোমরা-আমার কবরকে এতো গভীর করে খনন করবে যাতে আমি দাঁড়াতে পারি। অর্থাৎ যখন প্রিয় নবী আমার কবরে তাশরীফ আনবেন তখন আমি আহমদ রেজা বসে না থেকে যেন দাড়িয়ে রাসূলকে স্বাগত জানাতে পারি সে জন্য তোমরা আমার কবরকে গভীর করে তৈয়ার করবে। সুবহানাল্লাহ! আলা হযরত কেবলার গোটা জীবনটাই ঈশক্বে রাসূলে ভরপুর ছিল। তিনি আজীবন ঈশক্বে রাসূলের কথাই বলেছেন। ইন্তেকালের পর প্রথম ঠিকানা কবরে গিয়ে কিভাবে রাসূলে পাকের তাজীম করবেন তাও বলে গেছেন। আল্লাহু আকবর! মোদ্দা কথা হলো- আলা হযরত হলেন, নবী প্রেমের একটি উজ্জ্বল নমুনা। যার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ঈশক্বে রাসূলে পরিপূর্ণ। আল্লাহ আমাদের সবাইকে আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা ও গাজীয়ে দ্বীন ও মিল্লাত আজীজুল হক শেরে বাংলা রাদিয়াল্লাহু আনহুমা এর ওসিলায় ঈশক্বে রাসূল দান করুন।

আলা হযরত কেবলাকে শুধু আমরা অনুসারীরাই আশেক্বে রাসূল বলছি তা নয় বরং তিনি ঈশক্বে রাসূলের অতল সমুদ্রে ডুব দিয়ে যাদেরকে কাফের ফতোয়া দিয়েছেন তাদের মধ্যে অন্যতম একজন হল- ওহাবীদের হাকীমূল উম্মত আশ্রফ আলী থানবী

সাহেব। পাকিস্তান থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক আখবারে চ্যাটান ম্যাগাজিনে আশ্রফ আলী থানবী সাহেবের একটি বক্তব্য তুলে ধরেছে। সে তার বক্তব্যে আলা হযরতের ব্যক্তিত্বের ব্যাপারে বলেছে, আমার অন্তরে আলা হযরতের অনেক সম্মান রয়েছে। তিনি আমাকে কাফের বলেন, কিন্তু ঈশক্বে রাসূলের ভিত্তিতে বলেন, অন্য কোন স্বার্থ-সিদ্ধির উদ্দেশ্যে নয়।

উক্ত ম্যাগাজিনে আশ্রফ আলী থানবী সাহেবের আরেকটি ঘটনা তুলে ধরেছে ঘটনার বিবরণ নিম্নরূপ। যেদিন আলা হযরত কেবলা ইন্তেকাল ফরমায়েছেন, সেদিন ওহাবীদের হাকীমূল উম্মত মাওলানা আশ্রফ আলী থানবী সাহেব একটি বড় জলসায় তক্বরীর করতেছিল। সে যখন তক্বীর শুরু করল তখন খবর পেল আলা হযরত মাওলানা আহমদ রেজা খান সাহেব ইন্তেকাল ফরমায়েছেন, এ সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে আশ্রফ আলী থানবী সাহেব তার তক্বরীর বন্ধ করে দিল এবং চিন্তিত হয়ে বলল, মৌলভী আহমদ রেজা খান সাহেবের সাথে সারা জীবন আমাদের সাথে বিতর্ক হয়েছে। কিন্তু আমরা তার মাগফেরাতের জন্য দোয়া করতেছি। সে এবং তার সাথে জলসায় সমবেত সকলেই আলা হযরতের জন্য মাগফেরাতের দোয়া করল। তার মালফুজাতের মধ্যে বেশীর ভাগ এ কথার প্রমান পাওয়া যায়। যার দ্বারা বুঝা যায় তার অন্তরে আলা হযরতের প্রতি যথেষ্ট সম্মান রয়েছে। বিশেষ করে ঈশক্বে সরকারে রেসালতের ব্যাপারে সে আলা হযরতের প্রশংসা করত। এমনকি আলা হযরতের পিছনে নামায পড়ার ইচ্ছাও মালফুজাতে প্রকাশ করেছে।

আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইন্তেকালের ব্যাপারে মাওলানা আশ্রফ আলী থানবী সাহেবের আরেকটি ঘটনা খুবই উল্লেখযোগ্য। ঘটনাটি নিম্নরূপ ঃ

আশ্রফ আলী থানবী সাহেবের কোন এক মুরীদ আলা হযরত কেবলার ইন্তেকালে খুশী হয়ে আশ্রফ আলী থানবী সাহেবের কাছে টেলিগ্রাম দিল। উহা তার হাতে পৌছল এক ব্যক্তি উহার বিষয়বস্তু আশ্রফ আলী থানবী সাহেবকে পড়ে শুনাল। আশ্রফ আলী থানবী সাহেব বিষয়বস্তু শুনে (ইন্নালিল্লাহে ওয়াইন্না ইলাইহে রাজেউন) বলল। ওখানে যারা উপস্থিত ছিল তাদের একজন আশ্রফ আলী থানবী সাহেবকে বলল, হুজুর! আহমদ রেজা আপনাকে কাফের বলেছেন, অথচ আপনি তাঁর ইন্তেকালে ইন্নালিল্লাহ পড়তেছেন। আশ্রফ আলী থানবী সাহেব তার কথার উত্তরে বলল, মাওলানা আহমদ রেজা ঈশক্বে রাসূলে ডুবে রয়েছেন। তিনি একজন বড় আলেম। তিনি আমার লেখার উদ্দেশ্য যা বুঝেছেন এবং উহার ব্যাপারে যা লিখেছেন তা আপন স্থানে ঠিকই আছে। যদি আমি তাঁর জায়গায় হতাম এবং তিনি আমার জায়গায় হতেন এমতাবস্থায় তার কলম থেকে ঐ কথা বের হলে যা আমার কলম থেকে বের হয়েছে। তাহলে তাঁর যা বুঝে এসেছে আমার বুঝেও তা আসলে আমিও তাকে কাফের বলতাম। সুতরাং তিনি যা বলেছেন তা ঠিক বলেছেন। তিনি যা বলেছেন তা রাসূলের প্রেমে পড়েই বলেছেন। আশ্রফ আলী থানবী সাহেবের উক্ত মজলিসে খোরশেদ আলী খান সাহেব (আই,এস,ডি) উপস্থিত ছিল। সে থানবী সাহেবকে তার বার্তাটি পড়ে

শুনায়েছিল। খোরশেদ আলী খান সাহেব উপরোক্ত ঘটনাটি মৌলভী সরদার আলী খান সাহেবকে বর্ণনা করেছেন। মাওলানা হাসনাইন রেজা খান সাহেব বলেন, মৌলভী সরদার আলী খান সাহেব উক্ত ঘটনাটি আমার নিকট বর্ণনা করেছেন।

আলা হযরতের ইন্তেকালে আরেকজন ওহাবী আলেমের প্রতিক্রিয়া সৈয়্যদ মদনী মিয়া সাহেব বর্ণনা করেন, জুমার দিন আসরের সময় আলা হযরত কেবলার ইন্তেকালের টেলিগ্রাম যখন উস্তাজুল ওলামা, ফখরুল আমাসেল জনাব মাওলানা নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী সাহেবের নিকট মুরাদাবাদ পৌছল তখন তিনি ছাত্রদের একটি দলকে আদেশ করলেন যে, তোমরা শহরে ঘোষণা করে দাও যে, আলা হযরত কেবলা আজ জুমার সময় ইন্তেকাল ফরমায়েছেন। আগামীকাল তাঁর জানাযার নামায অনুষ্ঠিত হবে। অতএব যারা জানাযার নামাযে শরীক হতে ইচ্ছুক আপনারা ব্রেলী শরীফ চলে যান। ছাত্রদের এ দলটি শোকবার্তাটি ঘোষণা করতে করতে যখন শাহী মসজিদের নিকট পৌছল তখন মাগরিবের সময় হলো- আমি (সৈয়্যদ মদনী মিয়া সাহেব) একা একা নামায পড়তেছিলাম। আমার একটু পাশে একজন মৌলভী সাহেব যিনি আক্বীদাগত ওহাবী ছিলেন, একটি মাদরাসার সদরে মুদারিস ও ছিলেন, তিনি কিছু ছাত্রদের সাথে আলাপ করতেছিলেন। শোক সংবাদের আওয়াজ শুনে একজন ছাত্রকে আদেশ করলেন, দেখতো- বাজারে কিসের ঘোষণা করা হচ্ছে। ছাত্রটি বাহিরে গিয়ে ঘোষণা সম্পর্কে অবগত হয়ে খুশী মনে মৌলভী সাহেবের নিকট আসল। এসে বলল, হুজুর খুশীর খবর, খান সাহেব ব্রেলভী শেষ হয়ে গেছে। একথা শুনে মৌলভী সাহেব ক্রোধান্বিত হয়ে বললেন, এটা কী মুসলমানদের জন্য খুশীর খবর না কেদে চোখের পানি ফেলানোর খবর। মাওলানা আহমদ রেজা সাহেবের সাথে আমাদের বিরোধিতা আপন জায়গায় ঠিক আছে। কিন্তু আহমদ রেজাকে নিয়ে আমাদের অহংকার রয়েছে। অমুসলিমদের কাছে আমরা এখনো গর্ব করে একথা বলতে পারি যে, যদি গোটা পৃথিবীর সকল বিষয়ের জ্ঞান একটি সত্তার মধ্যে একত্রিত হওয়া সম্ভব হয় তাহলে উহা হবে মুসলমানেরই ব্যক্তিসত্তা। দেখো মুসলমানদের মধ্যে মাওলানা আহমদ রেজার মতো এমন একজন ব্যক্তিত্ব পৃথিবীতে এখনো রয়েছেন, যিনি পৃথিবীর সকল বিষয়ের উপর পান্ডিত্য রাখেন। আফসোস আজকে তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার সাথে সাথে আমাদের অহংকারও বিদায় নিচ্ছে। সুতরাং মাওলানা আহমদ রেজার ইন্তেকাল এটা মুসলমানদের জন্য খুশীর সংবাদ নয় বরং উহা মুসলমানদের জন্য আফসোসের সংবাদ।

আলা হযরতের সাধারণ অবস্থা ঃ

রাসূলে পাকের সুন্নাতের অনুসরণ ঃ আলা হযরত কেবলার জীবনে প্রিয় নবীর অনুসরণ সবচেয়ে বেশী প্রাধান্য ছিল। তিনি সব সময় সবকাজে প্রিয় নবীর সুন্নাতের অনুসরণ করতেন। কোন সময় কোন অবস্থায় নবীর সুন্নাতের পরিপন্থী হয় এমন কোন কাজ তিনি করতেন না। মসজিদে প্রবেশের সময় মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় নামাযে, চলা-ফেরায়, ওঠা-বসায়, আহারে, পানাহারে এবং কথায় জীবনের সবকিছুই সুন্নাত মোতাবেক করতেন।

এবাদত ঃ মৌলভী মুহাম্মদ হোসাইন ফখরী নেজামী চিশতী মিরীটী সাহেব তাঁর কর্ম জীবনের প্রারম্ভিকের কয়েকবছর আলা হযরত রাদিয়াল্লাহু আনহুর ফতোয়া সংকলনের খেদমতের আঞ্জাম দেন। বিশেষ করে ১৩১৩ হিজরী পর্যন্ত। তিনি বলেন, আলা হযরত হালকা পাতলা শরীর, ও কম আহারকারী একজন বুযুর্গ ছিলেন। তিনি নিজের সময়কে অযথা কখনো অতিবাহিত করতেন না। সব সময় লেখা-লেখি, কিতাব রচনা, ফতোয়া রচনা ইত্যাদিতে মশগুল থাকতেন। তিনি বিশেষ কক্ষে অবস্থান করতেন। কারণ সর্বসাধারণের সাথে কথা বললে, কাজ হবে না বা কাজ কম হবে ঐ ব্যস্ততার ধরুন তিনি কেবল পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ার জন্য বিশেষ কক্ষ থেকে বের হতেন যাতে জামাতের সাথে নামায আদায় করতে পারেন। অথবা কখনো বিশেষ মেহমানের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে বের হতেন। তিনি ও মুহাম্মদ হোসাইন বলেন, সব সময় আমার দু'রাকাত তাঁর এক রাকাত হতো অথবা তিনি এক রাকাত আদায় করতে যতক্ষণ সময় লাগতো ঐ সময়ে আমি দু'রাকাত আদায় করতে পারতাম। আর আমি চার রাকাত আদায় করতে যতক্ষণ সময় লাগতো ততক্ষণে অন্যান্য লোকেরা ৬ বা ৮ রাকাত পড়ে ফেলতেন। আলা হযরত যে সতর্কতার সাথে নামায আদায় করতেন সেরকম আদায় করার মানুষ বর্তমানে পাওয়া যাওয়া দুস্কর।

নামায আদায় ঃ আলা হযরত কেবলা সারা জীবন জমায়াত সহকারে নামায আদায় করেছেন। তিনি কখনো জমায়াত ব্যতীত নামায পড়তেন না। যতই গরম পড়তো না কেন তিনি কখনো পাগড়ি ও আচকান ব্যতীত নামায পড়তেন না। একবার তিনি অসুস্থ হয়ে পড়ার কারণে ক্বিরাত পড়তে অসুবিধা হয়ে পড়েছিল তাই তিনি ঐ সময় ফরয ও সুন্নাত অন্যের ইক্বতেদায় আদায় করেছেন। তিনি মসজিদে প্রবেশের সময় ডান পা দিয়ে প্রবেশ করতেন আর বের হওয়ার সময় বাম পা দিয়ে বের হতেন। আর মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় কেবলার দিকে মুখ করেই বের হতেন। কখনো কেবলাকে পিছ দিয়ে বের হতেন না।

সর্বসাধারণের সাক্ষাতের সময় ঃ তিনি প্রতিদিন আসরের নামাযের পর সর্বসাধারণের সাক্ষাতের কক্ষে তাশরীফ নিয়ে খাটের উপর বসতেন। চারদিকে চেয়ার বসানো হতো। এ সময়টাই ছিল সর্বসাধারণের সাক্ষাতের সময়। উক্ত মজলিসে মানুষেরা দ্বীনি মাসলা- মাসায়েল জিজ্ঞাসা করতেন তিনি উত্তর দিতেন। হিন্দুস্তানের বিভিন্ন শহর, বিভিন্ন প্রদেশ ও অন্যান্য দেশ থেকে যেসব চিঠি আসতো তিনি তার উত্তর লেখতেন। মাগরিবের নামাযের পর তিনি খাস কক্ষে চলে যেতেন যেখানে তিনি লেখা-লেখি, কিতাব পড়া ও অন্যান্য অযীফা পাঠে মাশগুল থাকতেন।

আলা হযরত কেবলার শয়নের নিয়ম ঃ হযরত ইকবাল আহমদ রেজভী মুস্তফায়ী বর্ণনা করেন, আমি একবার আমার শ্রদ্ধেয় পিতার সাথে একজন বুযর্গ ব্যক্তি হযরত জিন্নাত আলী শাহ সাহেবের দরবারে গেলাম তিনি ব্রেলীতে অবস্থান করতে ছিলেন। আমি তার খেদমতে হাজির হয়ে তার থেকে শরফে নেয়াজ হাসিল করলাম। শাহ সাহেব আমার

পিতার দিকে তাকায়ে বললেন, আপনি মাওলানা আহমদ রেজা খান সাহেবের হাতে বায়'য়াত হয়েছেন। আমার পিতা বললেন, জী-হ্যা। শাহ সাহেব বললেন, আপনার পীরের শয়ন আসতেছে। শাহ সাহেবের এ কথা শুনে আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম। এবং চিন্তা করলাম, এখানে শয়ন থেকে উদ্দেশ্য কী? চিন্তা করতে লাগলাম। এক পর্যায়ে শাহ সাহেবের উক্ত কথার হাকীকত স্পষ্ট হয়ে গেল। অর্থাৎ আমি যখন আলা হযরত কেবলার খাদেমকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলাম তখন খাদেম সাহেব বর্ণনা করলেন। আলা হযরত কেবলা ২৪ ঘন্টায় শুধুমাত্র দেড় বা দু'ঘন্টা আরাম ফরমাতেন। আর বাকী সময়গুলোতে কিতাব দেখা ও কিতাব রচনার কাজ করতেন। যখন আরাম ফরমাতেন তখন ডান পার্শ্ব হয়ে শয়ন করতেন এভাবে যে, তার দু'নো হাত মোবারক মিলায়ে মাথার নীচে রাখতেন এবং পা মোবারক সংকুচিত করে রাখতেন। কখনো কখনো খাদেম হাত-পা-দাবানোর জন্য বলে যেতেন এবং আবেদন করতেন, হুজুর! সারাদিন কাজ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, হুজুর! হাত-পা মোবারক সোজা করেদিন আমি একটু দাবিয়ে দিই। তখন তিনি এরশাদ ফরমাতেন, হাত-পা তো কবরে প্রসারিত করে রাখবো। অনেকদিন পর্যন্ত আলা হযরত কেবলার এ ধরনের শয়নের কারণ কেউ বুঝতে পারেননি। আবার কেউ সাহস করে তাঁর কাছে জিজ্ঞেসও করতে পারেননি। অবশেষে তার শাহজাদা হুজ্জাতুল ইসলাম মাওলানা হামেদ রেজা খান সাহেব উহার কারণ ও ফায়েদা বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, দু'নো হাত মাথার নীচে রেখে পা-কুড়ায়ে শয়ন করলে, মাথা হবে মীমের আকৃতি আর দু'নো হাতের কনুই হবে হায়ের আকৃতি, আবার কোমর হবে মীমের আকৃতিক এবং পা হবে দালের আকৃতি। এভাবে মীম, হা, মীম, দাল দ্বারা মুহাম্মদ। অর্থাৎ ঐ ধরনের শয়ন করলে তা হবে মুহাম্মদ নামের নকশা। তাই আলা হযরত শয়নের সময় মুহাম্মদ নামের নকশা বানায়ে ঘুমাতেন। উহার ফায়দা-আলা হযরত যেভাবে শয়ন করতেন ঐভাবে শয়ন করলে ৭০ হাজার ফেরেস্তা ঐ নাম মোবারকের চার পাশে দরুদ শরীফ পাঠ করেন এবং ঐ নকশায় শয়নকারী ব্যক্তির আমলনামায় ৭০ হাজার ফেরেস্তার দরুদ শরীফের সাওয়াব লিখে দেয়া হয়।

<u>আওলাদে রাসূলের প্রতি ভক্তি ঃ</u> মাওলানা হাশমত আলী লক্ষ্মৌভী সাহেবের কাছে একজন সৈয়্যদজাদা লেখাপড়া করতেন। স্মৃতিশক্তি অধারালো ছিল। পড়া শিখতে পারতেন না। মাওলানা হাশমত আলী সাহেব আলা হযরত কেবলার খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন, হুজুর! সৈয়্যদজাদা যদি পড়া শিখতে না পারেন তাহলে তাকে শাস্তি দেয়া যাবে কী? আলা হযরত কেবলা এরশাদ ফরমালেন, মাওলানা কি বলেন, সৈয়্যদজাদাকে কখনো শাস্তি দেয়া যাবে না। তিনি পুনরায় আরজ করলেন, হুজুর! যদি শাস্তি দেয়া না যায় তাহলে সৈয়্যদজাদা পড়বেন না এবং মুর্খ থেকে যাবেন। আলা হযরত কেবলা এরশাদ ফরমালেন, যদি শাস্তি দিতে বাধ্য হন তাহলে নিয়্যত করবেন যে, শাহাজাদার পায়ে মাটি লেগেছে উহাকে সাফ করতেছি। খবরদার শাস্তির খেয়াল করবে না। আলাহ আকবর! সৈয়্যদজাদার

প্রতি কি রকম ভক্তি ও কি রকম শ্রদ্ধাই না আলা হযরতের ছিল তা উক্ত ঘটনা থেকেই বুঝা যায়।

<u>আওলাদে রাসূলের প্রতি শ্রদ্ধা ঃ</u> ওলামায়ে কেরাম তাদের নির্ভরযোগ্য কিতাবের মধ্যে লিখেছেন, যারা রাসূলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের প্রতি সম্পর্কিত তাদেরকে সম্মান করতে হবে। তাদের মাঝে সাদাতে কেরামগণ রাসূলে পাকের আওলাদ হওয়ার কারণে অধিক সম্মান পাওয়ার হকদার। উহার উপর পরিপূর্ণ আমল করতে আমরা আলা হযরত রাদিয়াল্লাহু আনহুকে পেয়ে থাকি। কারণ তিনি সৈয়্যদজাদাকে তার ব্যক্তিসত্ত্বার দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতেন না বরং তিনি তাদেরকে এ দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতেন যে, তারা হলেন রাসূলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের অংশ। এ হিসাবে তারা যে সম্মান পাওয়ার যোগ্য তিনি তা যথাযথভাবে প্রদান করেন। এ ব্যাপারে তিনি নিজেই আওলাদে রাসূলের প্রশংসায় ও সম্মান প্রদর্শনার্তে লিখেছেন-

تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نورکا ☆ تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نورکا

"তেরে নছলে পাকমে হ্যাঁ বাচ্চা বাচ্চা নূরকা-তুহি আইনে নূর তেরা ছব গেরানা নূরকা" অর্থ-হে আমার আকা মাওলা! আপনার পূত পবিত্র বংশের সকল বাচ্চারাই নূরানী। আপনি হলেন নির্ভেজাল নূর আপনার সকল খান্দানই নূরানী।

সৈয়্যদ আইয়ুব আলী সাহেব বর্ণনা করেন, একজন কম বয়সী সাহেবজাদা আলা হযরতের ঘরের কাজকর্ম করার জন্য কর্মচারী হিসেবে নিযুক্ত হলেন। আলা হযরত কেবলা যখন জানতে পারলেন যে, ঐ কম বয়সী বালকটি সৈয়্যদজাদা তৎক্ষনাত তিনি ঘরের সকল সদস্যদেরকে দৃঢ়তার সাথে বলে দিলেন, খবরদার! তোমরা কখনো সৈয়্যদজাদা সাহেবের মাধ্যমে কোন কাজ করাবে না। তিনি হলেন মাখদুমজাদা। (খেদমত পাওয়ারযোগ্য) খানা-পিনা, কাপড়-চোপড় যা যা দরকার হবে সব তার খেদমতে হাজির করবে। তাঁর এরশাদ মোতাবেক পরিবারের সদস্যরা সৈয়্যদ জাদার যা যা প্রয়োজন তা তার খেদমতে পেশ করতে লাগলেন। তার দ্বারা কোন কাজকর্ম করাচ্ছেন না। তিনি কর্মচারী হিসাবে নিয়োগ হয়েছিলেন কিন্তু তার দ্বারা কোন কাজ করানো হচ্ছে না বরং তার প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা হচ্ছে। যখন যা প্রয়োজন তখন তা তার খেদমতে পেশ করা হচ্ছে। এটা যখন তিনি বুঝতে পারলেন তখন তিনি আলা হযরত কেবলার ঘর থেকে চলে গেলেন।

সৈয়্যদ আইয়ুব আলী সাহেব বর্ণনা করেন, আলা হযরত কেবলার দরবারে মীলাদ শরীফ উপলক্ষে যে সিরনী তৈয়ার হতো উহা বন্টনের একটা নিয়ম ছিল। ঐ নিয়মটি হলো উক্ত মীলাদ শরীফে যে সকল বাচ্চা ও দাড়িহীন ব্যক্তি উপস্থিত থাকতেন তাদেরকে এক অংশ সিরনী দেয়া হতো। দাড়িওয়ালা যেসব মানুষ থাকতেন তাদেরকে দু'অংশ দেয়া হতো আর যেসব সৈয়্যদজাদা শরীক হতেন তাদেরকে চার অংশ সিরনী দেয়া হতো। তাঁর খান্দানের সকলেই উহা অনুসরণ করতেন। এক বছর রবিউল আউয়াল শরীফের ১২ তারিখ মীলাদুন্নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের অনুষ্ঠানে মানুষের সমাগম বেশী হয়েছিল।

সিরনী বন্টনের সময় নিয়মের পরিপন্থী সৈয়্যদ মাহমুদ জানকে এক অংশ দেয়া হয়েছিল অথচ তিনি চার অংশ পাওয়ার হকদার। তিনি এক অংশ সিরনী গ্রহণ করে চুপেসরে আলা হযরতের খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন, হুজুর! আজকে আমাকে সিরনীর এক অংশ দেয়া হয়েছে। আলা হযরত এরশাদ ফরমালেন, সৈয়্যদ সাহেব তাশরীফ রাখুন, এরপর সিরনী বন্টনকারীকে ডাকলেন এবং খুব অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে এরশাদ ফরমালেন, এখনই একটি চিনির প্লেট নিয়ে উহাতে সিরনী পরিপূর্ণ করে সৈয়্যদ সাহেবের খেদমতে পেশ কর। অতঃপর তৎক্ষনাত হুকুম তামীল করা হলো। সৈয়্যদ সাহেব বললেন, হুজুর! আমার উদ্দেশ্য এটা ছিল না। তবে হা আমার মনে খুব কষ্ট এসেছে যা বরদাস্ত করতে পারিনি। আলা হযরত ফরমালেন, সৈয়্যদ সাহেব এ সিরনী আপনাকে গ্রহণ করতে হবে নতুবা আমি খুব কষ্ট পাব। এরপর সিরনীবন্টনকারীকে বললেন, একজন লোক সৈয়্যদ সাহেবের সাথে দাও যে সিরনীর প্লেটটি সৈয়্যদ সাহেবের ঘরে পৌছায়ে দেবে। তৎক্ষনাত হুকুম তামীল করা হল।

একবার একজন সৈয়্যদজাদা তাঁর ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে আওয়াজ দিলেন। হুজুর! সৈয়্যদজাদাকে কিছু দিন। এ আওয়াজ শুনা মাত্রই তিনি বাহিরে তাশরীফ আনলেন এবং দ্বীনের কাজের জন্য যে দু'শত রূপী রেখেছিলেন তা তিনি পেশ করে বললেন, হুজুর গ্রহণ করুন। উহাতে বিভিন্ন রকমের মুদ্রা ছিল। সৈয়্যদ সাহেব কিছু মুদ্রা উঠায়ে নিলেন এবং বললেন, ব্যস বাকীগুলো আপনি নিয়ে যান। ঐ সময় আলা হযরত কেবলা খাদেমকে নির্দেশ দিলেন, যদি সৈয়্যদ সাহেব আবার আসেন তাহলে চুয়ান্ন পয়সার মুদ্রা হাদিয়া স্বরূপ তার খেদমতে পেশ করবে যাতে তার মুখে বলার প্রয়োজন না হয়।

একদা জুমার নামায আদায় করার পর আলা হযরত তাশরীফ রাখলেন, মানুষের সমাগম খুব বেশী ছিল। এর মধ্যে একজন ছাত্র মৌলভী নূর মুহাম্মদ যিনি ঐ সময় আস্তানায়ে আলীয়ায় অধ্যয়নরত ছিলেন। তিনি বাহির থেকে কানায়াত আলী কানায়াত আলী বলে নাম ধরে কানায়াত আলীকে ডাক দিলেন। তার আওয়াজ শুনে আলা হযরত কেবলা তৎক্ষনাত তাকে ডাকলেন এবং ফরমালেন, সৈয়্যদ সাহেবকে ঐভাবে ডাকতেছ? আমি কোন সময় তাকে নাম ধরে ডাকতে শুনেছ? খবরদার এ ধরনের আচরণ আর কখনো করবে না। এ কথা ভালভাবে খেয়াল রাখবে।

সুবহানাল্লাহ! আলা হযরত কেবলা প্রিয় নবীকে নাম ধরে ডাকাতো দূরের কথা প্রিয়নবীর আওলাদকে পর্যন্ত নাম ধরে ডাকতেন না। আলা হযরত কেবলা প্রিয় নবীর নাম ধরে তথা ইয়া মুহাম্মদ বা ইয়া আহমদ সম্বোধন করে ডাকতে দৃঢ়তার সাথে নিষেধ করেছেন এবং প্রিয় নবীকে ইয়া মুহাম্মদ, ইয়া আহমদ নাম ধরে আহ্বান করা হারাম এ বিষয়ের উপর তজল্যিয়ুল এ্যক্বীন বেআন্না নাবিয়্যানা সৈয়্যদুল মুরসালিন নামক একটি কিতাবও লিখেছেন। তিনি কোরান ও হাদীসের দলীল পেশ করে প্রমাণ করেছেন যে, প্রিয় নবীকে ইয়া মুহাম্মদ ইয়া আহমদ জাতী নাম ধরে সম্বোধন করা শরীয়ত সম্মত নয়।

এমনকি নাদে আলীর মধ্যে যেখানে ইয়া মুহাম্মাদু আছে সেখানে ইয়া মুহাম্মাদু এর স্থলে ইয়া রাসূলাল্লাহু বলার জন্য আদেশ করেছেন।

যখন কোন হাজী সাহেব হজ্বে বায়তুল্লার সৌভাগ্য হাসিল করে ফিরে আসতেন তখন তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করতেন, হাজী সাহেব হুজুর পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের বারেগায়ে আলীয়ার হাজিরি দিয়েছেন? যদি হাজী সাহেব হা বলতেন তৎক্ষনাত তিনি তার কদমে চুমু দিতেন।

তিনি তার দুনিয়াবী জীবনের শেষের দিকে মাওলানা এরফান আলী ভয়সলপুরীর নিকট চিঠি পাঠিয়েছেন। ঐ চিঠিতে তিনি লিখেছেন। আমার ইন্তেকালের সময় নিকটবর্তী হয়েছে। আমার মন হিন্দুস্তানে নয় মক্কায়ে মুয়াজ্জমায়ও ইন্তেকাল করতে চায় না, বরং আমার মনের ইচ্ছা হলো এটাই যে, আমি মদীনায়ে তায়্যেবায় ঈমানের সাথে ইন্তেকাল করি এবং জান্নাতুল বাকী শরীফে সম্মানের সাথে দাফন হই।

উক্ত মজলিসে তিনি কথা প্রসঙ্গে একথাও বলেছেন যে, যদি কাজী সাহেব কোন সৈয়্যদজাদাকে শাস্তি দেন তাহলে এ ধারণা করতে পারবে না যে, আমি শাস্তি দিচ্ছি বরং এ খেয়াল করবে যে, শাহজাদার পায়ে ময়লা লেগেছে আমি উহা ধুয়ে দিচ্ছি।

তাজীমে মোর্শেদ ঃ আলা হযরত আজীমুল বরকত শময়ে পরওনায়ে রেসালত শাইখুল ইসলাম ওয়াল মুসলেমীন ইমামে ইশক্বে মুহাব্বত শাহ আহমদ রেজা খান ফাযেলে ব্রেলভী রাদিয়াল্লাহু আনহু স্বীয় মোর্শেদে কামেলের অকৃত্রিম তাজীম ও সম্মান করতেন এবং তিনি মাজারে পাকে আলেমানা সূফীয়ানা ওয়াজ ফরমাতেন। একদা সাজ্জাদানশীন সাহেব আলা হযরত কেবলার কাছে পাহারাদারের জন্য দু'টি কুকুরের ফরমায়েশ করলেন, তৎক্ষণাত আলা হযরত কেবলা ঘরে পৌছে উচ্চ বংশের দু'টি কুকুর খানেক্বায় নিয়ে সাজ্জাদানশীনের খেদমতে উপস্থিত করে আবেদন করলেন, হুজুর! আহমদ রেজা এ দু'টি কুকুর আপনার খেদমতে পেশ করতেছেন, এরা দিনের বেলায় আপনার কাজ কাম করবেন আর রাতের বেলায় পাহারা দেবেন। কুকুর দু'টি ছিল আলা হযরত কেবলার সাহেবজাদা। একজন হলেন হুজ্জাতুল ইসলাম হামেদ রেজা খান সাহেব অপরজন হলেন মুফতীয়ে আজম মুস্তফা রেজা খান সাহেব। মূলত এটা ছিল আলা হযরতের প্রতি সাজ্জাদানশীনের পরীক্ষা। আলা হযরত কেবলা উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন এবং আপন দু'শাহাজাদাকে পীরের দরবারে কুকুর হিসাবে পেশ করলেন। সুবহানাল্লাহ! পীরের প্রতি তাজীম হলে এ ধরনের হওয়া চাই।

আহার ঃ তাঁর খাবার অত্যন্ত সাদাসিদা ও স্বল্প ছিল। এক পেয়ালা বকরীর মাংস ঝোল সহকারে মরিচ বিহীন আর এক বা দেড়টি বিস্কুট। অনেক সময় বিস্কুট ও থাকত না।

মাওলানা মুহাম্মদ হোসাইন মিরিটী বর্ণনা করেন যে, এক বছর আমি রমযানুল মোবারকের ২০ তারিখ ব্রেলী শরীফে এতেকাফ রেখেছি। হুজুর আলা হযরত যখন মসজিদে তাশরীফ আনতেন তখন বলতেন, মনে অনেক চাই এতেকাফ রাখতে কিন্তু সুযোগ হচ্ছে না। পরিশেষে রমযানুল মোবারকের ২৬ তারিখ বললেন, আজ থেকে আমিও

মুতাকিফ হয়ে যাব। তিনি ইফতারের পর শুধু পান খেতেন আর কোন খাবার খেতেন না। আর সেহরীর সময় তার জন্য একটি ছোট পেয়ালার মধ্যে চাটনী এবং বাসনে করে ফিরনী আনা হতো। একদা আমি হুজুরের খেদমতে আরজ করলাম- হযরত! ফিরনী আর চাটনীর মধ্যে সম্পর্ক কী? তিনি এরশাদ ফরমালেন, লবন দ্বারা খাবার শুরু করা আবার লবন দ্বারা খাবার শেষ করা সুন্নাত। আর তার জন্য যে চাটনী আনা হতো তা লবন দ্বারা তৈয়ার করা হতো।

উল্লেখ্য যে, লবন দ্বারা খাবার শুরু করলে আর লবন দ্বারা খাবার শেষ করলে প্রিয় নবীর সুন্নাত আদায় হবে, সাওয়াবও পাওয়া যাবে আর এ সুন্নাত আদায়ের কারণে ৭০টি রোগের শেফা পাওয়া যাবে।

স্বভাব ঃ তাঁর জীবনে প্রিয় নবীর সুন্নাতের অনুসরণ সবচেয়ে বেশী প্রাধান্য ছিল। পাঁচ ওয়াক্ত নামায অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে জমাতের সাথে আদায় করতেন। ফরয নামায পাগড়ী ও আচকান ব্যতীত আদায় করতেন না। তাঁর খাদেম বর্ণনা করেছেন, তিনি রাত্রে ঘুমানোর সময় মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের নামে পাকের আকৃতিতে ঘুমাতেন সালাম করার সময় কখনো অট্টহাসি দিতেন না। কখনো খিল খিল করে হাসতেন না বরং সবসময় মৃদু হাসতেন। হাই আসলে হাতের আঙ্গুলি দাতের সাথে দবায়ে নিতেন। চুল পরিপাটি করার সময় চিরুনী ও আয়না নিতেন। এতো আস্তে হাটতেন কখনো পায়ের আওয়াজ হতো না। হাটার সময় দৃষ্টি প্রায় সময় নিচের দিকে রাখতেন। প্রায় সময় হালকা পাতলা নাগারা জুতা পরতেন। মসজিদে প্রবেশের সময় ডান পায়ে প্রবেশ করতেন, বের হওয়ার সময় বাম পায়ে বের হতেন। আর মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় কেবলার দিকে মুখ করেই বের হতেন কখনো কেবলাকে পিছ দিয়ে বের হতেন না। এক পা অপর পায়ের উরুর উপর রেখে বসাকে পছন্দ করতেন না। যে কাজ বাম হাতে করতে হয় উহা ছাড়া সব কাজ ডান হাতেই করতেন। পাগড়ির প্রান্তস্থিত কারু ডান কাঁদের উপর থাকত। যদি কাউকে কোন কিছু দিতেন তাহলে ডান হাতেই দিতেন। কখনো সুন্নাতের পরিপন্থী কোন কাজ করতেন না। ফরয, সুন্নাত ওয়াজিব তো যথাযথভাবে আদায় করতেন। পারিত পক্ষে কোন নফল, কোন মুস্তাহাব ও বাদ দিতেন না।

উদারতা ও দানশীলতা ঃ জনাব জাকাউল্লাহ খান সাহেব বর্ণনা করেন, শীতের মৌসুম ছিল। আলা হযরত কেবলা প্রতিদিনের নিয়মানুসারে মাগরিবের নামায আদায় করে সর্বসাধারণের সাক্ষাতের কক্ষে তাশরীফ নিয়ে মানুষদেরকে বিদায় করতেছেন। ঐ সময় খাদেমের দিকে তাকায়ে বললেন, আপনার কাছে ছোট লেপ নেই? খাদেম চুপ করে রইলেন, ঐ সময় আলা হযরত কেবলা যে ছোট লেপ গায়ে পরেছিলেন, তা খুলে খাদেমকে দিয়ে দিলেন এবং বললেন, নেন, গায়ে পরে নেন। খাদেম আদবসহকারে কদমবুছি করলেন এবং হযরতের ফরমান মোবারকের তামীল করে ছোট লেপটি নিলেন। তিনি আরও বর্ণনা করেন যে, আলা হযরত কেবলা তাঁর ছোট লেপটি আমাকে দান করার দু'তিন দিন পর তাঁর জন্য আরেকটি নতুন লেপ তৈরী করে আনা হল। তিনি নতুন লেপটি কয়েকদিন

ব্যবহার করলেন, এরপর একরাত্রে একজন মুসাফির মসজিদে আসলেন এবং আলা হযরতের খেদমতে আরজ করলেন। হুজুর! গায়ে দেয়ার মত আমার কোন কিছু নেই। তাঁর কথা শুনে আলা হযরত কেবলা তাঁর নতুন লেপটি মুসাফিরকে দিয়ে দিলেন।

বর্ষাকালে কোন কোন সময় ঘর থেকে বের হয়ে মসজিদে আসার সময় বৃষ্টির পানিতে কিছু ভিজতে হতো। এতে তাঁর সামান্য কষ্ট হত। হাজী কেফায়াতুল্লাহ সাহেব তার এ কষ্ট অনুভব করলেন তাই তিনি একটি বড় ছাতা খরিদ করে আলা হযরত কেবলাকে উপহার দিলেন। আর উহা তার কাছেই রাখতেন। আলা হযরত কেবলা মসজিদে আসার উদ্দেশ্যে যখন বের হতেন তখন হাজী সাহেব ঐ ছাতি মেলে তাঁকে নিয়ে আসতেন। কয়েকদিন যেতে না যেতেই একজন অভাবী লোক এসে আলা হযরত কেবলার খেদমতে একটি ছাতি চাইলেন। তিনি হাজী সাহেব থেকে ঐ ছাতিটি নিয়ে গরীব লোকটিকে দান করে দিলেন। তাঁর দরবার থেকে কখনো কোন অভাবী ব্যক্তি খালি হাতে ফিরে যেতেন না। ফরিয়াদী, বিপদগ্রস্থ, নিঃস্ব, অসহায়, দুর্দশাগ্রস্থ, গরীব, মিসকীন সবাইকে তিনি তাঁর সাধ্যমত সাহায্য-সহযোগিতা করতেন। এ সাহায্য কেবল তাঁর দরবারে সীমাবদ্ধ ছিল না। কিছু অভাবীকে প্রতিমাসে নির্ধারিত কিছু টাকা দিতেন। ঐ অভাবীরা টাকা নেয়ার জন্য তাঁর দরবারে আসতে হত না। বরং আলা হযরত কেবলা তাদের ঠিকানায় মাণিঅর্ডার করে টাকাগুলো পাঠায়ে দিতেন। এ ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণ আল্লাহর উপরেই তাওয়াক্কুল করতেন। একবার এক ব্যক্তির খেদমতে ৫০টি টাকা মদীনায়ে মোবারকে পাঠানোর ছিল। কিন্তু ঐ সময় আলা হযরত কেবলার হাতে একটা টাকাও ছিল না। তাই তিনি রাসূলে পাকের বারেগায়ে মনোযোগী হয়ে আবেদন করলেন। হুযুর আমি আপনার ভরসাই খোদার কিছু বান্দার মাসিক খরচের দায়িত্ব নিজের জিম্মায় নিয়েছি। হুযুর! কাল ৫০ টাকা মানিঅর্ডার করার প্রয়োজন। যদি করতে না পারি তাহলে পোষ্ট অফিসের মানিঅর্ডারের ব্যবস্থাপক এসে যাবেন। তার পরও দিতে না পারলে টাকা পাঠাতে দেরী হয়ে যাবে। ঐ রাত্রটি তিনি খুব দুশ্চিন্তা গ্রস্থাবস্থায় কাটালেন। সকাল হলে এক ব্যক্তি এসে ৫১ টাকা হযরত হাসনাইন রেজার মাধ্যমে আলা হযরতের খেদমতে উপহার পাঠালেন। এ উপহার পেয়ে আলা হযরত খুব খুশী হলেন এবং উল্লেখিত প্রয়োজনের হাকীকত উম্মোচন হয়ে গেল। তিনি এরশাদ ফরমালেন। নিঃসন্দেহে এটা হুযুর পাকের বদান্যতা। এ কারণে যে, একান্ন টাকা দেয়ার অর্থ হলো ৫০ টাকা মানিঅর্ডার করার জন্য আর মানিঅর্ডারের ফিসও তো লাগবে। তাই এক টাকা ফিসের জন্য। অতঃপর তিনি মানিঅর্ডারের ফরম পূর্ণ করলেন এবং পোস্ট অফিস খোলার সাথে সাথেই মানিঅর্ডার রওনা করে দিলেন।

যখন তাঁর কাছে কোথাও থেকে কোন টাকা আসত তখন তিনি তা বন্টন করে দিতেন। এ ব্যাপারে তিনি নিজেই কোন এক সময়ে এরশাদ ফরমায়েছিলেন, আমি কখনো যাকাতের এক পয়সাও দিই নাই। কেননা তিনি নিজের কাছে কখনো এতো টাকা রাখেননি যাতে বছর অতিবাহিত হওয়ার পর উহাতে যাকাত ওয়াজিব হয়।

একদিন এক অভাবী লোক হযরতের খেদমতে উপস্থিত হয়ে কিছু চাইলেন। আলা হযরত এরশাদ ফরমালেন, এ সময় আমার কাছে মাত্র সাড়ে তিন আনা পয়সা আছে। আর আমি উহা চিঠির জবাব লেখে পোষ্ট করার জন্য পোষ্ট অফিসের খরচ বাবৎ রেখেছি। যদি আপনি চান তাহলে উহা আপনাকে দিয়ে দেব। অথচ আজকে পোষ্টের মাধ্যমে ২৫০ টাকার একটি মানিঅর্ডার এসেছে আর আমি ঐ ২৫০ টাকার সবই বন্টন করে দিয়েছি যদি আপনি আগে আসতেন তাহলে আপনিও উহার কিছু অংশ পেতেন। বেচেরা গরীব লোকটি নজর নিচু করে ফেললেন। পরিশেষে আলা হযরত কেবলা ঐ সাড়ে তিন আনা তাকে দিয়ে দিলেন।

এখানে উল্লেখ্য যে, তাঁর কাছে যে ২৫০ টাকা এসেছিল তিনি তা গ্রহণ করে অভাবীদের মাঝে বন্টন করে দিলেন। দান করে খোটা দেয়া শরীয়ত সম্মত নয়। এরপরও তিনি আমাদের কতিপয় লোকের কু-ধারণা দূর করার জন্য নিয়মের পরিপন্থী হওয়া সত্ত্বেও তা বলেছেন। কারণ তিনি ২৫০ টাকা যে মানিঅর্ডার পেয়েছেন তা আমরা খাদেমেরা দেখেছি, তাই আমাদের কেউ যেন কু-ধারণা বশতঃ কোন কথা বলতে না পারি এ জন্য তিনি দান করার কথা বলেছেন, অন্য কোন উদ্দেশ্যে নয়।

<u>মুজাদ্দেদের পরিচয় ও মুজাদ্দেদে দ্বীনের তালিকা ঃ</u> ছাহেবে ফযীলত হযরত আলহাজ্ব আশ শাহ মুফতী রিদুওয়ানুর রহমান সাহেব রেজভী স্বীয় রচিত গ্রন্থ "সীরাতে আলা হযরত" এর মধ্যে লিখেছেন, সহীহ হাদীস শরীফের মধ্যে রয়েছে যে, সরওয়ারে কায়েনাত ফখরে মওজুদাত সরকারে মদীনা সুরুরে ক্বলবে সীনা আকা-মাওলা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম ইরশাদ ফরমান-, ان الله يبعث لهذه -
الامة على راس كل ماة سنة من يجدد لها امر ربهااوفى رواية دينها او كما قال عليه
السلام- (ابو داود شريف)

ইন্নাললাহা ইয়াবআছু লেহাজিহিল উম্মতে আলা রাছে কুল্লে মিয়াতে সনতিন মাই ইয়োজাদ্দেদো লাহা আমরা রব্বিহা ওয়া ফি রেওয়ায়েতি দিনাহা আও কামা কালা আলাইহিস্‌সালাম (আবু দাউদ শরীফ)

অর্থাৎ আল্লা তায়ালা এ উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য প্রতি শতাব্দীর প্রথমে একজন মুজাদ্দেদকে পাঠান যিনি দ্বীনের বিষয়াদীর সমাধান, অন্য বর্ণনামতে দ্বীনের সংস্কার করেন। আবু দাউদ শরীফ) এ হাদীস শরীফের ব্যাখ্যায় শেখুল ইসলাম হযরত আল্লামা বদরুদ্দীন আলাইহির রাহমাহ বলেন احواله اعلم ان المجدد انما هو بغلبة الظن ممن عارفه بقرائن -
والانتفاع بعلمه ولا يكون المجدد الا عالما بالعلوم الدينية الظاهرة والباطنة ناصرا للسنة قامعا
للبدعة-,

অর্থ: "জেনে রাখুন। নিশ্চয় মুজাদ্দেদের পরিচয় পাওয়া যায় অধিকাংশ ধারণানুসারে তার অবস্থাদির চিহ্নাবলী দ্বারা এবং তাঁর ইলমের উপকার সাধন দ্বারা। আর মুজাদ্দেদ তিনিই হবেন যিনি দ্বীনের বাহ্যিক জ্ঞান ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানের আলেম হবেন। সুন্নাতের সাহায্যকারী ও বিদায়াতের ধ্বংসকারী হবেন"।

সুলতানুল আরেফীন ইমামুল কামেলীন, শেখুত তরীক্বত ওয়াশ শরীয়ত হযরত আল্লামা মাওলানা মৌলভী আলহাজ্ব আশ শাহ্ আশ শেখ আহমদ ফারুক্বী মুজাদ্দেদে আলফে সানী রাদিয়াল্লাহু আনহু মুজাদ্দেদের পরিচয় প্রদান করতে গিয়ে তাঁর লিখিত "মাকতুবাত" দ্বিতীয় খন্ডের ১৫ পৃষ্ঠায় লিখেছেন-

وبدانند که بر سر ہر مائة مجددی گزشته است

জেনে রাখুন! প্রতি শতাব্দীর প্রারম্ভে একজন মুজাদ্দেদ অতিক্রম করবেন" একই পৃষ্ঠায় তিনি আরো লিখেন-

"مجدد آنست که ہر چہ در آن مدت از فیوض بامتیاں برسید بتوسط او برسد اگرچہ اقطاب واوتاد آں وقت بودند وابدال ونجبا باشند

অর্থাৎ মুজাদ্দেদ তিনিই যে, তাঁর জমানায় উম্মতেরা যত ফয়েজ পান তা তাঁর মাধ্যমেই পেয়ে থাকেন। যদিও ঐ সময় আকতাব, আওতাদ, আবদাল ও নুজবা থাকেন" (মাকতুবাতে ইমামে রাব্বানী দ্বিতীয় খন্ড ১৫ পৃষ্ঠা নাওল কিশুর লক্ষ্মৌ থেকে প্রকাশ) হাদীস শরীফ ও শেখে রাব্বানী মুজাদ্দেদে আলফে সানীর উপরোক্ত উদ্ধৃতির উপর গবেষণা করলে কয়েকটি বিষয় চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়। যথা- প্রত্যেক শতাব্দীতে মাযহাব ও মিল্লাতের সংস্কার ও খেদমতের জন্য একজন মুজাদ্দেদ প্রেরিত হওয়া এটা খোদার সুন্নাত। ঐ মুজাদ্দেদ স্বীয় জমানায় সকল আকতাব, আবদাল, রাহরাওয়ানে তরীক্বত হামীয়ানে শরীয়ত এর ইমাম, মুক্বতাদা, মালজা, মাওয়া, মারজা ও মানশা হয়ে থাকেন। আল্লাহ্ তায়ালার নৈকট্য অর্জনের জন্য তাঁর দরবারে হাজেরী দেয়া ছাড়া কোন উপায় নেই। যারা তাসাউফের কিছু কিতাব অধ্যয়ন করেছেন তাদের কাছে একথা স্পষ্ট যে, কেবল স্বঅর্জন এ পথে যথেষ্ট নয় যতক্ষণ উপর থেকে ফয়েজ না পায়। শুধু রিয়াজত আল্লাহ্ তায়ালার সান্নিধ্যে পৌছাতে পারে না, বরং প্রতি মুহূর্তে বিপদের সম্মুখীন হতে হয়। যদি মুজাহেদ ব্যক্তি উপরের কোন শেখ থেকে ফয়েজ প্রাপ্ত না হন তাহলে তার এবাদত, রিয়াজত কেড়ে নেয়ার জন্য ইবলিস শয়তান ওৎপেতে বসে রয়েছে সে যে কোন মুহূর্তে তার উপর হামলা চালায়ে তার সকল প্রকার এবাদত ধ্বংস করে দিতে পারে।

মোদ্দাকথা আল্লাহর পথে চলার জন্য আল্লাহর ফয়েজ পাওয়া আবশ্যক। মুজাদ্দেদে আলফে সানীর বাণী অনুসারে ঐ ফয়েজ অর্জন মুজাদ্দেদের মাধ্যম ছাড়া সম্ভব নয়। ফলাফল এটাই হলো যে, কোন বেলায়ত ও কুতুবিয়্যাতের আসনে ততক্ষণ আসীন হতে পারবেন না যতক্ষণ ঐ জমানার মুজাদ্দেদের প্রতি মনোযোগী না হবেন এবং তাকে নিজের ঈমাম ও মুক্বতাদা না মানবেন।

একথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, হিন্দুস্তানের জমিনে দু'জন মুজাদ্দেদের আবির্ভাব খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং তাদের সংস্কারমূলক কার্যক্রম সকলের স্মরণীয়। একজন হলেন, ইমামে রব্বানী মুজাদ্দেদে আলফে সানী শেখ আহমদ ফারুক্বী সেরহিন্দী। যিনি

ইসলামের এমন এক ক্রান্তিকালে হিন্দুস্তানের জমিনে আগমন করেছেন যখন সম্রাট আকবর দ্বীনে ইলাহী ক্বায়েম করে কালেমায়ে তায়্যেবার প্রথম অংশ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ তথা আল্লাহ্র একত্ববাদের উপর আঘাত হেনেছিল। ইমামে রাব্বানী তাঁর মুজাদ্দেদীয়াতের শান জাহের করে সম্রাট আকবরের সে দ্বীনে ইলাহীর কবর রচনা করেছেন। আরেক মুজাদ্দিদের আবির্ভাব সম্পর্কে জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিরা ভাল করে জানেন তিনি হলেন আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা ফাযেলে ব্রেলভী। যিনি ইসলামের এমন এক ক্রান্তিলগ্নে তাশরীফ এনেছেন যখন বাতেল ফের্কারা চতুর্দিক থেকে কালেমায়ে তায়্যেবার দ্বিতীয়াংশ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম তথা শানে রেসালতের উপর আঘাত হেনেছিল। যখন বাতেল ফের্কারা ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি ও দ্বীনি বিশ্বাসের মূলে কুটারাঘাত করতেছিল। একদিকে নীসিরীয়ত ফের্কা যারা মুসলমানদের মন ও মস্তিস্ককে খোদা তায়ালার কল্পনা করা থেকে ফিরিয়ে রাখার ঘৃণ্য প্রচেষ্টায় লিপ্ত। অন্যদিকে ক্বাদেয়ানীরা খতমে নবুয়াতকে অস্বীকার করে মির্জা গোলাম আহমদ ক্বাদেয়ানীকে ভন্ড নবী বানিয়ে সরলমনা মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত করার পায়তারা করছিল। কোথাও সকড়ালভীরা প্রিয় নবীর হাদীস শরীফ আমলযোগ্য নয় বলে দাবী করে মুসলমানদেরকে নবীর পথ থেকে সরানোর চেষ্টায় বিভোর, কোথাও দেওবন্দদীয়্যাত ওহাবীয়্যত লা-দ্বীনিয়্যাতরা মুসলমানদের অন্তরে রাসূলে খোদার মুহাব্বত থাকতে পারবেনা দাবী করে সরলপ্রাণ মুসলমানদেরকে আক্বায়েদে বাতেলার জালে আটকানোর মাধ্যমে মুরতেদ বানানোর চেষ্টায় নিমগ্ন হয়েছিল। এক কথায় বাতেল ফের্কারা শানে রেসালতের উপর চতুর্দিক থেকে আঘাত হানতেছিল। সে দুর্যোগময় সন্ধিক্ষণে আল্লাহ তায়ালা তাঁর মাহবুবের সাচ্চা ওয়ারেস আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজাকে চতুর্দশ শতাব্দীর মুহাদ্দেদে আজম করে হিন্দুস্থানের জমিনে ব্রেলী শরীফে প্রেরণ করেছেন। যিনি তাঁর তর্কযুদ্ধে ও কলমী যুদ্ধে সকল বাতেলদের বতুলতার কবর রচনা করে সরলমনা মুসলমানদেরকে ঐ সব হায়েনার কালো থাবা থেকে রক্ষা করে তাদের মনে প্রিয় নবীর মুহাব্বত জমিয়ে দিয়েছেন। তিনি আজীবন প্রিয় নবীর শান ও মানের কথা তাক্বরীরের মাধ্যমে ও লেখনির মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। তাঁর লিখিত প্রতিটি কিতাবে কোথাও না কোথাও শানে রেসালতের কথা লিখেছেন এবং বাতেলদের ভ্রান্ত মতবাদ খন্ডন করে তাদের মনে কম্পন সৃষ্টি করে তাদের বিভ্রান্তকর মতবাদে আগুন লাগিয়ে দিয়েছেন।

প্রিয় নবীর হাদীস শরীফ মোতাবেক ইজমায়ে ওলামায়ে উম্মতেরা বর্ণনা করেছেন যে, মুজাদ্দেদের জন্য শর্ত হচ্ছে তিনি এক শতাব্দীর শেষে পৃথিবীতে আবির্ভুত হবেন এবং অপর শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত জীবিত থেকে ইসলামের খেদমত করবেন। তার ইলেম ও ফযীলতের কথা সবার মুখে মুখে চর্চা হবে। সুন্নাতকে পুনরায় জীবিত করা, বিদায়াতকে ধ্বংস করা এবং দ্বীনি খেদমতের দ্বারা উম্মতে মুসলিমা উপকৃত হবেন। সুতরাং যে আলেম শতাব্দীর শেষ পায়নি অথবা পেয়েছে কিন্তু দ্বীনি খেদ্‌মত আঞ্জাম দেয়ার ক্ষেত্রে সুখ্যাতি অর্জন করেনি তিনি মুজাদ্দেদের তালিকাভুক্ত হবেন না।

ওলামায়ে কেরামের বর্ণনা মোতাবেক মুজাদ্দেদের তালিকা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো ঃ

১. প্রথম শতাব্দীর মুজাদ্দেদ হলেন, খলিফায়ে রাশেদ হযরত ওমর বিন আবদুল আজিজ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) জন্ম- ৯ হিজরী ইন্তেকাল ১০১ হিজরী।
উপরোক্ত শর্তালিপি অনুসারে তাকে দ্বিতীয় শতাব্দীর মুজাদ্দেদ বলা প্রয়োজন। কিন্তু ওলামায়ে উম্মতের ঐক্যমত অনুযায়ী তাকে প্রথম শতাব্দীর মুজাদ্দেদ বলা হয়েছে।

২. দ্বিতীয় শতাব্দীর মুজাদ্দেদ হলেন, ক) সৈয়্যদুনা ইমাম শাফিয়ী ও খ) সৈয়্যদুনা ইমাম হাসান বিন যিয়াদ (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা)

৩. তৃতীয় শতাব্দীর মুজাদ্দেদ হলেন ক) কাজী আবুল আব্বাস বিন শারীহ শাফিয়ী খ) ইমাম আবুল হাসান আশয়ারী গ) এবং ইমাম মুহাম্মদ বিন বাযারির তিবুরি (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)

৪. চতুর্থ শতাব্দীর মুজাদ্দেদ হচ্ছেন ক) ইমাম আবু বকর বিন বাকিল্লানী ও খ) ইমাম আবু হামেদ আসফারানী (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা)

৫. পঞ্চম শতাব্দীর মুজাদ্দেদ হচ্ছেন- ক) কাজী ফখরুদ্দীন ও খ) ইমাম মুহাম্মদ বিন গাযযালী (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা)

৬. ষষ্ঠ শতাব্দীর মুজাদ্দেদ হলেন ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)

৭. সপ্তম শতাব্দীর মুজাদ্দেদ হলেন- ইমাম তক্বীউদ্দীন বিন দাক্বীকুল ঈদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু)

৮. অষ্টম শতাব্দীর মুজাদ্দেদ হলেন- ক) ইমাম জয়নুদ্দীন ইরাক্বী খ) আল্লামা শামশুদ্দীন জাযায়ারী ও গ) আল্লামা ইমাম সিরাজুদ্দীন বলক্বীনী (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)

৯. নবম শতাব্দীর মুজাদ্দেদ হলেন- ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ুতী ও খ) আল্লামা শামশুদ্দীন সাখাভী (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা)

১০. দশম শতাব্দীর মুজাদ্দেদ হলেন- ক) ইমাম শাহাবুদ্দীন রামলী ও খ) মুল্লা আলী ক্বারী (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা)

১১. একাদশ শতাব্দীর মুজাদ্দেদ হলেন- ক) ইমাম রাব্বানী মুজাদ্দেদে আলফে সানী শেখ আহমদ সেরহিন্দী খ) মুহাক্কিক্কে জমান শেখ আবদুল হক মুহাদ্দেসে দেহলভী ও গ) আল্লামা মীর আবদুল ওয়াহিদ বিলগ্রামী সবয়ে সানাবীল শরীফের লেখক (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)

১২. দ্বাদশ শতাব্দীর মুজাদ্দেদ হলেন- ক) শাহেনশাহে হিন্দুস্তান মহিউদ্দীন আওরঙ্গজেব বাদশা আলমগীর খ) শাহ কালিমুল্লাহ চিশতী দেহলভী গ) হযরত শেখ গোলাম নক্বশবন্দী লক্ষ্মৌভী ও ঘ) আল্লামা কাজী মুহিবুল্লাহ বিহারী (রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমায়ীন)

কতিপয় ওলামায়ে কেরাম হযরত শাহ ওয়ালি উল্লাহ সাহেব মুহাদ্দেসে দেহলভী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কেও দ্বাদশ শতাব্দীর মুজাদ্দেদ বলেছেন। কিন্তু ওলামায়ে উম্মত মুজাদ্দেদ হওয়ার জন্য যে শর্তারোপ করেছেন সে অনুসারে তিনি মুজাদ্দেদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হবেন না। তাঁর জন্ম হলো ১১১৪ হিজরী। ওফাত হলো- ১১৭৬ হিজরী। তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞান, মান-মর্যাদায় পৃথিবীব্যাপী সুখ্যাতি অর্জন করলেও তিনি না কোন শতাব্দীর শেষ পেয়েছেন না কোন শতাব্দীর শুরু পেয়েছেন।

কিছু কিছু ওহাবীরা সৈয়্যদ আহমদ রায় ব্রেলভী ও তার মুরীদ মৌলভী ইসমাইল দেহলভীকেও মুজাদ্দেদ বলেছে। অথচ পৃথিবীর সকলেই জানে যে, এ দু'জন পীর-মুরীদ ইসলামী খেদমতের নাম দিয়ে ফিতনা ফ্যাসাদের বীজ বপন করেছে, মুসলমানদের আক্বীদা পরিবর্তন করেছে। সৌদি আরবে গিয়ে মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদীর অনুসারীদের সাথে সাক্ষাত করে ওহাবী ফিতনা আমদানী করে হিন্দুস্থানের জমিনে প্রচার করেছে। সুতরাং এরা কিভাবে মুজাদ্দেদ হবে? আর তাদের জন্ম ও মৃত্যুর সাল বের করলেও তারা মুজাদ্দেদের জন্য যে শর্ত রয়েছে তার আওতায় পড়বেনা। কারণ সৈয়্যদ আহমদ রায় ব্রেলভীর জন্ম হলো ১২০১ হিজরী আর ইসমাইল দেহলভীর জন্ম হলো- ১১৯৩ হিজরী। তাদের মৃত্যু হলো- ১২৪৬ হিজরী। সুতরাং তাদের জন্ম-মৃত্যু সনের কথা চিন্তা করলে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, সৈয়্যদ আহমদ রায় ব্রেলভী ১২০০ শতাব্দী পায়নি আর ইসমাইল দেহলভী ১২০০ শতাব্দী পেলেও তখন তার বয়স হয়েছিল মাত্র ৭ বছর। অতএব তারা কখনো ১২০০ শতাব্দীর মুজাদ্দেদ হতে পারে না।

এ ব্যাপারে ওহাবীদের সবচেয়ে বড় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি মাওলানা আবদুল হাই লক্ষ্মৌভীর ফয়সালাও জেনে রাখা দরকার। মাওলানা আবদুল হাই এর ফতোয়ার কিতাব "মাজমুয়ায়ে ফতোয়ায়ে আবদুল হাই" দ্বিতীয় খন্ডের ১৫১ পৃষ্ঠায় শেখুল ইসলাম বদরুদ্দীন ও ইমাম সুয়ুতীর উদ্ধৃতি সংকলন করার পর লিখেন-

ازیں عبارات واضح شد کہ سید احمد بریلوی کہ ولادت شان در سنہ ۱۲۰۱ ھ بود و سرید شان مولوی اسماعیل دہلوی وغیرہ در مصادیق حدیث ان اللہ یبعث لہذہ امۃ علی رأس کل مائۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا داخل نیستند

অর্থ: ওলামায়ে ইসলামের ঐ উদ্ধৃতি দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, সৈয়্যদ আহমদ ব্রেলভী যার জন্ম ১২০১ হিজরী ছিল আর তার মুরীদ মৌলভী ইসমাইল দেহলভী প্রমুখ

ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی رأس کل مائۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا

এ হাদীস শরীফের বর্ণনা মোতাবেক মুজাদ্দেদের অন্তর্ভুক্ত নয়।
যার দ্বারা পরিস্কারভাবে বুঝা যায় উল্লেখিত ওহাবী ফিতনা প্রচারকদ্বয় মুজাদ্দেদ নয়।

১৩. ত্রয়োদশ শতাব্দীর মুজাদ্দেদ হচ্ছেন- হযরত শাহ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দেসে দেহলভী সাহেবের সাহেবজাদা হযরত মাওলানা শাহ আবদুল আজিজ মুহাদ্দেসে দেহলভী সাহেব। যার জন্ম- ১১৫৯ হিজরী ওফাত ১২৩৯ হিজরী। তিনি দ্বাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ইলম, ফযল, জুহুদ ও তাক্বওয়ায় দিল্লীর চতুর্দিকে সুখ্যাতি অর্জন করেন এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীর শুরুতে তাঁর উলুম, ফযল ও কামালিয়াত গোটা হিন্দুস্থানে ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর গোটা জীবন দ্বীনি খেদমত, দরস, তাদরীস, ফতোয়া প্রদান ও কিতাব রচনায় অতিবাহিত হয়। সুন্নাতের পুনরায় জীবন দান ও বদমাযহাবের খন্ডন তাঁর বিশেষ কাজছিল। তাঁর মধ্যে হক্ব ও বাতেলের পরখ করার গুণ খুবই লক্ষ্যণীয় ছিল। যার প্রমাণ তাঁর কিতাব তোহফায়ে এসনা আশারিয়া। এ জলীলুল ক্বদর, আজীমুশ শান কিতাবের মধ্যে তিনি অসংখ্য দলিলাদী দ্বারা রাফেজী মাযহাবের চামড়া উপড়ে ফেলে তাদের হাড্ডিকে সুরমা বানিয়ে মাংসকে কিমা বানিয়েছেন।

১৪. চতুর্দশ শতাব্দীর জলীলুল ক্বদর মুজাদ্দেদ ঃ হাদীস শরীফের ঘোষণা ও ওলামায়ে ইসলামের বর্ণিত উসুল মোতাবেক যদি আমরা দেখি চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দেদ কে? তাহলে আমরা এমন এক মহান ব্যক্তিকে পাব যিনি তাঁর মুজাদ্দেদিয়্যত এর শান দ্বারা সমস্ত বাতেলের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়েছেন। আরব থেকে আজম পর্যন্ত যার খেদমতে দ্বীনের পতাকা উড্ডীন রয়েছে। যার আগমনে বেদআতের অবসান ঘটেছে। যাকে আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় হাবীবের সাচ্চা ওয়ারেস করে ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষের দিকে হিন্দুস্থানের জমিনে প্রেরণ করেছেন। তিনি হলেন আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা ফাযেলে ব্রেলভী। যার জন্ম- ১০ শাওয়াল ১২৭২ হিজরী এবং ওফাত ২৫ সফর ১৩৪০ হিজরী। তিনি ত্রয়োদশ শতাব্দীর আটাশ বছর দু'মাস বিশ দিন পেয়েছেন। এ সময় ব্যাপী তার উলুম, ফুনুন, দরস, তাদরীস, তাসনীফ, তালিফ, ওয়াজ ও নসীহত ভারত উপমহাদেশ থেকে শুরু করে হারামাইনে শারীফাইন পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে তিনি চতুর্দশ শতাব্দীর উনচল্লিশ বছর একমাস পচিশ দিন পেয়েছেন। এ মহান অলিয়ে কামেল তাঁর কামালিয়্যাতের পূর্ণতা লাভ করে ইসলামের এমন খেদমত করেছেন যে, পৃথিবীর পশ্চিম থেকে পূর্ব পর্যন্ত প্রতিটি আলেম তাঁর লিখিত সহস্রাধিক বই-পুস্তক দ্বারা আজ পর্যন্ত লাভবান হচ্ছেন এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত লাভবান হবেন। তিনি তাঁর প্রতিটি লেখায় ইশক্বে রাসূলের কথা লিখেছেন। তাঁর প্রতিটি ওয়াজ ও নসীহতে ইশক্বে রাসূলের কথা বলেছেন। বিশেষতঃ তিনি দুটি মহান জাতে পাকের প্রেমের আগুনে বিদগ্ধ ছিলেন। একজন হলেন, তাজেদারে কাউনাইন সরকারে মদীনা

সুরুরে ক্বলবওসীনা আলেমে মা কানা ওয়ামা ইয়াকুন রাসূলে আকরাম নূরে মুজাসমাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম, আরেকজন হলেন, পীরানে পীর দস্তগীর মাহবুবে ছোবহানী কুতুবে রাব্বানী গাউছে ছমদানী মানবায়ে ফুয়ুজাতে ইয়াজদানী হুজুর পীর মীর মুহিউদ্দীন আবদুল কাদের জিলানী আল হাসানী ওয়াল হোসাইনী রাদিয়াল্লাহু আনহু।

আলা হযরত মুজাদ্দেদ হিসেবে প্রকাশ হওয়ার কাহিনী ঃ

আলা হযরত কেবলার ফয়জানে মুজাদ্দেদীয়্যাতের প্রকাশ ১৩০১ হিজরীতে শুরু হয়েছে। আলা হযরত কেবলার ভাতীজা হযরত মাওলানা হাসনাইন রেজা খান সাহেব ঘটনার বিবরণে বর্ণনা করেন, আমার চাচা মৌলভী মুহাম্মদ খান ওরফে নত্তন খান সওদাগরান মহল্লার পুরাতন বাসিন্দা ছিলেন। বংশীয় সূত্রে জমিদার ছিলেন। আলা হযরত কেবলার বাল্য সাথী ছিলেন। তবে বয়সের দিক দিয়ে আলা হযরত কেবলা থেকে এক বছরের বড়ছিলেন। তিনি ছোট কাল থেকে বৃদ্ধ কাল পর্যন্ত আলা হযরত কেবলার সংস্রবেই ছিলেন। প্রায় সফরে ও মুকীমে আলা হযরতের সাথেই থাকতেন। ভাল আলেম ছিলেন। আলা হযরত কেবলা তাকে নত্তন ভাইজান বলে সম্বোধন করতেন। বয়সে তাঁর থেকে এক বছর বড় হওয়ার কারণে তার সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। হযরত মাওলানা হাসনাইন রেজা বর্ণনা করেন, আমি তাকে আলা হযরত কেবলার বৈঠকে আদবসহকারে চুপচাপ বসে থাকতে দেখেছি। তিনি যখন কোন মাসয়ালা জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা করতেন তখন নিজে না করে অন্যজনের মাধ্যমে করাতেন। তার এ ঘটনা আমি দীর্ঘ দিন ধরে দেখে আসতেছি। একদিন আমি তার খেদমতে আরজ করলাম- চাচা! আলা হযরত কেবলা তো আপনার বুযুর্গির প্রতি লক্ষ্য রাখেন। আপনি এ ধরনের ভয় করেন কেন? মাসয়ালা নিজে জিজ্ঞেস না করে অন্যজনের মাধ্যমে করান কেন? তিনি উত্তরে বলেন, আমি ও আলা হযরত ছোট বেলা থেকেই এক সাথে চলাফেরা করতাম। এখনো তাঁর সাথে থাকি। তাঁর একটি আমল ছিল তিনি মাগরিবের নামাযের পর বসতেন, আমিও তাঁর মজলিসে বসতাম। আমাদের সাথে সৈয়্যদ মাহমুদ শাহ সাহেব ও অন্যান্যরা বসতেন। এভাবে প্রতিদিন বৈঠক হতো। এ বৈঠক এশারের নামায পর্যন্ত চলত। বৈঠকে বিভিন্ন ধরনের কথাবার্তা হতো, ইলমি আলোচনা হতো, দ্বীনি মাসয়ালা- মাসায়েলের আলোচনা হতো। কিন্তু যেদিন ১৩০১ হিজরীর মুহরমের চাঁদ উদিত হলো। আমরা নিয়ম মোতাবেক মাগরিবের নামাযের পর আলা হযরত কেবলা যেখানে বসতেন সেখানে বসে রইলাম। আলা হযরত প্রতিদিনের নিয়মের পরিপন্থী একটু দেরীতে তাশরীফ আনলেন। নিয়ম মোতাবেক সালাম দেয়ার পর বসলেন, উপস্থিত মানুষেরাও বসে পড়লেন। তিনি আমাকে সম্বোধন করে বললেন, নত্তন ভাইজান! আজ ১৩০১ হিজরীর চাঁদ উদিত হয়েছে। আমি বললাম হ্যাঁ আমিও দেখেছি। উপস্থিত কতিপয় লোকেরাও নতুন চাঁদ দেখার সাক্ষী দিলেন। আলা হযরত কেবলা এরশাদ ফরমালেন, ভাই সাহেব আজ থেকে তো শতাব্দী বদলে গেছে। আমিও আরজ করলাম হ্যাঁ আজ থেকে শতাব্দী বদলে গেছে। আমার খেয়াল হলো নতুন চাঁদ উদিত হওয়ার মাধ্যমে ত্রয়োদশ

শতাব্দী সমাপ্ত হয়েছে এবং চতুর্দশ শতাব্দী শুরু হয়েছে। আলা হযরত কেবলা এরশাদ ফরমালেন, এক শতাব্দীর পরিসমাপ্তি ঘটেছে এবং নতুন শতাব্দী শুরু হয়েছে। শতাব্দীর এ বিবর্তনের সাথে সাথে আমি আর আপনারাও বদলে যাওয়া দরকার। তিনি এ ঘোষণা দেয়ার পর সমাবেশের সকলেই নিরব রইলেন। সকলে স্ব-স্ব-স্থানে বসে রইলেন, কেউ কোন কিছু জিজ্ঞাসা করার সাহস পাচ্ছিল না। কিছুক্ষণ পর এক এক করে সবাই সালাম দিয়ে সমাবেশ স্থল ত্যাগ করল। প্রতিদিন আমরা সবাই বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতাম কিন্তু আজ কেউ কোন কিছু জিজ্ঞাসা করার সাহস পাচ্ছিল না, এমন কি আমিও কিছু জিজ্ঞাসা করার সাহস পাচ্ছিলাম না। সবার সাথে আমিও চলে গেলাম, ঘরে গিয়ে অনেক চিন্তা করলাম কিন্তু ঐ সময় আমার কিছুই বুঝে আসল না। এরপর দিন ফজরের নামাযের পর যখন তাঁর সামনা-সামনি হলাম তখন আমি তাঁকে দেখলাম তাঁর চেহেরায় অনেক পরিবর্তন এসেছে তাঁর চলা-ফেরা, আচরণেও অনেক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছিল। এরপর আমি কিছু বুঝতে পারলাম যে, আলা হযরত কেবলা গতকাল শতাব্দীর পরিবর্তনের সাথে তিনিও পরিবর্তন হওয়ার যে ঘোষণা দিয়েছেন তা সম্ভবত আজ দেখা যাচ্ছে। খোদার কসম! তিনি এমন পরিবর্তন হয়েছেন যে, কোথা থেকে কোথায় পৌছে গেছেন আর আমরা আগে যেখানে ছিলাম সেখানেই রয়ে গেছি। ঐ দিন আর এ দিনের মধ্যে অনেক পরিবর্তন এসে গেছে। আগের দিনগুলোতে আমরা তাঁর সাথে কথা বলতাম তাঁর থেকে মাসলা-মাসায়েল জিজ্ঞাসা করতাম কিন্তু আজ তাঁর কাছে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করা তো দূরের কথা-আলাপ করার সাহসও হচ্ছে না। তাঁর এ গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের কারণ কি? সেটা নির্ণয় করতে আমি একা বসে বসে অনেক চিন্তা করেছি, চিন্তা করার পর শুধু এতটুকু বুঝে আসল যে, ঐ দিন থেকে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে তাকে এমন পরিবর্তন করে দেয়া হয়েছে যায় ফলে তিনি অনেক উচ্চস্থানে পৌছে গেছেন আর আমরা পূর্বে যে রকম ছিলাম এখনো সেরকম রয়েছি। এরপরও আমি একা থাকলে আলা হযরত কেবলার উক্ত ঘোষণাটির কথা চিন্তা করতাম। পরিশেষ দুনিয়াবাসী যখন আলা হযরত কেবলাকে বর্তমান যুগের (১৪০০ শ- হিজরীর) মুজাদ্দিদে আজম ঘোষণা করে মুজাদ্দিদ হিসাবে আহ্বান করতে লাগলেন, তখন আমার বুঝে আসল আলা হযরত কেবলার ঘোষণাটির রহস্য। অর্থাৎ তিনি ১৩০১ অর্থাৎ ১৪০০ শতাব্দীর নতুন চাঁদ উদিত হওয়ার সাথে তাঁর এবং আমাদের মাঝে যে পরিবর্তনের ঘোষণা তিনি দিয়েছেন তা আমার স্পষ্ট বুঝে আসল যে, তিনি ১৪০০ শ হিজরীর মুজাদ্দিদে আজমের পদে অধিষ্ঠিত হতে যাচ্ছেন বিধায় পরিবর্তনের ঘোষণা দিয়েছেন। যা আমার চিন্তাকে দূর করে দিয়েছে। আর ঐ তারিখেই তাঁকে বর্তমান যুগের মুজাদ্দিদ বানানো হয়েছে এবং মুজাদ্দিদের পদ দান করা হয়েছে। উহার সাথে সাথে তাঁর শান ও মান ও তাঁর চেহেরায় এমন গাম্ভীর্যতা দান করা হয়েছে যা আমি উক্ত তারিখ তথা ১৩০১ হিজরীর নতুন চাঁদ উদিত হওয়ার তারিখ থেকে অনুভব করেছি।

হযরত মাওলানা হাসনাইন রেজা খান সাহেব বলেন, আমার এ চাচা মুহাম্মদ শাহ খান ওরফে নত্তন খান সাহেব তার যৌবনকালেই একজন বুযর্গ হযরত আলী খান সাহেবের

হাতে বায়'য়াত হয়েছেন তিনি তাঁর বার্ষিক ওরশও করতেন। তিনি যখন ইন্তেকাল ফরমালেন তখন থেকে আলা হযরত কেবলার কাছে আসা-যাওয়া করতে লাগলেন। তিনি আলা হযরত কেবলার ছোটকাল, যৌবনকাল, কিছু বৃদ্ধকাল নিজ চোখেই দেখেছেন। তিনি আলা হযরত কেবলার একনিষ্ট ভক্ত ছিলেন, তাই আলা হযরত কেবলার মুরিদানরা তাকে মূল্যায়ন করতেন। পরিশেষে যখন তার ইন্তেকাল হলো তখন আলা হযরত কেবলা বড়ই দুঃখ পেলেন।

প্রিয় পাঠকবৃন্দ! মুজাদ্দিদ হিসেবে প্রকাশ হওয়ার উল্লেখিত ঘটনাটিও আলা হযরত কেবলার অন্যতম একটি উজ্জ্বল কারামত। যেহেতু যখন ১৪০০ শ হিজরীর নতুন চাঁদ উদিত হলো তখনই তিনি ঘোষণা দিলেন আমার ও আপনাদের পরিবর্তন হওয়া উচিত অর্থাৎ ১৩০০ শ শতাব্দীর সমাপ্ত হয়ে ১৪০০ শ শতাব্দীর চাঁদ উদিত হয়ে শতাব্দীর যেভাবে পরিবর্তন হয়েছে ঐভাবে আমাদেরও পরিবর্তন হওয়া জরুরী। সুবহানাল্লাহ! ১৪০০ হিজরীর শুরুতে যে তারিখই তাকে মুজাদ্দিদের আসনে অধিষ্ঠিত করা হয়েছে ঐ তারিখই তাকে আল্লাহ ও রাসূলের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। যা জেনে তিনি ঘোষণাও করে দিয়েছেন। যদিও উপস্থিত লোকেরা তৎক্ষনাত তা বুঝতে পারেননি।

ইংরেজ ও তাদের আদালতের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন ঃ

আলা হযরত কেবলা ইংরেজ ও তাদের শাসনকে আন্তরিকভাবে ঘৃণা করতেন। ব্রিটিশ শাসনামলে ডাক টিকিটের উপর রাণী ভিক্টোরিয়ার ছবি ছিল। আলা হযরত কেবলা তাদের সবকিছুকে ঘৃণা করতেন। যার ফলে তিনি চিঠি পোষ্ট করার সময় খামের উপর ডাক টিকেট উল্টো করে লাগাতেন যাতে রাণী ভিক্টোরিয়ার মাথা নিচে থাকে। অনুরূপভাবে তিনি ইংরেজদের আদালতকেও ঘৃণা করতেন। তাঁর প্রতিজ্ঞা ছিল তিনি কখনো তাদের আদালতে যাবেন না। তিনি ইংরেজদের কোর্টকে আদালত বলতেন না বরং যারা বলতো তাদেরকে নিষেধ করতেন। তিনি যে ইংরেজ ও তাদের আদালতকে ঘৃণা করতেন এ কথা সর্বসাধারণের জানা ছিল। বাতেলরা আলা হযরতকে পেরেশান করার জন্য এটাকে একটা বড় হাতিয়ার মনে করল। কারণ তারা কলম যুদ্ধে ও তর্কযুদ্ধে আলা হযরতের কাছে বার বার পরাজয় বরণ করতেছিল। বার বার পরাজয় বরণ করার কারণে লজ্জায় ক্ষোভে মাথা উচু করে দাঁড়াতে পারছিল না। আলা হযরত কেবলা ইংরেজদের আন্তরিকভাবে ঘৃণা করতেন এটাকে বড় সুযোগ মনে করল ব্রেলীর ওহাবীরা। তারা মনে করল এ সময়ে ব্রিটিশ আদালতে মাওলানা আহমদ রেজার বিরুদ্ধে মুকাদ্দামা দায়ের করলে এর মাধ্যমে তাকে লজ্জা দেয়া যাবে। তাই প্রথমে ব্রেলীর ওহাবীরা তাদের একজন ছাত্রকে মাওলানা আহমদ রেজা বন্দী করেছেন বলে দাবী করে তার বিরুদ্ধে মুকাদ্দামা করেছিল। ঐ সময় আশ্রফ আলী থানবীর সহোদর ভাই আকবর আলী ব্রেলীর পৌর এলাকার সেক্রেটারী ছিল। সেও আলা হযরতের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মুকাদ্দামা কার্যকর করার জন্য জোর প্রচেষ্টা চালাল। আলা হযরতের হামদরদীর জন্য শুধু মুহাম্মদ ফারুকই ছিলেন যিনি ঐ সময়ে শহরের কোতোয়াল ছিলেন। তাঁর একটি কথায় আল্লাহ তায়ালা আলা হযরত কেবলাকে আদালতে

হাজিরি দেয়া থেকে মুক্তি দিলেন। যার ফলে আলা হযরত কোর্টে হাজির হওয়া ব্যতীত তাঁর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মিথ্যা মামলা থেকে রেহাই পেলেন। আর যারা উক্ত মিথ্যা মামলাটি করেছিল তারা সবাই লজ্জা পেল।

ব্রেলীর ওহাবীদের কর্তৃক আলা হযরতের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মিথ্যা মামলা থেকে আলা হযরত কেবলা মুক্তি পাওয়ার কয়েকদিন পর বদায়ুনের ওহাবীরা আলা হযরতের বিরুদ্ধে আরেকটি মিথ্যা মামলা দায়ের করল। বদায়ুনের কয়েকটি সম্মানিত খান্দান ব্যতীত সবাই উক্ত মামলায় শরীক হলো। তারা আলা হযরত কেবলাকে আদালতে হাজির করার জন্য সর্বপ্রকার কৌশল গ্রহণ করল। কিন্তু হুযূর পাক ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর সদকায় আল্লাহ তায়ালা নিজেই উহার এন্তেজাম করেন। উক্ত মামলায় বদায়ুনের ওহাবীরা শুধু আলা হযরত কেবলাকে আদালতে হাজির করার জন্য জোর প্রচেষ্টা চালালো। কিন্তু আলা হযরত কেবলা ফরমালেন, আল্লাহ তায়ালা চাইলে আহমদ রেজার জুতাও আদালতে যাবে না।

মৌলভী হাশমত আলী রেজভী সাহেব ঐ সময় ফতেহগড়ের জয়েন্ট মেজিষ্টেট ছিলেন। তিনি মুকাদ্দমার প্রথম তারিখে বদায়ুনে আসলেন। তিনি দেখলেন আলা হযরত কেবলা কাচারীতে হাজির হচ্ছেন না। আর ঘটনার বিবরণে দেখলেন মামলাটি সম্পূর্ণ মিথ্যায় সাজানো। মৌলভী হাশমত আলী সাহেবের অবসর গ্রহণের সময় হলো। তিনি বদায়ুন থেকে ফতেহগড় পৌছে অবসর গ্রহণের দরখাস্ত করলেন এবং ছুটি নিয়ে বদায়ুন এসে গেলেন। তিনি প্রথমে ওকালতী পাশ করেছেন বিদায় বদায়ুনে এসে আলা হযরতের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মিথ্যা মামলাটি পরিচালনার জন্য আলা হযরতের পক্ষ গ্রহণ করলেন। তিনি মামলাটির ব্যাপারে খুব লড়লেন। আলা হযরতের কাছে প্রথম সমন আসল এরপর আদালতের হাজির হওয়ার জন্য ওয়ারেন্ট আসল। ঐ ধারাবাহিকতা এক মাস যাবত চলল। কিন্তু আলা হযরত কেবলা ওয়ারেন্ট আসা সত্ত্বেও আদালতে হাজির হলেন না॥ উক্ত মুকাদ্দমায় আলা হযরতের সাথে যাদেরকে জড়ায়ে ছিলেন তারা হলেন যথাক্রমে- আলা হযরত কেবলার ভাই মৌলভী মুহাম্মদ রেজা খান সাহেব, আলা হযরত কেবলার বড় সাহেবজাদা মাওলানা হামেদ রেজা খান সাহেব, আলা হযরত কেবলার ছাত্র ও খলিফায়ে আজম বাহরে শরীয়তের লেখক সদরুশ শরীয়াহ মাওলানা আমজাদ আলী সাহেব। আলা হযরত কেবলার ভাগিনা হাজী শাহেদ আলী খান সাহেব। এ চারজন নিয়মিতভাবে আদালতে হাজিরি দিতে লাগলেন। মুকাদ্দমা লড়তেছিল। আলা হযরত কেবলাকে আদালতে হাজির করার জন্য প্রতিপক্ষরা জোর প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখল। জয়েন্ট মেজিষ্ট্রেট মৌলভী হাশমত আলী সাহেবের সাথে রামপুরের শাসক নবাব হামেদ খান সাহেবের সাথে খুব ভাল সম্পর্ক ছিল। তিনি নবাব সাহেবের সাথে দেখা করার উদ্দেশ্যে রামপুর গেলেন। সাক্ষাতের পর আলোচনা পর্বে মৌলভী হাশমত আলী সাহেব নবাবকে আলা হযরতের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলাটির ব্যাপারে অবহিত করলেন। নবাব সাহেব মামলাটির অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে উত্তরে মৌলভী হাশমত আলী সাহেব বললেন, এ মামলাটি হলো

কেবল আলা হযরতকে আদালতে উপস্থিত করানোর মামলা। আলা হযরত সঙ্গত কারণে আদালতে উপস্থিত হতে যাচ্ছেন না কিন্তু প্রতিপক্ষরা তাকে যে কোন মূল্যে আদালতে হাজির করাতে চাচ্ছে। মূলতঃ এটা একটা তাঁর বিরুদ্ধে সাজানো মিথ্যা মামলা। নবাব সাহেব নিজেই বললেন, গভর্ণর মার্টন সাহেবকে আমার বাড়ীতে দাওয়াত করেছি তিনি আগামী কালের পরের দিন আমার বাড়ীতে আসতেছেন। আর ব্রেলীর কমিশনার সাহেবকেও দাওয়াত দেয়া হয়েছে তিনিও আসবেন। আমি নিজেই গভর্ণর ও কমিশনারকে এ ব্যাপারে বলব। অতঃপর গভর্ণর সাহেব যখন নবাব সাহেবের ঘরে আসলো তখন নবাব সাহেব গভর্ণরকে আলা হযরতের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মুকাদ্দমাটির কাহিনী বললেন, গভর্ণর সাহেব মুকাদ্দমাটির বিবরণ শুনে প্রশ্নের দৃষ্টিতে কমিশনারের দিকে তাকালেন। কমিশনার সাহেব বললেন, মাওলানা আহমদ রেজার বিরুদ্ধে ব্রেলীতেও এ ধরনের মামলা হয়েছিল। আর ব্রেলীর সাধারণ জনগণ এ ব্যাপারে খুব ক্ষুব্ধ। সুতরাং আপনি যদি হুকুম করেন তাহলে মৌলভী আহমদ রেজাকে আদালতে হাজির হওয়ার যে ওয়ারেন্ট দেয়া হয়েছে তা থেকে তাঁকে মুক্তি দিয়ে দেব। এরপর গভর্ণর কমিশনারকে হুকুম করলেন এ মামলা থেকে আহমদ রেজাকে মুক্তি দিয়ে দেন। অনন্তর কমিশনার সাহেব ব্রেলীতে এসে ব্রেলীর কালেক্টরকে নির্দেশ দিলেন যে, মৌলভী আহমদ রেজাকে আদালতে হাজির হওয়ার যে ওয়ারেন্ট জারি করা হয়েছিল তা থেকে তাঁকে মুক্তি দিয়ে দাও। ফলে আলা হযরত বৃটিশ আদালতে হাজির হওয়া থেকে মুক্তি পেলেন। মূলত এটা আল্লাহ তায়ালার গায়েবী সাহায্য যা তিনি অন্যজনের মাধ্যমে তাঁর প্রিয়ভাজন বান্দাদেরকে করে থাকেন। এরপর বাকী চারজনের সমন ছিল। আলা হযরত কেবলা আদালতে হাজির হওয়া থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি পেয়ে গেলেন। এ খবর ছড়িয়ে পড়লে ব্রেলীর সকলেই খুশী হয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। যার ফলাফল এ হলো, প্রত্যেক মামলায় আল্লাহ তায়ালা আলা হযরতকে সাহায্য করেছেন, তিনি প্রতিটি মামলায় ইংরেজদের আদালতে হাজির হওয়া ব্যতিত জয়ী হলেন অপরদিকে তাঁর ব্যাপারে পরশ্রীকাতর দুশমনেরা লজ্জা পেল এবং মামলায় পরাজয় বরণ করল।

আদালতে যাওয়া বর্তমানে দোষের কিছু নয়। সমস্যায় পড়ে বাধ্য হয়ে বড় বড় রাজনীতিবিদ, শাসক, সম্মানী ব্যক্তি সবাই আদালতে যায়। আলা হযরত কেবলা ইংরেজদেরকে আন্তরিকভাবে ঘৃণা করতেন তাদের আদালতকে আদালত বলতেন না, যারা বলতেন তাদেরকে নিষেধ করতেন। তিনি অঙ্গীকার করে বলেছিলেন, আল্লাহ চাহেন তো আহমদ রেজার জুতাও ইংরেজদের আদালতে যাবে না। তাঁর এ অঙ্গীকারকে মহান রাব্বুল আলামীন রক্ষা করেছেন এবং দুনিয়াবাসীকে দেখায়ে দিয়েছেন, আহমদ রেজা খান আমার (আল্লাহর) ঐ লক্ষ কোটি বান্দাদের মধ্যে অন্যতম যাদের ব্যাপারে আমার পেয়ারা হাবীব ঘোষণা দিয়েছেন "লাও আক্বাসামা আলাল্লাহে লাআবাররাহু" অর্থাৎ খোদা তায়ালার ভরসায় যদি এরা কসম করেন তাহলে খোদা তায়ালা তা পূর্ণ করেন। সুতরাং ঘটনা তাই হলো যে, আলা হযরতের জুতাও ইংরেজদের আদালতে না গিয়ে মুকাদ্দমা খারিজ হয়ে গেল।

উপরোক্ত বিবরণ দ্বারা স্পষ্টভাবে বুঝা যায় আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা খান ফাযেলে ব্রেলভী রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন সম্পূর্ণ ইংরেজ বিরোধী। তিনি তাদের আদালতকে আদালত বলতেন না বরং যারা বলতেন তিনি তাদেরকে ইংরেজদের আদালতকে আদালত বলতে নিষেধ করতেন। এটাকে সুযোগ মনে করে ইংরেজদের দালাল ওহাবীরা ইংরেজদের আদালতে আলা হযরতের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করেছিল কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় বান্দা আলা হযরতকে জয়ী করলেন এবং ইংরেজদের দালাল ওহাবীরা পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে ঘরে ফিরে গেলো। আলা হযরত কেবলা ইংরেজদের দালালী করেছে এমন কোন প্রমাণ ইতিহাসে পাওয়া যায়না। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো যারা প্রকৃত ইংরেজদের দালালী করলো তারা তাদের দালালীকে গোপন করার জন্য আলা হযরতকে ইংরেজদের দালাল নামে আখ্যায়িত করলো। যার দৃষ্টান্ত এরকম হলো যে, চোর চুরি করল আবার ওই চোর তার চুরিকে গোপন করার জন্য ঘরের মালিককে চোর সাজালো। প্রবাদে আছে চোরের মায়ের বড় গলা। নিজের চুরিকে ধামাচাপা দেয়ার জন্য চুরির অপবাদটি অপরের ঘাড়ে তুলে দিল ওদরপিন্ডি বোধের ঘাড়ের মতো। পাক ভারতের অবিকৃত ইতিহাসের চুলচেড়া বিশ্লেষণ করলে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ওহাবী দেওবন্দী, কাদীয়ানীরা ইংরেজদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দালাল ছিল। তারা বিভিন্ন সময় ইংরেজদের থেকে আর্থিক সাহায্য নিয়েছে। যেমন- ওহাবীদের কথিত হাকীমুল উম্মত, ওহাবীদের প্রথম সারির দেওবন্দী নেতা আশ্রফ আলী থানবী। ওহাবীরা দাবী করে তিনি নাকি ব্রিটিশ বিরোধী ছিলেন। কিন্তু বাস্তব ঘটনা সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি ব্রিটিশ বিরোধী ছিলেন না বরং তিনি ব্রিটিশের ঘনিষ্ট বন্ধু ছিলেন। তিনি ব্রিটিশ সরকার থেকে নিয়মিত মাসিক বেতন পেতেন ৬০০ টাকা। এ টাকা দিয়ে তিনি হিফজুল ঈমান, বেহেস্তী জেওর নামক ঈমান বিধ্বংসী কিতাবাদী ছাপিয়েছেন। ব্রিটিশ সরকার এভাবে আর্থিক সাহায্য দিয়ে ভারতে ওহাবী আক্বীদা প্রচার করার ব্যবস্থা করে সফল হয়েছিল। যার নেপথ্যে ব্রিটিশ সরকারের স্বার্থ ছিল ওহাবী আক্বীদা প্রচারের মাধ্যমে মুসলমানদের ঐক্যতা নষ্ট করে, তাদের মাঝে ফাটল সৃষ্টি করা। মুসলমানদের মাঝে দ্বন্দ সৃষ্টি করা, যাতে তারা ব্রিটিশ সরকারের বিরোধীতা না করে মুসলমানে-মুসলমানে দ্বন্দে লিপ্ত হয়। যার ফলশ্রুতিতে আজ পাক ভারত উপমহাদেশে মুসলমানেরা দ্বিধাবিভক্ত ওহাবী ও সুন্নী। তবে মজার বিষয় হল থানবী সাহেবের বেতন গ্রহণের ব্যাপারটি ছিল ওপেন সিক্রেট। তার দলের লোকই অসতর্ক মুহূর্তে তা ফাঁস করে দিয়েছে। যেমন, জমিয়াতুল ওলামা হিন্দের প্রধান মাওলানা হিফজুর রহমানের উদ্দেশ্যে ক্ষোভের সাথে মাওলানা শিব্বির আহমদ ওসমানী বলেছিলেন, "দেখুন! হযরত মাওলানা আশ্রফ আলী থানবী সাহেব আমাদের এবং আপনার সর্বজন স্বীকৃত বুযুর্গ ও নেতা ছিলেন। তার সম্পর্কে অনেক মানুষকে বলতে শোনা গিয়েছে যে, (ব্রিটিশ) সরকারের পক্ষ থেকে তাকে মাসে ৬০০ টাকা প্রদান করা হতো" (উদ্ধৃতি ঃ মুকালামাতুস সাদরাইন, পৃষ্ঠা- ১১ এবং তাবলীগী জামাতের গোপন রহস্য)

থানবী সাহেবের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ কোন সুন্নীদের পক্ষ থেকে করা হয়নি। নিজেদের লোকই তা ফাঁস করে দিয়েছেন। নতুবা আমরা এ তত্ত্ব পেতাম না। কেউ এ কথা বলতে পারবে না যে, ব্রিটিশ সরকার থানবী সাহেবের ভক্ত ও মুরীদ ছিলো, তাই তাকে প্রতি মাসে নজরানা হিসাবে ৬০০ টাকা প্রদান করতো। এ কথা সকলেরই জানা আছে যে, প্রতি মাসে নজরানা দেয়া হয় না, দেয়া হয় বেতন। ব্রিটিশ সরকারের তরফ থেকে নিয়মিত মাসিক ৬০০ টাকা। যা দ্বারা পরিস্কার বুঝা যায়, এটা ছিল বেতন, নজরানা নয়। তাই এ ধারণা করা কি ভুল হবে যে, ব্রিটিশ সরকারের সাথে থানবী সাহেবের নিশ্চয় কোন গোপন চুক্তি ছিল যার বিনিময়ে তাকে এ নিয়মিত বেতন দেয়া হতো। পাকিস্তান আমলের ১ টাকা বর্তমানে ১০০ টাকার সমমান ছিল। আর ব্রিটিশ আমলের ৬০০ টাকার বর্তমান মূল্য কত হবে তা সুহৃদ পাঠকরাই চিন্তা করুন। (আনুমানিক ছয় লক্ষ)। মাওলানা শিব্বির আহমদ ওসমানীর উপরোক্ত বক্তব্য দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হওয়া যায় যে, মাওলানা আশ্রফ আলী থানবী সাহেব ছিলেন ব্রিটিশ সরকারের দালাল। যে সমস্ত ওহাবীরা আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজাকে বৃটিশের দালাল বলেন তারা কি এমন কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ দেখাতে পারবেন যে, আলা হযরত ব্রিটিশ সরকার থেকে আর্থিক কোন সাহায্য নিয়েছেন? কখনো পারবেন না। নিজেদের দালালীকে গোপন করার জন্য অকৃত্রিম আশেক্বে রাসূল আলা হযরতকে অহেতুক ব্রিটিশের দালাল বলে মুসলমানদেরকে কেন বিভ্রান্ত করছেন? সুতরাং সাবধান হয়ে যান।

ওহাবী, দেওবন্দী, কাদিয়ানী, আহলে কোরআন ও তাবলিগী জামাতের লোকেরাই যে ব্রিটিশের দালালী করেছে এর অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে।

মুসলিম শরীফে রয়েছে, হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এরশাদ করেছেন যে, শেষ জমানায় অনেক মিথ্যুক দাজ্জাল আত্মপ্রকাশ করবে। তারা তোমাদের নিকট এমন কথা বলবে যা তোমরা এবং তোমাদের পূর্বপুরুষগণ শুনে নাই। এদের নিকট থেকে তোমরা দূরে থাক এবং তাদেরকে তোমাদের থেকে দূরে রাখ। যাতে তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করতে না পারে এবং তোমাদেরকে ফিতনা-ফ্যাসাদে ফেলতে না পারে। (মুসলিম শরীফ)

মুসলিম শরীফের উক্ত হাদীস শরীফ দ্বারা বুঝা যায়, শেষ জমানায় এমন কতগুলো মিথ্যুক দাজ্জাল বের হবে যারা এমন কথা বলবে যা তোমরা ও তোমাদের পূর্বপুরুষরা পূর্বে শুনে নাই। এ জমানাটা হলো শেষ জমানা। রাসূলে পাকের অমীয় বাণী অনুসারে এ জমানায় অনেক মিথ্যুক দাজ্জাল বের হয়েছে। ঐ মিথ্যুক দাজ্জালদের মাঝে অন্যতম একজন হলো আমাদের দেশের কুখ্যাত লেখক মিথ্যুক দাজ্জাল মাওলানা নুরুল ইসলাম ওলীপুরী। সে নতুনভাবে খ্রীষ্টানদের এজেন্সী নিয়ে "সুন্নী নামের অন্তরালে" নামক বিভ্রান্ত কর একটি চটি পুস্তিকা লিখে তাজ লাইব্রেরী, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া থেকে প্রকাশ করল। যার মধ্যে সে এমন কতগুলো জগণ্য লিখা লিখল যা পড়লে শরীরের লোম খাড়া হয়ে যায়। সে উক্ত পুস্তিকায় এমন কতগুলো কথা লিখল যা আমরা ও আমাদের পূর্বপুরুষরা কখনো শুনেনি।

তার লিখিত উক্ত চটি পুস্তিকার কিছু কথা পাঠকদের জানার জন্য পেশ করে তাকে জনাদালতের কাঠগড়ায় দাড় করালাম যাতে জনগণ তাঁর কথাগুলো শুনে তার বিচার করতে পারে।

উল্লেখ্য যে, তার আরেকটি পুস্তক বের হয়েছে যার নাম হলো কার ফতোয়ায় কে কাফের। এটাও কুফুরি আক্বীদায় ভরপুর। খুশীর খবর হল তার জগণ্য আকীদায় ভরপুর উক্ত পুস্তিকাটির বাংলা ভাষায় খন্ডন ওহাবী দাজ্জাল ওলীপুরী নিজ ফতোয়ায় ধরাশায়ী নাম দিয়ে বের হয়েছে। বর্তমানে বিভিন্ন লাইব্রেরীতে পাওয়া যাচ্ছে সুন্নী ভাইদের প্রতি একান্ত অনুরোধ আপনারা উক্ত পুস্তিকার খন্ডনে লিখিত বইটি সংগ্রহ করে পড়ুন, তাহলে বুঝতে পারবেন তাতে কি কি আক্বীদার কথা রয়েছে।

প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এরশাদ ফরমায়েছেন, বনী ইসরাইল ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছিল আর আমার উম্মত (উম্মতে ইজাবা তথা যে উম্মত প্রিয় নবীর ডাকে সারা দিয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে) ৭৩ দলে বিভক্ত হবে তম্মধ্যে একটি দল ছাড়া সবাই জাহান্নামী হবে কেবল একটি মাত্র দল জান্নাতী হবে। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ। যে দলটি নাজাত পাবে তথা জান্নাতী হবে সে দল কোনটি? রাসূলে কারীম তদুওরে এরশাদ ফরমালেন, যে দলের মধ্যে আমি ও আমার সাহাবায়ে কেরাম থাকবে। অর্থাৎ যে দল আমার ও আমার সাহাবায়ে কেরামের আদর্শে আদর্শিত হবে। হযরত মোল্লা আলী কারী উহার ব্যাখ্যায় বলেছেন, নিঃসন্দেহে উহা হল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত। প্রতিপাদ্য বিষয় হলো- প্রিয় নবী ৭২ দল সম্বন্ধে বলেছেন, (কুল্লুহুম ফিন্নার) অর্থাৎ ৭২ দলের সবাই জাহান্নামী। এখানে গভীর ভাবার বিষয় হলো- প্রিয় নবী মুতলাক তথা শর্তমুক্তভাবে বলেছেন ৭২ দলের সবাই জাহান্নামী। উসুলে ফিকহার একটি প্রসিদ্ধ কায়েদা হল-আল মুতলাকু ইয়াজরী আলা এতলাকাকিহি, অর্থাৎ মুতলাক শর্তমুক্তভাবে জারি হবে। উসুলে ফিকহার উক্ত সূত্র মোতাবেক একথার প্রতিভাত হয় যে, ৭২ দলের সবাই চিরস্থায়ী জাহান্নামী। সুতরাং প্রিয় নবীর উক্ত মুতলাক বাণীকে মুকায়্যেদ করে একথা বলতে পারবে না যে, ৭২ দলের সবাই ক্ষণস্থায়ী জাহান্নামী। যদি কেউ এরূপ বলে তা হলে উহা হবে প্রিয় নবীর বাণীকে নিয়ে অহেতুক বাড়াবাড়ি।

দাজ্জাল কায্যাব কুখ্যাত নুরুল ইসলাম ওলীপুরী তার চটি পুস্তিকা সুন্নীনামের অন্তরালের ১৫ পৃষ্ঠায় লিখেছে কাফের হবে চিরস্থায়ী জাহান্নামী আর মুসলমান হবে ক্ষণস্থায়ী জাহান্নামী। ওলিপুরী উহার বিশ্লেষণে গিয়ে লিখেছে, আহলে সুন্নাতের আক্বীদায় বিশ্বাসী মুসলমান নামায রোজার হুকুম পালন না করলে যত বড় পাপী, নামায রোজা আদায়কারী কোন মানুষ আহলে সুন্নাতের আক্বীদায় বিশ্বাসী না হলে সে তার চেয়ে আরও বড় পাপী। আর জাহান্নামের শাস্তি যার যার পাপের পরিমাণ মত হইবে। এখানে সে বুঝাতে চেয়েছে আহলে সুন্নাতের আক্বীদায় বিশ্বাসী না হলে তারা জাহান্নামের শাস্তি একটু বেশী পাবে। অর্থাৎ আহলে সুন্নাতের আক্বীদায় বিশ্বাসী মুসলমান আমলে ত্রুটি থাকার কারণে জাহান্নামের শাস্তি একটু কম পাবে আর আহলে সুন্নাতের আক্বীদায় বিশ্বাসী না হলে আক্বীদার ত্রুটির

কারণে জাহান্নামের শাস্তি বেশী পাবে তারা চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে না। উক্ত দাবী দ্বারা একথা বুঝা যায় যে, ৭২ দলের কেউ চিরস্থায়ী জাহান্নামী নয় বরং তারা নির্ধারিত সময়ের জন্য জাহান্নামী। অথচ কোরান, হাদীস, ইজমায়ে উম্মত ও আক্বীদার কিতাবে স্পষ্ট লিখা আছে যে, যদি কেউ ঈমান গ্রহণের পর ঈমান বিধ্বংসী কোন আক্বীদা পোষণ করে ঈমান থেকে ফিরে যায় তাহলে সে মুরতাদ হয়ে যাবে। আর ইসলামী হুকুমত জারী থাকলে মুরতেদের হুকুম হবে তাকে ক্বতল করা। আর আল্লাহ ও রাসূলের শানে অবমাননাকারী কাফির হয়ে যাবে এবং কাফিরের শাস্তি হলো চিরস্থায়ী জাহান্নাম। সুতরাং ৭২ দলের লোকেরা আল্লাহ এবং রাসূলের শানে অবমাননা করার কারণে তাদের আক্বীদা কুফরিতে পৌছে বিধায় তাদের সবাই চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত বহির্ভুত ৭২ ফের্কার লোকেরা আল্লাহ ও রাসূলের শানে আঘাত হানার কারণে কাফের হয়ে যাবে। (এ ব্যাপারে কোরান, হাদীস ও আক্বীদার কিতাবের দলীল পেশ করে) দাজ্জাল ওলীপুরীর ঈমান বিধ্বংসী কথাগুলো উপস্থাপন করছি।

দাজ্জাল ওলীপুরী তার উক্ত ঈমান বিধ্বংসী পুস্তিকার ১৯ পৃষ্ঠায় ওহাবী কারা এর পরিচয় প্রদান করতে গিয়ে লিখেছে ১৭০৩ সনে আরবের নজদ নামক স্থানের বাসিন্দা তমীম গোত্রে এক প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম ছিল মুহাম্মদ। সমাজে নানা রকম শিরক, বেদয়াত ও কুসংস্কার প্রচলিত ছিল। আবদুল ওয়াহহাবের পুত্র মুহাম্মদ এ সকল গর্হিত কাজের বিরুদ্ধে এক জোরদার সংস্কার আন্দোলন গড়ে তোলেন। এমতাবস্থায় তার বিরুদ্ধবাদীরা আন্দোলনটির নাম দেয় ওহাবী আন্দোলন। কিন্তু আন্দোলনকারী নিজদিগকে মুয়াহহেদীন এবং সালাফিয়া নামে অভিহিত করেন। উল্লেখ্য যে, মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহহাব নজদী ওহাবী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা ছিল। তার পূর্ব পুরুষদের কুকৃতী ও নজদ সম্পর্কে পেয়ারা রাসূলের বাণী এবং মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহহাব নজদীর সংক্ষিপ্ত কুকৃতী পাঠকদের জ্ঞাতার্থে পরে আলোচনা করব।

দাজ্জাল ওলীপুরী ওহাবী কারা এর পরিচয় ধরেছে তা হল, প্রদান করতে গিয়ে মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহহাবের যে পরিচয় তুলে ধরেছে সে দ্বিতীয় লাইনে মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহহাব নজদীকে প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিরূপে অভিহিত করেছে। একই লাইনে সে মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহহাবের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনার্থে তার জন্য "তাঁর" উপরে চন্দ্রবিন্দু ব্যবহার করে সম্মানসূচক শব্দ ব্যবহার করেছে। একই লাইনে তার পিতার পরিচয় দিতে গিয়ে (তাঁর) উপরে চন্দ্রবিন্দু দিয়ে সম্মানসূচক শব্দ ব্যবহার করেছে। তৃতীয় লাইনে ও (তাঁর) উপরে চন্দ্রবিন্দু দিয়ে সম্মান সূচক শব্দ ব্যবহার করেছে। পঞ্চম লাইনে মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহহাবকে শিরক, বেদয়াত ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে একজন জোরদার সংস্কার আন্দোলক হিসেবে আখ্যায়িত করেছে।

দাজ্জাল ওলীপুরী ওহাবী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহহাবের জন্য যতরকম সম্মানসূচক শব্দ হতে পারে সবই ব্যবহার করেছে। দাজ্জাল ওলীপুরী তার

পুস্তিকার ১৯ পৃষ্ঠার তৃতীয় প্যারাতে গিয়ে নিজের দালালীকে লুকানোর জন্য ওহাবী আন্দোলনের সাথে উপমহাদেশের কোন ব্যক্তি বা দলের সাথে তার কোনই সম্পর্ক নেই বলে উল্লেখ করেছে।

এখন দাজ্জাল ওলীপুরীর লিখাটি পড়ে স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন জাগে যে, সে যদি মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহহাব তথা ওহাবী আন্দোলনের প্রতি দুর্বল না হয়, ওহাবী আন্দোলনের সাথে তার কোন সম্পর্ক বা সম্পৃক্ততা না থাকে তাহলে সে প্রথমে মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহহাব নজদীকে একজন প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি, শিরক, বেদয়াত ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে একজন জোরদার আন্দোলক হিসেবে আখ্যায়িত করল কেন? এর উত্তরে আসবে নিশ্চয় দাজ্জাল ওলীপুরী ওহাবী আন্দোলনের প্রতি দুর্বল, ওহাবী আন্দোলনের সাথে তার নিগূঢ় সম্পর্ক রয়েছে। যার বিকাশার্থে সে তার মুরব্বী সৈয়্যদ আহমদ রায় ব্রেলভী, ইসমাইল দেহলভী, আশ্রফ আলী থানবী, রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী কাশেম নানুতবীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে ইংরেজদের নতুন এজেন্সী নিয়ে তাদের আর্থিক সাহায্যে সুন্নী নামের অন্তরালে নামক ঈমান বিধ্বংসী পুস্তিকা বের করে নবীন দালালীতে নেমেছে। যদি তা না হয় তাহলে সে এরূপ করল কেন? বুঝা গেল দাজ্জাল ওলীপুরী ইহুদী-নাসারাদের একজন বাংলাদেশীয় নতুন দালাল।

প্রিয় মুসলিম ভাইয়েরা আপনারা এ দাজ্জাল ওলীপুরী থেকে সতর্কতা অবলম্বন করুন। মনে রাখবেন! এ দাজ্জালের ফাঁদে পড়বেন তাহলে ঈমান হারাবেন।

দাজ্জাল ওলীপুরী তার লিখিত সুন্নী নামের অন্তরালে পুস্তিকাটির ১৯ পৃষ্ঠার শেষ প্যারাতে একটি প্রশ্ন করে উহার উত্তর দিলেন। প্রশ্নটি নিম্নরূপ-

প্রশ্ন ঃ তবে যে, রেজভী সাহেবের বক্তৃতা বিবৃতি ও বই পুস্তকে পাওয়া যায় যে, ভারতের সৈয়্যদ আহমদ ব্রেলভী ইসমাইল শহীদ এবং ওলামায়ে দেওবন্দ আরবের মুহাম্মদের নিকট থেকে ওহাবী মতবাদ গ্রহণ করতঃ উপমহাদেশেও ওয়াহাবী আন্দোলন চালিয়েছিলেন একথা কি ঠিক নয়? এটা ছিল তার প্রশ্ন। সে উক্ত প্রশ্নের উত্তরে বলল-

উত্তর ঃ এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা অপবাদ। কারণ প্রথমত ঃ মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহহাব ১৭৮৭ সনে ইন্তেকাল করেন। আর উপমহাদেশীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের বীর সেনানী হযরত মাওলানা সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী ১৭৮৬ সনে অর্থাৎ মুহাম্মদের ইন্তেকালের মাত্র এক বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণই করেন। তাই মুহাম্মদের কাছ থেকে হযরত ব্রেলভী ওয়াহাবী আন্দোলন গ্রহণের সুযোগটা পেলেন কোথায়? দ্বিতীয়ত ঃ হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদ ১৮২২-২৩ সনে অর্থাৎ মুহাম্মদের ইন্তেকালের প্রায় দুই যুগ পরে আরব সফরে গমণ করেন। তাই তিনি তার সাথে স্বাক্ষাতের সুযোগ পেলেন কোথায়? তৃতীয়ত ঃ মুহাম্মদের বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকে যে, তিনি মাযহাব মানতেন না। পক্ষান্তরে সৈয়দ আহমদ শহীদ ছিলেন হানাফী মাযহাবের একজন বিশিষ্ট অনুসারী। চতুর্থত ঃ মুহাম্মদ নাকি পীর মুরিদীকে বেদায়াত বলতেন। পক্ষান্তরে হযরত শহীদ ব্রেলভী নিজেই লক্ষ লক্ষ মুরিদানের পীর ছিলেন। পঞ্চমত ঃ মুহাম্মদ শিক্ষা-দীক্ষা গ্রহণ করেন আরব দেশে। পক্ষান্তরে, শহীদ

ব্রেলভী উপমহাদেশে শিক্ষা-দীক্ষাপ্রাপ্ত। তদুপরি হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদ আরব সফরের পূর্বেই উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের কর্মসূচী গ্রহণ করেন। সুতরাং তার পক্ষে আরব গমণের পর ওয়াহাবী আন্দোলনের কর্মসূচী নিয়ে উপমহাদেশে আসার প্রয়োজনটা কি ছিল?

বাকী রইল হযরত মাওলানা ইসমাইল শহীদ ও ওলামায়ে দেওবন্দের কথা। হযরত মাওলানা ইসমাইল শহীদ ছিলেন হযরত মাওলানা সৈয়দ আহমদ শহীদের ঘনিষ্টতম শিষ্য এবং তার জেহাদী আন্দোলনের প্রধান সহকর্মী। তারা উভয়ই ১৮৩১ সনে পাঞ্জাবের বালাকোট প্রান্তরে ইংরেজ সরকারের পক্ষপাতী শিখ সেনাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জেহাদ পরিচালনা করেন। শিখ সেনাদের গুপ্তচর খাজিখা ছদ্মবেশে সৈয়্যদ আহমদ শহীদ এর সেনাবাহিনীতে ভর্তি হয়ে সৈয়দ সাহেবের রণকৌশল গোপন শত্রু সেনাদের কাছে ফাঁস করে দেয়। পরিণতিতে তারা উভয়েই বালাকোটের যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। সুতরাং ইসমাইল শহীদ এর সাথে ওয়াহাবী আন্দোলনের সম্পর্ক করা আর সৈয়দ আহমদ শহীদ এর সাথে সম্পর্ক করা একই কথা। আর দারুল উলুম দেওবন্দ মাদরাসার সাথে সম্পর্কিত আলেমগণকেই ওলামায়ে দেওবন্দ বলা হয়। দারুল উলুম দেওবন্দ মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৬৬ সনে। অর্থাৎ বালাকোটের শহীদদ্বয়ের শাহাদাতের আরও প্রায় দীর্ঘ দু'যুগ পর। সুতরাং তারা ওয়াহাবী আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত হওয়াতে আরও অবান্তর কথা।

প্রিয় পাঠকবৃন্দ-দাজ্জাল ওলীপুরী প্রশ্নে উল্লেখ করেছে, রেজভী সাহেবদের বক্তৃতা-বিবৃতি ও বই-পুস্তকে পাওয়া যায় যে, ভারতের সৈয়্যদ আহমদ ব্রেলভী ইসমাইল শহীদ এবং ওলামায়ে দেওবন্দ আরবের মুহাম্মদের নিকট থেকে ওয়াহাবী মতবাদ গ্রহণ করতঃ উপমহাদেশে ও ওয়াহাবী আন্দোলন চালিয়েছিলেন। সে এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছে রেজভী সাহেবদের বই পুস্তকে পাওয়া যায়। কিন্তু তার দাবীকৃত মতটি রেজভী সাহেবদের কোন বই পুস্তকে রয়েছে তার কোন রেফারেন্স উল্লেখ করেনি। এর দ্বারা এ কথা বুঝা যায় যে, সে তার দাবীতে মিথ্যুক। সে চোর। যদি মিথ্যুক ও চোর না হয় তাহলে সূত্রের উল্লেখ করেনি কেন?

অথচ রেজভী সাহেবদের কোন বই পুস্তকে একথা নাই যে, সৈয়্যদ আহমদ ব্রেলভী, ইসমাইল দেহলভী ও ওলামায়ে দেওবন্দ অভিশপ্ত নজদের মুহাম্মদের সাথে সাক্ষাৎ করেছে। বরং এ কথা রয়েছে যে, তারা আরবে গমন করেন এবং মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদীর প্রবর্তিত ওহাবী আন্দোলন ভারতে প্রচারের জন্য মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদীর লিখিত কিতাবুত তৌহিদের মর্মার্থ ভালভাবে আহরণ করেন ও তার মতাদর্শ বিশ্বাস করে তা ভারতে প্রচার শুরু করেন এবং কিতাবুততৌহিদের ফার্সী অনুবাদ তাক্বিয়াতুল ঈমান গ্রন্থ প্রণয়ন করে সমগ্র ভারতবর্ষে ওহাবী আন্দোলনের প্রচার কার্য চালাতে থাকেন।

মিথ্যুক ওলীপুরী প্রশ্নটির উত্তরে বলেছে, এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা অপবাদ। কারণ **প্রথমত ঃ** মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহবাব ১৭৮৭ সনে ইন্তেকাল করেন। আর

উপমহাদেশীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের বীর সেনানী হযরত মাওলানা সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী ১৭৮৬ সনে অর্থাৎ মুহাম্মদের ইন্তেকালের মাত্র এক বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণই করেন।

এখানে ওলীপুরী মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদীকে ঈমানদার মেনেছে কারণ সে নজদীর জন্য ইন্তেকাল শব্দ ব্যবহার করেছে। অথচ নজদী ব্রিটিশ সম্রাটের গোয়েন্দা অফিসার মিঃ হামফ্রে থেকে ডলার খেয়ে কলার পাল্টিয়ে ফেলেছে। সে ইসলামের বিরাট সর্বনাশ করেছে। সে সকল সাহাবাদের মাজার ভেঙ্গে ফেলেছে। এমনকি প্রিয় নবীর মাজার শরীফ পর্যন্ত ভেঙ্গে ফেলার হীন চক্রান্ত করেছে। সে অনেক আওলাদে রাসূলকে শহীদ করেছে। অনেক সুন্নী মুসলমানকে শহীদ করেছে। অনেক ইমাম ও তাদের অনুসারীদেরকে কাফের বলেছে। সে প্রিয় নবীর উপর দরুদ শরীফ পড়াকে নিষেধ করেছে। এমনকি দরুদ শরীফের কিতাব দালায়েলুল খায়রাতসহ অনেক কিতাব পুড়ে ফেলেছে। একজন অন্ধ মুয়াজ্জেম আযানের পরে সালাত ও সালাম দেয়ার কারণে তাকে মসজিদে শহীদ করেছে। একদল মুসলমান কোরান তেলাওয়াত করা অবস্থায় তাদেরকে শহীদ করেছে। জুমার খুৎবায় প্রিয় নবীর উপর দরুদ পড়াকে হারাম বলেছে। প্রিয় নবীর শানে অশালীন ভাষায় আঘাত হেনেছে। সে বলেছে আমার মাযহাব চালু হয়েছে বিধায় মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের প্রবর্তিত ধর্ম তথা ইসলাম ধর্মের অনুসরণের কোন প্রয়োজন নেই। সে বলেছে, তার অনুসারীরা ব্যতীত আসমানের নিচে জমিনের উপর যারা থাকবে সকলেই কাফের। তার কৃকীর্তিসমূহ ফতোয়ায়ে শামী, আল মিনহাতুল ওহাবীয়্যাহ ফী রদ্দিল ওহাবীয়্যাহ, আল মুতাক্বেদুল মুনতাক্বদ, আল মুসতানাদুল মুতামদ বেনায়ে নাজাহিল আবদ, আল ফাজ্জস সাদেক সহ অনেক কিতাবে বর্ণনা করা হয়েছে। তার আক্বীদাহ এবং কৃকৃর্তিসমূহের কারণে আরব ও আজমের সকল সুন্নী ওলামা মাশায়েখরা এমনকি কতিপয় ওহাবীরা পর্যন্ত তাকে কাফের ফতোয়া দিয়েছে। (বাংলা ভাষী পাঠক ভাইদের প্রতি বিনীত অনুরোধ আপনারা এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য মোহাম্মদ রেদওয়ানুল হক ইসলামাবাদীর লিখিত নজদী পরিচয় বইটি পড়ুন) সকলের ঐক্যমতে সে কাফের সুতরাং কাফেরের জন্য ইন্তেকাল শব্দটি প্রযোজ্য নয়। এরপরও ওলীপুরী তার জন্য ইন্তেকাল শব্দ ব্যবহার করে এটা প্রমাণ করল যে মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী কাফের নয়। যদি কাফের হয় তাহলে তার জন্য ইন্তেকাল শব্দ ব্যবহার করল কেন? আর কাফেরকে কাফের না বলা এটাও একটা কুফুরী। প্রিয় নবীর শানে অবমাননাকারী কাফের হয়ে যাবে। এ বিষয়ে সকল ওলামায়ে কেরাম একমত। যেমন- ইমাম কাজী আয়ায মালেকী রাদিয়াল্লাহু আনহুর রচিত বিশ্ববিশ্রুত গ্রন্থ "শেফা শরীফের" ৩২১ পৃষ্ঠায় স্পষ্ট লিখা আছে, মূল ইবারত আরবী এর বাংলা তরজমা হচ্ছে, ওলামায়ে কেরাম এ বিষয়ে ইজমায় (সর্বসম্মত শরয়ী সিদ্ধান্তে) উপনীত হয়েছেন যে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর শানে অবমাননাকারী কাফের এবং তার উপর আল্লাহ তায়ালার আযাবের হুশিয়ারী কার্যকর। আর যারা সে ব্যক্তির কাফের হওয়ার এবং আযাবের অধিকারী হওয়ার বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করবে তারাও কাফের। এভাবে অসংখ্য কিতাবে রয়েছে যে, প্রিয় নবীর শানে বেয়াদবী

করলে কাফের হয়ে যাবে। এখন ওলীপূরীর কাছে প্রশ্ন- ওলীপুরী সাহেব তুমি কি নজদীর অনুসারী নও? না হলে তুমি তার তল্পিবাহক হলে কেন? লেখার সময় সম্ভবত তোমার মাথা ঠিক ছিল না। ঠিক থাকবেইবা কেন? তুমিতো ইংরেজদের নতুন এজেন্সী নিয়েছ, তাদের ডলার খেয়ে কালার পাল্টিয়ে ফেলেছ। ইবনে তায়মিয়া ও নজদীর মতাদর্শী বর্তমান সৌদি সরকারের রিয়াল পেয়ে বেহাল হয়ে গেছ। তাই তুমি প্রায় উম্মাদ হয়ে গেছ। কি লিখতে কি লিখে ফেলেছ তা তোমার জানা নেই।

দাজ্জাল ওলীপুরী তার কৃত উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তরে ব্রিটিশের প্রথম সারীর দালাল ভারতে ওহাবী নামের ঘৃণিত ফের্কার প্রচারক সৈয়্যদ আহমদ রায় ব্রেলভীকে উপমহাদেশীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের বীর সেনানী এবং তার ঘনিষ্টতম শিষ্য ও ওহাবী আন্দোলনের প্রধান সহকর্মী ইসমাইল দেহলভীকে শহীদ আখ্যায়িত করে তাদেরকে এবং ওলামায়ে দেওবন্দকে ব্রিটিশ বিরোধী তথাকথিত আন্দোলক বলেছে। সে-সৈয়্যদ সাহেব ও দেহলভী সাহেবকে ১৮৩১ সনে পাঞ্জাবের বালাকোট প্রান্তরে শিখদের বিরুদ্ধে সংঘটিত যুদ্ধকে ইংরেজ বিরোধী যুদ্ধ বলে দাবী করেছে। সে বলেছে পাঞ্জাবের শিখরা নাকি ইংরেজদের পক্ষপাতী ছিল। তাদের দালালীর ইতিহাস সংক্ষিপ্তাকারে পরে উল্লেখ করা হবে। ওলীপুরীকৃত প্রশ্নের উত্তরে লিখেছে নজদীর সাথে সৈয়্যদ সাহেবের নাকি কোন সর্ম্পক ছিল না। যুক্তি পেশ করেছে, নজদী নাকি মাযহাব মানতনা আর সৈয়্যদ সাহেব হানাফী মাযহাবের অনুসারী। নজদী নাকি পীর-মুরিদী মানত না আর সৈয়্যদ সাহেব লক্ষ লক্ষ মুরীদের পীর ছিল।

প্রিয় পাঠকবৃন্দ! দাজ্জাল ওলীপুরী তার লিখিত সুন্নীনামের অন্তরালে পুস্তিকাটির মধ্যে প্রিয় নবীর শানে অনেক বেয়াদবী করেছে। যেমন- সে লিখেছে প্রিয় নবী ইলমে গায়ব জানেন না। প্রিয় নবী নূর নন বরং মাটির তৈরী। এমনকি স্বয়ং আল্লাহও নূর নন। নূরের চেয়ে মাটি বেশী দামী। দাজ্জাল ওলীপুরী মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদীর সাথে তথাকথিত শহীদ সৈয়্যদ আহমদ ব্রেলভীর কোন সম্পর্ক না থাকার দ্বিতীয় কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছে হযরত সৈয়্যদ আহমদ শহীদ ১৮২২-২৩ সনে অর্থাৎ মুহাম্মদের ইন্তে কালের প্রায় দু'যুগ পরে আরব সফরে গমণ করেন। তাই তিনি তার সাথে সাক্ষাতের সুযোগ পেলেন কোথায়?

ওহে- দাজ্জাল কায্যার ওলীপুরী তুমি সুন্নীদের কোন কিতাবে পেয়েছ যে, তোমার মুরব্বী সৈয়্যদ সাহেব তার মুরব্বী নজদীর সাথে সাক্ষাত করেছে বলে লিখেছে, অথচ আমাদের সুন্নী গবেষকদের কিতাবে স্পষ্ট রয়েছে যে, তোমার সৈয়্যদ সাহেব হজ্জের ভান করে ইংরেজদের সাহায্য নিয়ে আরবে গমণ করে সেখান থেকে নজদীর মতাদর্শ গ্রহণ করে ভারতে তা প্রচার করেছে। তোমার দাবীকৃত মতটিতো আমাদের সুন্নী গবেষকদের গবেষণালব্ধ কিতাবে নেই। সুতরাং বুঝা গেল, তুমি তোমার দাবীতে মিথ্যুক। তুমি-তোমার কথায় ধরাশায়ী।

দাজ্জাল ওলীপুরী তার সৈয়্যদ সাহেবের সাথে নজদীর সম্পর্ক না থাকার চতুর্থ কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছে, মুহাম্মদ নাকি পীর-মুরীদকে বেদাআত বলতেন। পক্ষান্তরে হযরত শহীদ ব্রেলভী নিজেই লক্ষ লক্ষ মুরীদানের পীর ছিলেন।

প্রিয় পাঠক। দাজ্জাল ওলীপুরী তার সৈয়্যদ সাহেবকে লক্ষ লক্ষ মুরীদানের পীর বলেছে। হাঁ সে লক্ষ লক্ষ মুরীদানের পীর ছিল তবে লক্ষ লক্ষ মুরীদান কারা ছিল তার নেপথ্য কাহিনী অনুশীলন করলে দেখা যায় তারা ছিল ওহাবী সম্প্রদায়। আর ওহাবী সম্প্রদায় তো শয়তানের দল। তাদের বড় পীর হলো ইবলিশ শয়তান। এটা আমার কথা নয় বরং কোরানে কারীমের সূরা ফাতেরের ৮ম আয়াতের প্রথমাংশ যার তরজুমা নিম্নরূপ ঃ

তবেকি ঐ ব্যক্তি যার দৃষ্টিতে স্বীয়কৃত মন্দ কাজকে ভাল দেখানো হয়েছে তাতে সেও উহাকে ভাল বলে বিশ্বাস করেছে, এটা মুশরিক, খারেজী ও ওহাবীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে বলে তাফসীরে ছাবীর লেখক মুফাচ্ছের হযরত আল্লামা আহমদ ছাবী মালেকী তাফসীরে ছাবীর মধ্যে উল্লেখ করেছেন। উক্ত আলোচনায় আল্লামা ছাবী আরো বলেছেন শয়তান তাদের উপর চড়ে বসেছে বলে তারা হেজবুশ শয়তান তথা শয়তানের দল হয়ে গেছে।

তাফসীরে ছাবীর উক্ত তাফসীর দ্বারা আমরা বুঝতে পারলাম যে, ওহাবীরা হলো শয়তানের দল। আর তাদের বড় পীর হলো স্বয়ং ইবলিশ শয়তান।

এ প্রসঙ্গে বুখারী শরীফে রয়েছে একদা রাসূলে কারীম রাউফুর রাহীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম শাম, (সিরিয়া) ও ইয়ামনের জন্য বরকতের দোয়া করতেছিলেন, ইত্যিবসরে উপস্থিতদের মধ্যে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আরজ করলেন ঃ হুজুর আমাদের নজদের জন্য একটু দোয়া করুন! রাসূলে কারীম পূনরায় শাম ও ইয়ামনের জন্য দোয়া করলেন। এভাবে তিনি তিনবার দোয়া করলেন। প্রতিবারই নজদের জন্য দোয়া কামনা করা হয় কিন্তু রাসূলে কারীম শেষ পর্যন্ত নজদের জন্য দোয়া তো করেননি বরং রাগান্বিত হয়ে অসন্তুষ্টিরসূরে এরশাদ ফরমালেন নজদের মধ্যে (ঈমান ইসলাম বিধ্বংসী) ভূমিকম্প (মুসলমানদের মাঝে অশান্তিকারক) ফিতনা সৃষ্টি এবং (ইসলাম ধর্ম ও ঈমানকে ক্ষত-বিক্ষতকারী) শয়তানের দল ও শিং বের হবে। (বুখারী শরীফ)

উক্ত হাদীসে শয়তানের শিং এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কোন কোন ব্যাখ্যাকার মুসায়লামাতুল কায্যাব ও মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদীর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

প্রিয় পাঠকবৃন্দ! এখন ভারতবর্ষে ওহাবী ফের্কা প্রচার ও সৈয়্যদ আহমদ ব্রেলভী পীর হওয়ার কাহিনী শুনুন ঃ- ইসমাইল দেহলভী ছিল ইমামে আহলে সুন্নাত শাহ আবদুল আজীজ মুহাদ্দেসে দেহলভীর আপন ভাতিজা। ইসমাইল সাহেব বাল্য শিক্ষা হতে উচ্চ শিক্ষা পর্যন্ত সম্পন্ন করেছিল শাহ সাহেবের নিকট। তবে সে একটি পারিবারিক বিবাদকে কেন্দ্র করে গৃহহারা হয়ে সৈয়্যদ আহমদ রায় ব্রেলভীর সাথে হাত মিলায়ে ভারত উপমহাদেশে ওহাবী নামের এক নতুন ফের্কার উদ্ভব ঘটায়। শাহ আবদুল আজীজ মুহাদ্দেসে দেহলভী সকল ভাইদের মধ্যে বড় ছিলেন। ইন্তেকালের পূর্বে তিনি তার পিতার

স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তিকে একটি বন্টক নামার মাধ্যমে প্রত্যেক হকদারের মধ্যে ভাগ-বাটওয়ারা করেন। ইসমাইলের পিতা তার দাদা বিদ্যমান থাকাতে মৃত্যুবরণ করার কারণে সে তার দাদার সম্পত্তি থেকে আল্লাহর আইনে বঞ্চিত হয়। তার পরও দয়া করে শাহ আবদুল আজীজ মুহাদ্দেসে দেহলভী নিজের অংশ ও অন্যান্য ভাইদের অংশ হতে কেটে এ পরিমাণ সম্পত্তি ইসমাইলের জন্য নির্ধারণ করেন যাতে সে শাহ বংশে বসবাস করতে পারে। কিন্তু ইসমাইল আপত্তি করল যে, আমি আমার বাবার পুরো অংশ চাই, নচেৎ আমি মোটেই কিছু নিবনা। শাহ আবদুল আজীজ দেহলভী বুঝালেন যে, তুমি আল্লাহ তায়ালার আইন মোতাবেক সম্পত্তি মোটেই পাচ্ছ না, সে ক্ষেত্রে আমি তোমার জন্য উল্লেখিত হারে কিছু সম্পত্তি নির্ধারণ করেছি। তুমি আমার এ সিদ্ধান্ত মেনে নাও। ইসমাইল দেহলভী চাচার সিদ্ধান্তের অবহেলা করে ঘর ছাড়া হয়ে নতুন বুদ্ধি খাটাল। ইসমাইল বড় বক্তা ছিল, অনেক দিন পর্যন্ত দেশে দেশে গ্রামে-গঞ্জে ওয়াজ নসিহত করে বেড়ায়। মানুষ তাকে হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দেসে দেহলভী সাহেবের নাতি হিসেবে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি করতো।

ইসমাইল সাহেব কিছু দিন বিদেশ সফর করে দেশে ফিরে এসে শাহ আবদুল আজীজ মুহাদ্দেসে দেহলভীর এক জামাতা মাওলানা আবদুল হাই (মাহমী) কে পক্ষ করে শাহ সাহেবের কিছু সম্পত্তি জবর দখল করে নেয়। আর প্রকাশ্য বন্টক নামার উপেক্ষা করতে থাকে। এতে ইসমাইলের কোন লাভ হল না। কারণ শাহ আবদুল আজীজের অন্যান্য ভাইগণ বন্টক নামার পক্ষে ছিলেন। তারা সকলে একত্রিত হয়ে ইসমাইলকে সম্পত্তি হতে বেদখল করে দিলেন। ইসমাইল সম্পত্তি পুনঃদখল করার জন্য ভারত বিখ্যাত শরীর চর্চাবিদ এবং বড় লাঠিয়াল সৈয়্যদ আহমদ ব্রেলভীর নিকট গমন করে। সৈয়্যদ আহমদ ইসমাইলকে পরামর্শ দিল সম্পত্তি দখল করার পূর্বে শাহ আবদুল আজীজ মোহাদ্দেসে দেহলভীর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ইমামতি দখল করে নাও। অথবা তার এ ইমামতির বিপক্ষে কোন তরীক্বা কায়েম কর। ইসমাইল বহু চিন্তা ভাবনা করে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের বিপক্ষে প্রথমে খারেজী মাযহাব সমর্থন করে। পরবর্তীতে এ মাযহাব, খানাকে ওহাবী মাযহাবে রূপান্তর করে। অপর দিকে সৈয়্যদ আহমদ ব্রেলভী আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ইমামতির স্থলাভিষিক্ত হওয়ার জন্য শাহ আবদুল আজীজ মুহাদ্দেসে দেহলভীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। সৈয়্যদ আহমদের স্মৃতিশক্তি বলতে ছিলো না। তাই সে লেখা পড়ায় তেমন উন্নতি করতে পারল না।

সৈয়্যদ সাহেবের শিক্ষা নিয়ে বিভিন্ন জনের বিভিন্ন মত দেখা যায়। তার শিষ্যরা এ ব্যাপারে দ্বিধা বিভক্ত। তার অন্যতম খলিফা ইসমাইল দেহলভী বলেছে, তিনি একেবারে নিরক্ষর ছিলেন।

একজন নিরক্ষর ব্যক্তির হাতে শাহ ওয়ালিউল্লাহ পরিবারের একজন বিখ্যাত মুহাদ্দেস হযরত শাহ আবদুল আজীজ মুহাদ্দেসে দেহলভী জীবিত থাকা অবস্থায় তার খান্দানের একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি মাওলানা ইসমাইল দেহলভী কেন বাইয়াত হলেন তার নেপথ্য কারণ খুঁজলে পাওয়া যায় পারিবারিক সম্পত্তির দ্বন্দ।

সৈয়্যদ সাহেব নিরক্ষর হলেও তার মাথায় ছিল শয়তানী বুদ্ধি। সে শাহ সাহেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে কিছু দিন যেতে না যেতে শাহ সাহেবকে বলে আমার জাহেরী শিক্ষা বন্ধ করুন। আমি কালো অক্ষর সাদা দেখছি। শাহ সাহেব বুঝতে পারলেন যে, সৈয়্যদ আহমদের মতলব খারাপ। কালো অক্ষর সাদা দেখার তথাকথিত অর্থ এ যে, সে কামালিয়াতের দরজায় পৌছে গেছে। এখন শুধু বাকী রয়েছে আমার থেকে আহলে সুন্নাতের খেলাফতটা নেয়া। শাহ সাহেব এ কুমতলবী ছাত্রের উপর রাগান্বিত হয়ে নিজ ভাই শাহ আবদুল কাদের দেহলভীকে বললেন সৈয়্যদ আহমদকে আমার পাঠশালা হতে বের করে দাও। শাহ আবদুল কাদের তাকে বের না করে কিছু দিন পর্যন্ত নিজেই শিক্ষা প্রদান করেন। কিন্তু সৈয়্যদ আহমদের শিক্ষা লাভের একই ফল্যাফল দাঁড়াল যা শাহ সাহেবের নিকট দাঁড়িয়েছিল।

শাহ সাহেবের উল্লেখিত সৈয়্যদ আহমদ ও ইসমাইল দু'জন বিদ্রোহী ছাত্র কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে শাহ সাহেবের সুন্নী নীতিমালার দূর্নাম করার জন্য নতুন আন্দোলন শুরু করে। সৈয়্যদ সাহেব হজ্ব পালনের ভান করে মক্কায় গিয়ে ওহাবী নীতিমালার কিতাবুত তৌহিদ' নামক পুস্তক-খানা কতিপয় নজদী অনুসারীদের মাধ্যমে দিল্লী প্রেরণ করে। উক্ত ঈমান বিধ্বংসী বইখানা ইসমাইলের হস্তগত হলে সে বই-খানার ফার্সী অনুবাদ করে হিন্দুস্থানে প্রচার শুরু করে। এ অনুবাদের নাম রাখা হয়েছিল তাক্বীয়াতুল ঈমান।

ওহাবী ফের্কার সাথে সুন্নীদের প্রথম বহছ ঃ

মাওলানা ইসমাইল দেহলভী মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব কর্তৃক লিখিত কিতাবুত তৌহিদ এর ফার্সী অনুবাদ করে তাক্বীয়াতুল ঈমান নামকরণ করে। এর মধ্যে ৭০টি কুফুরী কথা রয়েছে। এটা যখন প্রচার শুরু করে তখন হিন্দুস্থানের সর্বস্থরের সুন্নী ওলামায়ে কেরাম এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে। পরিশেষে এ ধর্মনাশা পুস্তকের সমর্থন নেয়ার জন্য ১২৪০ হিজরী সনে ইসমাইল সাহেব মৌলভী আবদুল হাই এবং মৌলভী আবদুল গণি সাহেবানকে সঙ্গে করে দিল্লী জামে মসজিদ প্রাঙ্গনে সুন্নী ওলামায়ে কেরামদের সঙ্গে তর্ক যুদ্ধে উপনীত হন। বহছের বিষয়বস্তু অনেক ছিল। তম্মধ্যে প্রথম বিষয় ছিল, হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম একজন সাধারন মানুষ ছিলেন এবং আমাদের মত মানুষ ছিলেন।

সুন্নী ওলামায়ে কেরামগণ উল্লেখিত মিথ্যা ও ভ্রান্ত প্রশ্নের দাঁতভাঙ্গা উত্তর দিলেন। তখন ইসমাইল সাহেব নিরোত্তর হয়ে পালাবার চেষ্টা করে এবং পরিশেষে পালায়েও গেল।

ইসমাইল সাহেব তর্ক বহছে অপদস্ত হওয়ার পর দিশেহারা হয়ে সৈয়্যদ আহমদ ব্রেলভীর নিকট গিয়ে বলল যে, তর্ক বহছ দ্বারা ওহাবী নীতিমালা বাস্তবায়ন করা অসম্ভব, তাই এখন হতে আমার নতুন তরীক্বত পন্থী হতে হবে। তাই আপনি আমাকে সে নতুন তরীক্বতের সবক প্রদান করুন। এ কথার প্রতি-উত্তরে সৈয়্যদ সাহেব বললেন, আমার নিজেরই তরীক্বতের বাইয়াত নেই, সেক্ষেত্রে আমি তোমাকে তরীক্বতের সবক দিলে তা বিশ্বাস করবে কে? ইসমাইল সাহেব নিরাশ হয়ে সৈয়্যদ সাহেবকে বললেন, আমি আপনার

জন্য নতুন তরীক্বতের বিশেষ ব্যবস্থা করছি আপনি শান্ত থাকুন। শেষ পর্যন্ত ইসমাইল সাহেব সৈয়্যদ সাহেবকে নিম্ন নিয়মে আল্লাহ পাকের হাতে বায়'য়াত করালেন। এ আধুনিক নিয়মের তথাকথিত বাইয়াতের ঘটনাটি ইসমাইল সাহেব সৈয়্যদ সাহেবের ইশারায় ফার্সী ভাষায় লিখিত ছেরাতে মুস্তাকিমের ১৬৪ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেন। মূল এবারত ফার্সী তরজুমা নিম্নরূপ ঃ

ইসমাইল দেহলভী সাহেব বলেন ঃ একদা আল্লাহ পাক জনাব সৈয়্যদ আহমদ ব্রেলভী সাহেবের হাতকে চেপে ধরে কতিপয় উচ্চমানের অদ্বিতীয় পবিত্র বস্তু তার হস্তে প্রদান করে বলেন, হে সৈয়্যদ! এ মুহূর্তে আমি তোমাকে এতটুকু ফয়েজ দিলাম। পরবর্তীতে আমি তোমাকে আরো অনেক ফয়েজ প্রদান করতে ইচ্ছা রাখি। অর্থাৎ এতদ্দেশে পীরগণ সাধারণ মানুষকে যেমন মুরীদ করার জন্য পীরের হাতের উপর মুরীদের হাতকে রেখে বায়'য়াত করান, অবিকল সেরূপ আল্লাহ পাক সৈয়্যদ সাহেবের ডান হাতকে তার নিজ হাতে রেখে মুরীদ করে নিলেন।

এরপর উক্ত কিতাবের ১৬৬ পৃষ্ঠায় লিখেন, সৈয়্যদ আহমদ ব্রেলভী সাহেব আল্লাহ পাকের হাতে মুরীদ হওয়ার পর একটি ঘোষণা দিলেন যে, আল্লাহ পাক নিজেই করুনা করে কোন মানুষের উসিলা ছাড়া এককভাবে আমাকে চিশতীয়া তরীক্বা বখশিস করলেন। অর্থাৎ শাহ আবদুল আজীজ মোহাদ্দেসে দেহলভী সাহেবের মোজাদ্দেদিয়া তরীক্বা আমার আদৌ প্রয়োজন নেই।

উক্ত কিতাবের ১৬৫ পৃষ্ঠায় লিখেন, আল্লাহ পাক সৈয়্যদ সাহেবকে মুরীদ করার পর এক ঘোষণার মাধ্যমে বললেন, হে সৈয়্যদ সাহেব! তুমি যাকে ইচ্ছে কর (হিন্দু-বৌদ্ধ) সকলকে মুরীদ করতে পার এতে আমার সম্পূর্ণ সম্মতি রয়েছে।

অর্থাৎ সৈয়্যদ আহমদ ব্রেলভী আল্লাহ পাকের হাতে মুরীদ হওয়ার পর একটি ঘোষণা দিলেন যে, আমি চিশতীয়া তরীক্বার পীর। যার যার ইচ্ছে এ চিশতীয়া তরীক্বায় বায়'য়াত হতে পার। এ ঘোষণার পর পরই সর্বপ্রথম ইসমাইল দেহলভী সাহেব সৈয়্যদ সাহেবের হাতে মুরীদ হলেন। আর তিনি হিন্দুস্থানের মধ্যে ঘোষণা করে দিলেন। তোমরা মোজাদ্দেদিয়া তরীক্বা পরিহার করে চিশতীয়া তরীক্বায় মুরীদ হও। কারণ এ চিশতীয়া তরীক্বার উদ্ভাবক হলেন স্বয়ং আল্লাহ পাক।

অতঃপর ইসমাইল ওয়াজ-নসীহতের ভান করে সৈয়্যদ সাহেবের তরীক্বত প্রচারের জন্য আফগানিস্থানে গমন করেন। সেখানেও তিনি এ আধুনিক তরীক্বত বিস্তার করতে গিয়ে আফগানী ওলামাদের হাতে বহু নাজেহাল হন। সকলেই খোদা প্রদত্ত তরীক্বতের কথা শুনে অবাক হন। কারণ আল্লাহ পাক হলেন নিরাকার, তার হাত পা নেই সেক্ষেত্রে সৈয়্যদ সাহেব আল্লাহ পাকের হাতে কিরূপে মুরীদ হলেন একথা কোন অজ্ঞ, বুদ্ধিহীনও মেনে নিবে না।

প্রিয় পাঠক-বৃন্দ! ইসমাইল দেহলভী সৈয়্যদ আহমদ ব্রেলীর সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে হিন্দুস্থানের জমিনে ওহাবী ফের্কা প্রচারের জন্য খোদা প্রদত্ত যে অবিনব তরীক্বার উদ্ভাবন করলেন যাতে খোদার হাত আছে বলে প্রমাণ করলেন অথচ খোদা তায়ালা হলেন

নিরাকার তার কোন হাত পা নেই। তবে হা কোরানের মধ্যে আল্লাহ তায়ালা ইয়াদুল্লাহ তথা আল্লাহর হাতের ঘোষণা দিলেন। এটা বলে আল্লাহ তায়ালা তার কুদরতী হাতের কথা বলেছেন। আল্লাহ তায়ালার কুদরতী হাত সম্পর্কে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। এর দ্বারা আমরা আল্লাহর হাত আছে বলে প্রমাণ করতে পারব না। যদি কেউ আল্লাহর হাত আছে বলে প্রমাণ করে তাহলে প্রশ্ন উঠবে আল্লাহর হাত কীরকম? কার হাতের মতো। কারণ হাততো বান্দারই রয়েছে। যদি উত্তর দেয়া হয়, আল্লাহর হাত বান্দার হাতের মতো। তাহলে এটার সাথে আল্লাহর সাথে বান্দাকে শরীক করা। আর যে এ ধরনের শরীক করবে সে মুশরীক হয়ে যাবে। এ বিধান মোতাবেক সৈয়্যদ আহমদ ও ইসমাইল মুশরীক হয়ে গেছে। কারণ সৈয়্যদ সাহেবের ইশারায় ইসমাইল দেহলভী কর্তৃক লিখিত উপরোল্লেখিত ছেরাতে মুস্তাকিমের মধ্যে ইসমাইল সাহেব আল্লাহর হাত আছে বলে দাবী করছে। তার দাবী মোতাবেক তারা পীর মুরীদ উভয় কাফির-মুশরীক হয়ে গেছে। সুতরাং তাদেরকে যারা অনুসরণ-অনুকরণ করবে তারাও কাফের মুশরীক হয়ে যাবে।

দাজ্জাল ওলীপুরী যেহেতু তাদের অকৃত্রিম আশেক্ব বিধায় সেও কাফের হয়ে গেছে।

প্রিয় পাঠকবৃন্দ! দাজ্জাল ওলীপুরী তার ধর্মনাশক সুন্নী নামের অন্তরালে পুস্তকের মধ্যে প্রায় কয়েক জায়গায় ইংরেজদের ঘোর বিরোধী ইংরেজের আদালতকে আদালত বলতে বাঁধা প্রদানকারী সাচ্চা আশেক্বে রাসূল আমাদের সুন্নী জগতের মহাকাশের আলো বিচ্ছুরণকারী উজ্জ্বল রবি চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দেদে আজম আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজাকে ব্রিটিশের দালাল বলেছে। তার শানে মানহানিকর শব্দ ব্যবহার করেছে। আলা হযরত কেবলাকে ইংরেজের দালাল বলার শুধু একটা কারণ দেখা যাচ্ছে। সেটা হলো আলা হযরত কেবলা ইংরেজের প্রকৃত দালাল সৈয়্যদ আহমদ গংদের মুখোশ উন্মোচন করে দিয়েছেন। তাদের লিখিত বই পুস্তকে আল্লাহ ও প্রিয় নবীর শানে আঘাত করে যে সকল কুফুরি করেছে আলা হযরত কেবলা তাদের সে কুফুরি উক্তিগুলো লিখে হুসসামুল হারমাইনে শরীফাইন প্রণয়ন করে হারামাইনে শরীফাইনের মুফতীদের নিকট প্রেরণ করে সে বিষয়ে তাদের মতামত চেয়েছেন। তাদের মতামতের উপর ভিত্তি করে আলা হযরত কেবলা সৈয়্যদ আহমদ গংদেরকে কাফের ফতোয়া দিয়েছেন। তিনি তাদের নজদী মিশনে আঘাত হানার কারণে তাদের দুশমন হয়ে গেছেন। যার ফলে তারা আলা হযরতকে বিভিন্ন কর্কশ ভাষায় গালি-গালাজ করেছে। আলা হযরতের শানে অশালীন শব্দ ব্যবহার করেছে। এ ব্যাপারে আলা হযরতের ভক্ত অনুরক্তরা আলা হযরত কেবলাকে বললেন, হুজুর! আপনি তাদের ব্যাপারে লেখা-লেখি করার কারণে তারা আপনাকে অশালীন ভাষায় ভৎর্সনা করতেছে। আপনি তাদের ব্যাপারে লেখা-লেখি না করলে হয়তো তারা আপনাকে অকথ্য ভাষায় গালি-গালাজ করবে না। প্রতি উত্তরে আলা হযরত কেবলা বললেন, দুশমনানে রাসূলরা প্রিয় নবীর শানে অবমাননা করতেছে, তাই আমি তাদের মুখোশ উম্মোচন করার জন্য তাদের ব্যাপারে লেখা-লেখি করতেছি। তারা যতদিন প্রিয় নবীর শানে অবমাননা

করবে আমি আমার জীবদ্দশায় ততোদিন তাদের বিরুদ্ধে লেখা-লেখি করবো। যাতে তারা প্রিয় নবীর শানে আঘাত করা থেকে বিরত হয়ে আমার শানে আঘাত করুক। যদি তারা প্রিয় নবীর শানে অবমাননা করা থেকে বিরত হয়ে আমার দিকে মনোযোগী হয়ে আমাকে অকথ্য ভাষায় গালি-গালাজ করে এতে আমার কোন আপত্তি নেই। কারণ আমি চাই প্রিয় নবীর শানে আঘাত না করা।

সুবহানাল্লাহ! এটাইতো সাচ্চা আশেক্বে রাসূলের জ্বলন্ত প্রমাণ। যিনি নিজ যশোঃখ্যাতির জলাঞ্জলী দিয়ে প্রিয় নবীর শান-মান রক্ষা করতে চান।

প্রিয় পাঠকবৃন্দ! দাজ্জাল ওলীপুরী আলা হযরত কেবলাকে মুসলমানের দুশমন ও ইংরেজদের দালাল বলেছে আর মুসলমানদের প্রকৃত শত্রু ও ইংরেজদের প্রথম সারির দালাল সৈয়্যদ আহমদ ব্রেলভী ও তার প্রধান খলিফা ইসমাইল দেহলভী এবং দেওবন্দীদেরকে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনকারী বলেছে। এ ব্যাপারে দেওবন্দী আলেম ও ওহাবীদের কথিত হাকীমুল উম্মত আশ্রফ আলী থানবী সাহেব ইংরেজদের দালালী করে ইংরেজদের থেকে মাসিক ৬০০ টাকা ভাড়া পাওয়ার ইতিহাস পূর্বে উল্লেখ হয়েছে। এখন সৈয়্যদ আহমদ ব্রেলভী ও ইসমাইল দেহলভীর ইংরেজ প্রীতি ও ইংরেজদের দালালী করার ইতিহাস আমাদের জানা উচিত। এ ব্যাপারে সুন্নী আলেমদের গবেষণালব্ধ কিতাবের রেফারেন্স না দিয়ে ওহাবী আলেমদের নির্ভরযোগ্য কিছু কিতাবের রেফারেন্স পেশ করবো যাতে একথা প্রমাণিত হয়ে যায় যে, আলা হযরত কেবলা ব্রিটিশের দালাল ছিলেন না বরং সৈয়্যদ আহমদ গংরা ব্রিটিশের খায়েরখা ও তাদের প্রকৃত দালাল ছিলেন।

ইংরেজদের সাথে সৈয়্যদ আহমদের সম্পর্ক ঃ

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সৈয়্যদ আহমদ সাহেব প্রথমে পাঠানদের সাথে যুদ্ধ করে। এবং তাদের হাতে নিহত হন। ইংরেজদের সাথে তার কোন যুদ্ধ হয়নি। এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করার কোন ইচ্ছাও তার ছিল না। ইংরেজদের সাথে তার গভীর ও মধুর সম্পর্ক ছিল। ইংরেজরা তাকে বিভিন্ন সময় সাহায্য ও সহযোগীতা করতে দেখা যায়। আরো প্রমাণ পাওয়া যায় ইংরেজগণ সৈয়্যদ সাহেবকে যেদিকে ইশারা করেন সৈয়্যদ সাহেব সেদিকে ঝাপিয়ে পড়েন।

ভারতবর্ষে পাঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদেশ ইংরেজরা দখল করতে পারেনি। পাঠান ও শিখরা এখনো স্বাধীনভাবে বিদ্যমান আছে। এদেরকে কাবু করা ইংরেজদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। তাই ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দোহাই দিয়ে অকুতোভয় ও অপারেজয় পাঠান ও শিখ শক্তিকে দুর্বল করার লক্ষ্যে ইংরেজ বাহাদুর তাদের আজ্ঞাবহ সৈয়্যদ আহমদকে সীমান্ত প্রদেশ ও পাঞ্জাবে প্রেরণ করেন। ইংরেজরা এ পরিকল্পনায় ষোল আনা স্বার্থক ও সফল হয়। ইতিহাসের কোথাও এ প্রমাণ মিলে না যে, সৈয়্যদ সাহেব ইংরেজদের সাথে যুদ্ধ করেছেন। যুদ্ধ করাতো দূরের কথা তাদের প্রতি একটি ঢিল যে নিক্ষেপ করেছে তারও কোনো ইতিহাসে মিলে না। বরং ইংরেজ সরকার তাদেরকে নানাভাবে সাহায্য করতে দেখা যায়। ইংরেজদের সাথে মধুর সম্পর্ক থাকার কারণে তাদের অনেককে অহংকার করতে

দেখা যায়। সৈয়্যদ আহমদ গংদেরকে ইংরেজ বিরোধী আন্দোলক বা এ জাতীয় কোন খেতাব মানে ইতিহাসকে বিকৃত করা ছাড়া আর কিছু নয়। বাস্তবে এরা ছিল ভারতবর্ষে ইংরেজদের তল্পিবাহক ও গুপ্তচর। ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কোন অভিপ্রায় তাদের কোন সময় ছিল না। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে দেশ উদ্ধার যদি তাদের উদ্দেশ্য হতো তাহলে পাঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদেশে যাওয়ার প্রয়োজন ছিল না। লক্ষ লক্ষ জনতা তাদের সাথে কাধে কাঁধ মিলিয়ে ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়ত। যদি তারা দাবী করে একথা বলে যে, ইংরেজ রাজ্যের বাহিরে গিয়ে শক্তি সঞ্চয় করে একটি শক্তিশালী সেনা বাহিনী গঠন করার জন্য তারা পাঞ্জাবে গিয়ে ছিল, তাহলে আমরা বলব ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা দাবী। ইহা পরবর্তী বংশধরদের কাছে সুনাম ও মুখ রক্ষার জন্য কল্পিত দাবী। কারণ সৈয়্যদ সাহেব ও তার বাহিনীর যদি উদ্দেশ্য তাই হত, তাহলে তারা সেখানে গিয়ে হযরত ইমামে আজম রাদিয়াল্লাহু আনহু, ক্বাদেরীয়া, চিশতিয়া নক্সবন্দীয়া ও সরওয়ারদিয়া খান্দানের সমস্ত আউলিয়া ও বিশ্বের সমস্ত মুসলিমকে (ওহাবী ছাড়া) কাফের ফতোয়া দিত না। কোন মুক্তি বাহিনীর আচরণ এরূপ হয় না, হতে পারে না। এরূপ ফতোয়া প্রদান করে মুসলিম শক্তিকে খন্ড-বিখন্ড ও চূর্ণ-বিচূর্ণ করার কোন অর্থই হয়না। বাস্তবে দেশ মুক্তি তাদের উদ্দেশ্য হলে, হিন্দু-মুসলিম ও শিখ সবাইকে একত্রিত ও সংগঠিত করে ইংরেজদের উপর ঝাপিয়ে পড়ত।

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম মদীনা শরীফ তাশরীফ নিয়ে মদীনা রক্ষার জন্য সেখানকার সমস্ত অমুসলিম সম্প্রদায়কে নিয়ে ধর্মীয় স্বাধীনতার ভিত্তিতে একটি চুক্তি রচনা করেন। যা ইতিহাসে "মদীনার সনদ" নামে বিখ্যাত। চুক্তিতে প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম সকল সম্প্রদায়কে তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা ও জান-মালের নিরাপত্তার গ্যারান্টি দিয়েছিলেন। ফলে মদীনা রক্ষার স্বার্থে অমুসলিম সম্প্রদায় এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিল।

এখন ভাবার বিষয় হলো- সৈয়্যদ সাহেবের উদ্দেশ্য যদি ইংরেজ বিতাড়ণ হত, তাহলে তিনিও জাতী-ধর্ম নির্বিশেষে সকলকে নিয়ে এরকম একটি চুক্তি করত। কই সৈয়্যদ সাহেবতো এ জাতীয় কিছু করেননি। করবেই বা কেন। তিনি দেশ উদ্ধার ও ইংরেজ বিতাড়ণের জন্য তো আসেন নাই। তিনি এসেছেন এদেশের শিখ ও পাঠান মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করে এদের কিছু শক্তি ক্ষয় করে দুর্বল করার জন্য যাতে ইংরেজরা বড় ধরনের বিপদের সম্মুখীন না হয়ে অতি সহজে পাঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদেশ দখল করে নিতে পারে।

সুপ্রিয় পাঠকবৃন্দ! এখন চলুন ইতিহাসের পাতায় দৃষ্টি দিই। সৈয়্যদ আহমদ গংরা কার সাথে যুদ্ধ করেছেন, সে ব্যাপারে ইতিহাস কি স্বাক্ষী দেয় তা দেখি।

হাশিয়া-এ-মকালাতে স্যার সৈয়্যদ ৩৫২ পৃষ্ঠায় মুল এবারত উর্দু যার তরজুমা নিম্নরূপ ঃ

১৮৫৭ ইংরেজীর (স্বাধীনতা) আন্দোলনে ইংরেজদের বিরুদ্ধে অংশগ্রহণকারী তারা, যারা সকলে হযরত সৈয়্যদ আহমদ ও হযরত ইসমাইলের আক্বীদার ঘোর শত্রু ছিলেন এবং যারা হযরত শাহ ইসমাইলের খন্ডনে অনেক কিতাব রচনা করেন। (মৃত্যু

কালে) নিজের শিষ্যদেরকেও লিখার অছিয়ত করেন। এখানে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, ১৮৫৭ ইংরেজীর ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনে সৈয়্যদ সাহেব ও ইসমাইল অংশগ্রহণ করেননি। সৈয়্যদ ও ইসমাইল বিরোধীরাই উক্ত আন্দোলনে অত্যন্ত জোশের সাথে অংশ গ্রহণ করেন।

আল-ইক্বতিছাদ ফি মসায়েলিন জ্বিহাদ ৪৯ পৃষ্ঠায় ঃ

মুল এবারত উর্দু। যার তরজুমা নিম্নরূপ ঃ

১৮৫৭ ইংরেজীর ফিতনায় যে সমস্ত মুসলমান শরীক হন, তারা গুণাগার। কোরান ও হাদীসের হুকুম মতে তারা ফ্যাসাদকারী, বিদ্রোহী ও দুস্কৃতকারী ছিলেন। তাদের অধিকাংশ আওয়াম কাল আনাম (জন্তুসম) ছিলেন। কিছু লোক যারা বিশেষ আলেমের দাবী করে তারাও আসল ধর্ম (কোরান ও হাদীস) সম্বন্ধে অনবিজ্ঞ, বিবেক ও বুদ্ধিহীন। বিজ্ঞ আলেমগণ ঐ আন্দোলনে শরীক হননি।

উপরোক্ত লেখায় তারা যা বলেছে তা হলো ঃ

যারা ১৮৫৭ ইংরেজীতে ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন করেন, তারা সবাই পাপী ও গুণাগার।

কোরান-হাদীস মতে তারা ফ্যাসাদকারী, বিদ্রোহী ও দুস্কৃতিকারী। তারা সবাই আওয়াম, জানোয়ারের সমান। কিছু লোক যারা বিশেষ আলেমের দাবী করে তারাও কোরান-হাদীস সম্বন্ধে অনবিজ্ঞ।

সুপ্রিয় পাঠকবৃন্দ! এখানে ভাবার বিষয় যে, স্বাধীনতার আন্দোলনকারীদেরকে যারা গুণাগার, অনবিজ্ঞ ও দুস্কৃতিকারী বলেন, তারা কিভাবে আমীরুল মুমেনিন, মুজাহিদ হতে পারে? এতদসত্ত্বেও দাজ্জাল ওলীপুরী সৈয়্যদ সাহেব ও ইসমাইল দেহলভীকে বৃটিশ বিরোধী স্বাধীনতার আন্দোলক দাবী করেছে।

তাজকিরাতুর রশিদ ১ম খন্ড-৭৩ পৃষ্ঠায় ঃ

মুল এবারত উদু। যার বঙ্গানুবাদ নিন্মরূপ ঃ

অনেকের মাথার উপর মৃত্যু খেলতেছে। তারা কোম্পানীর (ইংরেজদের রাজত্বকে) শান্তি ও নিরাপত্তার কালকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখেনি এবং দয়াবান সরকারের সম্মুখে বিদ্রোহীর ঝান্ডা প্রতিষ্ঠা করে।

এখানে স্পষ্ট ভাষায় লেখা হয়েছে যে, ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনকারীদের মাথার উপর মৃত্যু খেলতেছে এবং ইংরেজদের শাসন কালকে শান্তি ও নিরাপত্তার কাল বলা হয়েছে।

কালাপানি ২৪ পৃষ্ঠা

মুল এবারত উর্দু। যার বাংলা তরজুমা নিন্মরূপ ঃ

মৌলভী নজির হোসাইন মুহাদ্দেসে দেহলভী একজন সুপ্রসিদ্ধ ও নামদার ইংরেজ হিতাকাংখী ছিলেন। এখানে সৈয়্যদ আহমদ ব্রেলভীর অনুসারী নজির হোসাইন মুহাদ্দেসকে ইংরেজদের হিতাকাংখী ও তাদের মঙ্গল কামনাকারী বলা হয়েছে। আমাদের চট্টগ্রামের আঞ্চলিক প্রবাদে আছে-আগের হাল যেদিকে যায় পিছের হাল সেদিকে যায়। এ প্রবাদ

অনুসারে বলা যায় যে, সৈয়্যদ আহমদ ব্রেলভী সাহেব ইংরেজের হিতাকাংখী ছিলেন। যদি সৈয়্যদ সাহেব ইংরেজ বিরোধী হতেন তাহলে তার অনুসারী নজির হোসাইন সাহেবও ইংরেজ বিরোধী হতেন। যার ইতিকথায় বলা যায় যে, আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা ফাযেলে ব্রেলভী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ইংরেজের দালাল ছিলেন না বরং সৈয়্যদ আহমদ গংরাই ইংরেজের দালাল ছিল।

ওলামা-এ-হিন্দ কা শান্দার মাজী ৪র্থ খঃ ২১৩ পৃষ্ঠা
আল-হায়াত বাদাল মামাত ১২৫ পৃষ্ঠা
আল- হায়াত বাদাল মামাত ১২৭ পৃষ্ঠা
আল- হায়াত বাদাল মামাত ৮১ পৃষ্ঠা
আল- হায়াত বাদাল মামাত ১৪০ পৃষ্ঠা
আল-ফোরক্বান শহীদ সংখ্যা ১৩৫৫ হিজরী ৭৬ পৃষ্ঠা

উপরোল্লেখিত কিতাবসমূহে ও সৈয়্যদ আহমদ ও ইসমাইল গংরা ইংরেজের দালালী করার কথা স্পষ্টভাবে লিখা রয়েছে।

ইংরেজের পক্ষে ফতোয়াদান ঃ

মক্বালাত-এ-স্যার সৈয়্যদ আহমদ ৯ম খন্ডের ১৪২ পৃষ্ঠায় রয়েছে। মুল এবারত উর্দু। যার তরজুমা নিম্নরূপ ঃ ইসমাইল দেহলভী ওয়াজ করতেছিল। ওয়াজের মাঝে, কোন ব্যক্তি তার (ইসমাইল) কাছে জানতে চায় আপনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার কেন ওয়াজ করেন না? তারাও-তো-কাফির। তার উত্তরে মৌলভী মুহাম্মদ ইসমাইল সাহেব বলেন যে, ইংরেজদের আমলে মুসলমানদের কোন কষ্ট হচ্ছে না। আর আমরা-তো-ইংরেজদের প্রজা হই। এ কারণে আমাদের ধর্ম মতে ইংরেজদের বিরুদ্ধে কোন যুদ্ধে আমাদের শরীক না হওয়া ফরজ। উপরন্তু এ সময় অস্ত্রে সজ্জিত হাজারো মুসলমান এবং যুদ্ধের অগণিত সাজ-সরঞ্জাম শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য হিন্দুস্থানে জমা হয়ে যায়।

এখানে চিন্তার বিষয় যে, যদি সৈয়্যদ আহমদ ও ইসমাইল গংরা ইংরেজদের দালাল না হয়, ইংরেজদের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ না করে, তবে প্রকাশ্য জনসভায় একটি দেশের বিরুদ্ধে দম্ভ উক্তি করা কিভাবে সম্ভব হল?

আর এত গুলি অস্ত্র জমা করতে ইংরেজরা কেন নিরব থাকল? আর এ অগণিত অস্ত্র তারা কোথায় পেল? ইসমাইল সাহেবের ব্যক্তিগত কোন অস্ত্র কারখানা তো ছিল না। চিন্তাশীল পাঠকরা একটু গভীরভাবে চিন্তা করুন।

ছওয়ানেহে আহমদী, মতবুয়া-এ-ফারুকী, দিল্লী ৭৩ পৃষ্ঠা ঃ
মওজে কাওছার ২০ পৃষ্ঠা ঃ
হায়াতে তৈয়্যবা ২৯৬ পৃষ্ঠা ঃ
আল-হায়াত বাদাল মামাত ২০৩ পৃষ্ঠা ঃ
এশায়াতুস সুন্নাহ ২য় খন্ড জমীমা ৫, ৬ পৃষ্ঠা ঃ
মক্বালাত-এ-স্যার সৈয়্যদ ৯ম খঃ ১৪৮ পৃষ্ঠা ঃ

হিন্দুস্থান কি পহেলি ইসলামী তাহরীক ৫৪-৫৫ পৃষ্ঠা ঃ

উপরোক্ত কিতাবগুলোতে ও অনুরূপ কথা রয়েছে।

যার সার কথা হলো ইসমাইল দেহলভী সাহেব স্বয়ং পাগলা মনে হিন্দুস্থানের অলিগলি দেশ-দেশান্তরে পর্যন্ত পৌছে গিয়েও তার পীর সাহেবের আধুনিক খোদা প্রদত্ত চিশতিয়া তরীক্বা বিস্তার করতে পারলেন না। অবশেষে তিনি বহুমুখী হয়ে ১৮২৩ ইংরেজী সৈয়্যদ আহমদ ব্রেলভী সাহেবকে সঙ্গে করে কলিকাতায় উপস্থিত হন। এ উপস্থিতির মূল উদ্দেশ্য ছিল যে, মানুষদেরকে সৈয়্যদী তরীক্বতের যাতাকলে আবদ্ধ করা। ঠিক সে সময় শিখদের বিরুদ্ধে তারা পীর মুরীদ দু'জনই জিহাদ করার জন্য কলিকাতার অধিবাসীদেরকে আহবান করেন। কলিকাতার অধিবাসী মুসলিমগণ ইসমাইল দেহলভীকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, আপনি শুধু শিখ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সৈয়্যদ সাহেবের হাতে বায়'য়াত নিতে চাচ্ছেন, তবে মুসলমানদের পরম শত্রুদল (ইংরেজ জাতি) তাদের বিরুদ্ধে কিছু বলছেন না কেন? ইসমাইল সাহেব তদোত্তরে বললেন, ইংরেজ জাতি হতে আপাততঃ আমাদের তত ক্ষতি হচ্ছে না। তাই আপনারা শিখ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য পীর সাহেব কেবলার সঙ্গে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হউন।

ইসমাইল সাহেবের এ অশ্রুজরা ওয়াজ শ্রবণ করার পর অনেক লোক শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার লক্ষ্যে সৈয়্যদ সাহেবের সঙ্গে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। তবে কলিকাতার কোন মুসলমান সৈয়্যদ সাহেবের হাতে তথাকথিত সৈয়্যদী তরীক্বা তথা তরীক্বায়ে আউর মুহাম্মদীয়ায় বায়'য়াত হননি। তবে সে যে বায়'য়াত করেছিল তা হল বায়'য়াতে জিহাদ।

ইংরেজদের খাদ্য সংগ্রহ ঃ

ইতিহাসের পাতায় সৈয়্যদ আহমদ সাহেব ইংরেজদের নিকট হতে খাদ্য গ্রহণ ও দাওয়াত খাওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন- সৈয়্যদ আহমদ ব্রেলভীর সর্বপ্রথম জীবনী লেখক জনাব জাফর থানেশ্বরী সৈয়্যদ সাহেবের বৃহত্তম জীবনী গ্রন্থ "ছওয়ানেহে আহমদী" ৪৯ পৃষ্ঠায় লিখেন- মুল এবারত উর্দু। যার তরজুমা নিম্নরূপ ঃ

নানা খাদ্য-দ্রব্য নিয়ে একজন ঘোড়ায় চড়ে আসছে। নৌকার নিকট এসে জিজ্ঞাসা করে যে, পাদ্রেরী সাহেব (সৈয়্যদ আহমদ) কই? সালাম ও কুশল বিনিময়ের পর নিবেদন করল তিন দিন হতে এখানে হুজুরের আগমন বার্তার জন্য চাকর নিযুক্ত করা হয়েছিল। সে আমাকে আসার খবর দেয়। এ খাদ্য দ্রব্য হুজুর ও সমস্ত বাহিনীর জন্য তৈয়ার করে নিয়ে এসেছি। দয়া করে গ্রহণ করুন। হযরত স্বীয় বাহিনীকে হুকুম দেন যে, তাড়াতাড়ি খাদ্য নিজ নিজ বর্তনে নিয়ে বাহিনীর মধ্যে বন্টন করে দাও। সে ইংরেজ প্রায় দু'ঘন্টা পর্যন্ত হুজুরের কাছে উপস্থিত থাকে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হওয়া যায় যে, সৈয়্যদ গংরা যদি ইংরেজদের দালাল না হয় তাহলে তাদের থেকে খাদ্য দ্রব্য সংগ্রহ করার অর্থই বা কি?

প্রিয় পাঠক! দাজ্জাল ওলীপুরী সৈয়্যদ আহমদ ব্রেলভী ও ইসমাইল দেহলভীকে ইংরেজ বিরোধী আন্দোলক বলেছে। অথচ উপরোল্লেখিত আলোচনা থেকে প্রমাণিত হলো,

তারা পীর-মুরীদ দু'জনই ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা জায়েয নয় বলেছে। এখন কার কথা বিশ্বাস করব, পীর-মুরীদের কথা না ওলীপুরীর কথা। নিয়ম মোতাবেক পীর-মুরীদের কথাই সঠিক। অর্থাৎ ওলীপুরী যাদেরকে আন্দোলক বলল, তারা বলতেছে ইংরেজের বিরুদ্ধে জিহাদ করা জায়েয নাই। অতএব পুর্ণিমার শশীর ন্যায় প্রমাণিত হয়ে গেল দাজ্জাল ওলীপুরীর দাবী ভিত্তিহীন। আমার মনে হয় ওলীপুরী তার মুরব্বী সৈয়্যদ আহমদ গংদের দালালীকে ধামাচাপা দেয়ার জন্য আলা হযরত ও ওলামায়ে আহলে সুন্নাতকে ইংরেজদের দালাল বলেছে। শেষ পর্যন্ত কেঁচো খুড়তে গিয়ে সাপ বের হয়ে গেল। অর্থাৎ ওলীপুরীর মুরব্বীরাই ইংরেজের দালাল প্রমাণিত হলো।

প্রিয় চিন্তাশীল পাঠক ভাইয়েরা! আমার লেখাটা হচ্ছে আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর জীবন ও কারামত সংশ্লিষ্ট। তাই এ বইয়ে মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী, সৈয়্যদ আহমদ রায় ব্রেলভী ও ইসমাইল দেহলভীর কথা আলোচনা করাটা বাহ্যিকভাবে অপ্রাসঙ্গিক মনে হলেও মূলতঃ অপ্রাসঙ্গিক নয়। কারণ আলা হযরত কেবলার জীবনটা হলো ইংরেজ শাসনামল। সুতরাং আলা হযরত কেবলা কি ব্রিটিশ বিরোধী ছিলেন, না- ব্রিটিশের পক্ষে ছিলেন? একথার আলোচনা করতে গিয়ে প্রসঙ্গক্রমে সৈয়্যদ আহমদ ও ইসমাইল দেহলভীর কথা আলোচনায় এসেছে। আলোচনায় আনার কারণ হলো আমাদের দেশের নব্য দালাল দাজ্জাল ওলীপুরী তার লিখিত 'সুন্নী নামের অন্তরালে' পুস্তকের মধ্যে আলা হযরত কেবলাকে ইংরেজের দালাল বলেছে আর ইংরেজের প্রকৃত দালাল সৈয়্যদ আহমদ গংদেরকে ইংরেজ বিরোধী আন্দোলক বলেছে। তার দাবী যে মিথ্যা তা প্রমাণ করার জন্য সঙ্গত কারণে তাদের কথা আলোচনায় এসেছে। কারণ তাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আলোচনা না করলে মানুষ বিভ্রান্তে পড়ে যাবে।

প্রিয় পাঠক! এ ব্যাপারে আরো সবিস্তারে জানার জন্য অধ্যক্ষ গাজী মফজল আহমদ নঈমী সাহেবের লিখিত ইতিহাসের দর্পনে সায়্যিদ আহমদ ব্রেলভী, অধ্যক্ষ আল্লামা আলহাজ্ব মুফতী মুহাম্মদ ইদ্রিস রেজভী সাহেবের লিখিত ছৈয়দ আহমদ ব্রেলভীকে জানা উচিত, মোহাম্মদ রেদওয়ানুল হক ইসলামাবাদী সাহেবের লিখিত নজদী পরিচয় বইগুলো সংগ্রহ করে পড়ুন। জানতে পারবেন সৈয়্যদ আহমদ গংদের প্রকৃত ইতিহাস কি?

আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা ফাযেলে ব্রেলভীর লিখিত কিতাবসমূহ-

চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দেদে আজম আলা হযরত আজিমুল বরকত ইমামে আহলে সুন্নাত ফখরে যমীন ও যমান আল্লামা মাওলানা হাফেজ ক্বারী মুফতী হাকীম আলহাজ্ব আশ্ শাহ আল মোখ্তার আবদুল মোস্তফা মুহাম্মদ আহমদ রেজা খাঁন ব্রেলভী (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর) এটা একটা উজ্জ্বল কারামত যে, তিনি কেবল ৬৮ বৎসর হায়াত পেয়েছেন তৎমধ্যে থেকে ১৪ বছর বাদদিলে আর থাকে ৫৪ বৎসর। ১৪ বৎসর বাদ দেয়ার কারণ

হল তিনি ১৪ বছর থেকে ফতোয়ার কাজ শুরু করেছেন। ৬৮ থেকে ১৪ বছর বাদদিলে বাকী থাকে ৫৪ বছর। আর তিনি এ ৫৪ বৎসরের মধ্যে ৫৫টি বিষয়ের উপর সহস্রাধিক গ্রন্থ লিখেছেন। কেউ কেউ অবশ্য এ সংখ্যাকে আরো বাড়িয়ে বর্ণনা করেছেন। তাদের মতে আলা হযরত কেবলা ৭০ এর অধিক বিষয়ে অন্তত ১৪০০শত কিতাব লিখেছেন। এ ব্যাপারে মালিকুল ওলামা মাওলানা যাফরুদ্দীন বিহারী হায়াতে আলা হযরতের মধ্যে লিখেছেন আল্লাহ তায়ালা আলা হযরতকে এত অধিক বিষয় জানার অধিকার দিয়েছেন যে, তিনি ৫০টি বিষয়ে কিতাব লিখেছেন। সুলতানুল মোনাজেরিন শেরে বীশিয়া-ই-আহলে সুন্নাত মাওলানা হাশমত আলী লক্ষৌনভী সাহেব তরজুমানে আহলে সুন্নাতের মধ্যে লিখেছেন, আলা হযরতের লিখনী এক হাজারের চেয়ে অধিক। এ কথা সর্বজন বিদীত যে, আলা হযরত কেবলার সময়কালীন বিশ্বে তাঁর মত বিশাল জ্ঞান ভান্ডারের অধিকারী দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি ছিল না। এর পরবর্তীতে আজ পর্যন্ত হয়নি ভবিষ্যতে হবেকিনা আল্লাহ ও তার রাসুল ভাল জানেন। লেখক হিসাবে আলা হযরত কেবলা ২টি কারণে বৈচিত্রময় স্বার্থকতার অধিকারী। প্রথমতঃ আলা হযরত কেবলার মত এত অধিক সংখ্যক বিষয়ে কোন নোবেল বিজয়ী কোন লেখকও আজ পর্যন্ত লিখতে পারেনি। এ কারণে আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ভাইসসেন্সলর ডঃ জিয়া উদ্দীন ১৯১৪ সালে আক্ষেপের সাথে বলেছিলেন আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা ব্রেলভীর নোভেল পুরস্কার পাওয়ার যোগ্যতা রয়েছে। দ্বিতীয়তঃ আলা হযরত কেবলা যে বিষয়ে এবং যখনই কলম তুলেছেন ঐ বিষয়ে তথ্য নির্ভর বিশ্লেষণ পেশ করেছেন যা বিশ্ববাসীকে অবাক করে তুলেছে। তাইতো অনেক মনীষীর মতে আইম্মায়ে মোতায়াখেরিনদের মধ্যে আলা হযরতের সমকক্ষ হওয়ার যোগ্যতা ইমাম জালাল উদ্দীন সুয়ুতী (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি অর্জন করতে পারেনি। এ কারণে বোধহয় শায়েরদের উস্তাদ দাগে দেহলভী বলেছেন সাহিত্য জগতের সম্রাট হে আহমদ রেজা আপনাকে মেনে নিলাম। আপনি যে বিষয়ে কলম তুলেছেন সে বিষয়ে পৃথিবীবাসীকে অবাক করে দিয়েছেন। আলা হযরত কেবলার রচিত কিতাবের সংখ্যা এক হাজারেরও অধিক। তৎমধ্য থেকে যেগুলো প্রকাশিত হয়েছে সেগুলোর তালিকা নিম্নে পেশ করা হল।

তাফসীর-

১. আযযিলালুল আনক্বা আন বাহরে সাবকাতিল আতক্বা (আরবী)।
২. হাশিয়া-এ-তাফসীরে বয়যাবী শরীফ (আরবী)।
৩. হাশিয়া-এ-এনায়াতুল কাজী (আরবী)।
৪. হাশিয়া-এ-মোয়ালিমুত তানজিল (আরবী)।
৫. হাশিয়া-এ-আল ইতকান ফি উলুমিল কোরআন (আরবী)।
৬. হাশিয়া-এ-আদ্ দুররুল মানসুর (আরবী)।
৭. হাশিয়া-এ-তাফসীরে হাযেন (আরবী)।
৮. নায়েলুর রাহি ফি ফারক্কিররিহি ওয়ার রিয়াহি।

৯. আনওয়ারুল হুকুম ফি মায়ানি মিয়াদি ইস্তাজাবালাকুম।
১০. আস্‌সালামসাম আল মুশাক্বক্বাক্ব ফি আয়াতি উলুমিল আরহাম।
১১. আননাফহাতুল ফাতিহা মিন মাসকি সুরাতিল ফাতিহা।
১২. কানযুল ইমান ফি তারজুমাতিল কোরআন।

হাদীস শরীফ-

১. আররাওযুল বাহিজ ফি আদাবিত তাখরিখ (আরবী)।
২. আননুযুমুস সাওয়াক্বিব ফি তাখরিজে আহাদিসিল কাওয়াকিব (আরবী)।
৩. মাদারিজু তাবাকাতিল হাদিস (আরবী)।
৪. ফজলুল ক্বাযা ফি রসমিল ইফতা (আরবী)।
৫. আল বাহাসুল ফাহিম আন তুরুকি আহাদিসিল খাসায়িস।
৬. আসসিমাউল আরবাইন ফি শাফায়াতে সায়্যিদিল মাহবুবীন।
৭. জালালুল আফলাক বিজালালি হাদিসি লাওলাক।
৮. সাইলুল মুদ্দাইলি আহসানিদ্দোয়া।
৯. আম্মাউল হাযাক্ব বি মাসলাকিল নিফাক্ব।
১০. আযাবুল ইমদাদ ফি মুকাফিরাতি হুক্কুল ইবাদ।
১১. আল হাদায়াতুল মোবারাকা ফি খালাক্বিল মালাইকা।
১২. আল হাদ্দুল কাফ লি আহাদিসিদ দ্দোয়াফ (উর্দু)।
১৩. আল আহাদিসিলি আরাবিয়া লিমাদহিল আমীরে মায়াভীয়া।
১৪. আল ইজায়াতুল রাজাভিয়া ফি মাবজালি মাজাতিল বাইয়াহ।
১৫. মুনিরুল আইন (উর্দু)।
১৬. হাশিয়াতুল কাশফি আন তাজাউসি হাজিহিল উম্মতে আনিল আলফি (আরবী)।
১৭. হাশিয়া বোখারী শরীফ (আরবী)।
১৮. হাশিয়া সহীহ মুসলিম শরীফ (আরবী)।
১৯. হাশিয়া তিরিমিজি শরীফ (আরবী)।
২০. হাশিয়া নাসায়ি শরীফ (আরবী)।
২১. হাশিয়া ইবনে মাজাহ শরীফ (আরবী)।
২২. হাশিয়া তায়াসিরে শরহে জামেয়িস সগীর (আরবী)।
২৩. হাশিয়ায়ে তাক্বরীব (আরবী)।
২৪. হাশিয়া মাসনাদে ইমামে আজম (আরবী)।
২৫. হাশিয়া কিতাবুল হাজিজ (আরবী)।
২৬. হাশিয়া কিতাবুল আসার (আরবী)।
২৭. হাশিয়া মাসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (আরবী)।
২৮. হাশিয়া তাহাবী শরীফ (আরবী)।

২৯. হাশিয়া সুনানে দারমী শরীফ (আরবী)।
৩০. হাশিয়া খাসায়েসে কোবরা (আরবী)।
৩১. হাশিয়া কানযুল উম্মাল (আরবী)।
৩২. হাশিয়া তারগীব ওয়াতারহীব (আরবী)।
৩৩. হাশিয়া কিতাবুল আসমা ওয়াস সিফাত (আরবী)।
৩৪. হাশিয়া আল ক্বাওলুল বাদীয় (আরবী)।
৩৫. হাশিয়া নিলুল আওতার (আরবী)।
৩৬. হাশিয়া আল মাকাসিদুল হুসনা (আরবী)।
৩৭. হাশিয়া আল আলিলি মাসনয়াহ (আরবী)।
৩৮. হাশিয়া মাওদুয়াতে কাবির (আরবী)।
৩৯. হাশিয়া আল ইশাবা ফি মারেফাতিস সাহাবা (আরবী)।
৪০. হাশিয়া তাযকেরাতুল হুফফাজ (আরবী)।
৪১. হাশিয়া উমদাতুল ক্বাবী (আরবী)।
৪২. হাশিয়া ফাতুহুল বারি (আরবী)।
৪৩. হাশিয়া এরশাদুল সারি (আরবী)।
৪৪. হাশিয়া নাসবুর রায়াহ (আরবী)।
৪৫. হাশিয়া জামেউল ওসায়েল ফি শারহিশ শামায়েল (আরবী)।
৪৬. হাশিয়া ফয়জুল কদীর শরহে জামেউস সগীর (আরবী)।
৪৭. হাশিয়া মিরকাতুল মাফাতিহ (আরবী)।
৪৮. হাশিয়া আশিয়াতুল লোময়াত (আরবী)।
৪৯. হাশিয়া মাজমাউ বিহারিল আনওয়ার (আরবী)।
৫০. হাশিয়া ফাতহুল মোগাস (আরবী)।
৫১. হাশিয়া মিজানুল এতেদাল (আরবী)।
৫২. হাশিয়া আল ইলালুল মোতানাহহিয়াহ (আরবী)।
৫৩. হাশিয়া তাহজিবুত তাহজীব (আরবী)।
৫৪. হাশিয়া খোলাসাতু তাহজীবিল কামাল (আরবী)।

আক্বাইদ, কালাম, ফিক্‌হ ও তাজবীদ ঃ

১. মাতলাউল কামারাইন ফি এহানাতি সাবকাতিল ওমারাইন (উর্দ্দু)।
২. কাওয়ারেউল কাহহার আলাল মুজাচ্ছামাতিল ফুজ্জার (উর্দ্দু)।
৩. আল আকায়েদ ওয়াল কালাম (উর্দ্দু)।
৪. আল জারহুল ওয়ালেজ ফি বাতনিল হাওয়ারেজ (উর্দ্দু)।

৫. দাউন নিহায়া ফি আলামিল হামদি ওয়াল হেদায়া।
৬. আস সাইয়ুল মাশকুর ফি ইবদায়িল হাক্কিল মাজহুর।
৭. মেইবারুদ তালিব ফি শুউনে আবি তালিব।
৮. ইতেক্বাদুল আহবাব ফিল যিলে ওয়াল মোস্তফা ওয়াল আলে ওয়াল আস।
৯. আল বুসরাল আযিলা মিন তুহফে আজিলা।
১০. মাকামেউল হাদিদ আলা খাদ্দিল মানাতিকিল জাদীদ।
১১. তাজাল্লেউল ইয়াক্বীন বি আন্না নাবিয়্যানা সাইয়্যেদুল মোরসালিন।
১২. হায়াতুল মাওয়াদ ফি বায়ানে সিমায়েল আসওয়াদ।
১৩. আল ফাউকাবাতুশ শাহাবিয়্যাহ ফি কুফরিয়াতে আবিল ওহাবিয়্যাহ।
১৪. আরশুল ইজাজি ওয়াল ইকরাম লি আওযালি মালাকুল ইসলাম।
১৫. জাবুবল আহওয়ায়িল ওয়াহিয়া ফি বাবিল আমিরে মাআওবীয়া।
১৬. ফাতাওয়া আল কুদওয়া লি কাশফি দাফিনিল্লাদোয়া।
১৭. কাওয়ারিউল কাহ্হার আলাল মুজাস্সামাতিল ফুজ্জার।
১৮. ফাতওয়া আল হারামাইন বি রাজফি নাদওয়াতিল মাইন।
১৯. আল মাকালুল রাহি আন্না মুনকিরুল ফিকহি কাফির।
২০. আল মোতামাদুল মোস্তনাদ বেনায়ে নেজাহিল আবাদ।
২১. আসসুওলুল ইক্বাব আলাল মাসিহিল কাজ্জাব।
২২. রাদ্দুর রাফদ্বা।
২৩. দাফয়াতুল রাসআলা জাহিদিল ফাতিহা ওয়াল ফালাকি ওয়ান্নাস।
২৪. কাহুরুদদিয়ান আলা মুরতাদি বি কাদিয়ান।
২৫. হুস্সামুল হারামাইন আলা মানহারিল কুফরি ওয়াল মাইন।
২৬. মুবিনু আহক্বাম ওয়া তাসদিকাতু আলাম।
২৭. তামহিদে ঈমান বি আয়াতে কোরআন।
২৮. দামানে বাগ সিজনিস সুবুহ।
২৯. আল মুবিন খাতামুন নাবিয়্যিন।
৩০. মাক্বালু উরাফা বে ইজামে শারাফা ওয়া ওলমা।
৩১. আল ফুয়ুজাতুল মালাকিয়্যাহ লি মুহিবিব দাওলাতিল মাক্বিয়্যাহ।
৩২. লামআতুশ শাকআ লেহাদায়ে শিয়াতিশ শানআ।
৩৩. আস সিমসামুল হায়দারী আল হুকুক্বিল আয়ারি আল মুফতারি।
৩৪. মুবিনুল হুদা ফিনাক্বিযি ইমকানিল মুস্তফা।
৩৫. আসমারিমুর রাব্বানী আল ইসরাফিল ক্বাদিয়ানী।
৩৬. যাফরুদ্দীন আল জাইয়্যিদ মুলাক্বক্বাবাবিহি বাতশি গাইয়্যিব।
৩৭. আল ফারকুল ওয়াজিব বাইনানা বিয়িল আযিয ওয়াল ওয়াহাবি আর রাজিয।
৩৮. দাওয়ামুল আইশ ফিল আইম্মাতি মিন কুরাইশ।

৩৯. জাল্লবিহুল জুহহাল বিল হাম্মিল বাসিতিল মুতাআল।
৪০. জাওয়ারাহে তুরকি বা তুরকী।
৪১. আব্বায়ে হাতুল আম্বারিয়া আনিল জুমরাতিল হায়দারিয়াহ।
৪২. আখবারিয়্যাহ কি কাশগীরী।
৪৩. চাবুকে লীস বার আহলে হাদীস।
৪৪. আল্লউনিনিরা ফি শারহিল জাউহারি মুলাক্কাব বিহি আননিরা।
৪৫. আহকামুল আহকাম ফিততানাউলি মিন ইয়াদে নিমমালিহি হারাম।
৪৬. আন নাফসুল বাক্কার ফি কোরবানিল বাক্কার।
৪৭. আল আমরু বি এহতেরামিল মাক্কারিব।
৪৮. ইক্কামাতুল ক্বিয়ামাহ আলা তুইনিল ক্বিয়ামী লিনাকীই তাহমা।
৪৯. হুসনুল বারাআ ফি তানফিযি হুকমিল জামায়াহ।
৫০. আননায়িমুল মুকীম ফি ফারহাতি মাওলিদীন্নবীয়্যিল কারীম।
৫১. বাযলুস সাফাহ লিআবদিল মুস্তফা।
৫২. মনিরুল আইন ফি হুকমি তাক্ববিলিল ইবহামাইন।
৫৩. আর মাক্কালাতুল মুসফারাহ আন আহকামিল বিদআতিল মুক্কাফফারাহ।
৫৪. আল মুজাম্মেলুল মাদাদ আন্না সাববল মুস্তফা মুরতাদ।
৫৫. আযওয়াদুল ক্বোরা লিমান ইয়াতলুবুসসিহাতা ফি ইজারাতিল ক্বোরা।
৫৬. নাসিমুস সাবাহ ফি আন্নাল আযানা ইউহাবিবলু আল ওবা।
৫৭. আল আলা মিনাস সুকরি লি তালাবাতি সুকার রাদ্দীসির।
৫৮. জামালুল আজমাল লি তাওক্বিতি হুকমিস সালাতি ফিননাআন।
৫৯. মানযাউল মারাম ফি তাদাওয়ী বিল হারাম।
৬০. মা'দালুযযাল ফি ইসবাতিল হেলাল।
৬১. তাওয়ালিউনুর ফি হুকমিস সিরাজী আলাল কুবুর।
৬২. আল বারিক্বাতুল লুমআ আলা সামিদি নুতক্বি বিল কুফরিতুআ।
৬৩. জামালু মরজিয়্যাহ আন্নাল মাকরুহা তানযিহা লাইসা বি মা'সিয়্যাহ।
৬৪. আনওয়ারুল ইনতিবাহ ফি হাল্লি নাদায়ি ইয়া রাসুলাল্লাহ।
৬৫. আনহারুল আনওয়ার মাই ইয়াম্মাসালাতিল আসরার।
৬৬. আল বাসাতুল মুসাজ্জাল ফি ইমতিনাইয যাউজাতি বাদাল ওয়াত্বী লিল মুয়াজ্জল।
৬৭. হাশিয়াতু শারহে ফিক্বহে আকবর।
৬৮. হাশিয়াতু খায়ালি আলা শারহিল আক্বাইদ।
৬৯. হাশিয়াতু শারাহ আক্বাইদ আসয়াহ।
৭০. হাশিয়াতু শারহে মাওয়াক্বিফ।
৭১. হাশিয়াতু শারহে মাক্বাসিদ।
৭২. হাশিয়াতু মুমামমারাহ ওয়া মুসা ইয়ারাহ।

৭৩. হাশিয়াতু আততাফারারাক্বাত বাইনাল ইসলাম ওয়ায যিনদাক্বাহ।
৭৪. হাশিয়াতু ইয়াওয়াকিদ ওয়াল জাওয়াহির।
৭৫. হাশিয়াতু মেফতাহুস সায়াদা।
৭৬. হাশিয়াতু আসমাওয়াইকুল মুহরিক্বাহ।
৭৭. আননাহি আল আকীদ আনিস সালাতি ওরায়ি আদিত তাক্বলিদ।
৭৮. সাইক্বালুর রাই আন আহকামি মাজাওয়াতিল হারামাইন।
৭৯. আযকাল আহলাল বি ইবতালি মা আহদামান্নাসসু ফি আসর।
৮০. বাবে গোলামে মুস্তফা।
৮১. আত তাজীর বে বাহিত তাদবীর।
৮২. আহসানুল মাক্বাসিদ ফি-বা-য়ানি মা তানাযাহা আনহুল মাসাজিদ।
৮৩. আযিয়ানু কাফিল বে হুকমিল আক্বাদাতি ফিল মাকতুবাতি ওয়ান নাওয়াফিল।
৮৪. সাফায়েহুল লাজাইন ফি কাউনিত তাসাফহ বি কাফিফল ইয়াদাইন।
৮৫. আ'লামুল আ'লাম বি আন্না হিন্দুস্থান দারুল ইসলাম।
৮৬. তিরয়াকুল ওয়ায়ুউ।
৮৭. আল হালঅওয়াহ ওয়অত্তালাওয়াহ ফি কালিমীর তাওজীবি সুজুদিত তিলওয়াহ।
৮৮. হুকমু রুজুও মিন ওয়ালিয়্যি ফি নাফক্বাতিল ওরসি ওয়াল জিহায ওয়াল হুলিয়্যি।
৮৯. আল মুলাখখাতুল মালিহা ফিমা নাহা আল আজযায়্যিল যাবিহা।
৯০. আযযাহারুল বাসিমা ফি হুরমাতিয যাকাতি আল বনী হাশিম।
৯১. তাজাল্লিউল মিশকাত লি আনারাতি আসআলাতিয যাকাত।
৯২. আততাবসিরুল মুনজিদ বে আন্না সাহনল মামজিদি মাসজিদ।
৯৩. হাক্কুল আইব ফি হুরমাতি তাসওয়িদুশশাইব।
৯৪. হুক্কাতুল মারজান লি মুহিম্মি হুকমিদ দুখখান।
৯৫. এ'বাবুল আনওয়ার লা নিকাহা বি মুজাহিরদিল ইক্বরার।
৯৬. আল হুজ্জাতুল ফায়িহা লি তাবিবি তাআইয়নি ওয়াল ফাতিহা।
৯৭. সুরুরুল ঈদিস সায়্যিদ ফি হাল্লিদ দোয়ায়ি বাদা সালাতিল ঈদ।
৯৮. আস সাফিআতুল মাওয়্যিাহ লি হুকমি জুলুদিল আদহিয়্যাহ।
৯৯. আত্তারাফি সাতরিল আওরাহ।
১০০. আল হারফুল হাসান ফিল কিতাবাতি আলাল কাফান।
১০১. আল বাহরুল মাকাল ফি ইসতেসানি কিবলাতিল আজলাল।
১০২. ফাতহুল মালিক ফি হুকমিত তামলিক।
১০৩. আওয়্যিবুল ওয়াজিয ফি ইমতিআতিল ওয়ারক্বি ওয়াল ইবরিয।
১০৪. রাফিউল মাদারিক ফি হুকমিসাওয়াইব ওমা তারাহাল মাসালিক।
১০৫. জালালুস সাউতি লিনাহিদ্দাওয়াতি আমামাল মাউতি।
১০৬. ইয়াসিরুযযাদ লি উম্মি দ্বাদ।

১০৭. আল আমনু ওয়াল উলা লি নায়াতিল মুস্তফা বিদাফাইল বলায়া।
১০৮. বারাকাতুল ইমদাদ লি আহিলিল ইমতিমদাদ।
১০৯. বাযলুল জাওয়াইয আলাদ্দুয়াই বাদাল সালাতিল জানাইয।
১১০.রাহিকুল আহক্বাক্ব ফি কালিমাতিত্তালাক।
১১১.আল মান্নু ওয়াদ্দুর লিমান আমাদা মিন্নি আবদার।
১১২.ওয়াসাহুল জাইয়্যিদ ফি তাহলিলি মুয়ানাক্বাতিল ঈদ।
১১৩.ওসাফুর রাজিম কি বাসমালা তিত্তারাওয়ীহ।
১১৪.আল ক্বালাদুল মুরসায়া ফি লাবখিল আজুবাতিদ আরবায়া।
১১৫.সুবুলুল আসফিয়া ফি হুকমিয যিবহী লিল আউলিয়া।
১১৬.সাতরে জমিল ফি মাসায়েলেস সারাওয়ীল।
১১৭.আত্তাইবুত্তাহানী ফিন্নিকাহসিসানী।
১১৮.রাদ্দুল ক্বাহাতি ওয়াল ওয়াবা বেদাওয়াতিল জিরানী ওয়া মাওয়াসাতিল ফুক্বারা।
১১৯.সালবুসসালাব আনিল ক্বায়েলিনা বি তাহারাতিল কালব।
১২০. রিয়াতুল মিন্না ফি আনাত্তাহাজ্জুদ নাফলুন আও সুন্নাহ।
১২১.হাক্কুল আহক্বাক্ব ফি হাদিসাতি মিন নাওয়াযেলিত্তালাক্ব।
১২২.হাজিযুল বাহরাইন আল ওয়াক্বি আন জামিউসসালাতাইন।
১২৩. লাওয়ামেউল বাহা ফিল মিসলি লিল জুমাআতি ওয়াল আরবাআ আক্বিবাহা।
১২৪. আল কাসদ্দেহাক্ব বি ইযা ফাতিততিলাক্ব।
১২৫. আল কুতুকুদ্দানিয়া আন আহমালিল জামাতি সানিয়া।
১২৬.আররাদ্দুল আশাদ্দুল বাহি ফি হিজরীল জামায়াতি আলা গাংগোহী।
১২৭. নাক্বদুল বয়ান লি হুরমাতি ইবনাতি আখল্লিবান।
১২৮. হাদিউল আসাহিরা বিশশাইল হিন্দিয়া।
১২৯.লাময়াতুদ্দোহা ফি এফাইল্লোহা।
১৩০. আনাহিউল হাবিজ আন তাকরারি সালাতিল জানাইয।
১৩১.শেফাউল ওয়ালা ফি সুয়ারিল হাবিবী ওয়ামাযারিহি ওয়ানায়ালীহি।
১৩২. মুরাব্বে ওয়ান নাজা ইউখার রেজুন্নিয়া।
১৩৩. তাজওয়ীযুররাদ্দি আন তাজওয়ীযুল আবয়াদ।
১৩৪. হিবতুন্নেসা ফি তাহাক্বিক্বিল মাসাহিরা বিযযিনা।
১৩৫. আল এলাম বেহালিল বুখুরি ফিস সিয়াম।
১৩৬. আত তাহারিরুল জাইয়্যিদ ফি বাইয়্যি হাক্বিক্বুল মাসজিদ।
১৩৭. আল ওফাকুল মাতিন বাইনা সিমাইদ্দাফিন ওয়া জাওয়াবুল ইয়ামিন।
১৩৮. ইযালাতুল আরবি হাজরিল কিরামদ আন কিল্লা বিন্নার।
১৩৯. তাফাসিরুল আহকাম লি ফিদায়াতিল সালাতিওয়াস সিয়াম।
১৪০. আন্নাহজুল জাদ্দি ফি হিফযিল মাসজিদ।

১৪১.আশ শারাতুল বাহিয়্যাহ ফি তাহাদিদিল ওয়াসিয়াহ।
১৪২. মাহিউদ্দালালাহ ফি আন কাহাতিল হিন্দী ওয়াল বানজালা।
১৪৩. আল জামুস সাদ আন সুনানিদ্বোয়াদ্ব।
১৪৪. আবজালুল ইবদা ফিহাদ্দির রিদ্বাআ।
১৪৫. লাব্বুশ শুউর বি আহকামিশ শুউর।
১৪৬. খায়রুল আমাল ফি হুকমিল কাসবি ওয়াস সোয়াদ।
১৪৭. আল ফিক্বহুত তাসজিলি ফি আজিনিন্নার জিলি।
১৪৮. আফসাহুল বায়ান ফি হুকমি মাযারায়ে হিন্দুস্থান।
১৪৯. আল হিলাতুল আসমা লি হুকমি বাদিল আসমা।
১৫০. তারিক্ব ইসবাতুল হেলাল।
১৫১.তিজানুসসাওয়ার ফি ক্বিয়ামুল ইমাম ফির মিহরাব।
১৫২. নুরুল জাওহারাহ ফিস সামরাতিস সাওকারাহ।
১৫৩. আল আহকাম ওয়াল এলাল ফিল আশকালিল এহতেলাম ওয়ালা বালাল।
১৫৪. মেরকাতুল জামান ফি হুবুতিল আনিল মিম্বারী লি মাদহিল সুলতান।
১৫৫. আজলুত তাজিল ফি হুকমিস সিমাই ওয়াল মাযামির।
১৫৬. রাময়ে মাগয়ান মারুফ বি দাফই যেগেযাগ।
১৫৭. আউফি লুমআ ফি আযানিল জুমআ।
১৫৮. আল ফাহহুল হুমুমাহ ফি ফাসলিল খুসুমাহ।
১৫৯. আয়ালিল একাদাহ ফি তাযিয়াতিল হিন্দীওয়াবায়ানিশ শাহাদা।
১৬০. আফকাহুল মাজাদিহি আন হালফিতত্বলিব আলা তালাবিল মাওয়াসাবা।
১৬১.আক্বদুত তাহক্বিক্ব বি বাবিত তালিক্ব।
১৬২.এহলাকুল ওয়াহাবিয়্যিন আলা তাউহীনে কুবুরিল মুসলিমীন।
১৬৩. হেদায়াতুল জেনান বি আহকামে রামাদ্বান।
১৬৪. হাদিউনাস ফি আশিয়াই মিন রুসুমল এরাস।
১৬৫. আলআতায়াতুন ন্নাবরিয়্যাহ ফি ফাতাওয়া আররাজওয়াইয়া।
১৬৬.মাউইহাবেবলু আসর আন তাহদিদিল মিসর।
১৬৭. রাদ্দুল ক্বাদাতি ইলা হুকমিল উলাতি।
১৬৮. আল জুদুল হুলু ফি আরকানিল উযু।
১৬৯.তানওয়ীরুল ক্বিনাদিল ফি আহকামিল মিনদীল।
১৭০. আত্তারায়ুল মু'ল্লীম ফিমা হুয়া হাদ্দামা মিন আহওয়ালি লিদাম্মী।
১৭১.লামউল আহকাম আন্না লা ওযুআ মিনায যুকাম।
১৭২. হেদায়াতুল মুতাআল ফি হাদ্দিল ইসতেক্ববাল।
১৭৩. আল হাক্বুল মুজতালি ফি আহকামিল মুবতালি।
১৭৪. ফিফলুল ফক্বীহিল ফাহিম ফি আহকামি কিরতাসিদ্দারাহিম।

১৭৫. নাবহুল কাওমী আন্নাল ওযুআ মিন আইয়্যে নাওমি।
১৭৬. তাসিরুল মাউন লিস সুকনি ফিততাউন।
১৭৭. আসসাহমুসশিহাবি আল বিদ্দায়িল ওয়াহাবী।
১৭৮. ফিক্বহে শাহেনশাহ ওয়া আন্নাল কুলুবিইয়াদিল মাহবুব।
১৭৯. মাফাদুল হিবরি ফিস সালাতি বিমাক্ববারাতি আউ জুনুবী ক্ববরী।
১৮০. বদরুল আনওয়ার ফি আদাবিল আসার।
১৮১.আল হাদিল হাজির আন জানাযাতির গায়িব।
১৮২. শামামাতুল আম্বার ফি মাহাল্লিন্নাদায়ি বি আযায়িল মেম্বার।
১৮৩. আত্তাররাতুর রাদ্বিয়া আলান্নিরাতিল ওয়াযিয়া।
১৮৪. শামামাতুল আম্বার ফি মাহাল্লিন্নাদায়ি বি আসায়িল মেম্বার।
১৮৫. ফাসলুল ক্বাযাই ফি রাসমিল ইফতায়ি।
১৮৬. আল জাওহারুস্সামিন ফিমা তানআক্বিছ বিহিল ইয়ামীন।
১৮৭. আওরাতুয মুহাযযার ফিততাযওয়জি বি গাইবি কুফহিল ওয়া মুখালিফিল মাযহার।
১৮৮. আবকারিউ হামান ফি ইজাবাতিল আযান।
১৮৯. শাওয়ারেকুন নেসা ফি হাদ্দিল মিসরী ওয়াল ইসমা।
১৯০. লাময়াতুশশাময়া ফি ইশতেরাতিল মিসরী লিশ শামমা।
১৯১.আল বুদুরুল আহিল্লা ফি উমুরিল আহিল্লা।
১৯২.নুরুল আদিল্লা ফি উমুরিল আজিল্লাহ।
১৯৩. রাফউল ইল্লা আন নুরুল আদিল্লাহ।
১৯৪. আল লুলুউল মাকসুদলিবায়ানি হুকমি ইমরাতিল মাফকুদ।
১৯৫. ইযানুল আজার ফি আযানিল বাক্বার।
১৯৬.বিয়াতুল মুহাযযেবীন ফি দোয়াই বাদাল খুতবাতাইন।
১৯৭. রিসাকাতুল কালাম ফি হাওয়াশি ইযাকাতু আসাম।
১৯৮. আল বায়ানু শাফিয়া লি ফুতুগ্রাফিয়া।
১৯৯.জাদ্দুল মোনাতাকাত মিন রাদ্দিন মোখতার।
২০০. আত্তাজুল মুক্কাল্লাল ফি আনারাতি মাদলুল কানা ইয়াফয়াল।
২০১. আসসুয়ুফুল মাখিফা আলা আয়েবী আবী হানিফা।
২০২. আসানুকাত বি জাওয়াবি সওয়ালে আরকাত মুলাক্বাব বিহিল ফাদ্দল।
২০৩. আতাযেবুসসায়ের ফিতাহক্বিক্বি মিলি ওয়াযযেরাই ওয়াল ফারাসেক ওয়াল গালওয়াহ।
২০৪. আল মাকসাদুন্নাফে ফি উসুবাতিয়ে সিনফিল রাবে।
২০৫. তাইয়্যেবুল ইমআন ফি তাদাদিল জিহাত ওয়াল আবদান।
২০৬. তাজাল্লিয়াতুল মুসলিম ফি মাসাইলে মিন নিসাফিল ইলম।
২০৭. বারাত নামা আনজুমানে ইসলামীয়া বাঁশ রেরেলী।

২০৮. নিয়ামুযযাদ লি রাদ্দেমিন আদ্দাস।
২০৯. আসাদুস সুয়ুল আলা ইজতেহাদিত তারারিল জুজহুল।
২১০. মুযাম্মন নাসরানি ওয়াত তাক্বসীমিল ঈমানী।
২১১.ইজতেনাবুল উম্মাল আনফামু ওয়াল জুহহাল।
২১২.সাইফে ওয়েলায়াতী বার ওয়াহিমে ওয়েলায়াতা।
২১৩. আল বারক্বুল মুখাইব আলা বেক্বাই তায়্যিব।
২১৪. আল ইতরুল মুতায়্যব লি নিয়াতি শাফতু তাইয়্যেব।
২১৫. আল আমামাতুল কাসিফাহ লিল কুফরিয়াতিল মালাতিফা।
২১৬.আল জাইফা আলা তাহাফাতিল মালাতিফা।
২১৭. সায়াতুল মুয়াদ্দিব আল রাহবাতিল মুসতারিব।
২১৮. আররাদ্দুন্নাহিয আলা সামিন্নাহি ইলহাজিব।
২১৯.নাফিউল আরমিন মা'য়াইবিল মাওলুভী আবদুল গাফফার।
২২০. ক্বাওয়ানিনুল ওলমা।
২২১.সাদ্দুল ফারার।
২২২. তীবওয়ীবুল আশবাহ ওয়ান্নযাইর।
২২৩. আজাল্লিয়ে নুজুমে রাজমে বার এডিটর আন্নাজম।
২২৪. আসসাইফুল সামদানী।
২২৫. আত্তুল বাদাল বাদীয়া।
২২৬. হাশিয়াহ ফাওয়াতিহুল রাহমাত।
২২৭. হামওয়ী শারাহ আল আসরা।
২২৮. হাশিয়াহ আসয়াফ আল আসবা ওয়ান নাযাইর।
২২৯. হাশিয়াহ আল আসয়াফ ফি আহকামুল আওক্বাফ।
২৩০. হাশিয়াহ ইফতাহুল আবসার।
২৩১. হাশিয়াহ কাশফুল গুম্মাহ।
২৩২. হাশিয়াহ শোয়াউস সেফার।
২৩৩. হাশিয়াহ কিতাবুল হুরাজ।
২৩৪. হাশিয়াহ মঈনুল হুক্কাম।
২৩৫. হাশিয়াহ মিযানুল শারিয়াতিল কুবরা।
২৩৬. হাশিয়াহ হেদায়াতুল আখেরীন।
২৩৭. হাশিয়াহ হেদায়াতুল ফাতহুল ক্বাদির ইনাইয়া হালবি।
২৩৮. হাশিয়াহ বাদায়ে উস সানায়ে।
২৩৯. হাশিয়াহ জাওয়াহেরা নিরাহ।
২৪০. হাশিয়াহ জাওয়াহীরে আখলাতী।
২৪১. হাশিয়াহ মারাক্বেউল ফালাহ।

২৪২. হাশিয়াহ মাজমাউল আনহার।
২৪৩. হাশিয়াহ জামেউ ফুসুলীন।
২৪৪. হাশিয়াহ জামেউল রুমুয।
২৪৫. হাশিয়াহ বাহরুর রাইক্ব।
২৪৬. হাশিয়াহ তাবাইয়্যেনুল হাক্বায়েক্ব।
২৪৭. হাশিয়াহ গুনিয়াতুল মুমতালি।
২৪৮. হাশিয়াহ ফাওয়াইদু কুতুবী আদীদা।
২৪৯. হাশিয়াহ কিতুবুল আনোয়ার।
২৫০. হাশিয়াহ বাসাইলু শামী।
২৫১. হাশিয়াহ ফাতহুল মুয়ীন।
২৫২. হাশিয়াহ শেফাউল আসক্বাম।
২৫৩. হাশিয়াহ তাহতাওয়ী আনাল রাদ্দুল রীল মুখতার।
২৫৪. হাশিয়াহ ফাতওয়া খানিয়া।
২৫৫. হাশিয়াহ ফাতওয়া সিরাজিয়া।
২৫৬. হাশিয়াহ খুলাসাতুল ফাতওয়া।
২৫৭. হাশিয়াহ ফাতাওয়া খাইরিয়া।
২৫৮. হাশিয়াহ উকুদুদ্দায়।
২৫৯. হাশিয়াহ হাদিসিয়া।
২৬০. হাশিয়াহ বাযাযিয়াহ।
২৬১.হাশিয়াহ ফাতাওয়া যারবিনিয়াহ।
২৬২. হাশিয়াহ ফতোয়া গিয়াসিয়াহ।
২৬৩. হাশিয়াহ রামাইলু ক্বাসিম।
২৬৪. হাশিয়াহ ইসলাহ শরহুল ফাইয়াহ।
২৬৫. হাশিয়াহ ফাতাওয়া আযিযিয়া।
২৬৬. হাশিয়াহ রাসাইলুল আরকান।
২৬৭. হাশিয়াতুল এলাম বিকুনিইল ইসলাম।
২৬৮. জাদ্দুল মুমতার কামিল (পাঁচ খন্ড) আরবী।

তাসাউফ, আযকার, আওফাক্ব, তাবীর এবং আখলাক-

১. আযহারুল আনোয়ার মান সাববাহ সালাতাল আসরার (আরবী)।
২. আল ইয়াকুতাতুল ওয়াসিতা ফিক্বালবি আক্বদির রাবিতা। (উর্দ্দু)।
৩. কাশফে হাক্বাইক্ব ওয়া আসরার ওয়া দাক্বাইক্ব।
৪. বাওয়ারিক্বে তুলুহ মিন হাক্বিক্বাতির রূহ।
৫. আততালাত্তুফ বে জাওয়াবে মাসাইলে তাসাউস।
৬. নুক্বাউসউস সুলাফা ফিল বাইয়াতে ওয়াল খেলাফা।

৭. যাহরুস সালাত মিন শাজারাতি আকারিমিল হুদাত।
৮. আল উরুসুল মু'তার ফি যামানে দাওয়াতিল আফতার।
৯. আল মান্নাতুল মুমতাযা ফি দাওয়াতিল জানাযা।
১০. মাকাল্লা ওয়া কাফা মিন আদইয়াতিল মুস্তফা।
১১. আল ফাউয বিল আমাল ফিল আওফাক্ব ওয়াদ্দোয়া (আরবী-উর্দ্দু)।
১২. শারহিল হুক্বুক্ব লে তাহরিল উক্বুক্ব।
১৩. মাসআলাতুল ইরশাদ ইলা হুক্বুক্বিল ইবাদ।
১৪. আ'যাউল ইকতিনা ফি রাদ্দে সাদক্বাতি মানেউয যাকাত।
১৫. হাশিয়াতু ইয়াহইয়াউল উলুম (আরবী)।
১৬. হাশিয়াতু হাদিক্বায়ে নাদিয়াহ (আরবী)।
১৭. হাশিয়াতু মাদখাল ১ম-২য়-৩য় (আরবী)।
১৮. হাশিয়াতু কিতাবুল ইবরিয (আরবী)।
১৯. হাশিয়াতু কিতাবুয যাওয়াজির (আরবী)।
২০. হাশিয়াতু তা'তীরিল আনাম (আরবী)।

তানক্বীদ-

১. হাল্লু খাতাইল খাত্তি।
২. আন নাযিরুল হাইল লি কুল্লি জালফি জাহিল।
৩. আল এহলাল বি ফাইযিল আউলিয়ায়ে বাদাল ওয়ীসাল।
৪. আল আদীল্লাতু ত্বায়ীনা ফি আযানিল মালায়িনা।
৫. আন্নিরুশ শাহাবি আলা তাদলীসিল ওয়াহাবী।
৬. ফাইহুন্নাসেরীন বি জাওয়াবিল আস ইলাতিল ইশরিন।
৭. মুরাসাতে সালাতে ওয়া নাদওয়া।
৮. মাওয়ালাতে হাক্বাইক্বে নুমা বারদোসে নাদওয়াতিল ওলমা।
৯. তরজুমাতুল ফাতাওয়া ওয়াজজাহা হাদমিল বালওয়া।
১০. খুলাসা ফাওয়াদে ফাতাওয়া।
১১. রাফিউত তায়াসসুফ আনিল ইমাম আবি ইউসুফ।
১২. আল জাসাউল মুহাইয়া লা'নাতু কানাহিয়া।
১৩. ইযাহারুল হাক্বেল জবল্লি।
১৪. মারেকুল জুরুহ আলা তাওহীবিল মাকরূহ।
১৫. তানক্বীদ।
১৬. হাশিয়াহ রাসায়েলুল আরকান।
১৭. বাইবেল মুসদাহ আরাদে কায়ফার কুফরানে নাসারা।
১৮. ইসলাহুল নাযির।
১৯. আহকামুল বাহাস আলা আহলীল হাদীস।

২০. খুলাসাতু ফাওয়াদে ফতোয়া।
২১. আল বারেকাতুশ শারেকা আলাল মারেক্বাতুল মাশারেকা।
২২. ইতানুল আরওয়াহ লি দাইয়ারেহিম বাদাল আরওয়াহ।
২৩. মুরতাজিউল ইজাবাত লে দোয়াইল আমওয়াত।
২৪. সাইফুল মুস্তফা আলা আদইয়ানিল ইফতিরা।
২৫. ফাতহু খায়রব।
২৬. নিশাতুসসিক্বীন আলা হালক্বিল বাক্বরিস সামিন।
২৭. সামসামে হাদিদ বর কোলিয়ে বে কাইদ আদুও ওয়াতাক্বলীদ।
২৮. নিহায়াতুন নুসরাহ বরদালে আজুবাতিল আশারাহ।
২৯. ইনতেসারুল হুদা মিন শুইবিল হাওয়া।
৩০. হাশিয়াতু হামওয়ী শারহুল আশবাহ ওয়ান্নাযাইর।
৩১. গাযওয়াহ লি হাদাম সিমাকী দারুন্নাদওয়া।
৩২. নাদওয়াহ কাতিজা রুদাদে সোমকা নাতিজা।
৩৩. বারিশে বাহারি বর সাদফে বিহারী।
৩৪. সুয়ুফুল আনওয়া আলা যামায়েমুন্নাদওয়া।
৩৫. সামসামে সুন্নীয়াত বে গুলোয়ে নাজদিয়্যাত।
৩৬. সামসামুল কাইউম আলা তাজিন্নাদওয়া আবদিল কাইয়ুম।
৩৭. ফারদাহ দার আমরিতসারী।
৩৮. আল আসলাউল ফাযেলা আলাত তওয়াইল বাবিলাহ।
৩৯. সাওয়ালামে ওলামা ওয়া জাওয়াবাতে নাদওয়াতুল ওলমা।
৪০. কায়ফারে কুফরে আরিয়া।
৪১. নূরে আইনী ফিল ইনতিসারিল ইমাম আইনী।

তারিখ, সিয়ার, মানাক্বিব এবং ফাযাইল-

১. জামেউল কোরআন ওয়া যাম্মে গাযাওয়ায়ে লে উসমান।
২. জামানুত তাজ ফি বায়ানিস সালাত ক্বাবলাল মিরাজ।
৩. নুতফুল হেলাল বারিখি ওয়ীলাদাল হাবিব ওয়াল ওয়ীসাল।
৪. মুসাম্মাউল মুনিয়া লি উসুলিল হাবিব ইলাহ আরশী ওয়াররুয়ীয়াহ।
৫. জালিবুল জিনান ফি রাসমি আহরুফিল মিনাল কোরান।
৬. সালাম ওয়াশের।
৭. আল কালাম লিল বাহি ফি তাশবিহিস সিদ্দীক্ব বিন্নবী।
৮. ওয়াজাহিল মাশকুক্ব বি জালওয়াতি আসমাইস সিদ্দীক্ব ওয়াল ফারুক্ব।
৯. নফীউ আলফে আম্মা বিনুরিহী আনারা কুল্লা শাইয়্যিন।
১০. সালাতুল মুস্তফা ফি মুলুকীল কুল্লিল ওয়ারাহ।
১১. আজলালু জিবরীল বিজালিহি খাদিমান লিল মাহবুবিল জলিল।

১২. মাদ্দাল হায়রান ফি নফীইল ফাইয়ে আন মাসসিল আকওয়ান।
১৩. মুজীরে মুয়াযযাম শরহে কাছিদাহ একসিরে আযাম।
১৪. আল উরুসুল আসমাউল হুসনা ফিমা লি নাবীয়্যানা মিনাল আসমাউল হুসনা।
১৫. তানযিউল মাকানাতিল হায়দারীয়াহ আন ওয়াসমাতি আহাদিল জাহেলিয়াহ।
১৬. আনযাউল বারী আন ওয়াস ওয়াসিল মুফতারি।
১৭. জামিলী সানাউল আইম্মাহ আলা ইলমি সিরাজিল উম্মাহ।
১৮. শুমুলুল ইসলাম লি আবায়েলের রাসুলিল কেরাম।
১৯. আম্মাউল মুস্তফা বি হালি সিররিন ওয়া আখফা।
২০. আদ্দাউলাতুল মাক্কীয়াহ বিল মাদ্দাতিল গাইবিয়্যাহ।
২১. ক্বামরুত্তামাম ফি নাফই আনফি আন সাইয়্যিল আনাম।
২২. ফাতওয়া কারামাতে গাউছিয়া।
২৩. দেওয়ানুল কাসায়েদ।
২৪. ইকসিরে আযম।
২৫. সিলসিলাতুব যাহার নাফিইয়াতুল আদাব।
২৬. জারিয়ায়ে ক্বাদরীয়া।
২৭. ফাযায়েলে ফারুক।
২৮. নসমে মুয়াততার।
২৯. মুশরেক্বিসতানে কুদস।
৩০. চেরাগে উনস।
৩১. ওয়াযিফায়ে ক্বাদেরীয়াহ।
৩২. হুজুরে জানে নূর।
৩৩. নাত ওয়া ইসতেযারাত।
৩৪. সারাপা নূর।
৩৫. মানাক্বেবে সিদ্দীকা।
৩৬. হামায়েলু ফাযলে রাসুল।
৩৭. নাযারগুদা দার তাহনিয়াতে শাদিয়ে উশরা।
৩৮. সিররে গুযাশত ওয়ামা জারায়ে নাদওয়া।
৩৯. ইবরাউল মাজনুন আলা ইনতিহাকে ইলমিল মাকনুন।
৪০. মাহিয়াতুল আইব বি ঈমানিল গাইব।
৪১. সাবিলূল হুদা লি বারেয়ে আইনিল কুযা।
৪২. আরাহাতু জাওয়ানেহুল গাইবে আন ইযাহাতিল আইব।
৪৩. আল জালাউল কামিল কা আইনি কুযাতিল বাতিল।
৪৪. হাশিয়াহ হাশিয়াতু হামযিয়া।
৪৫. হাশিয়াতু শরহে শিফা।

৪৬. হাশিয়াতু যুরক্বনী শরহে মাওয়াহীব।
৪৭. হাশিয়াতু বাহজাতুল আসরার।
৪৮. হাশিয়াতু আল ফাওয়াইদুল বাহিয়াহ।
৪৯. হাশিয়াতু কাশফুস যুনুন।
৫০. হাশিয়াতু আসরুশ শারিদ।
৫১. হাশিয়াতু খোলাসাতুল ওয়াফা।
৫২. হাশিয়াতু মুক্বাদ্দামা ইবনি খুলদুন।

আদব, নাহু, লোগাত, উরুয-

১. ইতহাফুল হালী লেবিকরে ফিকরীস সাম্বালী (উর্দু)।
২. তাবলীগুল কালাম ইলা মাদহিল কামাল ফি তাহক্বীক্বি ইসালাতুর মাসদারে ওয়াল আফয়াল (আরবী)।
৩. আযযামযামাতুল ক্বামারিয়াহ (উর্দু)।
৪. সানায়ে বাদিয়া।
৫. ফাতহুল মা'তি বি তাহক্বীক্বি মায়ানাল খাতি ওয়াল মুখতি।
৬. শরহে মাকালাতু মাযাকিয়াহ।
৭. মুশতারে ক্বিতানে আক্বাদাঁছ।
৮. আজাবু আদনা বার আদাদে আদনা।
৯. কামালুল আবরার ওয়া আলামুল আশরার।
১০. হাশিয়াতুল সুরাহ (আরবী)।
১১. হাশিয়াতু তাজুল উরুস (আরবী)।
১২. হাশিয়াতু মিযানুল আফকার (ফার্সী)।
১৩. হাদায়েক্বে বখ্শীশ।

ইলমে যুফর ওয়া তাকসীর ঃ

১. আততায়েবুল একসীর ফি ইলমে তাকসীর (আরবী)।
২. রিসালাহ দর ইলমে তাকসীর (ফার্সী)।
৩. ১১৫২ মুরাববায়াত (উর্দু)।
৪. আসসাউকাবুর রেজভীয়্যাহ আলাল কাওয়াকেবিল দ্দোররিয়া (আরবী)।
৫. আদদাওয়ালুল রজভীয়্যাহ লিল আমালিল জাফারিয়া (আরবী)।
৬. আল ওসায়েলুর রজভীয়্যাহ লিল মাসায়েলিল জাফারিয়া (আরবী)।
৭. মুজতালাল উরুস (উর্দু)।
৮. আল জাফরুল জামেয়ে (উর্দু)।
৯. আসহালুল কুতুব ফি জামিইল মানাযিল (আরবী)।
১০. রিসালাতুল ফি ইলমিল জাফার (আরবী)।
১১. আল জাদাওয়ালুর রেজভীয়্যাহ লিল মাসায়িলিল জাফরিয়াহ।

১২. আল আজবাতুর রেজভীয়্যাহ লিল সামায়েলিল জাফারিয়া।
১৩. হাশিয়াতু দুররুল মাকনুন (আরবী)।

জাবার ওয়া মুকাবিলা ঃ

১. হাল্লে সাফাতাহায়ে দরজায়ে মোম (ফার্সী)।
২. হীললুল মু'আদেলাত লি কাবিইল মুকাববায়াত (ফার্সী)।
৩. রিসালায়ে দর জাবরু মুক্বাবালা (ফার্সী)।
৪. হাশিয়াতু কাওয়াইদ আল জালিলাহ (আরবী)।

তাওক্বীত, নুজুম, হিসাব ঃ

১. ইসতিনবাতুল আওক্বাত (ফার্সী)।
২. রুইয়াতে হেলালে রমযান শরীফ (ফার্সী)।
৩. মাসউলিয়াতিস সেহাম (ফার্সী)।
৪. আল বোরহানুল ক্বাওয়ীম আলাল আরদে ওয়াত তাক্বওয়ীম (ফার্সী)।
৫. আল জুমালুদ দ্দায়েরাহ ফি খুতুতি দ্দায়েরাহ (ফার্সী)।
৬. তাসহীলুল তা'দীল (উর্দু)।
৭. ময়লুল কাওয়াকিব ওয়াতা'দীলুল আয়্যাম (উর্দু)।
৮. ইসতিকারাজু তাক্বিমাতে কাওয়াকেব (ফার্সী)।
৯. তুলু ওয়া গুরুবে নিরাইন (উর্দু)।
১০. তাজে তাওক্বীত (উর্দু)।
১১. তারজুমাহ ক্বাওয়াদে নাইটিকাল আল মিনক (উর্দু)।
১২. জাদওয়ালে আওক্বাত (উর্দু)।
১৩. হাশিয়াহ যুবদাতুল মুন্তাখাব (আরবী)।
১৪. হাশিয়াহ জায়েউল আফকার (আরবী)।
১৫. হাশিয়াহ হাদায়েক্বুন নুজুম (আরবী)।
১৬. হাশিয়াহ খাজানাতুল ইলমি।
১৭. যিজুল আওক্বাদ লিস সাওমে ওয়াসসালাম।
১৮. আল আনজাবুল আনীক্ব ফিতুরুকীত তালিক্ব।
১৯. কালামুল ফাহিম ফি সালাসিলিল জামই ওয়াততাক্বসীম।
২০. কাশফুল ইল্লাহ আন সিমতিল ক্বিবলাহ।
২১. আজকাল বাহা ফি কুয়াতিল কাওয়াক্বীব ওয়া যোফিহা।
২২. দারউল কুবহী আন দারক্বী ওয়াক্বতিস সুবহী।
২৩. সিররুল আওক্বাত।

ইলমে মুসল্লোস, ইরসিমাতিক্বী, লোগারসাম ঃ

১. রিসালা দার ইলমে মুসাল্লাস (ফার্সী)।
২. তালখীসে ইলমে মুসল্লোস কুরদী (ফার্সী)।

৩. উজুযহায়া মুসাল্লাম কুরদী (ফার্সী)।
৪. আল মাওহিবাত ফিল মুরাববাত (আরবী)।
৫. কিতাবুল ইরসিমাতিক্বী।
৬. রিসালা দার ইলমে লাওগারেসাম।
৭. আল বুদুর ফি আউজিল মাজযুর।
৮. হাশিয়াহ রিসালায়ে ইলমে মুসাল্লাম (ফার্সী)।

হাইয়াত, হিনদাসা, রিয়াযি ৪

১. মাক্বালাহ মুফরাদাহ (উর্দু)।
২. মায়াছানে উলুমি দারসুনানে হিজরী ঈসায়ী ওয়ারুমী (উর্দু)।
৩. তুলু ওয়াগুরুব কায়াকিব ওয়া ক্বামার (উর্দু)।
৪. কানুনে রুয়াতে আহীল্লাহ (উর্দু)।
৫. কাসওয়ায়ে আশারিয়াহ (উর্দু)।
৬. আল মায়ানাল মুজাল্লী লিল মুগনী ওয়াযিল্লী (ফার্সী)।
৭. যাওবীয়া ইখতেলাফীল মানযার (ফার্সী)।
৮. আছমারাহুল মাওজীব ফি তাদিলিল মারকায (ফার্সী)।
৯. আল বদুর ফি আউযিল মাজযুর (ফার্সী)।
১০. আযমুল বাযী ফি জাওয়ারীর রিয়াযি (ফার্সী)।
১১. মাবহাসুল মায়াদালাহ জাতিদ দ্দারজাতিল সানিয়্যাহ (আরবী)।
১২. কাশফুল ইল্লাহে আন সিমতিল ক্বিবলাহ (উর্দু)।
১৩. রুইয়াতুল হেলাল (উর্দু)।
১৪. ইকসিরুল ইশরী (আরবী)।
১৫. ইসতেখারাজে উসুলে ক্বামার বার রাস (ফার্সী)।
১৬. আল আনজাবুল আনীক লিতুরুকিত তালীক (আরবী)।
১৭. রিসালাতু আল ক্বামার (আরবী)।
১৮. হাশিয়াতু শারহা চাগমিনি (আরবী)।
১৯. হাশিয়াতু তাশরীহ (আরবী)।
২০. হাশিয়াতু ইলমুল হাইয়াত (আরবী)।
২১. হাশিয়াতু কিতাবুস সুয়ার (আরবী)।
২২. হাশিয়াতু উসুলুল হিনদাসাহ (আরবী)।
২৩. হাশিয়াতু তাহরীরে ইক্বলিদস (আরবী)।
২৪. হাশিয়াতু রাফউল খিলাফ (আরবী)।
২৫. হাশিয়াতু শারহে বাকুরা (আরবী)।
২৬. হাশিয়াতু তিববুন্নফস (আরবী)।
২৭. হাশিয়াতু শারহে তাযকিরাহ (আরবী)।

২৮. জাদওয়াল বারায়ে জানতারী শাস্তসালা (ফার্সী)।
২৯. আল আশকালুল ইক্বদিলিস লি নাকছে আশকালিল ইক্বদিস।
৩০. আক্বমারুল ইনশিরাহ লি হাক্বিক্বাতিল আসবাহ।
৩১. আ'আলীল আতায়া ফিল আদ্বলায়ে ওয়াযায়াওয়্যা।
৩২. আল জুমাদ্দায়্যেরা ফি খুতুতিদ্দায়েরা।
৩৩. সিত্তিন ওয়া লাওগামাম।
৩৪. জাদাতুত তুলু ওয়াল মুররী লিসসাইয়া রাহ ওয়াননুজুম ওয়াল ক্বামার।

ফালসাফা, মানতিক ঃ

১. ফাওযে মুবিন দার রাদ্দে হারকাতে যমীন (উর্দু)।
২. আল কালিমাতুল মুলহিমা ফিল হিকমাতিল মাহকামাহ (উর্দু)।
৩. মুয়ীনে মুবিন বাহরে দাউরে শামস ওয়া সুকুনে যামীন (উর্দু)।
৪. হাশিয়াতু মুল্লা জালাল মীর যাহীদ (আরবী)।
৫. হাশিয়া শামশু বাযেগাহ (আরবী)।
৬. হাশিয়া উসুলে তাবয়ী (উর্দু)।

ইলমে যিজাত ঃ

১. যুজয়ে মুসফিরুল মুতালেয়ে লিত তাক্বওয়ীম ওয়াত তালে (উর্দু)।
২. হাশিয়া বার জুন্দী (আরবী)।
৩. হাশিয়া জালালাতুল বার জুন্দী (আরবী)।
৪. হাশিয়া যেজ বাহাদুর খানী (ফার্সী)।
৫. হাশিয়া ফাওয়াইদে বাহাদুর খানী (ফার্সী)।
৬. হাশিয়া যাইজুন বুখানী (আরবী)।
৭. হাশিয়া জামেয়ে বাহাদুর খানী (ফার্সী)।

আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা ফাযেলে ব্রেলভী রাদিয়াল্লাহু আনহুর কতিপয় গ্রন্থ পর্যালোচনা ঃ

আলা হযরত কেবলা সহস্রাধীক কিতাব রচনা করে অতীতের অনেক রেকর্ড ভঙ্গ করেছেন। অর্থাৎ তাঁর মত এত অধিক কিতাব তাঁর পূর্বে কেউ লেখেনি এবং বর্তমান পর্যন্ত কেউ লেখতে পারেনি। কিয়ামত পর্যন্তও কেউ লেখতে পারবে বলে আমার মনে হয় না। তাঁর লিখিত এক একটি কিতাবের পরিধিও ছিল উল্লেখযোগ্য। ফতোয়ায়ে রেজভীয়াহ ও কানযুল ঈমান গ্রন্থদ্বয়ই তার প্রমাণ। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় আলা হযরতের রচিত কিতাবসমূহের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি বহুল পরিচিত ও আলোচিত।

১. কানযুল ঈমান ফি তারজুমাতিল কোরআন ঃ এটা কোরআন মজীদের প্রামাণিক ও তাফসীর ভিত্তিক উর্দু অনুবাদ। আলা হযরত বিষয় ভিত্তিক আয়াত সমূহের একটি পৃথক তালিকাও উক্ত অনুবাদে সংযুক্ত করেছেন। যাতে যে কোন বিষয়ে একজন জ্ঞানী ও গবেষক পাঠক অতি সহজে একাধিক আয়াতের সন্ধান করে নিতে পারেন। কানযুল ঈমানের অনুবাদ

অন্যান্য লেখকের ১২টি অনুবাদের সাথে তুলনা করলে দেখা যায় যে, আলা হযরতের অনুবাদটিই সর্বোত্তম এবং ইসলামী আক্বীদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

১৩৩০ হিজরী (১৯১১ খ্রীষ্টাব্দেউক্ত অনুবাদিত গ্রন্থটির অনুবাদ কর্ম সম্পন্ন হয়েছিল। বর্তমান বিশ্বে নির্ভূল ও বিশুদ্ধ কোরআন তরজুমার ক্ষেত্রে গ্রন্থটা বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জন করতে সক্ষম হয়। ফলে বাংলা ইংরেজীসহ পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় এ গ্রন্থখানার তরজুমার কাজ দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীর দু' প্রসিদ্ধ ভাষা ইংরেজী ও বাংলা ভাষাতে এটার তরজুমা বর্তমানে বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। উর্দু ও অন্যান্য ভাষার কোরআনের তরজুমার সাথে কানযুল ঈমানের তুলনামুল চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণ করে অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রের উচ্চতর ডিগ্রী নেয়ার ক্ষেত্রে সহায়ক হচ্ছে।

এ তরজুমাতুল কোরআনে আলা হযরত যে দক্ষতা ও প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছেন এবং তরজুমার ক্ষেত্রে মাধুর্য ও শালীনতা রক্ষা করেছেন তা কোরআনের অন্যান্য তরজুমার সাথে তুলনামুলক চুলচেরা বিশ্লেষণ করলে পুর্ণিমার শশীর ন্যায় সুস্পষ্ট হবে।

এখানে আশ্চর্যের বিষয় যে, এ তরজুমা হচ্ছে শব্দগত ও পরিভাষাগত। এভাবে শব্দ ও পরিভাষার সুন্দর সমন্বয় সাধন আলা হযরত কেবলার তরজুমার এক বিরাট বৈশিষ্ট্য। তিনি এ অনুবাদ থেকে এ মূলনীতিই নির্ণয় করেছেন যে, তরজুমা হবে অভিধানের অনুরূপ এবং শব্দগুলোর একাধিক অর্থের মধ্য থেকে এমন অর্থ বাছাই করে নেয়া হবে যা আয়াতের পূর্বাপর বর্ণনাভঙ্গির দিক দিয়ে সর্বাধিক উপযুক্ত হয়, তখনই সে তরজুমা শ্রেষ্ঠতর হবে। এ অনুবাদ থেকে কোরআনের নিগুঢ় রহস্যাদি ও জ্ঞান বিজ্ঞান এমন ভাবে প্রকাশ পায় যে, তা সাধারণ অন্যান্য তরজুমায় প্রকাশ পায়না। এ তরজুমা সহজ সরল হওয়ার সাথে সাথে কোরআনের রূহ এবং আরবী বাচনভঙ্গীর অত্যন্ত কাছাকাছি। আলা হযরত কেবলার তরজুমার আরেকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো তিনি প্রতিটি স্থানে নবীগণের প্রতি আদব ও সম্মানে এবং উচ্চ মর্যাদা ও নিষ্পাপ হবার বিষয়ের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখেছিলেন।

অন্যান্য তরজুমাগুলোর বিভিন্ন ভুল ত্রুটি ও বিভ্রান্তির অবস্থা তখনই সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যখন অন্যান্য অনুবাদের সাথে আলা হযরত কেবলার অনুবাদের একটা তুলনামূলক পর্যালোচনা করা হবে।

ওহাবী, মওদুদী ও তাবলীগ জামাতের আলেমদের উর্দু ভাষায় কোরআনের অনুবাদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ভুল ভ্রান্তি, ত্রুটি-বিচ্যুতি ও আপত্তিকর বক্তব্য রয়েছে। যেগুলোর মধ্যে আল্লাহ তা'য়ালার পেয়ারা রাসুল ও আউলিয়ায়ে কেরামের শানে অবমাননাকর বিভিন্ন কথা রয়েছে। পক্ষান্তরে আলা হযরত কেবলার তরজুমাতুল কোরআনটি ঐ সবকিছু থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত, বিধায় তাঁর কৃত তরজুমাটিই শ্রেষ্ঠ।

আলা হযরত কেবলা কোরানের তরজুমা ছাড়া তাফসীরের কাজও আরম্ভ করেছিলেন। এমনকি তিনি হযরত মাওলানা শাহ আবদুল কাদের বাদায়ুনী রাহমাতুল্লাহে আলাই এর ওরশ শরীফে অংশ গ্রহণ করতে বাদায়ুন যান, সেখানে ছয় ঘন্টা ব্যাপী সুরা দুহার উপর অনবদ্য বক্তব্য উপস্থাপন করেন। বক্তব্যের ইতি ঘটাতে গিয়ে তিনি এরশাদ ফরমান-

আমি এ পবিত্র সুরার কতেক আয়াতের তাফসীর ৬০০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত লিখে ছেড়ে দিই। এত সময় কোথায় যে, গোটা কোরআন করীমের তাফসীর লিখবো।

এ থেকে সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, যদি তিনি কোরআনের তাফসীর লিখতেন তাহলে তাঁর তরজুমার মতো উহাও আলাদা বৈশিষ্ট্য মন্ডিত হতো। বস্তুতঃ অন্যান্য দ্বীনি ইলমি ব্যস্ততার কারণে পূর্ণাঙ্গ তাফসীর লেখার ততটুকু সময় তাঁর হাতে ছিলনা।

২. ফতোয়ায়ে রেজভীয়্যাহ ঃ ১২৮৬ হিজরী থেকে ১৩৪০ পর্যন্ত লিখিত বিভিন্ন বিষয়ের ফতোয়ার সমষ্টি ১২ খন্ডে সমাপ্ত। বর্তমানে ইহা ত্রিশ খন্ডে লাইব্রেরীতে পাওয়া যাচ্ছে। ফিক্বহী মাসায়েলের এমন কোন শাখা নেই যা ফতোয়ায়ে রেজভীয়্যাতে বর্ণিত হয়নি। এক একটি মাসয়ালার উত্তরে তিনি নির্ভরযোগ্য ফিকহের অসংখ্য দলীল ও রেফারেন্স উল্লেখ করে প্রশ্নকৃত মাসয়ালার উত্তর দিয়েছেন। যে কোন দক্ষ আলেম ও মুফতী ফতোয়ায়ে রেজভীয়্যাহ পাঠ করলে দলীলের সমাহার দেখে স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয়। অতি সুক্ষ্ম ও চুল চেরা বিশ্লেষণ সহকারে তিনি প্রশ্নসমূহের উত্তর দিতেন। ফতোয়ায়ে রেজভীয়্যাহ শরীফ পর্যালোচনা করে এ কথা বললে ভুল হবে না যে, এ ফতোয়ার কিতাবটি হানিফি মাযহাবের পূর্ণ জীবনদানকারী। তাই কোন মনীষী বলেছেন যে, আলা হযরত হলেন যুগের আবু হানীফা।

আলা হযরত কেবলা এ ফতোয়ার কিতাবের মধ্যে অসংখ্য কিতাবের রেফারেন্স দিয়েছেন যা তিনি উক্ত কিতাবের খোতবায় উল্লেখ করেছেন। নিম্নে খোতবাটি আরবীতে পেশ করা গেলঃ

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصل على رسوله الكريم

الحمد لله الذى هو الفقه الاكبر والجامع الكبير لزيادات فيضه المبسوط والدرر الغرر به الهداية ومن البداية و إليه النهاية بحمده الوقاية ونقاية الدراية وعين العناية وحسن الكفاية والصلواة والسلام على الامام الاعظم للرسل الكرام مالكى وشافعى احمد الكرام- يقول الحسن بلاتوقف محمد الحسن ابو يوسف فإنه الاصل المحيط لكل فضل بسيط ووجيزو وسيط البحر الزخاء والدر المختار وخزائن الاسرار وتنوير الابصار ورد المختار على منح الغفار وفتح القدير وزاد الفقير وملتقى الابحر ومجمع الانحر وكنز الدقائق- وتبين الحقائق والبحر الائق منه يستمد كل نهر فائق- فيه المنية وبه الغنية ومراقي الفلاح وامدار الفتاح وايضاح الاصلاح ونور الايضاح وكشف المضمرات وحل المشكلات والدر المنتقى وينابيع المبتغى وتنوير الابصار وزواهر الجواهر البدائع النوادر المنزه وجوبا عن الاشباه والنظائر مغنى السائلين ونصاب المساكين الحاوى القدس لكل كمال قدسى وانسى الكافى الوافى الشافى المصفى المصطفى المنتصفى المجتبى المنتقى الصافى عدة النوازل والفع الوسائل لاسعاف المسائل لعيون المسائل عمدة الاواخر خلاصة الاوائل-

وعلى اله وصحبه واهله وحزبه مصابيح الدجى ومفاتيح الهدى لاسيما الشيخين الصاحبين الاخذين من الشريعة والحقيقة بكل الطرفين والختنين الكريمين كل منهما نور العين ومجمع البحرين وعلى مجتهدى ملته وائمة امته خصوصا الاركان الاربعة والانوار اللامعة وابنه

الاكرم الغوث الاعظم ذخيرة الاولياء وتحفة الفقهاء وجامع الفصولين فصول الحقائق والشرع المهذب بكل زين وعلينا معهم وبهم ولهم يا ارحم الراحمين وامين والحمد لله رب العالمين-

উপরোক্ত ফতোয়ায়ে রেজভীয়্যাহ শরীফের খুতবাটি পাঠ করে বুঝা যায় যে, আলা হযরত কেবলার প্রতিভা কত উচু মাপের ছিল। তিনি এ কিতাবটির নাম দিয়েছেন আল আতায়ানুন ননবীয়্যাহ ফি ফাতাওয়ায়ীর রেজভীয়। যার দ্বারা এক কথা স্পষ্টভাবে বলা যায় যে, তাঁকে এ জ্ঞান আল্লাহর রাসুল দান করেছেন যা আল আতায়ানু নববীয়্যা তথা নবী কারিমের দান। এর দ্বারা বুঝা যায় তিনি উক্ত ফতোয়ার কিতাবের মধ্যে দলীল স্বরূপ যথগুলো হাদীস শরীফ এনেছেন তা হযরত ঈসা রেজভী ক্বাদেরী একত্রিত করে ইমাম আহমদ রেজা আউর ইলমে হাদীস নামকরণ করে তিন খন্ড বিশিষ্ট কিতাব রচনা করে ইহাতে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন।

৩. আদদৌলাতুল মাক্কিয়্যা বিল মাদ্দাতিল গায়বিয়্যা ঃ

এ গ্রন্থটি আরবীতে রচিত। মাত্র আট ঘন্টা সময়ের মধ্যে আলা হযরত আরবের মক্কা শরীফে বসে উক্ত গ্রন্থটি রচনা করেছেন। এ গ্রন্থখানা রচনা করার কারণ হলো-আলা হযরত কেবলা ১৩২৩ হিজরীতে যখন দ্বিতীয়বার যিয়ারতে হেরেমাইনে শরীফাইনের উদ্দেশ্যে পবিত্র মক্কা শরীফ তাশরীফ নেন তখন কিছু ফাসেক ওহাবী গোমরাহীরা আলা হযরতকে লজ্জা এবং কষ্ট দেয়ার জন্য প্রিয় নবীর ইলমে গায়ব সংক্রান্ত বিষয়ে কিছু প্রশ্ন লিখে তখনকার মক্কার গভর্ণর শরীফ গালিবের নিকট প্রেরণ করে। বাতেলদের কুধারনা ছিল যে, আলা হযরততো হজ্জের জন্য গেছেন তাই সাথে কোন কিতাব নেননি। এ অবস্থায় তাকে ইলমে গায়ব সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি যথাযথভাবে কোন উত্তর দিতে পারবেন না। সুতরাং এটাই বড় সুযোগ তাকে লজ্জা দেবার। শরীফ গালিব ওহাবীদের প্রশ্নানুসারে আলা হযরতকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এর অদৃশ্য বিষয়ক ইলম বা ইলমে গায়ব সম্পর্কে উত্তর দেয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন। গভর্ণর শরীফ গালিবের নির্দেশে আলা হযরত কেবলা মাত্র আট ঘন্টা সময়ের মধ্যে প্রিয় নবীর ইলমে গায়ব সংক্রান্ত বিষয়ের উপর দেড়শত পৃষ্ঠার উক্ত কিতাবখানা লিখে ফেলেন। অথচ তিনি এ কিতাব রচনায় কোন রেফারেন্স গ্রন্থের সাহায্য নেয়ার কোন সুযোগই পাননি। উক্ত কিতাবখানা লেখার পর যখন শরীফ গালিবের সামনে পেশ করা হলো তখন শরীফ গালিব উক্ত কিতাবের পান্ডুলিপি দেখে এবং প্রিয় নবীর ইলমে গায়েবের দলিলাদী দেখে স্তম্ভিত হয়ে যান। এর পর শরীফ গালিব মক্কার সাবেক মুফতী শেখ সালেহ কামালকে উক্ত কিতাবখানা তাঁর দরবারে সবার সম্মুখে পাঠ করার জন্য নির্দেশ দেন। যখন উক্ত কিতাবখানা শরীফ গালিবের দরবারে পাঠ করা হচ্ছিল তখন ওহাবীদের মুফতীরাও সেখানে উপস্থিত ছিল। উক্ত কিতাব পাঠ করার সময় যখন প্রিয় নবীর ইলমে গায়েবের উপর একের পর এক দলিলাদী পেশ করা হচ্ছিল তখন পরশ্রীকাতর ওহাবী মুফতীরা লজ্জিত হয়ে শরীফ গালিবের দরবার থেকে পলায়ন করল। এর পর শরীফ গালিবের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, মাওলানা আহমদ রেজা হক্বের মধ্যে রয়েছেন পক্ষান্তরে ওহাবীরা না হকের মধ্যে রয়েছেন বিধায় তারা সবাই গোমরাহ।

অতঃপর শরীফ গালিব ওহাবীদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং খাটী সুন্নী হয়ে গেলেন। আলা হযরত কেবলা যেহেতু কোন রেফারেন্স গ্রন্থের সাহায্য ছাড়াই উক্ত কিতাব খানা লিখেছেন তাই উক্ত কিতাবে যে সব দলিলাদী উল্লেখ করা হয়েছে উক্ত দলিলাদী ঠিক আছে কিনা উহা যাচাই করার জন্য শরীফ গালিব যখন তার কুতুব খানায় সংরক্ষিত একটি হস্ত লিখিত কিতাবের সাথে মিলায় দেখেন, তখন তিনি উক্ত গ্রন্থের হুবহু দলিলাদী ও উদ্বৃতিসমূহ আদদৌলাতুল মক্কীয়ায় বিদ্যমান দেখে অবাক হলেন এবং বুঝতে পারলেন আলা হরতের কাশফ রয়েছে। এর পর তিনি আলা হযরতকে যথেষ্ট সম্মান করলেন এবং তাঁর ভক্ত হয়ে গেলেন।

৪. হুসসামুল হারামাইন ঃ

এ গ্রন্থখানা আলা হযরত কেবলা আল মো'তামাদ ওয়াল মোস্তানাদ বেনাহে নাজাহিল আবদ নামে আরবী রচনা করেন। এতে ভারতবর্ষের ৫ জন আকাবিরীনে ওহাবী ওলামার বিভিন্ন উদ্বৃতি উল্লেখ করে নীচে এগুলোর আরবী অনুবাদ করে ১৩২৪ হিজরীতে হারামাইনে শরীফাইনের ৩৩ জন মুফতীর খেদমতে প্রেরণ করে তাদের মতামত চান। উক্ত ৫ জন ওহাবী ওলামাদের গ্রন্থসমূহের মন্তব্য ছিল নিম্নরূপ ঃ

১. আল্লাহ মিথ্যা বলতে পারেন।

২. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মরে পঁচে গলে মাটির সাথে মিশে গেছেন।

৩. প্রিয় নবীর ইলমের চেয়ে শয়তানের ইলম বেশী ছিল।

৪. নবীজীর ইলমে গায়েবের মত এমন ইলমে গায়েব চতুস্পদ জন্তুরও আছে।

৫. মুর্খরা বলে থাকে খাতামুননবীয়ীন শেষ নবী, কিন্তু খাতামুন্নবীয়ীন এর প্রকৃত অর্থ শেষ নবী নয় বরং মূল নবী। তাঁর পরে এক হাজার নবী আগমন হলেও খাতামুন্নবীয়ীন বা মূল নবী হওয়ার ব্যাপারে কোন পার্থক্য সৃষ্টি হবে না ইত্যাদি।

হারামাইনে শরীফাইনের ৩৩ জন মুফতী উক্ত এবারত সমূহ পর্যালোচনা করে ঐগুলোর লেখকগণকে সরাসরি কাফের ঘোষনা করেন। তাঁদের উক্ত ফতোয়ার নাম দেয়া হয় হুসসামুল হারামাইনে শরীফাইন বা মক্কা-মদীনার তীক্ষ্ণ তরবারী। এটা বাতিলপন্থীদের জন্য আলা হযরত কেবলার অমর কীর্তি। অতএব সুচিন্তিত পাঠকবৃন্দের প্রতি একান্ত অনুরোধ আপনারা হুসসামুল হেরেমাইন কিতাবটি সংগ্রহ করে পড়ুন এবং নিজের ঈমান-আক্বীদাকে মজবুত করুন।

৫. আল কাওকাবাতুশ শিহাবীয়্যা ফি রদ্দে কুফরিয়াতে আবিল ওহাবীয়্যাহ্ ঃ

ইসমাইল দেহলভীর রচিত ৭০টি কুফরী ও বাতিল আক্বীদা সম্পন্ন কিতাব তাক্বভীয়াতুল ঈমান, সৈয়্যদ আহমদ রায় ব্রেলভীর ইশারায় লিখিত সিরাতে মোস্তকিম ও ইজাহুল হক্ব এর খন্ডনে উক্ত গ্রন্থটি লিখা হয়েছে। সংক্ষেপে ওহাবী আক্বীদা জানতে হলে উক্ত গ্রন্থখানা পাঠ করা উচিত।

ওহাবী সম্প্রদায়ের প্রতিটি বাতিল আক্বীদার বিরুদ্ধে আলা হযরত কেবলা একাধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন।

৬. কাব্যগ্রন্থ হাদায়েকে বখ্শীশ শরীফ ঃ

আলা হযরত কেবলা কাব্যগ্রন্থেও স্বীয় যুগের ইমাম ছিলেন। হাদায়েকে বখ্শীশ শরীফ এর প্রমাণ। এটা এমন একটি কাব্যগ্রন্থ যেখানে তিনি আরবী, ফার্সী, উর্দু ও হিন্দী ভাষায় প্রিয় নবীর এমন শান ও মান বর্ণনা করেছেন যা পড়লে পাঠকদের চোখ দিয়ে পানি বের হয়। এর মধ্যে তিনি রাসুলে পাকের প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মোবারকের শান বর্ণনা করেছেন। এটা আলা হযরতের আরেকটি অমর কীর্তি। তিনি যে কবিতা রচনায় নিজ যুগের ইমাম ছিলেন তা হযরত দাগে দেহলভীর নিম্নোক্ত ঘটনা থেকে বুঝা যায়।

আলা হযরত কেবলার মেঝ ভাই উস্তাদে জমন হযরত মাওলানা হাসান রেজা খান সাহেব কবিতা রচনায় হযরত দাগে দেহলভীর শিষ্য ছিলেন। একদা তিনি কিছু কবিতা লিখে উহা সংশোধন করার জন্য স্বীয় উস্তাদ হযরত দাগে দেহলভীর কাছে যাচ্ছিলেন। আলা হযরত কেবলা জিজ্ঞাসা করলেন, হাসান মিয়া কোথায় যাচ্ছ? হযরত হাসান রেজা খান সাহেব উত্তর দিলেন, আমি কিছু কবিতা লিখেছি উহা দেখানোর জন্য আমার উস্তাদ হযরত দাগে দেহলভীর নিকট যাচ্ছি। ঐ সময় আলা হযরত এ নাতে রাসুলটি লিখতেছিলেন যার প্রথম কলি নিম্নরূপ-

"উনকি মহক নে দিলকে গুনছে কিলা দিয়ে হ্যায়
জিস রাহ্ ছল গিয়ে হ্যায় কুছে বছা দিয়ে হ্যায়"

অর্থাৎ হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শরীর মোবারকের সুবাস অন্তরের ফুলের কুঁড়ি অন্কুরিত করে ফুল বানিয়ে দিয়েছে, তিনি যে রাস্তা দিয়ে তাশরীফ নিতেন ঐ রাস্তার গলিতে তাঁর সুবাস ছড়িয়ে পড়ত। সাহাবাগণ তাঁর খোশবোর ঘ্রাণ নিয়ে তাঁর কাছে পৌঁছে যেতেন।

আলা হযরত কেবলা উক্ত নাতে রাসুলটি সম্পূর্ণ লিখেন এবং শেষের কলি লিখেন নি। কিছু লিখে তাঁর মেঝ ভাই হযরত হাসান রেজা খান সাহেবকে বললেন এ কয়েকটি লাইনও তোমার উস্তাদকে দেখায়ে নিয়ে আনবে। হযরত হাসান রেজা আলা হযরতের উক্ত নাতে রাসুলটি নিয়ে দিল্লীর উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলেন। স্বীয় উস্তাদের নিকট পৌছে প্রথমে নিজের লিখিত কবিতাগুলো তাঁকে দেখালেন। উস্তাদজী তা দেখে যা সংশোধন করার প্রয়োজন তা সংশোধন করে দিলেন। এর পর হযরত হাসান রেজা খান সাহেব আলা হযরতের দেয়া কবিতাটি উস্তাদের খেদমতে পেশ করে আবেদন করলেন, হুজুর এ কবিতাটি একটু দেখুন যা আমার বড় ভাই মাওলানা আহমদ রেজা আমি আসার সময় আমাকে দিয়ে বলেছেন এটাও তোমার ওস্তাদকে দেখায়ে আনবে। হযরত দাগে দেহলভী আলা হযরত কেবলার উক্ত নাতে রাসুলটি গুন গুন করে পড়ে ডুলতে ছিলেন আর তাঁর দু'চোখ দিয়ে পানি বের হচ্ছিল। উহা পড়ার পর তিনি বললেন, আমি এ নাতে পাকে এমন কোন বর্ণ দেখতেছিনা যাতে আমি কলম লাগাব। আমার মনে হচ্ছে এ নাতে পাকটি নিজে

লিখেননি বরং লেখানো হয়েছে। আমি এ নাতে পাকের গুণগান কি করব। ব্যস আমার মুখ থেকে এটাই বের হয়েছে যে,

"মুলকে সুখন কী শাহী তুমকো রেজা মুসাল্লাম
জিস ছিমতে আগেরী হো ছিকে বেটা দিয়ে হ্যায়"

অর্থাৎ ফাসাহাত, বালাগাত গদ্য ও পদ্যের রাজ্যের বাদশা হে আহমদ রেজা আপনাকে সবাই মেনে নিলেন। আপনি যে বিষয়ে কলম ধরেছেন ওই বিষয়ে এমন বিশ্লেষণ মুলক আলোচনা করেছেন যার দৃষ্টান্ত পূর্ববর্তী মনীষীদের কিতাবসমূহে পাওয়া যায় না। এর পর হযরত দাগে দেহলভী বললেন এ নাতে পাকের শেষের কলি ছিল না। তাই আমার লাইনটি শেষের কলি। তার পর তিনি আলা হযরত কেবলার খেদমতে একটি চিঠি লিখে আবেদন করলেন হুজুর আমার এ লাইনটা আপনার দেওয়ানে সংযুক্ত করবেন এবং এটাকে এ নাতে পাকের শেষ পংক্তি হিসাবে রাখবেন। এটাকে আলাদা করবেন না। আর এটার শেষেও কোন পংক্তি রাখবেন না। উপরোক্ত ঘটনা থেকে পুর্ণিমান চাঁদের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে গেল আলা হযরত কাব্য গ্রন্থেও স্বীয় যুগের ইমাম ছিলেন। আলা হযরত কেবলার রচিত কবিতাসমূহের মধ্যে কসিদায়ে দরূদ শরীফ হল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ ধরণের কবিতাকে ইলমুন আরোজের পরিভাষায় কসিদায়ে মিরসাআ বলা হয়। এ কবিতা রচনার একটি নিয়ম হল এ ধরণের কবিতার মধ্যে এমন আটাশটা লাইন থাকবে যার প্রতিটি লাইনের শুরুতে আরবী আটাশটা হরফ থেকে একটি করে হরফ থাকে। এ কবিতার এবং সনেট কবিতার মধ্যে পার্থক্য হল সনেট কবিতা চৌদ্দ লাইনের হয়। আর কসিদায়ে মিরসাআতে এমন আটাশটা পংক্তি থাকে যার প্রতিটি পংক্তির প্রারম্ভে আরবী আটাশটা বর্ণের একটি করে বর্ণ থাকে। এ ধরণের কবিতা রচনাকারী পৃথিবীতে বিরল। যে কয়জন তা রচনা করেছেন তৎমধ্যে আলা হযরত কেবলা সবার শীর্ষে রয়েছেন। আলা হযরত কেবলার রচিত এ কসিদায়ে মিরসাআকে আমরা কসিদায়ে দরূদ শরীফ নামে আখ্যায়িত করি। কারণ উক্ত কবিতার প্রতিটি লাইনের শেষে রাসুলে পাকের শান-মান বর্ণনা সহকারে তুমপে করোরো দরূদ শব্দের উল্লেখ রয়েছে বিদায় উহাকে আমরা কসিদায়ে দরূদ শরীফ বলে থাকি। আলা হযরত কেবলার রচিত উক্ত কসিদার প্রথম লাইনটি হল নিম্নরূপঃ

কা'বা কে বদরুদ্দোজা তুমপে করোরো দরূদ
তৈয়্যবাকে শামশোদ দোহা তুমপে করোরো দরূদ।

আর হাদায়েকে বখ্শীশ শরীফের প্রতিটি নাত কোরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যা বললেও কোন ভুল হবেনা। কারণ এ নাতগুলো পর্যালোচনা করলে বুঝা যাবে এগুলো কোরআন ও হাদীসের তরজুমা ও ব্যাখ্যা।

দর্শন, জ্যোতিষ নক্ষত্র বিদ্যা ও বিজ্ঞানে আলা হযরতের পদচারণা ঃ

দর্শন জ্যোতিষ ও নক্ষত্র বিদ্যায়ও আলা হযরতের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল। ১৮ অক্টোবর ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজী এক্সপ্রেস পত্রিকায় আমিরিকার জ্যোতিষ বিজ্ঞানী প্রফেসর আলবার্ট ১৭ ডিসেম্বর ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দ সম্পর্কে একটি ভবিষ্যৎ বাণী করেন যে, কয়েকটি গ্রহ

সূর্যের সামনে চলে আসার দরুন উদ্ভুত মধ্যার্কষ পৃথিবীতে তান্ডব সৃষ্টি করবে। যখন এ ভবিষ্যৎ বাণী সম্পর্কে আলা হযরতকে জিজ্ঞাসা করা হল তখন তিনি বৈজ্ঞানিক যুক্তি দিয়ে তা খন্ডন করেন। পরে আলা হযরতের কথা মত এ ভবিষ্যৎবাণী মিথ্যায় পরিণত হয়। এদিকে আমেরিকার ঐ জ্যোতিষবিজ্ঞানীর উক্ত ভবিষ্যৎবাণী খন্ডনে জ্যোতিষ বিজ্ঞান ও দর্শন শাস্ত্রের উপর আলা হযরত কেবলা যা লেখেন তা তিনটি পুস্তকে পরিণত হয়। এগুলোর নাম যথাক্রমে-

১. আল কালিমাতুল মুলহামাতু ফি হিকামাতিল মোহকামা লিওহায়িন **ফালসাফাতিল মুশম্মা।**
২. ফাউযুল মুবিন দর রদ্দে হরকতে যমিন।
৩. নুযুলে আয়াতে ফোরকান বিসুকুলে যমিন ও আসমান।

আলা হযরত কেবলার রাজনৈতিক চিন্তাধারা ঃ

আলা হযরত কেবলা রাজনৈতিক চিন্তাধারার উপর নিম্নোক্ত কিতাবগুলো লিখেছেন। সংক্ষেপে তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারা বুঝার জন্য কিতাবগুলো পাঠকরা জরুরী। কিতাবগুলো হল যথাক্রমে-

১. আন নাফসুল ফিকরি ফি কোরবানীর বাকরি।
২. এনামুল এনাম বিয়ান্না হিন্দুস্থান দারুল ইসলাম।
৩. তাদবীরি ফালাহ ওয়ানাজাত ওয়া ইছলাহ।
৪. দাওয়ামুল আরশি ফি আইম্মাতি কুরাইশি।
৫. আল মোহাজ্জাতুল মোতামিনা ফি আয়াতে মোমতাহিনা।

আলা হযরত কেবলার রাজনৈতিক চিন্তা থেকে ময়দানের রাজনৈতিক কর্মীরা রাজনীতির ব্যাপারে সঠিক দিক নির্দেশনা লাভ করেন। তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারা ছিল অত্যন্ত পরিষ্কার ও স্পষ্ট। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তা কোরআন হাদীসের মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। কোন সময় তাতে নমনিয়তার ভাব পরিলক্ষিত হয়নি। আলা হযরত কেবলা প্রথম থেকে দো কওমি নজরিয়া তথা দ্বি জাতী তত্ত্বের দর্শন দেন। শেষ পর্যন্ত এটার প্রচার প্রসারে নিজ কর্ম প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। তিনি হিন্দুদের রাজনৈতিক চতুরতা সম্পর্কে সজাগ ছিলেন। এ জন্য জাতীয় রাজনীতির প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে তিনি উপমহাদেশের মুসলমানদের সতর্ক করেন। হিন্দুদের গোপন ইচ্ছা আর হিন্দু মুসলমান ঐক্যের বিপদজনক পরিনাম সম্পর্কে সাবধান করেন। ওহাদী আলেমেরা যখন মহাত্মা গান্ধীকে মসজিদের মিম্বরে বসায়ে বক্তব্য দিতে আরম্ভ করল আর এ সুযোগে হিন্দুরা মুসলমানদেরকে হিন্দু বানাতে লাগল এবং হিন্দুস্থানের জমিনে গাভী কোরবানী করা অবৈধ ঘোষণা করলো তখন আলা হযরত কেবলা মুসলমানদেরকে সতর্কতা প্রদর্শনার্থে ঘোষণা দিয়ে বললেন, হে মুসলমান ভাইয়েরা। হিন্দুরা হচ্ছে নাপাক। কারণ এরা হলো মুশরিক। যেমন আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেন ইন্নামাল মুশরিকুনা নাজাসুন অর্থাৎ নিশ্চয় মুশরিকরা হল নাপাক। সুতরাং আপনারা সাবধান হয়ে

যান। মসজিদ হলো আল্লাহ তায়ালার পবিত্র ঘর। ঐ ঘরে মুশরিকরা প্রবেশ করতে পারবে না। অতএব আপনারা গান্ধীকে মসজিদের মিম্বরে বসিয়ে ভাষণ দেয়ার সুযোগ দিবেন না। আপনারা কী বুঝতে পারছেন না, হিন্দু ধর্মে গাভী জবেহ করা হারাম। কারণ এরা গাভীকে মা বলে আর গাভীর মাংশ খাওয়া তাদের ধর্মে নিষেধ। তাই গান্ধী বাবু হিন্দু মুসলিম ঐক্যের বান করে মুসলমানদের মাধ্যমে হিন্দুস্থানে গাভী জবেহ করা অবৈধ ঘোষণা করতেছে। মুসলমানরা আপনারা পবিত্র মসজিদকে গান্ধীর দুর্গন্ধ থেকে পবিত্র রাখুন। এ ব্যাপারে তিনি আন নাফসুল ফিকরি দিকুরবানিল বাকরি রচনা করে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করে দিলেন যে, হিন্দুস্থানে গাভী কোরবানী একেবারে বন্ধ করে দেয়া কখনো বৈধ নয়। প্রিয় পাঠকবৃন্দ আপনারা আলা হযরতের রাজনীতির উপর লিখিত বইগুলি সংগ্রহ করে পাঠ করুন জানতে পারবেন আলা হযরত শুধু সমাজ সংস্কারই করেননি বরং তিনি রাজনীতিতেও বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ হিন্দু মুসলিম ঐক্যের পক্ষে কাজ করেছিলেন, পরবর্তীতে আলা হযরত কেবলার দ্বি জাতী তথ্য দর্শনের গুরুত্ব অনুধাবন করে হিন্দুস্থান থেকে পাকিস্তান ভাগ করার আন্দোলনে নেমে পড়লেন। অবশেষে তাতে সফলতা অর্জন করলেন আর এ সফলতার পিছনে যার দর্শন কাজ করেছিল তা হল আলা হযরতের দ্বি জাতী তত্ত্বের দর্শন। সুতারাং স্পষ্ট ভাষায় দাবী করা যায় যে, হিন্দুস্থান পাকিস্তান আলাদা হওয়ার ব্যাপারে এবং হিন্দু মুসলমান এক না হওয়ার ক্ষেত্রে আলা হযরতের অবদানকে উপ মহাদেশের মুসলমানরা অবশ্যই স্বরণ করতে হবে, নতুবা তা নিমখ হারামি হবে।

আলা হযরতের উপর গবেষণা ঃ

আলা হযরতের ব্যক্তিত্ত্বের উপর বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বর্তমানে যে গবেষণা চলছে তার মত অতীতের কোন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব নিয়ে এ ধরনের হয় নি এবং হচ্ছেও না। আলা হযরতের উপর বিভিন্ন ব্যক্তিরা এমফিল. পি. এইচ. ডি. ও উচ্চতর ডিগ্রী লাভ করতেছে। বর্তমানে আলা হযরতের উপর বিশ্বের প্রসিদ্ধ ৩৪ টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে গবেষণা চলতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নাম নিম্নে উল্লেখ করা গেল-

১. করাচি বিশ্ববিদ্যালয়।
২. পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়, লাহোর।
৩. সিন্দ বিশ্ববিদ্যালয়, হায়দরাবাদ।
৪. বাহা উদ্দীন জাকারিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, মুলতান।
৫. ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ভাউয়ালপুর।
৬. বাইনাল আকওয়ামী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামাবাদ।
৭. আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত।
৮. পাঠনা বিশ্ববিদ্যালয়, বিহার, ভারত।
৯. রাওহিল বিশ্ববিদ্যালয়, ব্রেলী শরীফ, ভারত।

১০. হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, বেনারস, ভারত।
১১. কানপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ইউপি, ভারত।
১২. পেশওয়ার বিশ্ববিদ্যালয়, পেশওয়ার।
১৩. কালহার বিশ্ববিদ্যালয়, কালহার, ভারত।
১৪. রান্‌জি বিশ্ববিদ্যালয়, রানজি।
১৫. বিহার বিশ্ববিদ্যালয়, মুজাফফরাবাদ, ভারত।
১৬. মায়সুর বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত।
১৭. পুর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, পুরনিয়া, বিহার, ভারত।
১৮. মুম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়, বুম্বাই, ভারত।
১৯. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পূর্ব বাঙ্গাল, ভারত।
২০. ওয়ার কুরনক বিশ্ববিদ্যালয়, আরাবিহার, ভারত।
২১. ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, হায়দরাবাদ, ভারত।
২২. কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, নিউইয়র্ক।
২৩. জামেউল আজহার, কায়রো, মিশর।
২৪. কাহেরা বিশ্ববিদ্যালয়, কায়রো, মিশর।
২৫. বাগদাদ বিশ্ববিদ্যালয়, বাগদাদ শরীফ, ইরাক।
২৬. সাগের বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত।
২৭. আইদেবী বিশ্ববিদ্যালয়, আন্দুর ভারত।
২৮. পুনা বিশ্ববিদ্যালয়, পুনা, ভারত।
২৯. জামেয়া মিল্লিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, নতুন দিল্লি, ভারত।
৩০. মগদাহ বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত।
৩১. বরমঙ্গম বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত।
৩২. জাওহারলাল বিশ্ববিদ্যালয়, নতুন দিল্লি, ভারত।
৩৩. ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, বাংলাদেশ।
৩৪. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ।

আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজার সমাজ সংস্কার ঃ

আক্বীদা ও মতবাদে আলা হযরত সলফে সালেহীন বা পূর্বসূরীদের অনুসারী ছিলেন। তিনি স্বীয় যুগে রাজনীতি ও মযহাবের ক্ষেত্রে সংস্কারমূলক কাজের আঞ্জাম দিয়েছেন। তাঁর চিন্তা-চেতনার ও দর্শন আপন পর সকলের নিকট এতই সুস্পষ্ট যে, যা আলোচনা-পর্যালোচনার অবকাশ রাখেনা। আলা হযরত কেবলা আপন খোদা প্রদত্ত জ্ঞান ও কলম যুদ্ধের দ্বারা ধর্মদ্রোহীতা ও ধর্মবিমুকতার সকল শক্তি ও সব ধরনের প্রচেষ্টাকে ধুলিস্যাৎ করে দেয়। সম্ভবত এ কারণেই ওলামায়ে আরব তাঁকে মুজাদ্দেদ বলেছেন। এমনকি হাফেজে কুতুবে হেরেম সৈয়্যদ ইসমাইল খলিল মক্কী লিখেছেন যদি তার ব্যাপারে

বলা হয় যে, তিনি এ শতাব্দীর মুজাদ্দেদ তাহলে এ কথা সঠিক ও সত্য হবে। আল্লাহ তায়ালা তাকে পৃথিবীতে এমন সময় প্রেরণ করেছেন যখন আরবের নজদ থেকে শুরু করে উপমহাদেশ পর্যন্ত নজদী আক্বীদা প্রচার-প্রসারের কাজ চলতেছিল। বিশেষ করে উপমহাদেশের মধ্যে নজদী দেওবন্দীরা কাদীয়ানীরা প্রিয় নবীর শানে এমন অবমাননাকর উক্তি তাদের লেখনি ও বক্তব্যের মাধ্যমে প্রচার করতেছিল যা সরলমনা মুসলমানদেরকে দ্বিধা বিভক্ত করে দিয়েছিল। আলা হযরত কেবলা তাদের সে উক্তিগুলোর জবাবে লেখনি ও বক্তব্যের মাধ্যমে তাদের এমন দাঁতভাঙ্গা জবাব দেন যা দ্বারা সরলপ্রাণ মুসলমানরা ঐ সব ধর্মদ্রোহী কুমতলবী তান্ডবী শক্তি থেকে মুক্তির দিশা পান।

দেওবন্দী আলেমেরা সুন্নী হানাফী মুসলমানদের ঐ সমস্ত আক্বীদা ও আমল যেগুলোকে শিরক ও হারাম বলে ফতোয়া প্রদান করেছেন আলা হযরত কেবলা কোরআন হাদীস হানাফী ও সালফে সালেহীনদের কিতাব থেকে উদ্বৃতি ও প্রমাণ পেশ করে এটা প্রমাণ করেছেন যে, এ আমলগুলো শিরক হারাম কিছুই নয়। বরং এগুলো কোরআন হাদীস সম্মত ও সালফে সালেহীনদের নিকট পছন্দনীয়। এগুলো নতুন সৃষ্টি নয় বরং এগুলো ইসলামের অতীত থেকে উত্তর সুরীরা আমল করে আসছে।

এ পর্বে অন্তর্ভূক্ত মাসায়ালাগুলো হল প্রিয় নবীর নাম শুনে বৃদ্ধাঙ্গুলী চুম্বন ইয়া রাসুলাল্লাহ বলে প্রিয় নবীকে আহবান করা শাফায়াত উছিলা তলব, ইলমে গায়েব, হায়াতুন্নবী, মিলাদ কিয়াম, ওরছ ফাতিহা ইত্যাদি। ওহাবী আলেমদের ঈমান ও ইসলামের জন্য ধ্বংসাত্বক কতিপয় ভ্রান্ত আক্বীকা হল-

১. উন্নত আমলের ক্ষেত্রে কখনো নবীদের অতিক্রম করে যায়।
২. নবীদের নিষ্পাপ মনে করা ভূল।
৩. নামাজে রাসুলে করিমের খেয়াল করা শিরক। আর গাধা ও গরুর খেয়ালে ডুবে যাওয়ার ছেয়ে মারাত্মক। নামাজে হুজুরে পাকের খেয়াল আসলে নামাজি মুশরিক হয়ে যায়। আর তার নামাজ বাতিল হয়ে যায়। তাই নামাজে নবীর স্বরণ আসলে তদস্থলে গরু গাধার খেয়াল করা উত্তম।
৪. আল্লাহর জন্য মিথ্যা বলা সম্ভব।
৫. রাহমাতুল্লিল আলামীন হওয়া রাসুলে পাকের সাথে নির্দিষ্ট নয়। উম্মতও রাহমাতুল্লিল আলামীন হতে পারে।
৬. হুজুরে পাক আমাদের বড় ভাই। আমরা তার ছোট ভাই।
৭. রাসুলে পাকের জ্ঞানের চেয়ে জীব জন্তু শিশু পাগল ও শয়তানের জ্ঞান বেশী।
৮. পৃথিবী সম্পর্কে রাসুলে পাকের জ্ঞান শয়তানের জ্ঞানের চাইতে কম। এমনকি শয়তানের জ্ঞানের ব্যাপকতা দলিল দ্বারা সাব্যস্থ। কিন্তু রাসুলে পাকের জ্ঞানের ব্যাপকতার উপর কোন দলিল নেই।

৯. রাসুল করিম শেষ নবী নন। এমনকি তার পরে আরো নবী আগমন করলে নবী আসার দরজা বন্ধ হবে না। অর্থাৎ খাতামুন্নবীয়িন অর্থ শেষ নবী নয়। বরং এর অর্থ হল মুল নবী। আর যারা শেষ নবী অর্থ করে তারা মুর্খ।

এভাবে অসংখ্য কুপরী উক্তি ওহাবীদের লেখনি হতে প্রকাশ পেয়েছে।

আলা হযরত কেবলা

১. আল মুতামাদুল মুস্তানাদ।
২. আদদৌলাতুল মক্কিয়া।
৩. আল মনিয়েমুল মুকিম।
৪. মুনিরুল আইনাইন।
৫. আল কাওকাবাতুস শিহাবিয়া।
৬. ছোবহানুস সুব্বুহ।
৭. মুবিনুল হুদা।
৮. জাযায়াল্লাহু আদুব্বাহু।
৯. আল ফারকুল ওয়াজিস ইত্যাদি কিতাবগুলো রচনা করে ওহাদীদের ঐ সব কুফরি উক্তির দাঁতভাঙ্গা জবাব দেন এবং মুসলিম উম্মাহর হাজার বছরের লালিত আক্বীদাকে বাতিলদের হাত থেকে রক্ষা করে সবাইকে একতার বন্ধনে ঐক্যবদ্ধ করার আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালান। আলা হযরত কেবলা ঘুণে ধরা মুসলিম সমাজের অনেক সংস্কার সাধন করেছেন। তৎমধ্য থেকে কতিপয় সংস্কারমূলক কাজের বিবরণ নিম্নে পেশ করা গেল।

১. **ফরায়েজ ও সুনান ব্যতিত নেক আমল ঃ**

ইসলামী জীবন যাপনে কতিপয় লোক ফরজ ও সুন্নাতকে ছেড়ে কেবল মোস্তাহাব ও মোবাহ কাজে লিপ্ত হয়েছে। আলা হযরতের মতে এ সব লোকের নেক আমল সমূহ শরীয়তের দৃষ্টিতে অগ্রহনযোগ্য।

২. **শরীয়ত ও তরীকত ঃ**

এমন কতিপয় লোক দেখা যায় যারা শরীয়ত ও তরীকতকে দুটি পৃথক পথ ও মতে বিভক্ত করে থাকে। আলা হযরত তাদের এ বিভাজনকে কঠোরভাবে অস্বীকার করেছেন। আর শরীয়তই যে সব কিছুর মূল এ কথার প্রতি জোর দিতে গিয়ে বলেন শরীয়ত হল মূল আর তরীকত হল শাখা। শরীয়ত হল ঝর্নার উৎস মূল আর তরীকত হল এর থেকে সৃষ্ট দরিয়া। শরীয়ত থেকে তরীকতকে আলাদা করা অসম্ভব। শরীয়ত ছাড়া সব পথকে কোরআনে আজীমে বাতিল ও অগ্রহণযোগ্য ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি আরো বলেছেন এ সব আমলের দ্বারা পূণ্যের আশা করা বোকামী ছাড়া আর কিছুই নয়। এ প্রসঙ্গে তিনি গাউছে আজম দস্তগীর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ফতহুল গাইব এর রেফারেন্স পেশ করে এক স্থানে লিখেছেন যে, যদি শরীয়তের ফরজ কার্যাদী আদায়ের পূর্বে সুন্নত ও নফল পালনে ব্যস্থ হয় তবে সুন্নাত ও নফল গ্রহণযোগ্য হয় না। বরং তিরস্কারের উপযোগী হয়।

৩. তাজিমী সিজদা ঃ

প্রকাশ থাকে যে, সিজদা দুই প্রকার- (১) সিজদায়ে তায়াব্বুদী। আল্লাহ ছাড়া কাউকে ইলাহ বা ইলাহ এর অংশ বা বন্ধু মনে করে ইবাদতের নিয়তে যদি সিজদা করা হয় তখন তাকে সিজদায়ে তায়াব্বুদী বলা হয়। (২) সিজদায়ে তাহিয়া- কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে বন্ধু ও নৈকট্য প্রাপ্ত মনে করে তার সম্মানার্থে (ইবাদতের উদ্দেশ্য নয়) সিজদা করা কে সিজদায়ে তাহিয়া বা তাজিমী সিজদা বলা হয়।

সাধারণভাবে এটা দেখা গেছে যে, অধিকাংশ মুসলমানগণ বুযুর্গদের মাজারে পাকে যান। আলা হযরত কেবলা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো জন্য সিজদায়ে ইবাদত করাকে শিরক ও কুফরী এবং সিজদায়ে তাজিমী করাকে হারাম বলেছেন। এমনকি তিনি সিজদায়ে তাজিমির ব্যাপারে একটি কিতাবও লিখেছেন যার নাম হল। আযযুবদাতুল যাকিয়্যাহ ফি তাহরিমে সুজুদিত তাহিয়া। ঐ কিতাবে তিনি লিখেছেন সিজদা আল্লাহ ছাড়া আর কারো জন্য নয়। তিনি ছাড়া আর কারো ইবাদতের জন্য সিজদা করা সর্বসম্মতভাবে অপমানজনক শিরক ও প্রকাশ্য কুফরী আর সিজদায়ে তাজিমী করা নিশ্চিতভাবে হারাম ও কবিরা গুনাহ। বিশ্বের কয়েকটি দেশের সে বৃহত্তর জনগোষ্টি বিভিন্ন আউলিয়ার মাজারে গিয়ে সিজদায়ে তাজিমী করে থাকে। আলা হযরত কেবলা ঐ কাজকে বড় জগণ্য গুনাহ বলে মুসলমানদেরকে এ'কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য জোরালোভাবে সতর্কতা প্রদর্শন করেছেন।

উল্লেখ্য যে, আলা হযরত রাদিয়াল্লাহু আনহু ঐ সব মানুষের জন্য সিজদা করাকে হারাম বলেছেন, যাদের হুশ ঠিক আছে। তবে হা যদি কোন আশেক প্রিয় নবীর দরবারে গিযে অথবা অন্য কোন অলী বুযুর্গদের মাজারে গিয়ে ছাহেবে মাজারের সাথে দীদার লাভ করে হুশ হারিয়ে ফেলে অর্থাৎ দুনিয়াবী কোন খেয়াল না থাকে এমতাবস্থায় যদি সে সিজদা করে তাহলে তার জন্য ঐ সময় সিজদা করা শুধু জায়েজ নয় বরং খুব উত্তম যেমন আলা হযরত রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন-

বে খোদী মে সিজদা দর ইয়া তাওয়াফ
জু কিয়া আচ্ছা কিয়া ফের তুজকো কিয়া।

অর্থাৎ বে খোদী অবস্থায় যে আশেক রওজা পাকে সিজদা অথবা তাওয়াফ করল যে করল সে খুব ভাল করল অতঃপর হে নিন্দুক বাতেল তোমার কী হল?
এটা নিয়ে তুমি বাড়াবাড়ি করতেছ কেন? আলা হযরতের উক্ত বাণী দ্বারা স্পস্ট হয়ে গেল যে, বে খোদী অবস্থায় সিজদায়ে তাজিমী জায়েজ। বে খোদী অবস্থা ব্যতীত আল্লাহ ছাড়া অন্য কোথাও সিজদা করা জায়েজ নেই।

৪. ঘরে ছবি রাখা হারাম প্রসঙ্গে ঃ

বর্তমানে শিক্ষিত মুসলমানদের ঘরে মানুষ জীব জন্তুর ছবি টাঙ্গিয়ে রাখা এবং মূর্তি দিয়ে ঘর সাজানো এক সর্বসাধারণ প্রথায় পরিণত হয়েছে। অনেক মুসলমানের ঘরে কাপড় বা প্লাষ্টিকের তৈরী পুতুল আলমিরায় সাজিয়ে রাখতে দেখা যায়। আবার মাটির তৈরী

গরু-গাধা, হাতি-গোড়া, বাঘ-বাল্লুগ এ জাতীয় মুর্তিও আলমিরায় সাজিয়ে রাখতে দেখা যায়। আসলে ইসলাম ঐ সব মূর্তির বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষনা করেছে অথচ মুসলমানরা এগুলোর প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে ঐগুলোকে ঘরের সুন্দর্য মনে করে ঘরের মধ্যে সাজিয়ে রাখছে। আবার কিছু অশিক্ষিত মুসলমানাতো বরকতের আশায় বোরাকের ছবি এবং ইহুদী নাসারা কর্তৃক তৈরীকৃত মুসলিম বুযুর্গদের ছবি ঘরে স্থাপন করে থাকেন। আলা হযরত এগুলোর কঠোর সমালোচনা করেছেন। আর এগুলো রাখার ক্ষেত্রে নিষেধ করেছেন তবে রাসুলে করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পাদুকা মোবারকের নকশা, সবুজ গুম্বদের প্রতিচ্ছবি ও বিভিন্ন আউলিয়ায়ে কেরামের মাজারের প্রতিচ্ছবি রাখাকে বৈধ ও ভাল বলে মত প্রকাশ করেছেন।

৫. সুয়াম, ছেহলাম, ও ফাতিহাখানি প্রসঙ্গে ঃ

মুসলিম সমাজে ফাতিহা সুয়াম, ছেহলাম বাৎসরিক ইত্যাদি ফাতিহাখানী প্রথার সাধারণভাবে প্রচলন দেখা যায়। আলা হযরত এগুলোকে বৈধ বলে ফতোয়া দিয়েছেন। কিন্তু উহাতে অপ্রয়োজনীয় কিছু করাকে ভিত্তিহীন বলেছেন। আর দিন নির্দিষ্ট করাকে সকলের আগমন সহজ হওয়ার জন্য বৈধ বলে ফতোয়া দিয়েছেন। তবে দিন নির্দিষ্ট করণের ক্ষেত্রে ছাওয়াব বেশী রয়েছে বলে যারা ধারণা করে তিনি উহাকে ভুল বলে ফতোয়া দিয়েছেন। অনুরূপভাবে নিয়তকে ইছালে ছাওয়াবের রূহ মনে করেন। আর কিছু কিছু মুসলিম সমাজে এ ধরনের প্রথা রয়েছে যে, মৃত ব্যক্তির উপলক্ষ্যে তৈরীকৃত খাবার ফাতিহা দেয়ার সময় সামনে রাখতে হবে এবং সামনে রেখে ফাতিহা দেয়া জরুরী বলে মনে করে তিনি উহার কঠোর সমালোচনা করে ওহাকে নাজায়েজ বলেছেন।

তবে ঐ ব্যাপারে রন্ধনকৃত খাবার সামনে রাখতে কোন অসুবিধা নাই বলে মত প্রকাশ করেন। ইছালে সওয়াব এর পর তাড়াতাড়ি উহা ভাগ করে দেয়ার জন্য বলেছেন। আর মৃতের জন্য ফাতেহা ও ইছালে ছওয়াবের উদ্দেশ্যে রন্ধনকৃত মৃতভোজ মৃতের হকদার ও গরীব মিছকিনকে তিনি প্রাধান্য দিতেন এবং মৃতভোজে বৃত্তবান ও আত্মীয়-স্বজনকে দাওয়াত করে গুরুত্ব সহকারে খাওয়ানোর বিরোধিতা করেছেন এবং ফাতিহা ইছালে ছওয়াবের নির্দিষ্ট শরয়ী নিয়ম নীতি বেধে দেন। এ বিষয়ে আল হুজ্জাতুল ফাহিয়া লিতিবিত তায়িন ওয়াল ফাতিহা নামক তথ্য নির্ভর পুস্তিকা রচনা করে উহার মধ্যে মৃতভোজ সম্পর্কে সবিস্তারে আলোচনা করেছেন।

৬. দাওয়াতে মায়্যত প্রসঙ্গে ঃ

মৃতের ঘরে মহিলা পুরুষ একত্রিত হয়ে খাওয়া পান করা এবং মৃতের ঘরের বাসিন্দাদেরকে কষ্ট নাদেয়ার পক্ষে তিনি ফতোয়া দিয়েছেন। এ বিষয়ে তিনি জলিয়স সাওত লিনাহিয়াদ দাওয়াতি আমামিল মাওত নামক পুস্তিকা রচনা করে উহাতে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

৭. মহিলাদের মাজার শরীফে গমণ প্রসঙ্গে ঃ

বর্তমানে আওলিয়ায়ে কেরামের মাজারে পাকে মেয়ে লোকদের আনা-গোনা এমন হারে বেড়ে গিয়েছে যে, সেখানে পর্দার কথা দুরে থাক বরং কতিপয় দুঃচরিত্র নারী তাদের কুমতলব সাধনের লক্ষ্যে বিভিন্ন মাজার সমুহকে নিরাপদ আস্তানা হিসাবে ব্যবহার করছে। বিভিন্ন জায়গায় মাজারের মোতাওয়াল্লী ও খাদেমরা টাকা পাওয়ার ঘৃণ্য মানসে এসব গর্হিত কাজে বাঁধা দেয়া দুরের কথা অনেক সময় সহায়তাও করে থাকে। আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা মহিলাদের কবর যিয়ারত ও মাজার যিয়ারতে না যাওয়ার জন্য শক্তভাবে নিষেধ করেছেন। এ ব্যাপারে তিনি এরশাদ ফরমান মহিলারা যখন ঘর থেকে বের হন তখন থেকে তাদের উপর আল্লাহ তায়ালা, ফেরেস্তারা ও কবরবাসীরা লানত করতে থাকে। আলা হযরত কেবলা এ প্রসঙ্গে আরো বলেন কবর যিয়ারত করা মেয়েদের জন্য নিষিদ্ধ। হাদীস শরীফের মধ্যে আছে আল্লাহর লানত সে সমস্ত মেয়েদের প্রতি যারা কবর যিয়ারত করতে যায়। আলা হযরত কেবলা মেয়েদের মাজারে যাওয়া নিষেধ মর্মে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন যার নাম হল- "জামানুল নুর ফি নাহিয়িন আন যিয়ারাতিল কবুর" উক্ত গ্রন্থে তিনি ফিক্হের প্রসিদ্ধ কিতাব আইনি ৩য় খন্ডের উদ্বৃতি দিয়ে উল্লেখ করেন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেছেন মেয়েদের আপাদমস্তক লজ্জার বস্তু। আপন আপন ঘরের মধ্যেই তারা আল্লাহর নিকটবর্তী থাকে। আর যখন ঘর থেকে বের হয় তখন শয়তান তার উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। আলা হযরত কেবলা বলেছেন প্রিয় নবীর রওজায়ে আনোয়ার ছাড়া কোন মাজারে যাওয়ার অনুমতি কোন মেয়েদের নেই। আর পুরুষ ও মেয়েরা প্রিয় নবীর দরবারে হাজির হওয়া ইহা ছহি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। আর প্রিয় নবীর রওজায়ে যাওয়াটা এমন একটি বড় সুন্নাত যা ওয়াজিবের কাছাকাছি। প্রিয় নবীর রওজায় যাওয়ার গুরুত্বের উপর আলা হযরত উক্ত কিতাবের মধ্যে বেশ কয়েকটি গুরুত্ব পূর্ণ হাদীস উল্লেখ করেছেন। তৎমধ্যে একটি হল প্রিয় নবী এরশাদ ফরমান, যে ব্যক্তি আমার পবিত্র রওজাপাক যিয়ারত করল তার জন্য আমার শাফায়াত ওয়াজিব হয়ে গেল। আলা হযরত কেবলা মহিলাদের প্রিয় নবীর রওজা ছাড়া আওলিয়ায়ে কেরাম ও বুযুর্গানে দ্বীনদের মাজারে যিয়ারতের উদ্দেশ্যে যেতে নিষেধ করেছেন।

৮. পীরের কাছ থেকে পর্দা করা প্রসঙ্গে ঃ

বর্তমানে মহিলারা বেপর্দায় নির্ভয়ে চলাফেরা করা পর পুরুষের সাথে কথা বলা মাজার যিয়ারতে যাওয়া, বেপর্দায় পীরের কাছে যাওয়া ইত্যাদি সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাড়িয়েছে। আলা হযরত কেবলা এগুলোর ঘোর সমালোচনা ও বিরোধিতা করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি মারজুন নাজা লেখুরুযিন নিসা পুস্তকটি রচনা করে মহিলাদেরকে বে পর্দায় ঘর থেকে বের হতে নিষেধ করেছেন। এমনকি পীরের সামনে পর্যন্ত বে পর্দায় যেতে নিষেধ করেছেন।

৯. কবরে বাতি জ্বালানো প্রসঙ্গে ঃ

কবরে বাতি জ্বালানো প্রসঙ্গে আলা হযরতকে প্রশ্নকরা হলে জবাবে তিনি এটাকে বিনা প্রয়োজনে সম্পদের অপচয় করা হয় বলে মন্তব্য করেছেন। আবার এটাকে তিনি বৈধও

বলেছেন এমন পদ্ধতিতে যে যদি কবর মসজিদ ও রাস্তার পাশে হয় আর বাতি জ্বালানো যদি নামাজি ও যিয়ারতকারীর উপকারে আসে তাহলে বাতি জ্বালানোতে কোন অসুবিধা নেই। যেই কাজ দ্বীনি উপকার বা পার্থিব বৈধ লাভ উভয় থেকে শুন্য এমন কাজ অতি অনর্থক। আর অনর্থক কাজ স্বয়ং মাকরুহ এতে সম্পদ ব্যয় করা অপচয়ের নামান্তর। আর অপচয় করা হারাম।

১০. কবরে লোবান ও আগর বাতি জ্বালানো প্রসঙ্গে ঃ

কবরে লোবান ও আগরবাতি জ্বালানোর প্রসঙ্গে প্রশ্নকরা হলে উত্তরে তিনি উহাকে নিষেধ করেছেন এবং উহাকে অপচয় ও বিনা প্রয়োজনে সম্পদ বিনষ্ট করা বলে মন্তব্য করেছেন। তিনি আরো বলেছেন নেককার ছালেহ মাইয়্যাতের কাছে খোশবোর কোন প্রয়োজন নেই। তারা উহার অমুখাপেক্ষী। হ্যা যদি হাজেরিনদের জন্য ফাতেহাখানী জিকির তেলাওয়াতের সময় কবরের পাশে খালি জায়গায় আগরবাতী জালানোকে উত্তম ও মুছতাহাছান বলেছেন।

১১. আওলিয়ায়ে কেরামের কবরে গিলাফ দেয়া প্রসঙ্গে ঃ

ছালেহিনে কেরামদের কবরে গিলাফ ছড়ানোর ব্যাপারে তাকে প্রশ্ন করা হলে তিনি উত্তরে বলেন তা বৈধ। যাতে সাধারণ মানুষ তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাদের থেকে ফুয়ুজাত লাভ করতে পারে। এর পর তিনি বলেন ছাদর দিতে হবে একটি এর অধিক নয়। হ্যাঁ যদি তা ফেটে যায় তাহলে উহাকে পাল্টিয়ে অন্য আর একটি দেয়া হবে। উহার বিপরীতে একটি ফেটে বা পুরাতন হয়ে না যাওয়াতে অন্য নতুন ছাদর চড়ানো তাঁর মতে বৈধ নয়। এ রসমের বশিভূত হয়ে ছাদর চড়ানোকে অপচয় বলে মত প্রকাশ করেন। আর এ ব্যাপারে বলেছেন যে, এ প্রকার চাদর না দিয়ে আউলিয়ায়ে কেরামদের ইসালে ছওয়াবের নিয়তে গরীবদেরকে তার মূল্য দান করা উচিত।

১২. ওরশ ও কাওয়ালী প্রসঙ্গে ঃ

ভারত পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মধ্যে অধিকাংশ বুযুর্গানে দ্বীনদের ওরশ শরীফে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে কাওয়ালীর ব্যবস্থা করা হয়। বিভিন্ন খানকায়ও অনুরূপ প্রথা রয়েছে। কিছু স্বার্থান্বেষী মহল ওরশ উদ্‌যাপন করতে গিয়ে শরীয়ত বিরোধী নানা রকম কার্যকলাপের মেলা জুড়ায়ে দেয়। ডোল তবলা বাঁশি সহকালে গান বাজনার ব্যবস্থা করে আলা হযরত এ প্রকারের কাওয়ালীকে নাজায়েজ বলেছেন এবং যে সব বাদ্যযন্ত্র সহকারে কাওয়ালীর আয়োজন করা হয় ঐ সব ওরশের মধ্যে অংশগ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। আলা হযরত ওরশ শরীফ উদযাপনের ব্যাপারে জায়েয ফতোয়া দিয়েছেন। তবে উহাকে শরীয়তের শর্ত দ্বারা শর্তারোপ করেছেন।

১৩. ছেমা কাওয়ালী প্রসঙ্গে ঃ

পাক ভারত উপমহাদেশে বুযুর্গানে দ্বীনরা তাদের আদর্শের মাধ্যমে ইসলামের আলো প্রসারিত করেছেন। সেখানে তারা ইসলামী শিক্ষা-সংস্কৃতিও প্রসারিত করেছেন। তখনকার চিশতীয়া তরীকার মশায়েখরা হিন্দুদের মোকাবেলায় ইসলাম প্রসারের জন্য ছেমার পন্থা

উদভাবণ করেছেন যা পরবর্তীতে কাওয়ালী নামে রূপধারণ করে এমনকি তা বিভিন্ন যান্ত্রীক বাদ্য বাজনার সাথে অনুষ্ঠিত হতে থাকে। আলা হযরত কেবলা তার দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে গিয়ে ইসলামী সমাজকে সংস্কার করার জন্য বাদ্যযন্ত্র সহকারে অনুষ্ঠিত কাওয়ালীকে হারাম হিসেবে মত প্রকাশ করেছেন। তিনি আহকামে শরীয়ত গ্রন্থের মধ্যে বাদ্যযন্ত্র সহকারে কাওয়ালী করা প্রসঙ্গে বলেন। কেবল কাওয়ালী করা জায়েয আছে। আর বাদ্য যন্ত্রসহকারে হারাম।

১৪. আতশবাজী প্রসঙ্গে ঃ

বিবাহ, শবে বরাত ও পবিত্র ঈদ ইত্যাদি উপলক্ষ্যে অনেক জায়গায় আতশবাজী ফটকা বাজীর সাধারণ প্রথা রয়েছে। আলা হযরত উহাকে হারাম বলেছেন এবং যে বিবাহে শরীয়তের পরীপন্থী কাজ ও আনাগোনা থাকে উহাতে শরীক হতে নিষেধ করেছেন।

আলা হযরতের ব্যাপারে গাউছে পাকের এরশাদ ঃ

আলীপুর ছিয়ালকোট জেলার সুপ্রসিদ্ধ সর্বজন পরিচিত বুযুর্গ শাইখুত তরীকত আমিরে মিল্লাত সৈয়দ মাওলানা আলহাজ্ব পির জমায়েত আলী শাহ্ সাহেব নক্সবন্দী মোজাদ্দেদী যিনি ১৮৩৩ সালে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১৯৫১ সালে মৃত্যু বরণ করেন তিনি ১১৮ বছর হায়াত পেয়েছেন। ২৭ অক্টোবর ১৯০৪ সালে দাজ্জাল কাজ্জাব মোর্তেদ ভন্ড নবীর দাবীদার কাদিয়ানী মাজহাবের প্রবর্তক মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ছিয়াল কোটে তার সাথে মোকাবেলা করার জন্য এসেছিল কিন্তু চরম পরাজয় বরণ করে ওখান থেকে পলায়ন করেছিল। যিনি ৪৪ বার হজ্ব ও যিয়ারতে মদিনায়ে তাইয়্যেবা করেছেন। তারই বর্ণিত ঘটনা তিনি বলেন আমি একদিন আমার নানা হুজুর কুতুবুল আকতাব গাউছুল আজম শাহেন শাহে বাগদাদ শেখ আবদুল কাদের রাদিয়াল্লাহু আনহুকে স্বপ্নে দেখলাম, তিনি আমাকে সু সংবাদ প্রদান করেছেন যে, হে সৈয়্যদ জমায়েত আলী শাহ্ হিন্দুস্থানে ব্রেলী শরীফের মধ্যে আমার প্রতিনিধি রয়েছেন। যার নাম হচ্ছে মাওলানা আহমদ রেজা খান। এর পর আমিরে মিল্লাত হযরত পীর ছৈয়দ জমায়েত আলী সাহেব আলা হযরতের সাথে সাক্ষাত করার জন্য আলীপুর থেকে ব্রেরলী শরীফ তাশরিফ আনলেন। আলা হযরতের সাথে স্বাক্ষাৎ করে তাঁকে হুজুর গাউছে পাকের স্বপ্নিল সুসংবাদ প্রদান করলেন।

বাগদাদ শরীফের প্রতি আলা হযরতের তাজিম ঃ

বর্ণিত আছে যে, যখন আলা হযরত কেবলায়ে আলমের বয়স ৬ বৎসর হয়েছিল তখন তিনি জানতে পারলেন ভারত বর্ষ থেকে বাগদাদ শরীফ কোন দিকে পড়েছে। তিনি উহা জানার পর ঐ সময় থেকে ইন্তেকাল পর্যন্ত কোনদিন বাগদাদ শরীফের দিকে পা মোবারক লম্বা করে বসেননি। সুবহানাল্লাহ! আলা হযরত হলেন আদবের খনি। আদব শিখতে চাইলে আলা হযরতের জীবনী অনুসরণ করুন।

আলা হযরতের ব্যাপারে ওলমাকুল শিরমণি সৈয়্যদ আলে মুস্তফা সাহেবের এরশাদ ঃ

অল ইন্ডিয়া সুন্নী জমিয়তুল ওলামা এর সভাপতি আলীয়া বরকাতীয়া সরকারে কালা মারেহারা মুতাহারা দরবার শরীফের সাজ্জাদানশীন মাখদুমুল আউলিয়া সৈয়্যদুল ওলামা

ইয়াদগারে মাশায়েখে মারেহারা হযরত আল্লামা মাওলানা আলহাজ্ব আশ শাহ সৈয়্যদ আলে মুস্তফা বলতেছেন, আমি এ বিষয়ে অনেক গবেষণা করেছি যে, হুজুর আলা হযরত মুজাদ্দেদে দ্বীনো মিল্লাহ প্রতিটি পদ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তাঁর নির্মল চরিত্র, অনুপম আদর্শ ও যাবতীয় গুণাবলী রাসুলে পাকের আদর্শে পরিপূর্ণ ছিল। এতদসত্ত্বেও আল্লাহ তায়ালা তাঁকে পাঠান বংশে কেন পাঠায়েছেন, প্রিয় নবীর বংশ থেকে কেন পাঠাননি। এ ব্যাপারে ব্যাপক গবেষণার পর আমার বুঝে এসেছে যে, যদি আলা হযরত কেবলা সৈয়্যদ হতেন এবং সৈয়্যদ হয়ে সৈয়্যদদের শান-মান আদব-এহতেরামের কথা বলতেন, তাদের তাজীম-সম্মানার্থে বক্তব্য দিতেন তাহলে মুনাফিকরা একথা বলতো যে, মিয়া নিজের মুখে নিজের প্রশংসা সম্মানের কথা বলতেছেন, নিজের সম্মানের উদ্দেশ্যে এ ধরনের পন্থা অবলম্বন করেছেন, সুতরাং আল্লাহ তায়ালার এ প্রজ্ঞা প্রকাশিত হলো যে, তিনি আলা হযরত কেবলাকে প্রিয় নবীর আওলাদের মধ্যে থেকে না পাঠায়ে রোজে ক্বিয়ামত পর্যন্তের জন্য ইসলামের শত্রুদের মুখ বন্ধ করে দিলেন। যাতে বাতেলেরা একথা বলার সুযোগ না পায় আলা হযরত নিজের সম্মানের কথা নিজে বলতেছেন। আলা হযরত শাহ ইমাম আহমদ রেজা সৈয়্যদজাদাদের যে মান মর্যাদায় আদব-এহতেরাম করেছেন তাঁদের প্রতি তা'জীম ও তাওকীর করে উম্মতকে দেখায়েছেন ইতিহাসে তার নজীর বিরল।

আখেরী মজলিশ মোবারক ঃ

ভাউয়ালী পাহাড়ে অবস্থান কালে আলা হযরতের বাহু মোবারকে প্রচন্ড ব্যথা এসে গিয়েছিল এতে তিনি খুবই দুর্বল হয়ে গিয়েছিলেন। যার ফলে মুহররম মাসের প্রথমের কয়েকদিন ওখানে থাকতে হয়েছে। পরিশেষে মুহররমের ১৪ তারিখ ১৩৪০ হিজরীতে ভাউয়ালী পাহাড় থেকে ব্রেলীতে তাশরীফ আনলেন। ব্রেলীর মুসলিমগণ জাঁকজমকের সাথে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন। আলা হযরত কেবলার অসুস্থতার কথা সর্বত্রের মুসলিমগণের কাছে ছড়িয়ে পড়লে সর্বত্রের মুসলিমগন ব্রেলীতে আসা যাওয়া করতেছিল। আলা হযরত কেবলার নুরানী হাতে বায়য়াত হয়ে কাদেরীয়া তরীক্বতে প্রবেশ এবং তার কিছু সেবা যত্ন করে নিজেকে ধন্য করার উদ্দেশ্যে। আলা হযরত কেবলার শারীরিক অবস্থা খুবই খারাপ হয়েছে। এ দুর্বল অবস্থাই তাঁর প্রতিটি আলোচনা সভা রোগী পরিদর্শন মুসলমান ও অসহায়দের স্মরণ এবং মহামূল্য উপদেশাবলীতে পরিপূর্ণ থাকত। তাঁর প্রতিটি আলোচনা বৈঠক সর্কারে দো-আলম তাজেদারে মদীনা সুরুরে ক্বলবো ছিনা হুজুর পুরনূর ফায়জে গাঞ্জুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এর স্বরণ থেকে মুক্ত ছিলনা। বরং ঐ রোগ্ন অবস্থায়ও রাসুলে পাকের বেশাবেশী স্মরণ করতেন। বিশেষ বিশেষ অবস্থায় নিজের এবং সমস্ত মুসলমানদের জন্য খাতেমা বিলখায়েরের দোয়া করতেন। সে সভাস্থলে বিনয়ী ও খোদা ভীতির এমন অবস্থা ছিল যে, অধিক হারে তাত্বিক হাদীস শরীফ উল্লেখ করতেন। নিজে কাঁদতেন এবং উপস্থিত শ্রোতাদেরও কাঁদতে কাঁদতে হাচি এসে যেত। অধিকাংশ সময় তিনি এরশাদ করতেন যার ইন্তেকাল ঈমানের উপর হয়েছে সে সব কিছু পেয়েছে। আর

কখনো এরশাদ করতেন যদি ক্ষমা করেন তবে তা আল্লাহর দয়া। আর যদি ক্ষমা না করেন তাহলে উহা তার ইনছাফ।

একদিন লোকদেরকে ঘরে ডাকলেন এবং দ্বীন ও ঈমানকে বাচানোর জন্য শক্ত তাকিদ ও উপদেশ দিলেন। ওয়াজে ও ঐ আখেরী মজলিশে তিনি ঈমান তাজাকারী তাকরির ফরমালেন উহার সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ।

আখেরী তাকরীরের সার সংক্ষেপ ঃ

আলা হযরত কেবলার অন্তিম অনুরোধ, প্রিয় ভাইয়েরা আমার জানা নেই যে, কতদিন আমি আপনাদের মাঝে অবস্থান করব। মানুষের তিনটি অবস্থা হয়ে থাকে যথা-

১. শৈশব
২. যৌবন
৩. ও বৃদ্ধ

শৈশব কাল গেল যৌবন কাল আসল যৌবন কাল গেল বৃদ্ধকাল আসল এখন চতুর্থ কোন অবস্থা আছে যার জন্য অপেক্ষা করা যাবে কেবল মৃত্যুই বাকী আছে। আল্লাহ মহা ক্ষমতাবান যিনি এরূপ হাজারো বৈঠক দান করেন। আপনারা সবাই রয়েছেন আমিও আপনাদের মাঝে রয়েছি। আর আমি আপনাদেরকে নছিহত শুনাচ্ছি। বাহ্যত এখন তা বলার মওক্বা নয়। এ মুহূর্তে আমি আপনাদেরকে দুটি অছিয়ত করতে চাই-

১. আল্লাহ ও রাসুল(জাল্লা ওয়ালা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)সম্পর্কে ও
২. আমার নিজ সম্পর্কে।

(এক) আপনারা রাসুলে পাকের পেয়ারা উম্মত। আপনাদের চর্তুদিকে নেকড়ে বাঘ রয়েছে। এরা আপনাদেরকে বিপদগামী করতে উৎপেতে রয়েছে। তারা আপনাদেরকে ফিতনা ফ্যাসাদে নিক্ষেপ করতে, আপনাদেরকে তাদের সাথে নরকে নিয়ে যেতে চায়। সাবধান! আপনারা তাদের ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখবেন এবং তাদের থেকে দুরে সরে থাকবেন। দেওবন্দী, রাফেজী, নিছেড়ী, কাদিয়ানী ও চকড়ালভী কতইনা দল হয়েছে। কত নতুন নতুন বাতেল দলের উদ্ভব হয়েছে। তারা নাপাক সকল প্রকার নাপাকি তারা নিজেদের মধ্যে বহন করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এরা সবাই নেকড়ে বাঘ আপনাদের ঈমান চোর আপনাদের ঈমান হরন করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। আমি আপনাদেরকে সতর্কতা প্রদর্শন করতেছি যে, আপনারা তাদের হামলা থেকে নিজেদের ঈমানকে বাচাবেন। বাতিলের বতুলতার ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখবেন।

হুজুর পাক ছালাল্লাহু আলইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর নূর। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম থেকে সাহাবায়ে কেরামগন আলোকিত হয়েছেন। সাহাবায়ে কেরাম থেকে তাবেয়ীগণ আলোকিত। তাদের থেকে মুজতাহেদীনগন আলোকিত, তাদের থেকে আমরা আলোকিত। এখন আমরা আপনাদেরকে বলতেছি আপনারা এ জ্যোতি আমাদের থেকে নিন। আপনাদের উহার প্রয়োজন। আপনারা আমাদের থেকে আলোকিত হউন। আর মনে রাখুন ঐ নূর হলো আল্লাহ ও রাসুলের সত্যিকারের ভালবাসা। তাদের

সম্মানে এবং তাদের বন্ধুদের খেদমত ও সম্মান প্রদর্শন আর তাদের শত্রুদের সাথে সত্যিকারের দুশমনি। যাদের থেকে সামান্য পরিমাণ আল্লাহ ও রাসুলের শানে মান হানিকর উক্তি পাবেন তারা আপনাদের যতই প্রিয় হউক না কেন তৎক্ষনাত আপনারা তাদের থেকে পৃথক হয়ে যাবেন। যার থেকে প্রিয় নবীর শানে কিঞ্চিত পরিমান বাড়াবাড়ি দেখবেন সে আপনাদের যথই সম্মানিত বুযুর্গ ব্যক্তি হউক না কেন তাকে আপনারা নিজেদের থেকে এমনভাবে সরায়ে দেবেন যেভাবে দুধ থেকে মাখন সরানো হয়। আমি পৌনঃ চৌদ্দ বছর বয়স থেকে এ কথা বলে আসতেছি। আর এ মুহূর্তে শুধু উহাই আবেদন করতেছি। আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তার দ্বীনের পৃষ্টপোষকতার জন্য কোন বান্দাকে দাড় করাবেন। কিন্তু জানা নেই আমার পরে যিনি আসবেন তিনি কেমন হবেন। আপনাদেরকে কি বলবেন। এভাবে আপনারা আমার কথাগুলো মনোযোগ সহকারে শ্রবন করুন। আল্লাহর হুজ্জত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমি কবর থেকে উঠে আপনাদের উদ্দেশ্যে কথা বলার, সর্তকতা প্রদান করার জন্য আপনাদের কাছে আসব না। যারা আমার কথাগুলো শুনেছেন এবং মেনেছেন কাল কিয়ামতের দিন উহা তাদের জন্য নূর ও মুক্তির হাতিয়ার হবে। আর যারা না মানে তাদের জন্য আধাঁর ও ধ্বংশ হবে। ইহাই হচ্ছে আল্লাহ ও তদ্বীয় রাসুলের ব্যাপারে অছিয়ত। যারা এখানে উপস্থিত আছেন সকলে আমার কথাগুলো শুনুন এবং মান্য করুন। আর যারা এখানে অনুপস্থিত তাদেরকে অবহিত ও সর্তকতা প্রদান করার দায় দায়িত্ব উপস্থিত সকলের উপর ন্যস্থ রইল।

(দ্বিতীয়) আর দ্বিতীয় অছিয়ত হল আমার ব্যাপারে আপনারা সকলে আমার নিকট কোন কষ্ট পৌছতে দেননি। আমার কাজ আপনারা নিজেরাই করেছেন। আমাকে করতে দেননি। আল্লাহ তায়ালা আপনাদের সবাইকে উত্তম পুরস্কার প্রদান করুন। আমি আপনাদের সকলের নিকট থেকে আশা করব কবরের মধ্যেও আপনাদের পক্ষ থেকে কোন প্রকার কষ্ট পাব না। আমি আল্লাহ তায়ালার ওয়াস্তে সকল সুন্নী ভাইদেরকে আমার হক সমূহ ক্ষমা করে দিয়েছি আর আপনাদের সকলের খেদমতে আমার একান্ত আবেদন আপনারাও যেন আল্লাহর ওয়াস্তে আমার পক্ষ থেকে কোন প্রকার কষ্ট ও হক পেয়ে থাকলে ক্ষমা করে দেবেন। আর যারা এখানে অনুপস্থিত তাদের থেকে আমার জন্য ক্ষমা নেয়ার দায় দায়িত্ব উপস্থিত সকলের উপর ন্যস্থ রইল।

আলোচনা সভার সমাপনী মুহূর্তে তিনি এরশাদ ফরমালেন আল্লাহ তায়ালার অনুকম্পা ও বদান্যতায় এ ঘর থেকে ফতোয়া বের হবার ধারা নব্বই বছর থেকে বেশী হয়েছে। আমার শ্রদ্ধেয় দাদা দীর্ঘদিন যাবত এ কাজের আঞ্জাম দেন। তিনি যখন দুনিয়া থেকে তাশরিফ নিয়ে গেলেন তখন তার স্থানে আমার শ্রদ্ধেয় পিতাকে রেখে যান। তিনি গুরুত্বের সাথে এ কাজ সম্পাদন করে থাকেন। আমি চৌদ্দ বছর বয়সে তাঁর থেকে এ গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করি। অতঃপর কিছুদিন পর ইমামতিও নিজ দায়িত্বে নিয়ে নিয়েছি।

মূলতঃ আমি ছোট কাল থেকেই তাঁর সকল দায়িত্ব নিজের কাঁদে তুলে নিয়ে গুরুত্বের সাথে আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছি। যখন আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন পিতা দুনিয়া থেকে চলে গেলেন

তখন তিনি আমাকে রেখে গেলেন। এখন আমি চলে যাচ্ছি। চলে যাওয়ার প্রাক্কালে আপনাদের কাছে তিনজনকে রেখে যাচ্ছি যথা- (এক) আমার বড় সাহেবজাদা আল্লামা হামেদ রেজা খান, (দু') আমার ছোট শাহজাদা আল্লামা মুস্তফা রেজা খান ও (তিন) আমার ভাতিজা আল্লামা হাসনাইন রেজা খান। যদি আপনারা সকলে তাদের সাথে মিলে-মিশে কাজ করেন তাহলে আল্লাহর ফজল ও করমে যে কোন কাজই সহজে করতে পারবেন এবং সকল কাজে সফলতা লাভ করবেন। আল্লাহ আপনাদের সকলকে সাহায্য করবেন। তারপর তিনি সকলের জন্য দ্বীনের খেদমত ও জ্ঞানের উন্নতি লাভ করার জন্য দোয়া করলেন।

আলা হযরত কেবলার এ মোবারক বাণী উপস্থিত জনসমুদ্রে এমন প্রভাব ফেলল যে, সকলে দাড়িতে আঘাত করে করে কাঁদতে লাগলেন। হযরত মাওলানা হাসনাইন রেজা খান বলতেছেন ঐ উপস্থিত সকলের জার জার কান্নার কথা আমার সারা জীবন স্মরণ থাকবে। আলা হযরত কেবলা ঐ দিন দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার কথা সুস্পষ্টভাবে বললেন। ঐ দিন থেকে ইন্তেকালের দিন পর্যন্ত লাগাতারভাবে নিজের ওফাত শরীফের সংবাদ দিতে লাগলেন। এমন দৃঢ়তার সাথে প্রতি মিনিটে মিনিটে সংবাদ দিতেছে আর এ সময়ে কিছু অলৌকিক ঘটনাও ঘটেছিল। হযরত মাওলানা হাসনাইন রেজা খান বলেছেন আমি সব ঘটনা স্বচক্ষে অবলোকন করেছি। আলা হযরত কেবলার এ অছিয়তনামা যা উপরে উল্লেখিত সবগুলো মৌখিক ছিল।

ঠিক ইন্তেকালের দিন তথা ২৫শে সফর জুমাবার সকাল থেকে আলা হযরত কেবলা পরকালে সফর করার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। সম্পত্তির ব্যাপারে ওয়াক্‌ফনামা পরিপূর্ণ করালেন অতঃপর অছিয়ত নামা লেখালেন।

লিখিত অছিয়ত নামা ঃ

আলা হযরত কেবলার বেছাল শরীফের দু'ঘন্টা ১৭ মিনিট পূর্বে অছিয়ত নামা লিপিবদ্ধ করার শেষে আল্লাহর হামদ ও প্রিয় নবীর উপর দরুদ শরীফের পর নিজ হাতের কলম দ্বারা স্বাক্ষর করলেন।

লিখিত অছিয়তনামা নিম্নরূপ ঃ

১. অন্তিম নিঃস্বাস ত্যাগের সময় ছবিযুক্ত কার্ড, খাম, ছবি ওয়ালা টাকা-পয়সা ও কোন প্রকার ছবি এ ঘরে থাকতে পারবে না। যে ব্যক্তির উপর গোসল ফরজ সে ব্যক্তি, কোন ঋতুস্রাববর্তী মহিলাও এখানে আসতে পারবে না। কুকুরকে ঘরে আসতে দেয়া যাবে না।

২. সূরা ইয়াছিন শরীফ ও সূরা রা'য়াদ শরীফ উচুঁ আওয়াজে পড়বেন। কালেমায়ে তায়্যেবা বক্ষের উপর নিঃশ্বাস থাকা অবধি উচ্চ স্বরে পড়বেন। কেউ চিৎকার করে কথা বলবে না। কোন ক্রন্দনকারী বাচ্চা ঘরে আসতে পারবে না।

৩. নিঃস্বাস চলে যাওয়ার সাথে সাথে নরম হাতে চক্ষু বন্ধ করে দেবেন এবং চক্ষু বন্ধ করার সময় বিসমিল্লাহে ওয়ালা মিল্লাতে রাসুলিল্লাহ পাঠ করবেন। অন্তিম নিঃস্বাস ত্যাগ কালে খুব ঠান্ডা পানি সম্ভব হলে বরফ বিগলিত পানি পান করাবেন। হাত-পা-

সোজা করার সময় বিসমিল্লাহে ওয়ালা মিল্লাতে রাসুলিল্লাহ পাঠ করে সোজা করবেন। অতঃপর কেউ অহেতুক কান্নাকাটি করবেন না।

ইন্তেকালের সময় আমার ও আপনাদের জন্য কল্যাণের প্রার্থনা করতে থাকবেন কোন মন্দ কথা মুখে আনবেন না। কেননা ঐ সময়ে ফেরেস্তারা আমিন বলে থাকেন। সাবধান! খাটে লাশ উঠানোর সময় কেউ আওয়াজ করবেন না।

৪. গোসল এবং অন্যান্য কার্যাদি সুন্নাত মোতাবেক করবেন। আর মাওলানা হামেদ রেজা খান এ দোয়া পাঠ করবেন যা ফতোয়ায় লিখা আছে। দোয়াটি বাহারে শরীয়ত চতুর্থ খন্ডে রয়েছে। অতঃপর মাওলানা হামেদ রেজা খান নামাযে জানাযা পড়াবেন অথবা মাওলানা আমজাদ আলী পড়াবেন (যিনি বাহারে শরীয়তের প্রণেতা)।

৫. জানাযার নামাজ শরয়ী নিয়ম ব্যতিত অযথা বিলম্ব করবেন না। জানাযার নামাযের আগে যদি কোন কিছু পড়েন তাহলে কসিদায়ে দরুদ তথা তুমপে করুরো দরুদ নাতে রাসুলটি পাঠ করবেন। (যা হাদায়েখে বখ্শীশ শরীফে রয়েছে)।

৬. সাবধান! কোন নাত আমার প্রশংসায় পড়বে না। এভাবে কবরেও।

৭. কবরে খুব সাবধানে আস্তে আস্তে অবতরণ করাবেন। বিসমিল্লাহে ওয়ালা মিল্লাতে রাসুলিল্লাহ পাঠ করে ডান পাশ করে শয়ন করাবেন। পিছনে নরম মাটির আঁটি লাগায়ে দেবেন।

৮. কবর তৈরী হওয়া পর্যন্ত "সুবহানাল্লাহ ওয়ালহামদু লিল্লাহে ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবর আল্লাহুম্মা সাব্বিত আবিদাকা হাজা বিল ক্বাওলিস সাবিত বেজাহে নবীয়্যেকা ছাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহে ওয়াসাল্লাম" পড়তে থাকবেন। শয্য দানা কবরের পাড়ে নিয়ে যাবেন না, এখানেই ভাগ করে দেবেন। কেননা ওখানে অনেক শোরগল হয়ে থাকে যাতে কবরের মান ক্ষুন্ন হয়।

৯. কবর দিয়ে মাটি লেবেল করার পর শিয়রে "আলিফ লাম মিম থেকে মুফলেহুন পর্যন্ত আয়াতগুলো পড়বেন আর পায়ের দিকে দাঁড়িয়ে সুরায়ে বাকারার শেষের দু'আয়াত তথা আমানার রাসুল থেকে সুরাটির শেষ পর্যন্ত পড়বেন। আর মাওলানা হামেদ রেজা খান উচ্চ কণ্ঠে আযান দেবেন। অতঃপর সকলেই ওখান থেকে চলে আসবেন। আর তলক্বীনকারী আমার শিয়রে দাঁড়িয়ে তিনবার তলক্বীন করবেন। একবার তলক্বীন করে পূনরায় তলক্বীনের পিছনের শব্দাবলী পাঠ করবেন। এভাবে তিনবার তলক্বীন করবেন। তারপর প্রিয়জন ও আত্মীয় স্বজন সকলেই চলে আসবেন। দেড় ঘন্টা আমার মাওয়াযাহায় দরুদ শরীফ এমন আওয়াজে পড়তে থাকবেন যাতে আমি শুনতে পায়। অতঃপর আমাকে করুণাময় আল্লাহর কাছে সোপর্দ করে চলে আসবেন। যদি কষ্ট সহ্য হয় তাহলে পরিপূর্ণ তিন দিবারাত্রি পাহারার সাথে দু'প্রিয়জন বা বন্ধু মাওয়াযাহায় কোরআন মাজীদ ও দরুদ শরীফ এমন আওয়াজে বিরতিহীনভবে পড়তে থাকবে যেন আল্লাহ তায়ালা চাইলে এ নতুন স্থানে মন লেগে যায়। উল্লেখ্য যে, তাঁর বেছাল শরীফের পর থেকে গোসল শরীফ পর্যন্ত কোরআন শরীফ উচ্চস্বরে তেলাওয়াত করা

হয়েছিল আর পরিপূর্ণ তিন দিবারাত্রিও। মাওয়াযাহা শরীফে ধারাবাহিকভাবে কোরান তেলাওয়াত জারী ছিল।

১০। কাফনে কোন মূল্যবান বস্ত্র বা বড় চাদোয়া দেবেন না। কোন কথা যেন সুন্নাতের পরিপন্থী না হয়।

১১। ফাতেহার খাবার থেকে ধনীদেরকে দেয়া যাবে না শুধু গরীবদেরকে দেবেন। তা-ও সম্মান ও মনোরঞ্জনের সাথে। ধমক দিয়ে নয়। যাতে কোন কার্যক্রম নবীর সুন্নাতের পরিপন্থী না হয়।

১২। প্রিয়জনদের মন রক্ষার খাতিরে সম্ভব হলে খাবার থেকে কিছু তাদের কাছে পৌঁছায়ে দেবেন।

১৩। রেজা হোসাইন, হাসনাইন,রেজা ও আপনারা সবাই প্রীতি ও ঐক্যতার বন্ধনে আবদ্ধ থাকবেন। যতটুকু সম্ভব শরীয়াতের অনুসরণ পরিত্যাগ করবেন না। আর আমার দ্বীন ও মাযহাব যা আমার কিতবাদী হতে প্রকাশিত উহার উপর দৃঢ়তার সাথে স্থির থাকা প্রত্যেক ফরজ অপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ফরজ। আল্লাহ তায়ালা শক্তিদাতা। ইহা লিপিবদ্ধের পর আ'লা হযরত কেবলা নিজেই দস্তখত করলেন।

ইমামে আহলে সুন্নাত মজাদ্দেদে দ্বীন ও মিল্লাত আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজার ইন্তেকালের মুহূর্তঃ

আলা হযরত কেবলা অছিয়ত নামা লিপিবদ্ধ করালেন অতঃপর উহাতে নিজ হাতে দস্তখত করে নিজেই আমল করলেন। অন্তিম নিঃশ্বাস ত্যাগ করার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সব কাজ ঘড়ি দেখে ঠিক সময়ে এরশাদ করতেছেন। যখন দু'টা বাজার চার মিনিট বাকী ছিল তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন কয়টা বেজেছে যখন সময় বলে দেয়া হল তখন তিনি ইরশাদ করলেন একটা ঘড়ি আমার সামনে রেখে দেন। হুকুম তামীল করা হল। তারপর ইরশাদ করলেন, ছবি নামিয়ে ফেলুন এখন ছবির কোন কাজ নেই। উল্লেখ্য যে, তিনি ছবি বলতে ডাক পোষ্টের ছবি যুক্ত স্ট্যাম, ছবি ওয়ালা কার্ড, ছবি ওয়ালা টাকা পয়সার কথা বলেছেন) এমনিতে তাঁর ঘরে অন্য কিছুর ছবি ছিলনা। অতঃপর মাওলানা মুহাম্মদ হামেদ রেজা খান সাহেবকে লক্ষ্য করে বললেন অযু করে আসুন এবং কোরআন শরীফ নিয়ে আসুন। তিনি অযু করে এখনো আসেননি, ইতিমধ্যে মুফতীয়ে আজম হিন্দ মাওলানা মুস্তফা রেজা খান সাহেবকে বললেন কী করতেছেন, কোরানে কারীম নিয়ে সুরা ইয়াছিন শরীফ এবং সুরা রা'য়াদ শরীফ তেলাওয়াত করুন। এখন দুনিয়া থেকে চির বিদায় নেয়ার মাত্র কয়েক মিনিট অবশিষ্ট। নির্দেশ মোতাবেক সূরাদ্বয় তেলাওয়াত করা হচ্ছে। আ'লা হযরত একাগ্রচিত্তে তেলাওয়াত শ্রবণ করতেছেন, আর যে আয়াতের মধ্যে সন্দেহ হচ্ছে বা শ্রবণে পরিপূর্ণ আসতেছে না কিংবা পঠনে যের-যবরের কোন পার্থক্য হচ্ছে তা তিনি নিজে তেলাওয়াত করে বলে দিলেন।

এরপর সৈয়্যদ মাহমুদ আলী সাহেব একজন মুসলমান ডাক্তার আ'লা হযরত কেবলার খুব প্রিয় হযরত মাওলানা হাসনাইন রেজা খান সাহেবের সঙ্গে আরও কিছু ভক্ত-অনুরক্ত সহ

হুজুরের খেদমতে উপস্থিত হলেন, ঐ সময়ে যারা যারা হুজুরকে সালাম করেছেন হুজুর সকলের সালামের উত্তর দিলেন। আর সৈয়্যদ সাহেবের প্রতি দু'হাত প্রসারিত করে করমর্দন করলেন। ডাক্তার সাহেব আ'লা হযরত কেবলাকে তাঁর অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইলেন, কিন্তু আ'লা হযরত কেবলা ঐ সময়ে আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন ছিলেন বিধায় তিনি ডাক্তারের সাথে তাঁর রোগ কিংবা চিকিৎসার বিষয়ে কোন কিছু এরশাদ করেননি।

দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার প্রাক্কালে যে সমস্ত দোয়া পাঠ করা সুন্নাত তিনি সবগুলো পরিপূর্ণভাবে এবং এর চেয়ে ও অধিক পড়লেন। অতঃপর ২৫শে সফর ১৩৪০ হিজরী মোতাবেক ২৮ অক্টোবর ১৯২১ সাল জুমা মোবারকের দিনে ঠিক ২টা ৩৮ মিনিটে (উল্লেখ্য যে উক্ত সময়ে আ'লা হযরত কেবলা জন্ম গ্রহণ ও করেছিলেন) যখন মুয়াজ্জিন জুমার আজান দিচ্ছেন এবং হাইয়্যা আলাল ফালাহ (কল্যাণের দিকে এসো) পৌঁছলেন তখন আ'লা হযরত কেবলা কালিমায়ে তৈয়্যবা পরিপূর্ণ পড়লেন, যখন তাঁর শক্তি একেবারে শেষ, নিঃশ্বাস বুকে এসে পড়ল অধরোষ্ট নড়াচড়া ও যিকির শেষ হতে না হতে চেহারা মোবারকের উপর একচ্ছটা আলো প্রস্ফুটিত হল- যাতে ঝাকুনি ছিল যেমনি ভাবে সুর্যের কিরণ দর্পনে নিপতিত হয়ে ঝলমল করে ঐ আলোকচ্ছটা বিদূরিত হতেই রূহ মোবারক হুজুর কেবলার পবিত্র আত্মা থেকে উর্ধ্ব বিচরণ করল। (ইন্না লিল্লাহে ওয়াইন্না ইলাইহি রাজেউন)।

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেজা রাদিয়াল্লাহ আনহু'র ইন্তেকালের পর পবিত্র লাশ মোবারকের গোসল ও দাফন শরীফের বিবরণঃ-

গোসল শরীফে ওলামায়ে কেরাম সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ ও কোরানের হাফেজ সাহেবগন অংশ গ্রহন করলেন-

- জনাব সৈয়্যদ আজহার আলী সাহেব- কবর খনন করলেন। এ কাজে কয়েকজন তাকে সাহায্য করলেন।
- বাহরে শরীয়তের প্রণেতা সদরুস শরীয়্যাহ হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আমজাদ আলী সাহেব, হুজুর কেবলার অসিয়ত মোতাবেক গোসল দিলেন।
- জনাব হাফেজ আমীর হাসান মুরাদাবাদী সাহেব, তাকে গোসল দেয়ার কাজে সাহায্য করলেন।
- জনাব মাওলান সৈয়্যদ সোলায়মান আশরাফ সাহেব , সৈয়্যদ মাহমুদ জান সাহেব, সৈয়্যদ মমতাজ আলী সাহেব এবং হযরত মাওলানা মুহাম্মদ রেজা খান সাহেব পানি ঢেলে দিলেন।
- জনাব মাওলানা হাকীম হোসাইন রেজা খান সাহেব জনাব লিয়াকত আলী খান সাহেব ও মুফতী ফেদায়েক খান সাহেব পানি এনে দেয়ার কাজে নিয়োজিত ছিলেন।
- শাহজাদায়ে আ'লা হযরত মুফতীয়ে আজম হিন্দ মোস্তফা রেজা খান সাহেব গোসল কার্জে নিয়োজিত অন্যান্য ব্যক্তিদের অসিয়ত অনুসারে দোয়া স্মরণ করায়ে দিচ্ছিলেন।
- গোসল শরীফ দেয়ার পর শাহাজাদায়ে আ'লা হযরত হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত মাওলানা হামেদ রেজা খান সাহেব কপালে সিজদার জায়গায় কাপুর লাগালেন।
- হযরত মাওলানা সৈয়্যদ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন কাপন শরীফ বিছালেন। উল্লেখ্য যে, গোসল দেয়ার সময় একজন হাজী সাহেব আলা হযরত রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে ব্রেলী শরীফ এসেছেন। তিনি এসে আ'লা হযরত কেবলার বেছাল শরীফের সংবাদ শুনলেন। হাজ্বী সাহেব আ'লা হযরত কেবলার জন্য জম্ জম্ শরীফের পানি মদীনায়ে তৈয়্যবার আতর ও অন্যান্য তাবাররুকাত উপঢৌকন স্বরূপ আনলেন। তার থেকে উপহারগুলো গ্রহণ করার পর জম্ জম্ শরীফের পানিতে কাপুর ভিজায়ে বিদায়ী পোষাক তথা কাফনে লাগায়ে দেয়া হল। আ'লা হযরত সারা জীবন নবীর প্রেমে অতিবাহিত করেছেন, তাই তাঁর অন্তিম মুহূর্তে মদীনায়ে তৈয়্যবা থেকে প্রিয় উপহার ঠিক সময়ে এসে পৌঁছেছে।

গোসল শরীফ থেকে অবসর হওয়ার পর মহিলাদেরকে যিয়ারতের সুযোগ দেয়া গেল। ঘরে মহিলাদের আর বাহিরে পুরুষদের বিশাল উপস্থিতি পরিলক্ষিত হল। মানুষের মাঝে এমন স্ফুটন আর কখনো দেখা যায়নি। খাট কাঁদে নেয়ার প্রত্যাশায় মানুষের উপর মানুষ পড়তে ছিল। যে অন্ত্যষ্টি পর্যন্ত পৌছেছে সে পিছনে আসার নাম পর্যন্ত নিচ্ছে না। ওহাবী, খারেজী, রাফেজী এমনকি গান্দবী পর্যন্ত অধিক হারে উপস্থিত ছিল।

একজন রাফেজী শেষ প্রচেষ্টা ও সব শক্তি প্রয়োগ করে আ'লা হযরত কেবলার লাশ মোবারক পর্যন্ত পৌছল। একজন সুন্নী তাকে এ বলে ওখান থেকে তাড়ায়ে দিল যে, সারা জীবন হুজুর কেবলার বিরোধীতা করেছ এখন জানাজা কাঁদে নিতে এসেছ? যাও এখানে আসবে না আমি তোমাকে জানাযায় কাঁদ লাগাতে দেবনা। রাফেজী লোকটি বলল, ভাই আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে তাড়ায়ে দেবেন না এ সুযোগ আমার জীবনে আর আসবে না আমাকে একটু সুযোগ প্রদান করুন।

শহরের কোথাও ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন জানাযার নামাযের জায়গা ছিল না। ঈদগাহের মধ্যে জানাজার নামায হল। প্রথম থেকেই ঈদগাহে জানাযা অনুষ্ঠিত হওয়ার কোন ঘোষণা ছিল না । ঈদগাহে যাওয়ার পথে এমন অবস্থা হল যে, ঘরের দুয়ারে ও ছাদে মহিলা আর রাস্তায় পুরুষদের বিশাল সমাগম হল। সকলে অপেক্ষা করতেছে যে, ইমামে আহ্লে সুন্নাতের শেষ জুলুশ আসলে এক নজর দেখে জীবনকে ধন্য করব। জানাযার নামাযের পর ঈদগাহে যিয়ারত করা হলো। আর ঈদগাহ থেকে ফিরে আসার সময় সব রাস্তার মানুষেরা মনভরে যিয়ারত করলেন। আর জানাযা নেয়ার সময় এবং আনার সময় ও কবর শরীফ যিয়ারতের পর আ'লা হযরত কেবলার অসিয়তকৃত নাতে রাসুলটি সবার মুখে মুখে জারী ছিল।

লাশ মোবারক দাফনের পর এমন একটি অলৌকিক ঘটনা দেখা গেল যা ফটো গ্রাফিকরা তাদের ক্যামেরায় ধারণ করতে পারেনি। অলৌকিক ঘটানাটি হল- আলা হযরত কেবলার লাশ মোবারকের দাফন কার্য সম্পন্ন করার পর দেখা গেল আসমান থেকে সরাসরি একটি নূরের ছটা তাঁর কবর শরীফের মধ্যে এসে পড়েছে যা দেখে সবাই আশ্চর্য হয়ে গেলেন কারণ এ ধরণের ঘটনা কেউ ইতিপূর্বে আর দেখেনি। এ নূরের লাইটটি দীর্ঘক্ষণ ছিল এরপর আর দেখা যায়নি। দাফনের পর থেকে ধারাবাহিকভাবে তিনদিন পর্যন্ত কোরান তেলাওয়াত কবর শরীফে জারী ছিল। এক মিনিটের জন্য ও বন্ধ ছিল না।

আসলে ১৩৪০ হিজরী সনটি মুসলমানদের জন্য একটি মর্মান্তদ বিয়োগান্তক ঘটনা ছিল। কারণ এ হিজরীতে সুন্নীয়তের দিক নিদের্শনা প্রদানকারী ব্যক্তিত্ব আ'লা হযরত কেবলা ইন্তে কাল করেছেন।

এ মহান হাস্তীর মাজার শরীফ ভারতের উত্তর প্রদেশ ব্রেলী শরীফের সওদাগরান মহল্লার একটি শানদার সুরম্য খানাকায়ে রেজভীয়াতে অবস্থিত। প্রতি বছর আরবী সফর মাসের ২৩-২৪-২৫ এ তিন দিন পর্যন্ত লাখো আশেকের সমাগমে অতি জাঁকজমকের সাথে এ মহান হাস্তীর ওরশ শরীফ উদ্‌যাপিত হয়। আল্লাহ তায়ালা এ ফক্বীরকেও এক বছর ওরশ শরীফে অংশ গ্রহণ করার তাওফীক দান করেছেন। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবাইকে এ মহান অলিয়ে কামেলের ফয়েজ ও বরকত দান করুন আমীন সুম্মা আমীন।

উল্লেখ্য যে, আ'লা হযরত কেবলার লাশ মোবারক নিয়ে জুলুশ সহকারে ঈদগাহে পৌঁছার পর পর ওখানে একটি বিস্ময়কর ঘটনা দেখা গেল, আর তা হল আলা হযরত কেবলার লাশ মোবারক ঈদগাহে পৌঁছার পূর্বেই ওখানে ৬/৭টি জানাযা উপস্থিত করা হয়েছিল। ঐ জানাজার সাথে যারা এসেছিলেন সকলেই আলা হযরতের জানাযার অপেক্ষা করতেছেন।

যখন ঐ জানাযাগুলোর ওয়ারেশদেরকে বলা হলো, তোমরা এ রকম করলে কেন? তোমরা তো ঐ জানাজাগুলো আগেই নামাজ পড়ে দাফন করে ফেলতে পারতে? তারা বলল, এখানে যে ৬/৭ টা জানাযা উপস্থিত করা হয়েছে এরা সবাই আলা হযরত কেবলার খুব ভক্ত ছিল। তাই ভক্তদের জানাযার নামায যাতে আলা হযরতের জানাযার নামাজের সাথেই হয় সে উদ্দেশ্যে এ জানাযাগুলোকে এখানে এনে আলা হযরত হুজুরের জানাযার জন্য অপেক্ষা করতেছি। অবশেষে ঐ ৬/৭ জনের জানাযার নামায আলা হযরতের জানাযার নামাজের সাথেই হলো। উল্লেখ্য যে, ঐ ৬/৭ জানাজার মধ্যে কয়েকজন গ্রামের ছিল আর বাকীরা শহরেরই ছিল।

হিন্দুস্থানের বিভিন্ন জায়াগায় তিজা তথা আলা হযরত কেবলার ইন্তেকালের পর তৃতীয় দিনে ফাতেহাখানী উদযাপিত হয়েছিল। বিশেষ করে হযরত খাজা গরীবে নওয়াজের আস্তানা শরীফের খাদেম হযরত সৈয়্যদ হোসাইন সাহেব যে কুলখানী করেছেন ওহা অনেক শানদার ছিল। যাতে বেশ কয়েকটি খতমে কোরান হয়েছে। অনুরূপ, কলকাতা, রেঙ্গুনে ও তিজা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তবে আশ্চর্যের বিষয় হলো মিসর জামেউল আজহার বিশ্বদিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত কুলখানীর খবর শুনে। কারণ ওখানে আলা হযরতের ইন্তেকালের কোন সংবাদ দেয়া হয়নি এতদসত্ত্বেও ওখানে তিজা অনুষ্ঠিত হয়েছে যার বিবরণ ইংরেজী পত্রিকায় এসেছিল। কুলখানীর ঘটনা বর্ণনাকারীরা বলেন, আমরা ইংরেজী পত্রিকায় উহার বিবরণ পড়েছি।

এছাড়া মক্কায়ে-মুয়াজ্জমা ও মদীনায়ে-মুনাওয়ারায় ও ইসালে সাওয়াব হয়েছে। মদীনায়ে তাইয়্যেবায় আলা হযরত কেবলার খলীফা কুতবে মদীনা হযরত জিয়া উদ্দীন মদনী সাহেব অনেক ওলামায়ে কেরামদেরকে সাথে নিয়ে রাসুলে পাকের মাওয়াযাহা শরীফে বসে খুব শানদার ভাবে ইসালে সাওয়াব করেছেন।

আলা হযরত কেবলার জন্ম জীবন ও ইন্তেকালের সাল দুটি শব্দ থেকেই বের হয়। নিম্নে শব্দ দুটি উল্লেখ করে মান বের করে দেখানো হল। আলা হযরত কেবলার তারিখী নাম হলো 'আল মুখতার' যার আবজাদ সংখ্যা হলো= ১২৭২ উক্ত সালেই আলা হযরতের জন্ম হয়েছে। আর আলা হযরত কেবলা হায়াত পেয়েছিলেন ৬৮ বৎসর। হাকাম শব্দের আবজাদ সংখ্যা বের করলে হয় ৬৮। যা আলা হযরতের হায়াত ছিল। আর আল মুখতার ও হাকম এ শব্দ দুটো একত্র করে আবজাদ সংখ্যা বের করলে হবে- ১৩৪০, যাতে আলা হযরত কেবলা ইন্তেকাল ফরমায়েছেন। অতএব, আল মুফখতার ও হাকম এ শব্দদু'টোর মধ্যে আলা হযরত কেবলার জন্ম, জীবন ও ইন্তেকালের সন বিদ্যমান রয়েছে অর্থাৎ আল-মুখতার শব্দের আবজাদ সংখ্যা হলো ১২৭২ আর হাকাম শব্দের আবজাদ সংখ্যা হলো ৬৮। এখন দুনোটির যোফল হবে,১২৭২+৬৮= ১৩৪০ হিজরী।

রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে আলা হযরতের ইন্তেজারঃ

এ দিকে ২৫শে সফর ১৩৪০ হিজরী ব্রেলী শরীফে আলা হযরত এ নশ্বর পৃথিবী থেকে চির বিদায় নিয়েছেন ঐ দিকে শাম দেশের একজন বুযুর্গ ব্যক্তি ২৫শে সফর ১৩৪০ হিজরীতে

বায়তুল মুকাদ্দাসে স্বপ্নে দেখলেন সৈয়দুল মুরসালীন ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ ফরমায়েছেন সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম ও আউলিয়ে এজাম রাদিয়াল্লাহু আনুহু বারেগাহে আকদসে হাজির হয়েছেন। কিন্তু মজলিসের মধ্যে নিরবতা পরিলক্ষিত হচ্ছিল যা দ্বারা একথা বুঝা যাচ্ছিল যে, সকলেই কোন আগমনকারী ব্যক্তির জন্য অপেক্ষা করতেছেন। শাম দেশের ঐ বুযুর্গ ব্যক্তি রাসুলে পাকের খেদমতে আরজ করলেন "ফেদাকা আবি ও উম্মি" আমার পিতা মাতা হুজুরের খেদমতে কোরবান, হুজুর কার জন্য অপেক্ষা করতেছেন? হুজুরে পাক এরশাদ ফরমালেন, আহমদ রেজা খানের জন্য, যিনি হিন্দুস্থানের ব্রেলীর বাসিন্দা। স্বপ্ন ভেঙ্গে যাওয়ার পর জাগ্রত হয়ে গবেষণা করে তিনি জানতে পারলেন আলা হযরত মাওলানা আহমদ রেজা খান হিন্দুস্থানের একজন বড় আলেমে দ্বীন এবং তিনি এখনো জীবিত আছেন। অতঃপর ঐ বুযুর্গ ব্যক্তি আলা হযরতের সাথে সাক্ষাত করার আগ্রহী হয়ে পড়লেন এবং মুলকে শাম থেকে হিন্দুস্থানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। তিনি সুদূর শাম দেশ থেকে ব্রেলী পৌছে আলা হযরতের খোজ নিয়ে জানতে পারলেন আশেকে রাসুল আলা হযরত ২৫শে সফর দুনিয়া থেকে চিরবিদায় নিয়েছেন। সুন্নী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় আল জামেয়াতুল আশরাফিয়্যাহ আজমগড় এর আজিমুশশান মুহাদ্দেস উস্তাজুল ওলামা হাফেজে মিল্লাত মাওলানা আলহাজ্ব আশ্ শাহ আবদুল আজিজ আনচারী মুরাদাবাদী সাহেব উক্ত ঘটনাটি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, আমার জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সময় হলো- দারুল খাইর, আজমীর শরীফের হাজেরী। তখন আমার শিক্ষা জীবন ছিল। আমার জীবনের নয় বছর পর্যন্ত আমি ওখানে ছিলাম এবং উক্ত নয় বৎসর পর্যন্ত সুলতানুল হিন্দ খাজা গরীবে নওয়াজ রাদিয়াল্লাহু আনহুর মাজার শরীফের হাজেরী নসীব হয়েছিল এবং সম্মানিত উস্তাদ সদরুশ শরীয়্যাহ কেবলা আলাইহির রাহমার কাছে অধ্যয়নরত ছিলাম। ঐ মুবারক সময়ে অধিকাংশ ওলামা- মাশায়েখ ও বুযুর্গানে দ্বীনের সাক্ষাত হয়েছিল। ঐ বুযুর্গ ব্যক্তিদের মাঝে অন্যতম একজন হলেন, খাজা গরীবে নওয়াজের আস্তানায়ে আলীয়ার সাজ্জাদানশীন হযরত দেওয়ান সৈয়্যদ আলে রাসূল সাহেবের সম্মানিত মামু সাহেব। তিনি দিল্লীর বাসিন্দা এবং বড়ই সম্মানিত বুযুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি দেওয়ান সাহেবের ঘরে প্রায় তাশরীফ আনতেন এবং আমি তাঁর সাথে স্বাক্ষাত করতাম। তিনি প্রায় সময় বুযুর্গানে দ্বীনের ঘটনাবলী শুনাতেন। একদিন তিনি বর্ণনা করলেন মাহে রবিউস সানী ১৩৪০ হিজরীতে শাম দেশের একজন বুযুর্গ ব্যক্তি দিল্লীতে তাশরীফ আনলেন। তাঁর আগমনের সংবাদ শুনে আমি তাঁর সাথে দেখা করলাম। তিনি বড় শান ও শওকত ওয়ালা বুযুর্গ ছিলেন। সাদাসিদা স্বভাবের লোক ছিলেন। মুসলমানেরা যেভাবে আরবীদের খেদমত করতেন ঐভাবে ঐ শাম দেশের বুযুর্গ ব্যক্তির ও খেদমতে করতে চাইলেন এবং তাঁর খেদমতে টাকা-পয়সা নজরানা পেশ করতে চাইলেন কিন্তু তিনি কারো নিকট থেকে কোন নজরানা নিলেন না। তিনি বললেন আমার এগুলোর কোন প্রয়োজন নেই। আল্লাহর ফজলে আমি এগুলো থেকে মুক্ত। তিনি যখন কারো কাছ থেকে কিছু গ্রহণ করছেন না তাই তাঁর আগমনের রহস্যটা কি সেটা জানার জন্য আমি তাঁকে

জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি উত্তর দিলেন। আমি এখানে আসার পিছনে একটা মহৎ উদ্দেশ্য ছিল কিন্তু তা হাসিল করতে পারিনি। যার জন্যে আফসোস করতেছি। আসল ঘটনা হলো ২৫ শে সফর আমার ভাগ্যের তারা উদিত হয়েছিল। আমি স্বপ্নের মধ্যে নবী করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামকে দেখি। হুজুর পাক তাশরীফ ফরমায়েছেন। কিন্তু মজলিশটা একেবারে নিরব। যার আলামত দ্বারা বুঝা যাচ্ছিল কারো জন্যে অপেক্ষা করা হচ্ছে। তাই আমি হুজুরের খেদমতে আবেদন করলাম। আমার মা-বাবা আপনার খেদমতে কোরবান। কার জন্যে অপেক্ষা করতেছেন? রাসূলে পাক এরশাদ ফরমালেন, আহমদ রেজার জন্য অপেক্ষা করতেছি। আমি আবেদন করলাম, হুজুর! আহমদ রেজা কে? হুজুর পাক এরশাদ ফরমালেন, হিন্দুস্থানের ব্রেলীর বাসিন্দা। আমি এ স্বপ্ন দেখার পর মাওলানা আহমদ রেজার সাথে দেখা করার জন্য সুদূর শাম দেশ থেকে যখন হিন্দুস্থানের ব্রেলীতে পৌঁছলাম এবং পৌঁছে জানতে পারলাম তিনি ইন্তেকাল ফরমায়েছেন এবং ঐ ২৫ শে সফরই হল তাঁর ইন্তেকালের তারিখ। আমি এ লম্বা সফরটা তাঁর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে করেছি। কিন্তু আফসোস তাঁর সাথে সাক্ষাত হয়নি। উপরোক্ত ঘটনা দ্বারা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে গেল যে, আলা হযরত কেবলা রাসুল পাক ছাহেবে লওলাকে আলাইহিছ সালামের দরবারে গ্রহণকৃত একজন সাচ্চা আশেকে রাসূল। মহান আল্লাহ তাঁর উসিলায় আমাদেরকেও রাসূলের দরবারের আশেক হিসেবে কবুল করুন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

এক নজরে ইমাম আহমদ রেজা খান ফাযেলে ব্রেলভী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুঃ

১। দুনিয়াতে শুভাগমন-১০ শে শাওয়াল ১২৭২ হিঃ/১৪ জুন ১৮৫৬ খ্রীঃ
২। খতমে কোরান মাজীদ- ১২৭৬ হিঃ/১৮৬০ খ্রীঃ
৩। প্রথম তাকরীর- রবিউল আউয়াল- ১২৭৮ হিঃ /১৮৬১ খ্রীঃ
৪। প্রথম আরবী কিতাব রচনা- ১২৮৫ হিঃ /১৮৬৮ খ্রীঃ
৫। শিক্ষা সমাপ্ত দস্তারে ফযীলত- শা'বান- ১২৮৬ হিঃ/১৮৬৯ খ্রীঃ (তখন তাঁর বয়স ১৩ বছর ১০ মাস পাঁচ দিন)।
৬। প্রথম ফাতোয়া প্রদান- ১৪ই-শা'বান ১২৮৬ হিঃ ১৮৬৯ খ্রীঃ
৭। শিক্ষা দান শুরু- ১২৮৬ হিঃ ১৮৬৯ খ্রীঃ
৮। বৈবাহিক জীবন- ১২৯১ হিঃ/১৯৭৪ খ্রীঃ
৯। বড় সাহেবজাদা মাওলানা মুহাম্মদ হামেদ রেজা খানের জন্ম-রবিউল আউয়াল।- ১২৯২ হিঃ/১৮৭৪ খ্রীঃ।
১০। ফতোয়া প্রদানের এজাজত- ১২৯৩ হিঃ ১৮৭৬ খ্রীঃ
১১। বায়'য়াত ও খেলাফত- ১২৯৪ হিঃ ১৮৭৭ খ্রীঃ
১২। প্রথম উর্দু কিতাব রচনা- ১২৯৪ হিঃ/১৮৭৭ খ্রীঃ
১৩। প্রথম হজ্ব ও যিয়ারতে হারামইনে শরীফাইন- ১২৯৫ হিঃ/১৮৭৮ খ্রীঃ

১৪। শেখ আহমদ যাইন ইবনে দাহলান মক্কী থেকে এজাজতে হাদীস- ১২৯৫ হিঃ/১৫৭৮ খ্রিঃ

১৫। মুফতীয়ে মক্কা শেখ আবদুর রহমান সিরাজ মক্কী থেকে এজাজতে হাদীস ১২৯৫ হিঃ/১৮৭৮ খ্রীঃ

১৬। শেখ আবেদ আস-সিনদী এর ছাত্র ইমামে কা'বা শেখ হোসাইন ইবনে ছালেহ জমলুল লাইল থেকে এজাজতে হাদীস ১২৯৫ হিঃ ১৮৭৮ খ্রীঃ

১৭। উপরোক্ত শেখ আলা হযরতের কপালে আল্লাহর নূর অবলোকন- ১২৯৫ হিঃ/১৮৭৮ খ্রীঃ

১৮। মসজিদে খাইফ (মক্কায়ে মুয়াজ্জমার মধ্যে তাঁর ব্যাপারে সু-সংবাদ- ১২৯৫ হিঃ/১৮৭৮ খ্রীঃ।

১৯। ইন্তেকালের পূর্বে ইহুদী নাসারাদের মেয়েদের সাথে বিবাহ নাজায়েজ হওয়ার ফতোয়া প্রদান ১২৯৮ হিঃ/১৮৮১ খ্রীঃ

২০। গাভী জবেহ বর্জন আন্দোলনের মূল্যেৎপাটন-১২৯৮ হিঃ ১৮৮১ খ্রীঃ

২১। প্রথম ফার্সী ভাষায় কিতাব রচনা ১২৯৯ হিঃ/১৮৮২ খ্রীঃ

২২। উর্দু কাব্যের অহংকার কসিদায়ে মিরাজীয়্যাহ এর রচনা- ১৩০৩ হিঃ/১৮৮৫ খ্রীঃ

২৩। আলা হযরত কেবলার ছোট সাহেবজাদা মুফতীয়ে আজম হিন্দ মুহাম্মদ মুস্তফা রেজা খানের জন্ম ২২ জিলহজ্ব ১৩১০ হিঃ/ ১৮৯২ খ্রীঃ

২৪। কানপুরে অনুষ্ঠিত নদওয়াতুল ওলামা এর বৈঠকে অংশ গ্রহণ ১৩১১ হিঃ ১৮৯৩ খ্রীঃ

২৫। নদওয়া আন্দোলন থেকে পৃথক- ১৩১৫হিঃ/১৮৯৭খ্রীঃ।

২৬। কবরে মহিলাদের গমনের নিষেধাজ্ঞার উপর ফাযেলানা বিশ্লেষণ ১৩১৬ হিঃ/১৮৯৮ খ্রীঃ।

২৭। আরবী কসিদাহ রচনা ১৩১৮হিঃ/১৯০০ খ্রীঃ।

২৮। পাটনায় অনুষ্ঠিত নদওয়াতুল ওলামার বিপক্ষে হাপ্তে রোযা ই-এজলাসে অংশ গ্রহন- ১৩১৮ হিঃ/১৯০০খ্রীঃ।

২৯। হিন্দুস্থানের ওলামাদের পক্ষ থেকে আলা হযরত কেবলাকে ১৪০০ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হিসাবে সম্বোধন- ১৩১৮হিঃ/১৯০০খ্রীঃ।

৩০। দারুল উলুম মানজারে ইসলামের ভিত্তি প্রস্তর -১৩২২হিঃ/১৯০৪খ্রীঃ।

৩১। দ্বিতীয়বার হজ্ব ও যিয়ারতে হারামাইনে শরীফাইন ১৩২৩হিঃ/১৯০৫খ্রীঃ।

৩২। ইমামে কাবা শেখ আব্দুল্লাহ মিরদাদ ও তাঁর শিক্ষক শেখ হামেদ আহমেদ মুহাম্মদ জদ্দাদী মক্কীর ফতোয়া আর ইমাম আহমদ রেজার ফাযেলানা জবাব ১৩২৪হিঃ/১৯০৬খ্রীঃ

৩৩। মক্কায়ে মুকাররমা ও মদীনায়ে মুনাওয়ার ওলামাদের নামে এসনাদ এজাজত ও খেলাফত ১৩২৪ হিঃ ১৯০৬ খ্রীঃ।

৩৪। করাচী গমন ও মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল করীম সিন্দীর সাথে সাক্ষাত ১৩২৪ হিঃ ১৯০৬ খ্রীঃ।

৩৫। ইমাম আহমদ রেজার আরবী ফতোয়ার ব্যাপারে হাফেজে কুতুবুল হেরম সৈয়্যদ ইসমাইল খলিল মক্কীর সাধুবাদ জ্ঞাপন- ১৩২৫ হিঃ ১৯০৭ খ্রীঃ

৩৬। শেখ হেদায়তুল্লাহ বিন মুহাম্মদ সাঈদ আস সিন্দী মুহাজেরে মদনী আলা হযরতকে মুজাদ্দেদ হিসেবে মেনে নেয়া ১৩৩০ হিঃ ১৯১২ খ্রীঃ

৩৭। কুরআনুল কারীমের উর্দু তরজুমা- কানযুল ঈমান ফি তারজুমাতিল কুরআন ১৩৩০ হিঃ ১৯১২ খ্রীঃ

৩৮। শেখ মুসা আলী আশ্ শামী আল আযহারীর পক্ষ থেকে ইমামুল আয়িম্মাতিল মুজাদ্দেদ লিহাজিল উম্মত বলে সম্বোধন ১ রবিউল আউয়াল ১৩৩০ হিঃ/১৯১২ খ্রীঃ

৩৯। হাফেযে কুতুবিল হেরম সৈয়্যদ ইসমাইল খলিল মক্কীর পক্ষ থেকে হাতামুল ফোক্বাহা ওাল মুহাদ্দেসীন বলে সম্বোধন ১৩৩০ হিঃ ১৯১২ খ্রীঃ

৪০। ড. স্যার জিয়া উদ্দীনের চতুর্ভুজ সংক্রান্ত একটি প্রশ্নের ফাযেলানা জবাব ১৩৩১ হিঃ/ ১৯১৩ খ্রীঃ।

৪১। মিল্লাতে ইসলামীয়ার জন্য সংশোধনীয় বৈপ্লবিক প্রোগ্রামের ঘোষণা ১৩৩১ হিঃ/১৯১৩ খ্রীঃ

৪২। ভাওয়ালপুর হাই কোর্টের জাস্টিস মুহাম্মদ দ্বীনের ফতোয়া আর ইমাম আহমদ রেজার ফাযেলানা জবাব ২৩ রজমান ১৩৩১ হিঃ/১৯১৩ খ্রীঃ

৪৩। কানপুর মসজিদ অঞ্চলে ব্রিটিশ শাসনের প্রতি সমর্থনকারী লোকদের বিপক্ষে পুস্তক রচনা ১৩৩১ হিঃ ১৯১৩ খ্রীঃ

৪৪। আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ড. স্যার জিয়া উদ্দীন ব্রেলী শরীফে আগমন করে আলা হযরত থেকে ইলমি ফায়দা গ্রহণ ১৩৩২ হিঃ/১৯১৪ খ্রীঃ- ১৩৩৫ হিঃ/১৯১৬ খ্রীঃ

৪৫। ইংরেজ আদালতে যাওয়া অস্বীকার এবং কোর্টে হাজিরা থেকে বিরত থাকা ১৩৩৪ হিঃ/১৯১৬ খ্রীঃ।

৪৬। সদরুস সুদুর দক্ষিণের সোবেজাতের নামে এরশাদ নামা- ১৩৩৪ খ্রিঃ/১৯১৬ খ্রীঃ

৪৭। জামাআতে রেজায়ে মুস্তফা ব্রেলীর ভিত্তি- ১৩৩৬ হিঃ ১৯১৭ খ্রীঃ

৪৮। সিজদায়ে তাজিমী হারাম হওয়ার উপর ফাযেলানা বিশ্লেষণ- ১৩৩৭ হিঃ ১৯১৮ খ্রীঃ

৪৯। আমেরিকান বৈজ্ঞানিক প্রফেসর আলব্রট আইফ ফোর্টাকে চরম পরাজয়- ১৩৩৮ হিঃ ১৯১৯ খ্রীঃ

৫০। বৈজ্ঞানিক আইজ্যাক নিউটন ও আইন স্ট্যাইনের চিন্তাধারার বিপরীত ফাযেলানা বিশ্লেষণ- ১৩৩৮ হিঃ/১৯২০ খ্রীঃ

৫১। জমিন নড়াছড়া করে না এর উপর ১০৫ টি দলিল পেশ এবং ফাযেলানা বিশ্লেষন ১৩৩৮ হিঃ/১৯২০ খ্রীঃ

৫২। প্রাচীন ফালসাফার খন্ডন- ১৩৩৮ হিঃ/১৯২০ খ্রীঃ।
৫৩। দ্বি-জাতি তত্ত্বের উপর শেষ বাণী- ১৩৩৯ হিঃ/১৯২১ খ্রীঃ
৫৪। খেলাফত আন্দোলনের রহস্য উন্মোচন ১৩৩৯ হিঃ/১৯২১ খ্রীঃ
৫৫। তরকে মাওয়ালাত আন্দোলনের রহস্য উন্মোচন ১৩৩৯ হিঃ/১৯২১ খ্রীঃ
৫৬। ইংরেজদের সাহায্য সহযোগীতার বিপরীত ঐতিহাসিক ভাষণ- ১৩৩৯ হিঃ/১৯২১ খ্রীঃ
৫৭। বেছাল (ইন্তেকাল) ২৫ সফর ১৩৪০ হিঃ ২৮ অক্টোবর ১৯২১ খ্রীঃ
৫৮। লাহোর পেশা-ই আখ্‌বার এর মুদীরের শোক প্রকাশ-১লা রবিউল আউয়াল ১৩৪০ হিঃ/৩ নভেম্বর ১৯২১ খ্রীঃ
৫৯। সিন্দীর প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক সরসার আক্কলীর শোক প্রকাশক কথাবার্তা ১৩৪১ হিঃ/ ১৯২২ খ্রীঃ
৬০। মুম্বাই হাইকোর্টের জাষ্টিস ডি, আইফ মোল্লার শ্রদ্ধাঞ্জলী ১৩৪৯ হিঃ ১৯৩০ খ্রীঃ
৬১। শাযেরে মাশরিক আল্লামা ডঃ মুহাম্মদ ইকবালের শ্রদ্ধাঞ্জলী ১৩৫১ হিঃ/১৯৩২ খ্রীঃ।

তৃতীয় অধ্যায়

আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা সম্পর্কে কতিপয় জ্ঞানী ব্যক্তিদের অভিমতঃ

তাজকারা-এ-আকাবেরে আহলে সুন্নাত, দীলকুস্তানে রেজা, পয়গামাত-এ-ইয়াউমে রেজা, ও মকালাতে-এ-ইয়াউমে রেজা- গ্রন্থ সমূহ অনুশীলন করলে আমরা দেখতে পাই আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা সম্পর্কে অসংখ্য গুণী ব্যক্তিরা বিভিন্ন অভিমত প্রকাশ করেছেন। তম্মধ্যে থেকে কতিপয় মনীষীর অভিমত পাঠকদের জেনে রাখার জন্য নিম্নে পেশ করলাম।

শায়েরে মাশরিক্ব ড. আল্লামা ইকবালঃ-

আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের উলুমে ইসলামীয়া বিভাগের প্রধান খলিকারে ইমাম আহমদ রেজা হযরত মাওলানা সোলায়মান আশরাফ (ওফাঃ ১৩৫৮/১৯৩৯ খ্রীঃ) বলেন,

সম্ভবতঃ ১৯৩২ ইংরেজীর ঘটনা- ড. আল্লামা ইকবাল বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থানরত ছিলেন. একটি অনুষ্ঠানের মধ্যে আমিও ছিলাম, বক্তব্যের এক পর্যায়ে যখন আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজার আলোচনা আসল তখন ড. আল্লামা ইকবাল বললেন-

ভারতবর্ষের শেষ যুগে আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজার মতো বিজ্ঞ ও মেধাসম্পন্ন ফক্বীহ জন্ম গ্রহণ করেনি।

তিনি আরো বলেন,

তাঁর ফতোয়াসমূহ পড়েই আমি এ অভিমত ব্যক্ত করলাম যে, তাঁর ফতোয়াই তাঁর প্রতিভা, বুদ্ধিমত্তা, উৎকৃষ্ট স্বভাব, পূর্ণাঙ্গ বুঝশক্তি এবং দ্বীনি বিষয়াদিতে জ্ঞান সমুদ্রের ন্যায়বান সাক্ষী।

তিনি আরো বলেন,

মাওলানা (আলা-হযরত) একবার যে মত প্রতিষ্ঠা করে নেন, সেটার উপরই তিনি অটলভাবে স্থির থাকেন। নিঃসন্দেহে তিনি স্বীয় মতামতের বহিপ্রকাশ ঘটান অতি গভীরভাবে চিন্তা ভাবনার পরই। তাঁর কৃত শরীয়তের কোন ফয়সালা এবং তাঁর প্রদত্ত কোন ফতোয়ায় তাঁকে কখনো না পরিবতর্ন করতে হতো না কখনো তা বাতিল করে অন্য কোন মতের প্রতি প্রত্যাবর্তন করতে হতো। অতএব, জ্ঞানগত দিক দিয়ে মাওলানা (আলা হযরত) হলেম যুগের ইমাম আবু হানিফা।

(মকালাতে-এ-ইয়াউমে রেজা- ৩য় খন্ড, লাহোর- এপ্রিল ১৯৭১ ইং
হাপ্তাহ রোজায়ে উফুক করাচী-২২-২৮ জানুয়ারী- ১৯৭৯) ইং

*** ড. স্যার জিয়া উদ্দীনঃ ভাইস চ্যান্সেলর আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ঃ**

আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ড. স্যার জিয়া উদ্দীন ১৩৩৪হিঃ/১৯১৪ খ্রীঃ ও ১৩৩৫ হিঃ১৯১৭ খ্রীঃ হযরত মাওলানা সৈয়্যদ সোলায়মান আশরাফ এর সাথে ব্রেলী শরীফ পৌঁছে আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা ফাযেলে ব্রেলভীর খেদমতে উপস্থিত হয়ে তাঁর কাছে গণিতের একটি জটিল মাসয়ালার সমাধান চাইলেন। এ ঘটনাটি প্রসিদ্ধ এবং আলা হযরতের সব জীবনী গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখ রয়েছে।

ড. স্যার জিয়া উদ্দীন সাহেব আলা হযরতের খেদমতে গণিতের কঠিন মাসয়ালাটি যখন পেশ করলেন আলা হযরত কোন চিন্তা ভাবনা ছাড়া তৎক্ষনাত উহার সমাধান দিয়ে দিলেন যাতে ড. স্যার জিয়া উদ্দীন সাহেব অবাক হয়ে গেলেন।

আলা হযরতের কক্ষ থেকে বের হয়ে ড. স্যার জিয়া উদ্দীন সাহেব হযরত সোলায়মান আশরাফ সাহেবকে অভিমত ব্যক্ত করতে গিয়ে বললেন, এ যুগে এতো বড় একজন মুহাক্কেক আলেম এ সময়ে মম্ভবত: তিনি ছাড়া আর কেই নেই। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে এমন জ্ঞান দান করেছেন যেখানে আকল হায়রান। দ্বীনি মাযহাবী, ইসলামী জ্ঞানের পাশাপাশি গণিত, একলিদস, জাবুর, মুকাবেলা, তাওক্বীত ইত্যাদি বিষয়েও তাঁর পরিপূর্ণ দক্ষতা, পারদর্শিতা, ও অভিজ্ঞতা রয়েছে। গণিতের এ জঠিল মাসয়ালাটি কয়েক সপ্তাহ চিন্ত া-ভাবনা করার পরও আমি সমাধান করতে পারিনি কিন্তু আলা হযরত কয়েক মিনিটের মধ্যে উহার এমন সমাধান দান করলেন যারপর উহাতে আর কোন জটিলতা থাকে না। (একরামে ইমাম আহমদ রেজা পৃ: ৫৯-৬০ মুদ্রিত লাহোর।)

তিনি আরো বলেন নিজের দেশের মধ্যে মা'ক্বলাতের এতো বড় জ্ঞানী থাকা স্বত্ত্বেও আমরা ইউরোপে গিয়ে যা শিখেছি তাতে শুধু সময় নষ্ট করেছি। (খুতবায়ে সদারতে ইয়াউমে রেজা নাগপুর)। তিনি আরো বলেন, আমি শুনেছি ইলমেলাদুনী বলে কোন বিষয় রয়েছে, তবে আজ আমি চোখে দেখলাম তা কি, গণিতের এ জটিল মাসয়ালাটির সমাধান

আনার জন্য আমি জার্মান যাওয়ার প্রস্তুতি নিয়েছি কিন্তু ভাগ্যক্রমে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বীনিয়াতের প্রফেসর মাওলানা সোলায়মান আশরাফ সাহেব আমার প্রতি দয়া করে আমাকে আলা হযরতের দরবারে নিয়ে আসলেন। আলা হযরত উহার এমন সমাধান দিয়েছেন যাতে মনে হয় তিনি এ মাসালায়াটি কিতাবে দেখতেছেন। (আল্লামা যাফরুদ্দীনের লিখিত হায়াতে আলা হযরত ১৫৩ পৃষ্ঠা)

ভাইস চ্যান্সেলর সাহেব আনন্দ চিত্তে ফিরে গেলেন এবং আলা হযরতের সংস্রব তাঁর মাঝে এমন প্রভাব ফেললো যে, তিনি দাঁড়ি রেখে দিলেন এবং নামায-রোযার পাবন্দ হয়ে গেলেন।

(ইয়াদে আলা হযরত ২৬ পৃষ্ঠা।)

*** আল্লামা আলা উদ্দীন ছিদ্দিক্বীঃ ভাইস চ্যান্সেলর করাচী বিশ্ববিদ্যালয় ঃ**

আল্লামা আলা উদ্দীন ছিদ্দিক্বী সাহেব আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা সম্পর্কে অভিমত পেশ করতে গিয়ে বলেন-

যখন ধর্মের মর্যাদার উপর আঘাত হানা হচ্ছিল তখন মাওলানা আশ্ শাহ আহমদ রেজা কাদেরী রাদিয়াল্লাহু আনহু অগ্রসর হলেন এবং তিনি ধর্মের মান ও মর্যাদাকে তার সঠিক স্থানে স্থান প্রদান করলেন। আর আলা হযরত ফাযেলে ব্রেলভী রাদিয়াল্লাহু আনহু ইমামে আহলে সুন্নাত ছিলেন, তাই ফাযেলে ব্রেলভীর আদর্শিক জীবনকে সঠিক পথের দিশা হিসেবে মুসলমানদের গ্রহণ করা উচিত।

(মকামাত-এ-ইয়াউমে রেজা ২য় খন্ড ১৭ পৃষ্ঠা- মুদ্রিত লাহোর)

*** ড. সৈয়দ আবদুল্লাহঃ** সাবেক চেয়ারম্যান দায়েরাতুল মায়ারেফুল ইসলামীয়া বিশ্ববিদ্যালয়-লাহোর।

আলেম স্বীয় জাতির মস্তিষ্ক ও তাদের মুখ হয়ে থাকে। আর ঐ আলেম যার চিন্তা-চেতনা ও দৃষ্টি কোরান ও হাদীস মোতাবেক হয়, তিনি জ্ঞান ও বিজ্ঞানের ভাষ্যকার, হক ও সত্যের মূত প্রতীক ও মানুষের কল্যাণকামী হয়ে থাকেন।

যদি আমি এ কথা বলি যে, মাওলানা মুফতী শাহ আহমদ রেজা ফাযেলে ব্রেলভী ও এরূপ আলেমে দ্বীন ছিলেন তাহলে তা অতিরঞ্জিত হবে না বরং উহা তাঁর যথাযথ শানের বর্ণনা হবে।

তিনি নিঃসন্দেহে ভাল আলেম, সুবীজ্ঞ-হাকীম, সুদক্ষ ফকীহ, ছাহেবে নজর, মুফাস্সেরে কোরআন, মহান মুহাদ্দিস ও অনলবর্ষী বক্তা ছিলেন, কিন্তু ঐসব উচ্চ মর্যাদার চেয়েও তাঁর আরেকটি উচ্চ মর্যাদা রয়েছে আর তা হলো তিনি একজন সাচ্চা আশেকে রাসূল ছিলেন।

তিনি যা বলতেন তা করতেন আর যা করতেন উহার মধ্যে ইশক্কে রাসুলের ঝলক পরিষ্কার দৃষ্টিগোচর হত।

(পয়গামতে-ই-ইয়াউমে রেজা ২য় মুদ্রণ মরকেজী মজলিসে রেজা লাহোর।

*** ড: ফরমান ফতেহপূরী: উর্দু বিভাগের প্রধান করাচী বিশ্বদ্যিালয়:**

ওলামায়ে দ্বীনের মধ্যে না'ত চিত্রের দৃষ্টিপাতে সবচেয়ে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত নাম হলো মাওলানা আহমদ রেজা খান ব্রেলভী।

মাওলানা আহমদ রেজা খান ১৮৫৬ খ্রীঃ মোতাবেক ১২৭২ হিঃ জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১৯২১ খ্রীঃ মোতাবেক ১৩৪০ হিঃ ইন্তেকাল করেন।

সে হিসেবে তিনি মাওলানা হালী, মাওলানা শিবলী, আমীর মীনারী ও আকবর ইলাহ আবাদী প্রমুখের সমসাময়িক যুগের ছিলেন। তাঁর কবিতায় হুজুরে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের সীরত ও চরিত্রের বর্ণনা ছিল। মাওলানা ছাহেব শরীয়ত ও ছিলেন এবং ছাহেব তরীক্বতও ছিলেন। শুধু না'ত সালাত ও হুজুরে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশংসা করতেন এবং বড়ই বেদনা বিধুর ও হৃদয়োত্তাপের সাথেই বলতেন। তাঁর না'তীয়া, আশ্য়ার ও সালামে সিরাত বিভিন্ন জলসায় পাঠ করে শুনানো হয় তাঁর সালাম

মুস্তফা জানে রহমত পে লাকো সালাম
সময়ে বজমে হেদায়ত পে লাকো সালাম

অনেক মকবুল হয়েছে। (উদুকী নাতীয়ান শায়েরী ৮৬ পৃষ্ঠাঃ মুদ্রিত, লাহোর।)

মুহাম্মদ দ্বীন কলীমঃ

লাহোরেরর ইতিহাসবিদঃ তিনি (ইমাম আহমদ রেজা) স্বীয় যুগের খ্যাতিমান সুদক্ষ আলেম এবং এ যুগের মুজাদ্দেদ। ফিক্হ শাস্ত্রে তাঁর একক বিশেষত্ব রয়েছে। ফিক্হ শাস্ত্রে এতো বেশী বই পুস্তক রচনা করেছেন, যার গৌরবময় ইলমী কাজের দরুদ তিনি ইলম ও ফজল এর ক্ষেত্রে আকাশের সূর্যের ন্যায় চির উজ্জ্বল হয়ে থাকবেন।

(মাহানামা-ই-আরফাত-লাহোর- সেপ্টেম্বর-অক্টোবর- ১৯৭৫ খ্রীঃ)

*** ড. জামিল জলেকী: ভাইস চ্যান্সেলর করাচী বিশ্ববিদ্যালয়:**

মাওলানা শাহ আহমদ রেজা খান ব্রেলভী চতুর্দশ হিজরীর উচু মানের ফক্বীহ, জ্ঞানের সমুদ্র, উৎকৃষ্ট নাত রচনাকারী, ছাহেব শরীয়ত ছাহেবে তরীক্বত বুযুর্গ ছিলেন। (মায়ারেফে রেজা চতুর্থ খন্ড- মুদ্রিত- করাচী)

*** ড. এশতিয়ার হোসাইন কোরাইশী: ভাইস চ্যান্সেলর করাচী বিশ্ববিদ্যালয়:**

ধর্মীয় জ্ঞানে তাঁর যে দক্ষতা অর্জিত ছিল তা তৎকালীন যুগে ফক্বীহুল মসাল ছিল। অন্যান্য জ্ঞানে ও তাঁর অনেক পারদর্শিতা ছিল। তাঁর অন্তর যেহেতু ইশক্বে নববীতে বিদগ্ধ ছিল ঐ কারণে নাতের মধ্যে অকপটতা ও হৃদয়োত্তাপ রয়েছে যা গভীর জজ্বাত ছাড়া সৃষ্টি হয় না।

(খায়াবানে-ই- রেজা ৪৩ পৃ: মুদ্রিত-লাহোর)

*** শেখ এমতেয়াজ আলীঃ ভাইস চ্যান্সেলর পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় লাহোরঃ**

হযরত মাওলানা আহমদ রেজা খান ব্রেলভী স্বীয় যুগের সুদক্ষ আলেম, মকবুল নাত রচনাকারী ও সহস্রাধীক দ্বীনি, ইলমি বই পুস্কেকের লেখক ছিলেন। দ্বীনি ইলম বিশেষতঃ ফিক্হ ওহাদীসে মওকূফ-এ (পূর্বোল্লিখিত ব্যক্তির) গভীর নজর ছিল। ফক্বীহী মাসায়েলের মধ্যে ফতোয়ায়ে রেজভীয়্যাহ, ইজতেহাদীর যোগ্যতার প্রশংসা করতে গিয়ে আল্লামা ইকবাল এক জায়গায় বলেছেন। হিন্দুস্তানের শেষ যুগে তাঁর মতো মেধাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব পাওয়া বিরল। (খায়াবানে-ই-রেজা ৪৪ পৃষ্ঠা লাহোর থেকে প্রকাশিত)।

*** প্রফেসর কাররার হোসাইনঃ ভাইস চ্যান্সেলর বেলুসিস্তান বিশ্ববিদ্যালয়ঃ**

আমি তাঁর (আলা হযরতের) ব্যক্তিত্বে এ কারণে প্রভাবিত হয়েছি যে, তিনি ইলম ও আমলের মধ্যে ইশক্বে রাসূলকে ঐ কেন্দ্রীয় স্থান দিয়েছেন যা ছাড়া গোটা দ্বীন প্রাণ বিহীন একটি শরীর। (খায়াবানে-ই-রেজা ৮৫ পৃঃ লাহোর থেকে প্রকাশিত)।

*** ড. নছীর আহমদ নাছির: ভাইস চ্যান্সেলর ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ভাওয়ালপুরঃ** হযরত মাওলানা আহমদ রেজা খান ব্রেলভী হলেন একজন মহান ব্যক্তিত্ব ও তাঁর ইলমি মরতবা বহুত উঁচুমানের। তিনি নিঃসন্দেহে অতি উত্তম মডেল।

(খায়াবানে-ই রেজা ১১৫ পৃঃ মাতবুয়া লাহোর।)

*** প্রফেসর মুহাম্মদ তাহের ফারুকীঃ** উর্দু বিভাগের প্রধান পেশাওয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ঃ

আলা হযরত ইশ্কে রাসূলের মধ্যে ডুবে রয়েছেন। আর ঐ জয্বাই তাঁর নাত রচনায় সবচেয়ে বড় বিশেষ্যত্ব। (খায়াবানে-ই রেজা- ৯৬ পৃঃ মাতবুয়া লাহোর।)

*** ড. গোলাম মুস্তফা খান:** উর্দু বিভাগের প্রধান সিন্দী বিশ্ববিদ্যালয়ঃ

প্রকৃত কথা এ যে, হযরত শাহ আহমদ সাউদ দেহলভী রাহমাতুল্লাহে আলাাই এর পরে হযরত মাওলানা আহমদ রেজা খান সাহেব আলাইহির রাহমাহ্ স্বীয় কিতাব সমূহে ও তাক্বরীরাতের মধ্যে ইশকে রাসুল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে নিজের আলোচ্য বিষয় জানিয়েছেন। আর উহা হতে এক বিন্দুও নড়তে রাজী নন। আমার ধারণা যে, মাওলানা আহমদ রেজা খান সাহেব সম্ভবত: একক আলেমে দ্বীন। যিনি উর্দু গদ্য ও পদ্য উভয়ের মধ্যে অসংখ্য পরিভাষা ব্যবহার করেছেন। তিনি স্বীয় জ্ঞান দ্বারা উর্দু কবিত্বে তাক লাগায়ে দিয়েছেন। তিনি ইশ্কে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) কেই আসল তাসাউফ মনে করতেন। (খায়রাবানে-ই- রেজা)

*** সৈয়্যদ আলতাফ ব্রেলভী: এডিটর আল ইলম করাচী:**

আলা হযরত ইংরেজদের কে এতো ঘৃণা করতেন যে, তিনি আজীবন খামের উপর ডাক টিকিট উল্টো লাগাতেন। অর্থাৎ ডাক টিকেটে রানী ভিক্টোরিয়ার ছবি ছিল আলা হযরত পোষ্ট করার সময় খামের উপর ডাক টিকেট উল্টো করে লাগাতেন তথা রানী ভিক্টোরিয়ার

মাথাকে নিচের দিকে করে ডাক টিকেট লাগাতেন। (খায়াবানে-ই-রেজা ১৩০ পৃঃ মাতবুয়া লাহোর)

*** প্রফেসর মুখতার উদ্দীন আহমদঃ** ডীন- মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়-আলীগড়ঃ

তাঁর ব্যক্তিসত্তা আল হুব্বু ফিল্লাহ ওয়াল বুগজো লিল্লাহর জীবনের নমুনা। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে যারা ভালভাসেন তিনি তাঁদেরকে প্রিয়ভাজন মনে করতেন আর আল্লাহ ও রাসুলের দুশমনকে নিজের দুশমন মনে করতেন।

(ইমাম আহমদ রেজা - ৩৩৫ পৃষ্ঠা, আল মীযান মুম্বাই ১৯৭৬ খ্রীঃ)

*** প্রফেসর আবদুশ শুকুর শাদঃ** কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়, আফগানিস্তানঃ

সাধারণ পাঠান ও বিশেষ করে আশ্রাফুল বেলাদ কান্দাহাবের বাসীন্দারা এ কথার উপর অনেক খুশী যে, আল্লামা জিয়া উদ্দীন আহমদ রেজা খান ব্রেলভীর মতো ইলমি হাস্তী তাঁর জাতি ও খান্দানের ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেশের সাথে সম্পর্ক রাখেন।

(পয়গামাত-এ-ইয়াউমে রেজা লাহোর ৩৩ পৃঃ)

*** সৈয়্যদ আওছাফ আলীঃ** হামর্দদ বিশ্ববিদ্যাল-নতুন দিল্লীঃ

মাওলানা আহমদ রেজা ব্রেলভী পরলোক গমনের বেশ অর্ধশতাব্দী অতিবাহিত হয়েছে। আফসোস হলো যে, আমরা এমন কামেল আলিম ও দৃষ্টান্তহীন ব্যক্তিত্বকে ভূলায়ে দিয়েছি। উহার বড় কারণ হয়তো তাঁর মজবুত এতেক্বাদ। যার আগে কোন বিরোধীর চিন্তা- চেতনার চেরাগ জ্বলতে পারেনি। (আহমদ রেজা পৃষ্ঠা- ৩০ আল মিযান মুম্বাই)

*** প্রফেসর আজীজ আহমদঃ হাল বিশ্ববিদ্যালয়-ইংল্যান্ডঃ**

আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা খান ব্রেলভীর রচনাবলী কামালাতে ইলমিয়্যাহ ও খেদমাতে দ্বীনিয়্যাহর উপর বিশ্লেষণ করে উহার দ্বারা সাধারণ ও বিশেষদেরকে সঠিকতর ভিত্তিতে পরিচয় করায়ে দেয় শুধু আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের খেদমত করা নয় বরং মূলে আক্বায়ে নামেদার, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লামের প্রদত্ত সঠিক দ্বীনের প্রচার করা ও হযরত ইমামে আজম রাদিয়াল্লাহু আনহুর মজহাবের প্রতিনিধিত্ব করাই উদ্দেশ্য।

*** মাহের আল ক্বাদেরীঃ** এডিটর মাহেনামাহ্-ই ফারান-করাচীঃ

মাওলানা আহমদ রেজা খান ব্রেলভী মরহুম ধর্মীয় জ্ঞানের সমন্বয়কারী ছিলেন। এমনকি গণিত শাস্ত্রে ও পারদর্শিতা রাখেন। দ্বীনি ইলম ও ফজল এর সাথে কবিতা রচনায় ও অভ্যস্ত ছিলেন।

(মাহনামা-এ-ফারান করাচী ৪৪-৪৫ পৃঃ সেপ্টেম্বর-১৯৭৩ ইং)

*** ড. খলিলুর রহমান আজমীঃ** উর্দু বিভাগের প্রধান, আলী মসুলিম বিশ্ববিদ্যালয়ঃ

হযরত মাওলানা আহমদ রেজা খান বাহমাতুল্লাহে আলাই এর নাম ছোটকাল থেকেই শুনে আসছি এবং তাঁর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে বাল্যকালেই অবগত হয়েছি। তাঁর জ্ঞান ও

আত্ম মর্যাদা, ধর্মানুরাগ ও নিস্কুলষতা, দ্বীনের সংরক্ষণ ও ঈমানী উদ্দীপনার আলোচনা আমরা অধিকাংশ বুযুর্গদের থেকে শুনেছি।

ফক্বীহে ইসলাম ও কোরানের অনুবাদের দৃষ্টিতে হযরতের যে মর্যাদা ও মরতবা হাসিল হয়েছিল উহার আলোচনা সকল জ্ঞানীরাই করেছেন।

(ড: সাহেবের মাকতুবাদ)

*** আল্লামা মুহাম্মদ করম আজহারীঃ** প্রধান মাহনামায়ে জিয়ায়ে হেরম- লাহোরঃ

আলা হযরত আজীমুল বরকত ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা আহমদ রেজা খান ব্রেলভী আলাইহে রাহমাহ এর এ সংক্ষিপ্ত জীবন যার কোণায় কোণায় ইলম ও আমলের আলো দ্বারা আলোকিত। যার মুহূর্তে মুহূর্তে যিক্‌রে খোদা ও ইয়াদে মুস্তফা দ্বারা পরিপূর্ণ।

(জংগ, করাচী, রাহাওয়ালায়ে আলা হযরত কী শায়েরী ফর এক নজর)

*** ড. সালাম সনদীলভী:** পি,এইচ, ডি,ডি, লিমট্- উর্দু, বিভাগ গোরকপুর, বিশ্ববিদ্যালয়:

হযরত ইমাম আহমদ রেজা স্বীয় স্তুতিগানের মধ্যে সাধুতার খোশবু ভরে দিয়েছেন। এ সাধুতা তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উপর বুনিয়াদ। তিনি প্রতিটি নিঃশ্বাসে মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খুশবো অনুভব করেছেন। আর উহার অনবদ্যতা তাঁর কাব্য-চর্চার মধ্যে সঙ্গীতের তাল আমাদের নজরে আসে।

তিনি যেহেতু রাসূলের প্রেমে বিভোর ছিলেন, সেহেতু তাঁর মাযহাবী কাব্য-চর্চার মধ্যে সততা বিদ্যমান। তাঁর কাব্য-র্চচা এবং কাব্য-চর্চাই তাঁর ব্যক্তিত্ব। তিনি ব্যক্তিত্ব ও কাব্য-চর্চার মধ্যে এতো গভীরে পৌঁছেন যে, উহা পর্যন্ত পৌঁছতে পেরেছেন এমন কোন উর্দুভাষী কবি পাওয়া যাবে না।

(মাহনামা-ই- আল জিহান মুম্বাই- ৪৬৬ পৃষ্ঠা)

*** ড: হামেদ আলী খান: আই, এম, আই, পি, এইচ, ডি, আরবী বিভাগ, আলী গড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ঃ**

আল্লাহ তায়ালা স্বীয় কুদরতের আলো দ্বারা ফাযেলে ব্রেলভীর উপর পুরস্কার বর্ষণ ফরমায়াছেন, আর অসংখ্যা নিয়ামতরাজী প্রদান করেছেন। খোদা তায়ালা তাঁকে তীক্ষ্ণ মেধা ও ধারালো স্মৃতিশক্তি দান করেছেন, পাশাপাশি স্বীয় ফজল ও করম দ্বারা আপন দানকৃত যোগ্যতা সমূহকে সঠিক পথে কাজে লাগানোর তাওফীক দান করেছেন।

যাকে গায়েবী সাহায্য বলে আখ্যায়িত করা যায়। তিনি স্বীয় যুগের-যুগ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ও জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সকল বিষয়ের মধ্যে পরিপূর্ণ পারদর্শি ছিলেন। প্রচলিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় তাঁর নিপূর্ণ দক্ষতা ছিল। (আল মিযান- মুম্বাই ৪৪৭ পৃষ্ঠা)

*** জাষ্টিস শামীম হোসাইন ক্বাদেরীঃ চীফ জাষ্টিস লাহোর হাইকোর্টঃ**

ফাযেলে ব্রেলী আশেকে রাসূল ছিলেন। এ ইশক্বকে ব্যাপক করা জরুরী। কেননা সরওয়ারে কায়েনাতের মুহাব্বত কেবল এ দুনিয়ার মধ্যে আমাদের সমস্যার সমাধান করছেন না বরং পরকালে ও নাজাতের উসিলা।

(মকামাত-এ-ইয়াউমে রেজা ২য় খন্ড- মাতবুয়া লাহোর)

* ড. আবদুল অহীদঃ পি, এইচ, ডি- লন্ডনঃ

মাওলানা মুহাম্মদ আহমদ রেজা খান উলুমে দ্বীনী ও দুনিয়াবী ঘরে আপন শ্রদ্ধেয় পিতা মৌলভী মুহাম্মদ নক্বী আলী খান থেকেই পরিপূর্ণ করেছেন। দু'বার বায়তুল্লাহ শরীফের হজ্ব করেছেন। পাঠদান ছাড়া জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিবিধ বিষয়ে অনেক কিতাব ও পুস্তক রচনা করেছেন। যার মধ্যে ১২ খন্ডের ফতোয়ায়ে রেজভীয়াহ তাঁর অমর কীর্তি। কোরান মাজীদের তরজুমা ও করেছেন । উলুমে রিয়াযী ও যফরের মধ্যে ও অভিজ্ঞতা রাখতেন। কবিতা-কাব্য চর্চা ও করেছেন। হুজুর আলাইহিস সালামের শানে অনেক স্তুতিগান লিখেছেন, সালাম ও লিখেছেন এবং খুব উত্তম ভাবেই লিখেছেন। (বিশ্বকোষ উর্দু- ১৮৬ পৃষ্ঠা)

* প্রফেসর আজগর সওদায়ীঃ অধ্যক্ষ ইকবাল কলেজ সিয়ালকোটঃ

আলা হযরতের মতো ভাল, দক্ষ ও পুতঃপবিত্র হাস্তীর জন্য আলোচনা করা দুনিয়ার মহান ব্যক্তিদের কাজ। আমি কোন মতেই নিজেকে উহার উপযুক্ত বলে মনে করছিনা।

আলা হযরত দুনিয়ার হাতেগোনা কয়েকজন ব্যক্তিদের অন্যতম একজন। যার জিন্দেগী একনিষ্টতা, আমল ও নিষ্কুলুষ চিন্তা-গবেষণার উত্তম নমুনা।

(পয়গামাতে-ই-ইয়াউমে রেজা ৪৩ পৃষ্টা, মারকাজি মজলিসে রেজা লাহোর)

* মুহাম্মদ হালীমঃ সাবেক চীফ জাষ্টিস সুপ্রিম কোর্ট হুকুমতে পাকিস্তানঃ

এমনি সব ইসলামী জ্ঞান ও বিষয় ইমাম আহমদ রেজার আয়ত্বে ছিল, কিন্তু বিশেষ করে ইলমে ফিকহীর উপর ইমাম আহমদ রেজার চিন্তার নৈপুন্যতা ও গভীরতা প্রশংসার যথোপযুক্ত ও আশ্চর্যের। তাঁর জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা ও সুক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বোধশক্তি ফিক্হ শাস্ত্রে যা প্রবেশ করেছে এবং যে পর্যন্ত উহা পৌছেছে তার দৃষ্টান্ত প্রবাদে দেয়াই ইনসাফপূর্ণ হবে। তিনি ইমাম আজম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহে আলাই এর চোখের শান্তি, দ্বিতীয় ইমাম আবু হানিফা ও মুজাদ্দেদে মিল্লাতের যথোপযুক্ত উপাধি দ্বারা ভূষিত হয়েছেন।
(মুজিল্লাহে মায়ারেফে রেজা করাচী ৫২ পৃষ্টা- ১৯৯১ খ্রীঃ)

* মীর খলিলুর রহমানঃ চীফ এডিটর রোজনামা-ই-জংগ করাচীঃ

নিকটতম অতীতে পরিস্ফুটিত অনুস্মরণীয় ইসলামী ব্যক্তিত্বদের মাঝে আলা হযরতের ব্যক্তিত্ব খুব গুরুত্বসহকারে দৃষ্টিগোচর হয়। তাঁর ব্যক্তিত্বকে এমন দৃষ্টিকোণ থেকে দৃষ্টান্ত দেয়া যায়, যার প্রতিটি সম্মুখভাগ থেকে আলো ও হরেক রকমের কিরণ প্রস্ফুটিত হতে দেখা যায়। (মায়ারেফে রেজা করাচী ৩১ পৃষ্টা- ১৯৮৯ খ্রীঃ)

কতিপয় মাশায়েখে তরীকৃত ও দরবারের গদীনশীনদের অভিমত ঃ

পীরে তরীকৃত হযরত শাহজী মুহাম্মদ শের মিয়া ঃ

ইমামুল মুহাদ্দেসীন হুজুর মুহাদ্দেসে সুরুতী সাহেবের মসজিদের খতিব মুহতরাম জনাব হাফেজ মোহাম্মদ এমরান রেজভী নূরী সাহেব হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে হযরত

শাহ মিরখান ফীলীভেতী সাহেব এ ঘটনা বর্ণনা করেন, একদা আমি হযরত শাহজী মুহাম্মদ শের মিয়া সাহেব কেবলা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর মুরিদ হওয়ার জন্য তাঁর খেদমতে আলীয়ায় গেলাম আর আবেদন করলাম হুজুর আমাকে মুরিদ করে নেন। আমি তাঁর খেদমতে এ আবেদন পেশ করার পর তিনি কয়েক মিনিট চোখ বন্ধ করলেন, অতঃপর বললেন, তোমার অংশ এখানে নয় ব্রেলী যাও। ওখানে বড় মৌলভী আলা হযরত কেবলার কাছে তোমার অংশ রয়েছে তাঁর মুরিদ হয়ে যাও। আর মনে রেখ যে তাঁর মুরিদ সে আমার মুরিদ, আর যে আমার মুরিদ সে তাঁর মুরিদ, আর যে তাঁর নয় সে আমার নয়। অতঃপর হযরত শাহজী মিয়ার নির্দেশে আমি ব্রেলী শরীফ গিয়ে আলা হযরত কেবলা রাদিয়াল্লাহু আনহুর মুবারক হাতে বায়'য়াত হলাম। এ ঘটনা হযরত শাহ মিরখান সাহেবের শাহজাদা জনাব আহমদ মীর খান রেজভী মুস্তফবী সাহেবও বর্ণনা করেন। তিনি বললেন এ ঘটনা আমার সম্মানিত পিতা মহোদয় প্রায় সময় বর্ণনা করতেন। (তজল্লীয়াতে ঈমাম আহমদ রেজা)

*** বাংলাদেশে জশনে জুলুসে ঈদে মিলাদুন্নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদযাপনের প্রবর্তক, বাংলাদেশের সুন্নী মুসলমানদের পথ প্রদর্শক, পীরে কামেল, মুর্শিদে বরহক হযরতুল আল্লামা হাফেজ ক্বারী খাজা তৈয়্যব শাহ সাহেব কেবলা রাদিয়াল্লাহু আনহু (শেতালু শরীফ ছিরিকোট পাকিস্তান)।**

বাতিলপন্থীদের বিভ্রান্তিকর উপকরণাদি, রাসূলে কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের শানে অবমাননাকারী এবং খারাপ আক্বীদা যখন সাইক্লোনের আকার ধারণ করেছিল, তখনি হযরত নূহ আলাইহিস সালামের কিস্তিতুল্য আলা হযরতের লিখনি উম্মতে মুহাম্মদী "ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম"কে আপন বক্ষে তুলে নিয়েছে। রহমতে আলমের রহমতের দরিয়া থেকে পানি পান করিয়ে পরিতৃপ্ত করেছেন। তাঁর না'ত ঈমানদারের রুহানী প্রেরণার উৎস। ভেবে দেখার বিষয় হলো- যে মহান ব্যক্তির পবিত্র মুখে এ জাতীয় কাব্য প্রবাহমান, তাঁর অন্তরের অবস্থাই বা কি নিঃসন্দেহ তিনি ফানাফির রাসুল এর মর্যাদা প্রাপ্ত।

(পয়গামাত-ই ইয়াউমে রেজা- লাহোর, ৩১ পৃষ্ঠা)

<u>গঞ্জে মুরাদাবাদঃ</u>

ফাযেলে ব্রেলভী মাওলানা শাহ আহমদ রেজা ১৩১৯ হিজরীতে শাইখুল মুহাদ্দেসীন হযরত মাওলানা অসী আহমদ মুহাদ্দেসে সূরুতীর সাথে হযরত শাহ ফজলুর রহমান আলাইহির রাহমতু ওয়াররিদ্ওয়ান এর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্য গঞ্জে মুরাদাবাদে পৌঁছলেন। হযরত ফজলুর রহমান শাহ সাহেব মাওলানা ব্রেলভীকে সুস্বাগতম জানানোর জন্য ঘর থেকে বের হলেন এবং বিশেষ কক্ষে তাঁর মেহমানদারীর এন্তেজাম করলেন। আসরের পর সভাস্থলে উপস্থিত লোকদের সম্বোধন করে বললেন, আমি তাঁর মধ্যে নূর আর নূর দেখতেছি। এরপর নিজের টুপি মাথা থেকে নিয়ে তাঁর মাথায় পরায়ে দিলেন এবং তাঁর টুপিটি নিজের মাথায় পরলেন। (তাযকারে-ই ওলামায়ে আহলে সুন্নাত- ৩০ পৃষ্ঠা)

*** আজমীর মুফাদ্দাসঃ**

নিঃসন্দেহে মাওলানা আহমদ রেজা খান ব্রেলভী রাহমাতুল্লাহে আলাই এর বৈচিত্রময় ব্যক্তিত্বের কারণে চতুর্দশ শতাব্দীর অনুস্মরণীয় ওলামা ও মুবাল্লেগীনদের মধ্যেই পরিগণিত হতেন।

*** পাক পাঠান শরীফঃ**

হযরত মাওলানা আহমদ রেজা খান ক্বাদেরী ব্রেলভী রাহমাতুল্লাহে আলাই আক্বায়ে নামেদার হুজুর নবীয়ে করীম শাফিয়ীল মুজ্নেবীন ছাল্লাল্লাহু লাইহি ওয়াসল্লামের সতিক্যার আশেক ও বিদ্যাসাগর আলেম ছিলেন। তিনি পদস্খলন ও খোদাদ্রোহীতার যুগে সঠিক সময়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পথ প্রদর্শন ও নেতৃত্বে ছিলেন। আর বর্তমান পর্যন্ত তাঁর শিক্ষা ওলামায়ে কেরামের জন্য সঠিক পথের মশাল হয়ে রয়েছে। তাঁর লিখনী বাতিলপন্থীদের ভূল দৃষ্টিভঙ্গি ও আক্বীদার জন্য বড় বিষের প্রতিশেধক এর প্রভাব রাখতেছে। সুতরাং ফাযেলে ব্রেলভী কুদ্দিসা সিরুহু এর শিক্ষা ও চিন্তাধারাকে প্রকাশ ও প্রচার করা বর্তমান সময়ের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় জরুরী বিষয়। (পয়গামাত-ই ইয়াউমে রেজা ১৪ পৃষ্ঠা- দ্বিতীয়বার মুদ্রিত লাহোর।)

*** কতিপয় ভিন্ন আক্বীদাবলম্বীর অভিমতঃ**

*** মাওলানা আশরাক আলী থানবী**- ওহাবীদের হাকীমুল উম্মতঃ

আমার যদি সুযোগ হতো তাহলে আমি মৌলভী আহমদ রেজার পিছনে নামায পড়ে নিতাম। (উসউয়া-ই-আকাবির ১৮ পৃষ্টা)

তাঁর সাথে আমাদের বিরোধীতার কারণ বাস্তবিক পক্ষে হুব্বে রাসুলই। তিনি আমাদেরকে রাসূল পাকের শানে অবমাননাকারী মনে করেন।

(আশরাফুস সাওয়ানিহ্ প্রথম খন্ড ১২৯ পৃষ্টা।

আমার অন্তরে আহমদ রেজার প্রতি অত্যধিক সম্মান রয়েছে। তিনি আমাদেরকে কাফির বলেন, কিন্তু ইশক্বে রাসূলের ভিত্তিতেই বলেন অন্য কোন উদ্দেশ্য তো বলেন না। (আলা হযরত কা ফিক্বহী মক্বাম)

*** মাওলানা খলিলুর রহমান বিন মাওলানা আহমদ আলী সাহারানপুরীঃ**

১৩০৩ হিজরী সনে মাদরাসাতুল হাদীস ফীলীভেত এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন উপলক্ষে আয়োজিত জলসায় সাহারানপুর, লাহোর, কানপুর, মৌনপুর, রামপুর ও বদায়ুনের আলিগমনের উপস্থিতিতে মুহাদ্দেসে সুরতীর একান্ত ইচ্ছাক্রমে আলা হযরত ইলমে হাদীস এর উপর অনবরত তিন ঘন্টা যাবত সারগর্ভ ও স্বপ্রমাণ বক্তব্য রাখলেন। জলসায় উপস্থিত ওলামায়ে কেরাম তাঁর বক্তব্য অবাক চিত্তে শ্রবণ করলেন এবং খুব প্রশংসা করলেন।

বক্তব্য শেষ হলে মাওলানা খলিলুর রহমান বিন আহমদ আলী স্বতঃস্ফুর্তভাবে আলা হযরতের হাতে চুম্বন করলেন। আর বললেন যদি এ মুহূর্তে আমার সম্মানিত পিতা

থাকতেন তবে তিনি আপনার জ্ঞান-সমুদ্রের মুক্তমনে প্রশংসা করতেন। আর তখন তাঁর এটা উচিতই ছিলো। উল্লেখ্য যে, মুহাদ্দে সুরুতী ও মাওলানা মুহাম্মদ আলী মুঙ্গরী (নদওয়াতুল ওলামা লক্ষ্মৌ এর প্রতিষ্ঠাতা) ও তার মন্তব্যের প্রতি সম্মান জানান।
(মকালা-ই-মাহ্মুদ আহমদ ক্বাদেরী)

শাইখুল মা'কুলাত মুহাম্মদ শরীফ কাশমিরীঃ প্রধান- মাদরাসায়ে খায়রুল মাদারেস মুলতান
তিনি ভাওয়ালপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি ইলমি আলোচনার পর মুফতী গোলাম সরোয়ারকে সম্বোধন করে বললেন,
তোমাদের ব্রেলীর মধ্যে শুধু একজন আলেম রয়েছেন আর তিনি হলেন মাওলানা আহমদ রেজা খান। তাঁর মতো আলেম আমি ব্রেলীতে না দেখেছি না শুনেছি। তিনি নিজের উপমা নিজেই। তাঁর বিশ্লেষণ ওলামাদেরকে অবাক করে দেয়।
(আশ্- শাহ্ আহমদ রেজা ৮৩ পৃষ্টা)

* **মাওলানা আবুল আলা মুওদুদীঃ** জামাতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা, লাহোরঃ

মাওলানা আহমদ রেজা খানের জ্ঞানকে আমি আন্তরিকভাবে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি। তিনি দ্বীনী বিধানবলীর বিষয়ে অত্যন্ত উচু মানের ছিলেন। তাঁর এ শ্রেষ্টত্বের কথা ঐ সমস্ত লোককে ও স্বীকার করতে হবে যারা তাঁর সাথে বিরোধ রাখে। (মকালাত-ই-ইয়াউমে রেজা-২য় খন্ড)

আমার দৃষ্টিতে মাওলানা আহমদ রেজা খান মরহুম মগফুর ধর্মীয় জ্ঞান ও গভীর অর্ন্তদৃষ্টির ধারক এবং মুসলমানদের একজন উচ্চ পর্যায়ের সম্মানযোগ্য অনুস্মরনীয় ইমাম ছিলেন। যদিও তাঁর কোন কোন ফতোয়া ও মতামতের সাথে আমার বিরোধ রয়েছে, কিন্তু আমি তাঁর দ্বীনী খেদমতের কথা ও স্বীকার করছি।

(ইমাম আহমদ রেজা, আল মিযান সংখ্যা, মোম্বাই- ১৯৭৭ সন)

* **মালিক গোলাম আলীঃ** নায়েব মাওলানা মওদুদীঃ

বাস্তব কথা হলো এ যে, মাওলানা আহমদ রেজা খান সাহেবের ব্যাপারে এখানো পর্যন্ত আমরা বড় ভূলের মধ্যে লিপ্ত রয়েছি, তাঁর কিছু কিতাব ও ফতোয়া অনুশীলন করে এ ফলাফলে পৌঁছেছি। আমি তাঁর কিতাবের মধ্যে জ্ঞান-গরীমার যে গভীরতা পেয়েছি তা খুব কম সংখ্যক আলেমের মধ্যে পাওয়া যায়। (হাফতে রোজা-ই শিহাব-লাহোর)

চতুর্থ অধ্যায়

কারামত সম্পর্কে কিছু কথা

كرامة শব্দটি একবচন, বহুবচনে কারামাতুন যার শাব্দিক অর্থ হল-উদারতা, মহাত্ম, মর্যাদা, অলৌকিকতা, অলৌকিক ঘটনাপুঞ্জি ও অসাধারণ শক্তি।

এ কারামাত বা অলৌকিক ঘটনা যাদের থেকে প্রকাশ পায় তাদেরকে অলিউল্লাহ বা আল্লাহর বন্ধু বলা হয়। অলির পরিচয় প্রদান করতে গিয়ে শরহে আক্বায়েদে নসফী গ্রন্থকার বলেন-

الولى هو العارف بالله تعالى وصفاته حسب ما يمكن المواظب على الطاعات المجتنب عن المعاصى المعرض عن الانهماك فى اللذات والشهوات۔

অর্থাৎ অলি ঐ ব্যক্তিকে বলা হয় যে আল্লাহ তা'য়ালা ও তাঁর গুনাবলীর মা'রেফাত হাছিল করেছেন, সাধ্য পরিমাণ এবাদত বন্দেগী করেন, গুনাহের কাজ হতে বিরত থাকেন এবং প্রকৃতিগত বিষয়াদী হতে বিমুখ হন।

শরহে আক্বায়েদে নসফী গ্রন্থকার অলির কারামতের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন-

وكرامته ظهور امر خارق للعادة من قبله غير مقارن لدعوى النبوة۔

অর্থাৎ তার (অলির) কারামত বলতে ঐ বস্তুকে বুঝায়, যা তাঁর পক্ষ হতে সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত ঘটনা প্রকাশিত হয় এবং তিনি নবুয়তের দাবী করেন না।

- আর সাধারণ মুমিন থেকে যদি এ ধরনের ঘটনা প্রকাশিত হয় তাহলে উহাকে মাওয়ুনত বলা হয়।
- আর এমন কাজ যদি ঈমান ও সৎকর্মের সাথে প্রকাশ না হয় তাহলে উহাকে কারামত বলা হয় না বরং উহাকে এসতেদ্‌রাজ বলা হয়।
- আর এ ধরনের অলৌকিক ঘটনা যদি নবুয়তের দাবীর সাথে হয় তাহলে উহাকে মো'জেজা বলে, যা নবীদের জন্য খাস।

নবীদের মো'জেজা হক ইহাকে কেউ অস্বীকার করে না।

আর অলিদের কারামত ও হক যদি কেউ উহাকে অস্বীকার করে তাহলে সে গোম্‌রাহ ও বদময্‌হাব হয়ে যাবে। যেমন এ ব্যাপারে শরহে ফিক্‌হে আকবরের ৯৫ পৃষ্টায় রয়েছে-

الكرامات للاولياء حق اى ثابت بالكتاب والسنة۔

অর্থ আল্লাহর অলিদের কারামত সত্য অর্থাৎ যা কোরান ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। হযরত শেখ আব্দুল হক মুহাদ্দেসে দেঁহ্‌লভীর রচিত কিতাব আশিয়াতুল লুমাত চতুর্থ খন্ডের ৫৯৫ পৃষ্টায় রয়েছে-

اهل حق اتفاق دارند بر جواز وقوع كرامات از او لياء ودليل بر وقوع كرامت كتاب وسنت - وتواتر اخيارست ازصحابه ومن بعدهم تواترمعنى۔

অর্থাৎ আহলে হকরা এ কথার উপর একমত যে, আউলিয়ায়ে কেরাম থেকে কারামত প্রকাশ হতে পারে, আর আল্লাহ ওয়ালাদের থেকে কারামত প্রকাশ হওয়া ইহা কোরান ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আর সাহাবা ও তা'বেয়ীদের ধারাবাহিক বর্ণনা দ্বারাও স্পষ্ট।

কারামতের সত্যতার দলিল অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরাম ও তা'বেয়ীনদের দ্বারা মোতাওয়াতেরের সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। এমনভাবে বর্ণনা যা অস্বীকার করা সম্ভব নয়। বিশেষ করে এমন বিষয় যা প্রত্যেকের মধ্যে পাওয়া গেছে। যদিও এগুলোর বিস্তারিত বর্ণনা পৃথক পৃথকভাবে খবরে ওয়াহেদ এর পর্যায়ে পৌছেছে। তা ছাড়া আল্লাহ তা'য়ালার কিতাবও এ কথা সাক্ষ্য দেয় যে, হযরত মরিয়ম (আলাইহাস্‌সালাম) থেকে ও হযরত সোলায়মান (আলাইহিস্‌সালাম) এর সাহাবী হতে ও কারামত প্রকাশ পেয়েছে। সত্য ঘটনা বাস্তবায়িত হওয়ার পর উহার সম্ভাব্যতা প্রমাণ করার আবশ্যকতা নেই।

• মো'জেজা, কারামত ও এসতেদ্‌রাজের মধ্যে পার্থক্য-

আম্বীয়ায়ে কেরামদের থেকে সাধারণ নিয়ম বহির্ভূত অলৌকিক ঘটনা প্রকাশিত হলে উহাকে মো'জেজা বলে। যেমন মৃতকে জীবিত করা, ইহা রেসালতের দাবীর সমর্থনে করা হয়।

সাধারণ নিয়ম সংশ্লিষ্ট বর্হিভূত ঘটনা প্রকাশ হওয়াই কারামত। কিন্তু এ কারামত হঠকারীতার সাথে সংশ্লিষ্ট হবে না। ইহা অলিদের কারামত। মোতাযেলাগণ এর বিপরীত মত পোষণ করে, অথচ তাদের নিকট এর স্বপক্ষে কোন প্রমাণ নাই। শিয়ারা কারামতকে ১২ ঈমামের জন্য খাস করে। অথচ ইহা নির্দিষ্ট করার স্বপক্ষে কোন দলিল তাদের নিকট নেই। কেহ কেহ বলেছেন, কারামত মো'জেজার পরিপূরক, আল্লাহ তায়ালা অলিদের নিকট ইহা আমানত রেখেছেন, অদ্যাবধি অলিদের মধ্যে এ গুণের সমাবেশ রয়েছে।

যে সমস্ত নিয়ম বহির্ভূত অলৌকিক ঘটনা ঈমান ও সৎকর্মের সাথে সম্পৃক্ত নয়, এগুলোকে এসতেদ্‌রাজ বলে। অর্থাৎ বে-ঈমান, কাফিরদের থেকে যদি কোন অলৌকিক ঘটনা প্রকাশিত হয় তাহলে উহাকে কারামত বলা যাবে না বরং উহাকে বলা হবে এসতেদ্‌রাজ। যেমন-ইব্‌লিশের যমীন ভাঁজ করা, পৃথিবীর পূর্ব দিক হতে পশ্চিম দিকে ভ্রমন করা, মানুষের অন্তঃকরণে কুমন্ত্রনা দেয়া এবং বনী আদমের রক্ত চলাচলের জায়গায় বিচরণ করা ইত্যাদি আর ফেরাউন নীলনদকে তার আদেশ মত প্রবাহিত হওয়ার নির্দেশ দেয়া ইত্যাদি।

আক্বায়েদে নসফী গ্রন্থকার বলেন, অলির কারামত সাধারণ নিয়ম ভঙ্গ করে প্রকাশিত হয়। যেমন- অল্প সময়ের মধ্যে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করা। যেমন হযরত সোলায়মান আলাইহিস সালামের নিকট আসেফ ইবনে বারখিয়া বিলকিসের সিংহাসন বহু দুরের পথ হওয়া সত্বেও চোখের নিমিষে তাঁর নিকট উপস্থিত করেছিলেন।

প্রকাশ থাকে যে, আসেফ বিন বারখিয়া হযরত সোলায়মান (আলাইহিস্‌সালাম) এর উজির ছিলেন। কেহ কেহ বলেন যে, তাঁর লিখক ছিলেন। কারো মতে তিনি একজন বিজ্ঞ

আলেম এবং সোলায়মান (আলাইহিস্‌সালাম) এর বিশেষ বন্ধু ছিলেন। তাঁর নাম ছিল উছতুম। কেহ কেহ বলেন- তিনি হযরত খিজির (আলাইহিস্‌সালাম) ছিলেন। তবে প্রথম কথাটিই সঠিক এবং শুদ্ধ। তিনি বিসমিল্লাহ পড়ে চোখের পলকে বিলকিসের সিংহাসন হযরত সোলায়মান (আলাইহিস্‌সালাম) এর দরবারে উপস্থিত করেছেন। কেহ বলেন তিনি লা-হাওলা বলে সিংহাসন এনেছেন। কেহ বলেন- ইয়া হাইয়্যু ইয়া কায়্যুম বলে উপস্থিত করেছেন। অনেকের মতে তিনি ইসমে আযম পাঠ করে মুহূর্তের মধ্যে বিলকিসের সিংসাহন উপস্থিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

আর খাদ্য ও পানীয় বস্তু ও পোষাক-প্রয়োজেনের সময় উপস্থিত পাওয়া। যেমন হযরত মরিয়ম (আলাইহাস্‌সালাম) এর বেলায় তা হয়েছিল। অর্থাৎ হযরত মরিয়ম (আলাইহাস্‌সালাম) এর মাতা যখন গর্ভধারণ করলেন, তখন তিনি মান্নৎ করলেন যে, তারঁ গর্ভে যে সন্তান আছে তাকে বায়তুল মোকাদ্দাসের খেদমতের জন্য মুক্ত করে দেবেন। তিনি ভেবেছিলেন যে, তাঁর গর্ভে ছেলে সন্তান হবে। কিন্তু আল্লাহ তা'য়ালার ইচ্ছায় তিনি মরিয়ম (আলাইহাস্‌সালাম) কে প্রসব করলেন অনন্তর তিনি মরিয়মকে বাইতুল মোকাদ্দসের খাদেমদের জন্য নিয়ে গেলে হযরত যাকারিয়া (আলাইহিস্‌সালাম) তাঁকে গ্রহণ করেন। কেননা তিনি খাদেমদের প্রধান ছিলেন এবং হযরত মরিয়াম (আলাইহাস্‌সালাম) এর খালূ ছিলেন। অতঃপর হযরত যাকারিয়া (আলাইহিস্‌সালাম) তাঁর জন্য একখানা উচ্চ ঘর নির্মাণ করলেন এবং সে ঘরে হযরত মরিয়মকে রেখে দরজা বন্ধ করতেন। আর যখনই যাকারিয়া (আলাইহিস্‌সালাম) তাঁর নিকট বাইতুল মোকাদ্দাসের মেহরাবে উপস্থিত হতেন তখনই তাঁর নিকট রিযিক দেখতে পেতেন অর্থাৎ অমৌসুমী ফল দেখতে পেতেন। একদা হযরত যাকারিয়া (আলাইহিস্‌সালাম) জিজ্ঞেস করলেন হে মরিয়ম! কোথা হতে এ রিযিক পেয়েছ? মরিয়ম বললেন ইহা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে এসেছে।

আর পানির উপর দিয়ে চলাচল করা। যেমন- অনেক আউলিয়ায়ে কেরাম থেকে এরূপ ঘটনা বর্ণিত আছে। যেমন-সৈয়্যদুত তায়েফা হযরত সৈয়্যদুনা জুনায়েদ বাগদাদী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) একবার দাজলা নদীর নিকট তাশরীফ নিয়ে গেলেন এবং তিনি ইয়া আল্লাহু বলে জমিনের উপর যেভাবে হাটেন সেভাবে দাজলা নদীর পানির উপর দিয়ে হাটতে লাগলেন। এরপর এক ব্যক্তি নদীর নিকট আসলেন এবং নদী পার হওয়া তার জন্য অতীব জরুরী ছিল। সে পার হওয়ার জন্য নৌকা খোজ করল কিন্তু কোন নৌকা সেখানে ছিলনা। যখন সে হযরত জুনায়েদ (রদিয়াল্লাহু আনহু) কে পানির উপর দিয়ে তাশরীফ নিয়ে যেতে দেখলেন তখন সে হযরতের খেদমতে আরজ করলেন হুজুর আমি কিভাবে আসব হযরত এরশাদ করলেন তুমি ইয়া জুনায়েদ ইয়া জুনায়েদ বলে চলে আস। সে অনুরূপ বলে পানির উপর দিয়ে হাটতে লাগল যেভাবে জমিনের উপর হাটে। এভাবে যখন সে মাঝ দরিয়ায় গিয়ে পৌছল তখন অভিশপ্ত শয়তান তার অন্তরে কুমন্ত্রণা দিল যার কারণে সে বলল হযরত নিজেইতো ইয়া আল্লাহু বলতেছেন অথচ আমার দ্বারা ইয়া জুনায়েদ বলাচ্ছেন। আর আমি ইয়া আল্লাহু বলবনা কেন? এ ধারণা করে সে ইয়া আল্লাহু বলতে শুরু

করল। সে যখন ইয়া জুনায়েদ যিকির পরিত্যাগ করে ইয়া আল্লাহ্ এর যিকির আরম্ভ করল তখন সে পানিতে ডুবে যেতে লাগল। যখন ডুবে যাচ্ছিল তখন সে ডাক দিল হযরত আমি তো ডুবে যাচ্ছি। হযরত তখন তাকে নির্দেশ দিলেন তুমি পুনরায় ইয়া জুনায়েদ ইয়া জুনায়েদ এর যিকির শুরু কর। যখন সে ইয়া জুনায়েদ যিকির আরম্ভ করল তখন সে পুনরায় পানির উপর দিয়ে হাটতে শুরু করল এবং উক্ত সমুদ্র পার হয়ে গেল। সমুদ্র পার হয়ে হযরতের খেদমতে নিবেদন করলেন হযরত এ কি ব্যাপার? আপনি ইয়া আল্লাহ্ বলে পার হচ্ছেন আর আমি ইয়া আল্লাহ্ বলে যিকির করলে ডুবে যাচ্ছি। হযরত জুনায়েদ বাগদাদী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু উত্তর দিলেন ওহে বোকা-তুমি এখনো তো জুনায়েদ পর্যন্ত পৌছতে পারনি আর আল্লাহ্ পর্যন্ত কিভাবে পৌছবে। আল্লাহ্ আকবর (আল মালফুযাত)।

অনুরূপভাবে বর্ণিত আছে যে, দু'জন আউলিয়ায়ে কেরাম সমুদ্রের উপকুলে বসবাস করতেন। একজন এ তীরে আর অপর জন অন্য তীরে থাকতেন। তাদের একজন একদিন ফিরনী রান্না করলেন এবং খাদেমকে বললেন কিছু ফিরনী আমার বন্ধুকে দিয়ে আস। খাদেম আরজ করলেন-হুজুর! পথিমধ্যে তো নদী রয়েছে। কিভাবে নদী পার হব? নৌকার কোন ব্যবস্থা নেই। হযরত বললেন তুমি নদীর তীরে যাও এবং বলো আমি ঐ ব্যক্তির নিকট থেকে এসেছি যিনি আজ পর্যন্ত স্বীয় স্ত্রীর কাছে যাননি। একথা শুনে খাদেম অবাক হয়ে গেলেন এজন্য যে, হযরত ফরমাচ্ছেন তিনি আজ পর্যন্ত আপন স্ত্রীর কাছে যাননি অথচ তিনি হলেন জনক অর্থাৎ তার সন্তান রয়েছে। স্ত্রীর সাথে না থাকলে কিভাবে সন্তান হল। যাক খাদেম চিন্তা করলেন এসব ধারণা না করে হুজুরের হুকুম পালন করা জরুরী। সুতরাং তিনি নদীর কুলে গিয়ে পয়গাম জানিয়েদিলেন যা তাঁর হুজুর কেবলা এরশাদ ফরমায়েছেন। নদীকে পয়গাম পেশ করার সাথে সাথে নদী রাস্তা দিয়ে দিল। তিনি পানির উপর দিয়ে পায়ে চলে নদী পার হয়ে নদীর অপর পারে গিয়ে ঐ বুযুর্গ ব্যক্তির খেদমতে উপস্থিত হয়ে তাঁকে উক্ত ফিরনী দিলেন। তিনি ঐ ফিরনী খেয়ে বললেন, তুমি তোমার মালিকের নিকট গিয়ে তাঁকে আমার সালাম বলবে। খাদেম আবেদন করলেন, হুজুর সালাম তো তখন দেব যখন আমি নদী পার হয়ে ঐ পাড়ে যেতে পারব। শুনে তিনি এরশাদ করলেন তুমি নদীর তীরে দিয়ে নদীকে সম্বোধন করে বলবে আমি ঐ ব্যক্তির নিকট থেকে আসতেছি যিনি ত্রিশ বছর হতে আজ পর্যন্ত কিছুই খাননি। এ কথা শুনে খাদেম আরোবেশী অবাক হলেন এজন্য যে, হুজুরতো এ মাত্র আমার সামনে ফিরনী খেলেন অথচ বলতেছেন তিনি এতদিন যাবৎ কিছুই খাননি। যাক তিনি আদবের প্রতি লক্ষ্য করে নিরব রইলেন। নদীর কিনারায় গিয়ে হুজুরের পয়গাম শুনানোর পর নদী রাস্তা করে দিলে খাদেম নদী পার হয়ে আপন মালিকের খেদমতে উপস্থিত হয়ে আবেদন করেলেন হুজুর- এখানে রহস্য কি? আপনি এরশাদ ফরমালেন কোন দিন আপনি আপনার স্ত্রীর সাথে স্বাক্ষাৎ করেননি অথচ আমি জানি আপনার সন্তান রয়েছে। যদি আপনি আপনার স্ত্রীর সাথে স্বাক্ষাৎ না করেন তাহলে আপনার সন্তান হল কিভাবে? আর আপনার বন্ধু যিনি আপনার প্রেরিত ফিরনী আমার সামনে খাওয়ার পর বললেন তিনি ত্রিশ বছর পর্যন্ত কিছুই খাননি। ইহা শুনার পর হুজুর কেবলা এরশাদ

ফরমালেন-ওহে খাদেম তুমি যা জান এবং দেখছ সব ঠিক। কিন্তু আমাদের কোন কাজ নিজেদের চাহিদা মিটানোর জন্য হয়না বরং আমাদের সকল কাজ আল্লাহ ও রাসুল (জাল্লা ওয়ালা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) কে খুশি করার জন্য হয়ে থাকে। (আল মালফুজ)।

আর শুন্যস্থানে উড়ে যাওয়া। যেমন- হযরত জাফর বিন আবু তালিব ও লোকমান সারাখসী ও অন্যান্য বুযুর্গ হতে এরূপ আশ্চর্য্য ঘটনা বর্ণিত আছে। যেমন-হযরত জাফর বিন আবু তালিব তিনি ছিলেন হযরত সায়্যেদেনা আলী (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)র ভাই। তিনি প্রিয় নবীর নবুয়্যত প্রকাশের প্রথম যুগেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং হাবশায় হিজরত করেন। অতঃপর রাসুলে পাক ছাহেবে লাওলাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মুতার যুদ্ধে সৈনিকদের সাথে মুলকে শামের দিকে তাঁকে প্রেরণ করলেন এবং সে যুদ্ধে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। যুদ্ধে তাঁর দু'নো হাত কাটা যাওয়ার কারণে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে দুটি পাখা দান করলেন এবং দু পাখা দ্বারা তিনি উড়তে পারতেন। যেমন-হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত আছে, রাসুলুল্লাহ ছাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, আমি জাফরকে দেখেছি তিনি জান্নাতে ফেরেশতাদের সাথে উড়তেছেন। (তিরমিজী শরীফ) এ কারণে তাঁকে তাইয়্যার বলা হয়।

সহস্রাধিক বই-পুস্তকের লেখক ঃ

চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দেদ শরীয়তে মুহাম্মদীয়ার সহায়তাকারী ও শক্তিবর্ধক আলা হযরত আজিমুল বরকত ইমামে আহলে সুন্নাত জমিন ও জমানার গৌরব আল্লামা মাওলানা মৌলভী হাফেজ ক্বারী মুফতী হাকীম আলহাজ্ব আশ্ শাহ আল মোখ্তার আবদুল মোস্তফা মুহাম্মদ আহমদ রেজা খাঁন সাহেব রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এর এটা কতই উজ্জল কারামত যে, কেবল আটষট্টি বছর বয়স পেয়ে এক হাজারের চেয়েও বেশী বই-পুস্তক লিখেছেন। মশায়েখে ক্বেরামগণ বলেছেন, আলা হযরত কেবলার লিখিত সহস্রাধিক বই পুস্তকের মধ্যে অন্যতম একটি কিতাব হলো ফতোয়ায়ে রেজভীয়্যা শরীফ যা বার খন্ডে প্রকাশিত। আর উহার প্রতিটি খন্ডকে যদি কলম দ্বারা লিখা হয় তাহলে এক খন্ডের মধ্যে প্রায় এক হাজার পৃষ্টা হবে। উহা এতো প্রকান্ড কিতাব যে, অন্য কেই আটষট্টি সাল কেন একশত বছরেও লিখা মুশকিলের বিষয়। যার পুরো নাম হলো "আল আতায়ান নববীয়্যাহ ফিল ফাতাওয়ায়ির রেজভীয়্যাহ"

আলা হযরত কেবলার জীবনটা রহস্যজনক কারামতে ভরপুর। তিনি শুধু আটষট্টি বছর বয়স পেয়েছেন। আর এই আটষট্টি থেকে যদি চৌদ্দ বছর বাদ দিই কারণ চৌদ্দ বছরেই তিনি ফতোয়ার কাজ শুরু করেছেন, তাহলে কেবল চুয়ান্ন বছর অবশিষ্ট থাকবে। আলা হযরত কেবলা চুয়ান্ন বছরে চুয়ান্নটি মতান্তরে ৫৫টি বিষয়ে প্রকাশিত এক হাজারের চেয়েও বেশী কিতাব লিখেছেন। সুবহানাল্লাহ। এটাই আলা হযরত কেবলা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সবচেয়ে বড় কারামত। পুতঃপবিত্র মহান আল্লাহ এটা তাঁরই দান। যা তিনি যাকেই ইচ্ছা তাকেই দান করেন। আর আল্লাহ তায়ালা মহান অনুগ্রহের অধিকারী।

ইহা দ্বারাই প্রিয় নবীর সত্যিকার ওয়ারেছ নায়েবে শাহেন শাহে বেলায়ত মুজাদ্দেদে দ্বীন ও মিল্লাত আলা হযরত আজিমুল বরকত রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর জ্ঞান, মেধা, যোগ্যতা, বাগ্মিতা, বিরল বুদ্ধিমত্তা, কারামত ও বেলায়তের আন্দাজ করা যায়।

ইলম ও ইরফার কতই প্রসবণ দ্বারা জারি করেছেন
একহাজারের চেয়েও বেশী কিতাব লিখেছেন, আপনিই
হলেন চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দেদ সৈয়্যদী মুরশিদি শাহ্ আমহদ রেজা।

আলা হযরত কেবলা মা'দরযাদ তথা জন্মলগ্ন থেকেই যে অলি ছিলেন তা নিম্নোক্ত কারামত দ্বারা প্রমাণিত-

আলা হযরত কেবলার বয়স সবে মাত্র সাড়ে তিন বছর ঐ বয়সে তিনি একদিন মসজিদের সামনে দিয়ে তাশরিফ নিয়ে যাচ্ছিলেন ঐ সময় একজন বুজুর্গ ব্যক্তি তাশরীফ আনলেন, যাকে আরব দেশের মানুষের মত লাগতেছিল কারণ তার পরিধানে ছিল আরবী পোষাক। ঐ বুযুর্গ ব্যক্তি কারো সাথে কোন কথা না বলে সোজা শিশু আলা হযরত কেবলার কাছে গেলেন এবং আরবী ভাষায় কিছুক্ষণ কথা বললেন এদিকে শিশু আলা হযরত কেবলা অনারবী হয়ে ঐ বুযুর্গ ব্যক্তির সাথে বিশুদ্ধ আরবী ভাষায় কথা বলেছেন। ঐ আরবী লোকটি আলা হযরতের সাথে কথা শেষ করে কারো সাথে কোন কথা না বলে চলে গেলেন। আর কোন দিন তাকে দেখা যায়নি। আর আলা হযরত কেবলা ও বলেননি যে, ঐ বুযুর্গ ব্যক্তি কে ছিলেন? তার সাথে আরবী ভাষায় কি আলোচনা করেছেন, সুবহানাল্লাহ। এর দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, আলা হযরত কেবলা মা'দরযাদ অলি ছিলেন, কারণ ঐ বয়সে তিনি সবেমাত্র কথা শিখতেছেন, এমতাবস্থায় আরববাসী না হয়ে ও আরবী ব্যক্তির সাথে প্রাঞ্জল আরবী ভাষায় কথা বলেছেন।

চার বছর বয়সে আর একটি কারামত ঃ

আলা হযরত কেবলার বয়স চার বছর। ঐ সময় একদিন পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত একটি জামা পরিধান করে ঘরের বাহিরে তিনি তাশরীফ নিলেন। এমন সময় তাঁর সামনে দিয়ে কিছু নর্তকী যাচ্ছিল। হুজুর কেবলা তাদেরকে দেখে জামার নীচের অংশ দু'হাতে উঠায়ে চেহেরা ঢেকে ফেললেন। এদিকে চেহেরা ডাকলেন তবে চতর দেখা যাচ্ছিল। অর্থাৎ তিনি পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত জামা পরিধান করার কারণে ভিতরে পেন্ট জাতীয় কিছু পরেননি। তাঁর এ অবস্থা দেখে একজন নর্তকী বলল, বাহ! মিয়া-সাহেবজাদা মুখ ডেকেছেন কিন্তু সতর খুলে দিয়েছেন। নর্তকী যখন একথা বলল তখন আলা হযরত কেবলা মুখ গোপন রেখে তাৎক্ষনিক উত্তর দিলেন চোখ অনুরক্ত হলে আন্তরিক ভক্ত হয় আর অন্তর ভক্ত হলে সতর অনুরক্ত হয়। তাই আমার প্রথমে চোখ ঢাকা। সুতরাং আমি চোখ গোপন করেছি এতে সতর দেখা গেলেও কোন অসুবিধা নাই। আলা হযরত কেবলার এ জবাব শুনে নর্তকীরা লজ্জিত হয়ে সকলেই মাথা নিচু করে চলে গেল। সুবহানআল্লাহ। আলা হযরত কেবলা এমন একজন অলিয়ে কামেল যিনি চার বছর থেকে মানুষকে হেদায়তের আলো দেখাতে লাগলেন।

শাহেন শাহে মদীনা মাহবুবে কিবরীয়া (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এরশাদ ফরমালেন, আমার আহমদ রেজা এসে গেছেন ঃ

আরবী ব্যাকরণের একটি কিতাব যার নাম হেদায়াতুন নাহু, যা আমাদের বাংলাদেশের মধ্যে বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক নির্বাচিত সরকারী অনুদানভুক্ত সকল মাদ্‌রাসা সমূহের মধ্যে দাখিল ৮ম শ্রেণী হতে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পড়ানো হয়। আর সকল খারেজী মাদ্‌রাসায় ও পড়ানো হয়। আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা খান নিজেই বর্ণনা করেন। তিনি ৮ বছর বয়সেই ঐ কিতাবটি পড়েছেন এবং কিতাবটি পড়ার পর ঐ কিতাবটির একটি আরবী ব্যাখ্যা লিখেছেন। ঐ সময়ে আলা হযরত কেবলা স্বপ্নে দেখলেন, একটি সু-উচ্চ প্রাসাদ, যার পাহারা দিতেছেন ভারত বর্ষের একজন সুপ্রসিদ্ধ অলি হযরত কাফী (রাহমাতুল্লাহে আলাই) হযরত কাফী (রাহমাতুল্লাহে আলাই) আলা হযরতকে সম্বোধন করে এরশাদ করলেন- يا احمد رضا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فى هذه الدار فادخل وزره صلى الله عليه واله عليه وسلم

হে আহমদ রেজা নিশ্চয় রাসুলাল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ ঘরে তাশরীফ এনেছেন, তুমি ভিতরে যাও এবং আল্লাহর রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এর সাথে স্বাক্ষাৎ করে আস। অতঃপর আলা হযরত কেবলা প্রাসাদের মধ্যে প্রবেশ করলেন, প্রবেশ করার পর দেখলেন, মাহবুবে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর দয়ালূ মাতা হযরত সৈয়্যদাতুনা আমেনা খাতুন রাদিয়াল্লাহু আনহার কোল মোবারকে নিজ শিশুকালীন অবস্থায় তাশরীফ ফরমায়েছেন এবং তাঁর পবিত্র বুকের দুধ পান করতেছেন। রাসুলে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঐ প্রাসাদে তাঁর গোলাম আলা হযরতকে দেখে তাঁর শ্রদ্ধেয়া আম্মাজান কে বললেন, আমার আহমেদ রেজা এসে গেছেন। আলা হযরত রাসুলে খোদাকে সালাতো সালাম, সম্মান ও তাজীম আরজ করে প্রাসাদ থেকে বের হয়ে আসলেন। আসার সময় পাহারায় নিয়োজিত হযরত কাফী (রাহমাতুল্লাহে আলাই) কে বললেন

يا كافى لقد زرت رسول الله صلى الله عليه وسلم-

অর্থাৎ হে কাফী নিশ্চয় আমি রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে স্বাক্ষাৎ করেছি।

গাউছে পাকের দরবারে আলা হযরতের স্থান ঃ

মাজমাউস সালাসেল আরেফ বিল্লাহ হযরত মাওলানা শাহ খাজা আহমদ হোছাইন নক্‌শবন্দী, মোজাদ্দেদী সাহেবকে হুজুর সৈয়্যদুনা গাউছে আজম দস্তগীর (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) স্বপ্নযোগে এরশাদ করলেন যে, তুমি ব্রেলী গিয়ে মাওলানা শাহ আহমদ রেজা খানের সাথে স্বাক্ষাৎ কর। গাউছে পাক শাহিন শাহে বাগদাদের ইঙ্গিতের পর হযরত খাজা আহমদ হোছাইন সাহেব ২৪ রমজানুল মোবারক ১৩৩১ হিজরীতে আলা হযরত মুজাদ্দেদে দ্বীন ও মিল্লাহ মাওলানা শাহ আহমদ রেজা খান ফাযেলে ব্রেলভী (রাদিয়াল্লাহু

তায়ালা আনহু) এর সাথে দেখা করার জন্য ব্রেলী শরীফ পৌছলেন। তিনি যখন ব্রেলী শরীফ পৌছলেন তখন মাগরিবের নামাজের ওয়াক্ত ছিল। মাগরিবের জামাত কায়েম হয়ে গেছে। আলা হযরত ইমামতি করতেছেন। হযরত খাজা আহমদ হোছাইন সাহেব প্রথম রাকায়াতে শামিল হলেন। মাগরিবের নামাজের শেষ বৈঠকে আলা হযরত কেবলাকে হুজুর পূরনূর সর্কারে গাউছে আজম দস্তগীর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু জানিয়ে দিলেন যে, খাজা আহমদ হোছাইন উপস্থিত হয়েছেন। তাঁকে পরিপূর্ণ অনুমতি দিয়ে দেন। আলা হযরত কেবলা নামাজের সালাম ফিরানোর পর নিজ শির মোবারকের পাগড়ী মোবারক খুলে খাজা আহমদ হোছাইন সাহেবের মাথায় পড়ায়ে দিলেন। সাথে সাথে হাদীস, আমল, যিকির, আজকার ও সমস্ত সিলসিলার অনুমতি এবং খেলাফত প্রদান করলেন। তিনি ওখানেই তাঁকে ফিল বদিহীয়া তাজুল ফুয়ুজ উপাধিতে ভূষিত করলেন। যার থেকে ১৩৩১ হিজরী বের হয়। হযরত খাজা আহমদ হোছাইন শাহ সাহেব আরজ করলেন, হুজুর সবেমাত্র আমি এসেছি। এখানে আপনার সাথে কোন কথা হয়নি। কথোপকথন ব্যতীত আপনি এ ফকিরকে এত দয়া করতেছেন? তখন আলা হযরত কেবলা এরশাদ করলেন, এখনই নামাযের শেষ বৈঠকের মধ্যে হুজুর গাউছে আজম রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু আমার হৃদয়স্পটে জানায়ে দিলেন যে, খাজা আহমদ হোছাইন এসেছেন তাঁকে পরিপূর্ণ অনুমতি দিয়ে দেন। সুতরাং আমি গাউছে পাকের ইশারায় আপনাকে এসব কিছুর অনুমিত দিতেছি। সুবহানাল্লাহ। এক দিকে খাজা আহমদ হোছাইন গাউছে পাকের ইশারায় আলা হযরত কেবলার দরবারে আসলেন অন্যদিকে আলা হযরত কেবলা গাউছে পাকের ইশারায় তাঁকে পরিপূর্ণ অনুমতি দিতেছেন। এর দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয় যে, আলা হযরত কেবলা যুগশ্রেষ্ট কামেল আধ্যাত্মিক পুরুষ ছিলেন যিনি তরীকতের সব-কাজ গাউছে পাকের ইশারায় আঞ্জাম দিয়ে থাকতেন।

গাউছে পাকের প্রতিনিধি ঃ

শেখে পাঞ্জাব, শেরে রব্বানী হযরত পীরে রওশন জমীর শাহজী শের মুহাম্মদ মিয়া শরকপূরী নকশবন্দী মুজাদ্দেদী সাহেব একদা গাউছে পাক শাহেন শাহে বাগদাদ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে স্বপ্নে দেখলেন। তিনি গাউছে পাকের খেদমতে আবেদন করে জানতে চাইলেন, হুজুর এ সময়ে আপনার প্রতিনিধি কে? হুজুর গাউছে আজম এরশাদ করলেন ব্রেলী শরীফের আহমদ রেজা। শাহজী মিয়া ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর সকালে ব্রেলী শরীফ সফর করার প্রস্তুতি শুরু করলেন। তাঁর মুরিদেরা জিজ্ঞাসা করলেন, হুজুর কোথায় যাবার ইচ্ছা করেছেন? হযরত শাহজী মিয়া তাঁর মুরীদদেরকে বললেন, আমি ব্রেলী শরীফ যাবার সংকল্প করেছি। গত রাত্রে আমি গোলাম হুজুর গাউছে আজমের যিয়ারত করেছি এবং আমি তাঁর থেকে জানতে চেয়েছি যে, হুজুর এ সময়ে দুনিয়াতে আপনার প্রতিনিধি কে? তিনি আমাকে সুসংবাদ দিয়েছেন যে, ব্রেলী শরীফের মাওলানা আহমদ রেজা। সুতরাং এখন আমি গাউছে পাকের বর্তমান প্রতিনিধির সাথে সাক্ষাত করার উদ্দেশ্যে ব্রেলী শরীফ যাচ্ছি। তাঁর মুরীদেরা আবেদন করলেন, হুজুর আমাদেরকেও আপনার সাথে যাবার অনুমতি প্রদান করুন যাতে আমরাও আপনার সাথে ব্রেলী শরীফ গিয়ে আলা হযরত কেবলাকে এক নজর দেখে ধন্য হতে পারি। তিনি তাদেরকে অনুমতি দিলেন। এখন পীর সাহেব ও উপস্থিত তাঁর মুরীদেরা শরকপুর থেকে ব্রেলী শরীফের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলেন।

এদিকে শাহে পাঞ্জাব তাঁর মুরীদদেরকে নিয়ে ব্রেলী শরীফের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন অন্যদিকে শাহে ব্রেলী আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা ব্রেলী শরীফে বসে বসে এরশাদ করতেছেন, আজ শেখে পাঞ্জাব তাশরীফ আনতেছেন, তাঁর অবস্থানের জন্য উপরের কক্ষ তৈয়ার কর এবং ঐ কক্ষ পরিস্কার করে তাতে সুন্দর করে বিছানা বিছাও। সুবহানাল্লাহ। একজন অলি পাঞ্জাব থেকে আরেকজন অলির সাথে সাক্ষাতের জন্য ব্রেলী শরীফে আগমন করতেছেন। ঐদিকে নায়েবে গাউছুল আজম ইমাম আহমদ রেজা ব্রেলী শরীফে বসে বসে কোন যোগাযোগ ছাড়া কাশ্‌ফ দ্বারা জেনে ব্রেলী শরীফে তাঁর আগমনের সুসংবাদ প্রদান করতেছেন এবং তাঁর থাকার জন্য ব্যবস্থা করতেছেন। আল্লাহু আকবর। এটাই আল্লাহর অলিদের শান। যাঁরা একজন অপরজনকে চিনেন এবং একজনের খবরাখবর অপরজন রাখেন।

যখন শেরে রব্বানী হযরত শাহজী মিয়া ব্রেলী শরীফে তাশরীফ আনলেন তখন আলা হযরত কেবলা ঘরের প্রধান দরজায় তাশরীফ নিলেন এবং শেখে পাঞ্জাবকে সম্বোধন করে বললেন, ফকীর সংবর্ধনার জন্য উপস্থিত আছে। আলা হযরত কেবলার সাথে হযরত শাহজী মিয়ার কোলাকোলি ও করমর্দনের পর তাকে উপরের কক্ষে বিশ্রাম করার ব্যবস্থা করে দিলেন। হযরত শাহজী মিয়া ব্রেলী শরীফে তিন দিন অবস্থানের পর ব্রেলী শরীফ থেকে পাঞ্জাবের উদ্দেশ্যে চলে যাওয়ার জন্য আলা হযরত কেবলা থেকে অনুমতি চাইলেন। অনুমতি প্রাপ্তির পর তিনি যখন ব্রেলী শরীফ থেকে পাঞ্জাবের শরকপুরে পৌছলেন তখন তার যে মুরীদানরা তাঁর সাথে সফরসঙ্গী হয়ে ব্রেলী শরীফ আসেননি তারা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, হুজুর! আপনি সেখানে কি কি দেখেছেন? মুরীদদের এ প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে শেখে পাঞ্জাবের চোখের পানি এসে গেল এবং বলতে লাগলেন, আমি কি বলব ওখানে কি কি দেখেছি। আরে আমি ওখানে দেখেছি- একটি পর্দা যার পিছন থেকে তাজেদারে মদীনা উভয় জাঁহানের শাহেন শাহ রাসুলে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাতেছেন আর মাওলানা আহমদ রেজা তাঁর জবান দিয়ে উহা বলতেছেন। সুবহানাল্লাহ! চোখ ওয়ালারাই অদৃশ্যের সককিছু দেখেন। যেমন শেখে পাঞ্জাব হযরত শাহজী মিয়া ব্রেলী শরীফ গিয়ে নায়েবে গাউছে আজম আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজাকে আধ্যাত্মিক জগতের এমন এক ব্যক্তিত্ব হিসাবে দেখেছেন যিনি যখনই যা বলেন সব প্রিয় নবীর ইঙ্গিতেই বলে থাকেন।

ব্রেলী শরীফ বসে মুরাদাবাদের দু'বন্ধুর কথোপকথন বলে দেয়ার ঘটনা ঃ

শেখুল মুহাদ্দেসীন হযরতুলহাজ্ব আল্লামা মাওলানা সৈয়্যদ শাহ মুহাম্মদ দিদার আলী রাহমাতুল্লাহে আলাই এর সাথে সদরুল আফাজেল হযরত আল্লামা মাওলানা হাকীম শাহ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী রাহমাতুল্লাহে আলাই এর নিগুঢ় বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল। একদা সৈয়্যদ সাহেব মুরাদাবাদে সদরুল আফাজেলের সাথে সাক্ষাত করার উদ্দেশ্যে তাঁর বাড়ীতে তাশরীফ আনলেন। হযরত সদুরুল আফাজেল নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী তাঁকে বললেন ব্রেলী শরীফে ইমামে আহলে সুন্নাত মুজাদ্দেদে দ্বীন ও মিল্লাত ইমামে এশকো মুহাব্বত শেখুল ইসলাম ওয়াল মুসলেমীন আলা হযরত আজিমুল বরকত মাওলানা শাহ আহমদ রেজা খান

সাহেব রয়েছেন। যিনি একজন অতুলনীয় আমলদার যুগ শ্রেষ্ঠ আলেমে দ্বীন। চলুন আমরা দু'বন্ধু মিলে ব্রেলী শরীফে গিয়ে আলা হযরত কেবলার সাথে সাক্ষাত করে তাঁর রুহানী ফয়েজ ও বরকত হাসিল করে আসি। তখন শেখুল মুহাদ্দেসীন সৈয়্যদ সাহেব হযরত সদরুল আফাজেলকে বললেন, আমি আলা হযরত সম্বন্ধে শুনেছি এবং তাঁর ব্যাপারে খুব ভাল করে জানি। যিনি হলেন পাঠান বংশোদ্ভুত, কঠিন স্বভাবের ও বেশী রাগী মানুষ। দীর্ঘ আলোচনার পর অবশেষে সদরুল আফাজেল সাহেব সৈয়্যদ সাহেবকে নিজ নিগুঢ় বন্ধুত্বের দাবী নিয়ে আবদার খাটিয়ে ব্রেলী শরীফ নিয়ে গেলেন। যখন তাঁরা সওদাগরান মহল্লায় আলা হযরতের দরবারে আক্দসে পৌছলেন এবং আলা হযরতের সাথে সাক্ষাত করে তাঁর সাথে করদমর্দনের পর শেখুল মুহাদ্দেসীন সৈয়্যদ সাহেব আলা হযরতের কাছে জিজ্ঞাসা করলেন হুজুর আপনি কেমন আছেন? তখন সৈয়্যদুনা আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা খান প্রতি উত্তরে বললেন, সৈয়্যদ সাহেব কি জিজ্ঞাসা করতেছেন-আমি তো, পাঠান বংশের, কঠিন স্বভাবের ও বেশী রাগী মানুষ। তৎক্ষনাত সৈয়্যদ সাহেব কিংকতর্ব্যবিমুঢ় হয়ে পড়লেন এবং চিন্তিত হয়ে ভাবতে লাগলেন মুরাবাদে আমাদের দু'অন্তরঙ্গ বন্ধুর মাঝে যে কথোপকথন হয়েছিল তা আলা হযরত কিভাবে জানলেন। নিঃসন্দেহে ইনি একজন বিশিষ্ট অলিয়ে কামেল যিনি খোদা প্রদত্ত ক্ষমতাবলে আপন কাশ্ফ ও কারামতের মাধ্যমে তা জেনে নিলেন এবং দ্বিতীয়বার ঐ শব্দাবলী পুনরাবৃত্তি করলেন আর ইহাও জেনে নিলেন যে, আমি সৈয়্যদ প্রিয় নবীর আওলাদ। অথচ আমার সাথে ইতি পূর্বে তাঁর সাথে সাক্ষাত হয়নি আর আমি তাঁর কাছে আমি কোন বংশের তাও প্রকাশ করিনি এর পরও আমি কোন বংশের লোক তিনি তা জেনে নিলেন। নিশ্চয় ইহা তার জিন্দা কারামত। আল্লাহু আকবর। এ বলে সৈয়্যদ সাহেব আলা হযরতের কদমবুছি করলেন এবং আলা হযরতের হাতে বায়'য়াত হয়ে ক্বাদেরীয়া আলীয়া রেজভীয়া সিলসিলায় প্রবেশ করলেন। আর ঐ সময়ে আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা খান তাঁকে খেলাফত প্রদান করলেন। সুবহানাল্লাহ ইহা আল্লাহর অলিদের শান। দুনিয়া কেন লাওহে মাহফুজ পর্যন্ত আল্লাহর বন্ধুদের চোখের সামনে উপস্থিত। আল্লাহ ওয়ালারা এক স্থানে বসে অন্য স্থানের সবকিছু স্বচক্ষে দেখেন এক জায়গায় অবস্থান করে অন্যত্রের খবর রাখেন।

ফীলিভেতের মাজযুব অলি হযরত চুপ শাহ্ মিয়া ও হযরত ইমাম আহমদ রেজাঃ

হযরত মুহতরম আলহাজ্ব সৈয়্যদ মুহাম্মদ সফদর আলী ফাতেমী রেজভী নূরী সাহেব থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেন যে, ফীলীভেতের সুপ্রসিদ্ধ সুপরিচিত মাজযুব অলি হযরত শাহ আবদুল ওয়াহীদ খান সাহেব যিনি চুপ শাহ মিয়া নামে সকলের কাছে পরিচিত। যার মাজার শরীফ হুজুর শাহজী মুহাম্মদ শের মিয়া রাহমতুল্লাহে আলাই এর মাজার পাকের নিকটস্থ মুনীর খান মহল্লায় অবস্থিত। হযরত চুপ শাহ মিয়া ডুরী লাল মহল্লার জামন নামক বৃক্ষের নীচে উলঙ্গবস্থায় আল্লাহ ও তদ্বীয় রাসুলের ধ্যানে আত্মহারা হয়ে পড়ে থাকতেন। তাঁর পাশে আগুন প্রজ্জলিত থাকত। এখনো ঐ জায়গা জামন বৃক্ষের

নীচে সংরক্ষিত রয়েছে। উক্ত জায়গার উপর একটি সিলিফ পাথর রাখা আছে। আর ঐ জায়গা রমেশ চন্দর শিংয়ের মালীকানাধীন রয়েছে। হযরত চুপ শাহ মিয়া সর্বদা স্বর্গীয় ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। কারো সাথে কোন কথাবার্তা বলতেন না। খানা-পিনার প্রতিও কোন অনুভূতি ছিলনা। সতর অনাবৃত অবস্থায় পড়ে থাকতেন। একদা হযরত চুপ শাহ মিয়া দাঁড়িয়ে উঁচু স্বরে চিৎকার করে বলতে লাগলেন, কেউ আছেন? কেউ আছেন? তাঁর চিৎকার শুনে এক ব্যক্তি তাঁর কাছে পৌঁছলেন এবং আদবের সাথে জিজ্ঞেস করলেন মিয়া কি ব্যাপার! আপনার কোন কিছুর প্রয়োজন আছে কি? তখন হযরত চুপ শাহ মিয়া বললেন, আমি উলঙ্গ সতর অনাবৃত। একজন আল্লাহর প্রিয় বান্দা তাশরীফ আনতেছেন। সুতরাং কোন কাপড় থাকলে তাড়াতাড়ি নিয়ে আস। আমি সতর ডাকব। ঐ ব্যক্তি তৎক্ষনাত একটি কম্বল এনে তাঁকে দিলেন। হযরত চুপ শাহ মিয়া কম্বলটি নিয়ে আপন সতর ডাকলেন আর দাঁড়িয়ে রইলেন কারো আগমনের প্রতীক্ষায়। হঠাৎ একটি পাল্কী আসল আর ঐ পাল্কীতে আলা হযরত কেবলা তাশরীফ ফরমালেন। পাল্কী যখন হযরত চুপ শাহ মিয়ার পাশ দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন আলা হযরত ঈমাম আহমদ রেজা খান বললেন হে পাল্কী বাহকেরা পাল্কী থামাও। এখানে আল্লাহর অলির খোশবু আসতেছে। পাল্কী থামানো হল। আলা হযরত পাল্কী থেকে অবতরণ করে সোজা হযরত চুপ শাহ মিয়ার দিকে তাশরীফ নিয়ে গেলেন। এদিকে হযরত চুপ শাহ মিয়াও আলা হযরতের দিকে দৌড়ে গিয়ে তাঁর সাথে আলিঙ্গন করলেন। কোলাকোলির পর উভয়ের মাঝে প্রায় বিশ মিনিট কথোপকথন হল। হযরত চুপ শাহ মিয়া ও ইমাম আহমদ রেজা (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) এর সাথে যে আলোচনা হয়েছে তা উপস্থিত শ্রোতা মন্ডলীর কেউই বুঝতে পারেননি। অতঃপর আলা হযরত পুনরায় পাল্কীতে আরোহণ করলেন। আরোহণের পর যখন আলা হযরত রওনা হলেন তখন হযরত চুপ শাহ মিয়া আপন স্থানে গিয়ে ঐ কম্বল খানা খুলে ফেলে দিলেন এবং পূনরায় উলঙ্গ হয়ে গেলেন। সুবহানাল্লা। এটাইতো অলি আল্লাহদের শান। যারা অপরিচিত হলেও একজন অপরজনকে চিনে এবং একজনের সম্মানার্থে অপরজন এগিয়ে আসেন। আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা খান এমন একজন কামেল অলি ছিলেন যিনি হযরত চুপ শাহ মিয়া কে না চিনেও আপন কাশফের মাধ্যমে জেনে নিলেন যে, তিনি একজন মাজযুব অলি। আর আলা হযরত এমন একজন শরীয়তের পাবন্ধ ব্যক্তি ছিলেন যার সম্মানার্থে একজন মাজযুব অলি হযরত চুপ শাহ মিয়া যিনি সবসময় উলঙ্গ থাকতেন তিনিও কম্বল নিয়ে সতর ডেকে আলা হযরতের সাথে কথা বলেছেন।

আলা হযরতের প্রতি বিচলিত কবুতরের সম্মান প্রদর্শন ঃ

১৩২৩ হিজরীতে আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা হেরেমাইনে শরীফাইনে দ্বিতীয় বার গমন করলেন। ঐ সময়ের একটি ঘটনা আলা হযরত কেবলা নিজেই বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি পবিত্র মক্কা শরীফে পৌঁছে প্রথমে শেখ ওমর সবহীর ঘর ভাড়ায় নিলাম। অতঃপর সৈয়্যদ ওমর রশিদী ইবনে সৈয়্যদ আবু বকর রশিদী আমাকে ওখান থেকে তাঁর ঘরে নিয়ে গেলেন। তাঁর দালানের মধ্যবর্তী দরজায় আমার উপবেশন ছিল।

দরওয়াজা সমূহের উপরে যে সমস্ত তাক ছিল ঐ গুলোর মধ্যে দক্ষিণ দিকের তাকে একজোড়া বিচলিত কবুতর থাকত। তারা খড়কটা নিয়ে আসত এবং গড়াইত। ঐ দিকে যারা বসতেন তাদের উপর ঐ খড়কুটা নিপতিত হত। যখন আমার জন্য খাট আনা হল এবং উক্ত খাট ঐ দরজার সামনে বিছানো হল যাতে ঐ ঘরে আমার সাথে সাক্ষাত করতে যারা আসেন তাদের জন্য জায়গা প্রশস্ত হয়ে যায়। যখন আমি উক্ত বিছানায় গিয়ে বসলাম তখন ঐ কবুতরগুলো ঐ তাক ছেড়ে মধ্যবর্তী দরজার তাকে বসা আরম্ভ করে দিল। এরপর ওখানে যারা বসতেন তাদের উপর খড়কটা গড়ে পড়ত। হযরত মাওলানা ইসমাইল আমাকে বললেন অসভ্য কবুতর ও আপনার প্রতি লক্ষ্য রাখে। তখন আমি তাকে বললাম আমি তাদের সাথে সন্ধি করেছি আর তারাও আমার সাথে সন্ধি করেছে।

সুবহানাল্লাহ! বিচলিত কবুতর ও আলা হযরতের প্রতি বিনয়ী হয়ে তাঁর উপর যেন কোন খড়কটা না পড়ে সে দিকে ভ্রক্ষেপ করে তাঁর মাথার উপরের তাক পরিত্যাগ করে অন্য তাকে চলে গেছে। বাস্তব কথা হল ইহাই আল্লাহর অলিদের শান যাদেরকে কবুতর পর্যন্ত চিনে তাজীম করে।

আলা হযরতের হাত মোবারকে তাওবা করে চল্লিশ জন ডাকাতের দস্যুতা পরিহারঃ

১৩২৩ হিজরীতে হযরত মাওলানা মুহাদ্দেস সুরুতীর শাহজাদা সুলতানুল ওয়ায়েজীন হযরত মাওলানা আলহাজ্ব আশ শাহ আবদুল আহাদের সাথে গঞ্জে মুরাদাবাদ শরীফের শেখুল মশায়েখ হযরত মাওলানা শাহ ফজলুর রহমান রাহমাতুল্লাহে আলাই এর দৌহিত্রী তথা হযরত মৌলভী আবদুল করিম শাহ সাহেবের সাহেবজাদী হামিদা খাতুনের বিবাহ হয় আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা খান ফাযেলে ব্রেলভী ও সে বিবাহ অনুষ্ঠানে গমন করে বরযাত্রী হিসাবে কনের পিত্রালয় তথা গঞ্জে মুরাদাবাদে গমন করেন। সুলতানুল ওয়ায়েজীনের বরযাত্রীরা খাওয়া দাওয়া সমাপনের পর ওখান থেকে প্রস্থান করে ঐ সময়ের রেলওয়ে ষ্টেশন মাদো গঞ্জে যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেলেন। ষ্টেশনে পৌঁছার তিন মাইল আগে মাগরিবের নামাজের সময় হয়ে গেল, তাই আলা হযরত কেবলাকে ইমাম করে বাকী সকলে মুক্তাদী হয়ে জামাতের সাথে মাগরিবের নামাজ আদায় করলেন। অরণ্য পথ ও নিকটবর্তী গ্রাম-ডাকাতের বস্তী হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিল। ঐ গ্রামের একজন লোক এসে খবর দিলেন যে, আপনারা সকল বরযাত্রী কনের পিত্রালয়ে ফিরে যান। কেননা রাত হয়ে গেছে আর রাস্তা খুবই বিপদজনক এবং নিকটবর্তী গ্রামটি ডাকাতের গ্রাম নামে প্রসিদ্ধ। আমি হযরত গঞ্জে মুরাদাবীর মুরীদ। আপনারা যেহেতু ওখান থেকে আসতেছেন তাই আমি আপনাদেরকে এ পরামর্শ দিতেছি। হুজুর মুহাদ্দেস সুরুতী সাহেব আলা হযরতের কাছে আবেদন করলেন হযরত আপনি যা হুকুম করেন তাই পালন করা হবে। আলা হযরত কেবলা এরশাদ করলেন, আল্লাহও তাঁর প্রিয় হাবীব আমাদেরকে সাহায্য করবেন। অবশেষে আলা হযরত কেবলার হুকুমে বরযাত্রীরা ষ্টেশনের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলেন। সকলে কিছু দুর যাওয়ার পর অস্ত্র সস্ত্রে সজ্জিত ডাকাতের দল তাদের দিকে আসতে শুরু করল, তখন আলা হযরত কেবলা বললেন হাসবুনাল্লাহু ওয়ানেমাল অকীল। আর

বরযাত্রীদেরকে সামনের দিকে অগ্রসর না হয়ে ওখানে অবস্থান করতে বলে আলা হযরত কেবলা নিজেই ঐ ডাকাতদের দিকে গমন করলেন। এদিকে ডাকাতেরা যখন এ দৃশ্য দেখল তখন তারা সম্মুখভাবে অগ্রসন না হয়ে সেখানেই দাঁড়ায়ে রইল। আলা হযরত কেবলা তাদের সামনে গিয়ে ডাকাতদেরকে সম্বোধন করে বললেন, হে ডাকাতরা আমরা তোমাদের এলাকার বুযুর্গ ব্যক্তির দৌহিত্রীকে বিবাহোত্তর বউ করে নিয়ে যাচ্ছি আর তোমাদের এ নাপাক ইচ্ছা যে, তোমরা বর যাত্রীদের লুট করার জন্য আসতেছ, আহ! ইহা বড়ই অনুতাপের বিষয়। তোমাদের তো এ কাজ করা উচিৎ ছিল যে, তোমরা এর বরযাত্রীদেরকে ষ্টেশন পর্যন্ত পৌছিয়ে দিতে পথ প্রদর্শন করবে, কিন্তু তোমরা তা না করে এর পরিবর্তে লুট করার উদ্দেশ্যে আসতেছ। এ অবস্থায় কি তোমরা বরযাত্রীদের লুট তরাজ করা সমোচিত মনে করতেছ? আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি তোমরা আর কতদিন অসচেতন থাকবে? চিন্তাকর আল্লাহ্ তায়ালাকে ভয় কর। আল্লাহর শাস্তির কথা স্মরণ কর। খোদার দরবারে তাওবা কর। এ সময়কে তোমরা গণীমত মনে কর ইহা বলে আলা হযরত দোয়া করলেন-

هداكم الله تعالى الى الصراط المستقيم

"হাদাকুমুল্লাহু তায়ালা ইলাস সিরাতিল মোস্তাকিম" অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে সরল সঠিক পথে পথ প্রদর্শন করুন। আলা হযরতের এ কথা গুলো ডাকাত দলের উপর বিশেষ প্রভাব ফেলল। ডাকাত দলের প্রত্যেকেই আলা হযরতের কারামতে কাপতে লাগল। আর সকলেই ঐ সময় স্বীয় অপবিত্র খেয়াল থেকে ফিরে আসল এবং তারা আলা হযরত কেবলার কাছে ক্ষমা চাইল এবং আল্লাহর রহমতে তারা সকলেই আলা হযরত কেবলার হাতে তাওবা করলেন যাদের সংখ্যা ছিল চল্লিশ জন। খোদার কৃপায় সকলেই আলা হযরত কেবলার হাতে বায়'য়াত হয়ে সিলসিলায়ে কাদেরীয়া আলীয়া রেজভীয়ায় প্রবেশ করলেন। এ ঘটনাকে মৌলভী মাহমুদ আহমদ সাহেব কানপুরী স্বীয় লিখিত তাজকেরা-এ-ওলামায়ে আহলে সুন্নাত আর খাজা রজী হায়দার সাহেব নিজের লিখিত তাজকেরা-এ-মুহাদ্দেসে সুরুতীর মধ্যে সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করেছেন। আর নবীরায়ে মুহাদ্দেসে সুরুতী হযরত শাহ ফজলুস সামাদ মানা মিয়া রেজভী সাহেব তাঁর মুর্শিদ আলা হযরত কেবলার এ অলৌকিক ঘটনা এবং তারঁ পিতার বিবাহের ঘটনা নিজেই বর্ণনা করেছেন।

আলা হযরত ও একজন অমুসলিম জাদুকর ঃ

হযরত শাহ্ মানা মিয়া বর্ণনা করেন যে, একদা আমার পীরে মুর্শিদ আলা হযরত কেবলা মসজিদ থেকে নামাজ আদায় করার পর তাশরীফ আনতেছিলেন, এমতাবস্থায় সওদাগরা মহল্লার গলীর মধ্যে মানুষের ভীড় দেখলেন, আলা হযরত কেবলা জানতে চাইলেন ইহা কি রকম সমাবেশ? তখন বলে দেয়া হল যে, একজন অমুসলিম জাদুকর তার জাদুর নৈপুন্যতা দেখাচ্ছে। সে তিন/চার কিলো পানিতে পরিপূর্ণ প্লেইট কাঁচা তাগায় উঠাচ্ছ। ইহা শুনার পর আলা হযরত কেবলা ও ঐ সমাগমস্থলে গেলেন এবং ঐ জাদুকরকে

লক্ষ্য করে বললেন, আমি শুনেছি তুমি নাকি তিন/চার কিলো পানিতে পরিপূর্ণ প্লেইট অপক্ষ সুতায় উটাচ্ছ। সে উত্তর দিল জী হাঁ। আলা হযরত কেবলা তার থেকে জানতে চাইলেন অন্য কোন জিনিসও কি উঠাতে পার? সে উত্তর দিল আপনি যে কোন জিনিসই আমাকে দেবেন আমি উহা উঠাতে পারব। তখন আলা হযরত কেবলা নিজ পাদুকাদ্বয় পা থেকে বের করে বললেন (কথিত আছে যে, আলা হযরত কেবলা হালকা পাতলা নাগারা জুতা পরতেন যার ওজন নুন্যতম পঞ্চাশ গ্রাম হত তার চেয়ে বেশী নয়) নাও এ জুতা উঠানো তো সম্ভবই হবে না বরং এ জুতা এখানে রাখতেছি তুমি এ জুতা জায়গা থেকে একটু সরিয়ে তোমার জাদুর নৈপূন্যতা দেখাও। জাদুকর লোকটি ঐ পাদুকা মোবারক অপক্ষ সুতায় উঠাতে চাইল কিন্তু উঠানোতো সম্ভবই হয়নি এমনকি যেখানে রেখেছেন সেখান থেকে একটু সরাতেও পারেনি। অনন্তর আলা হযরত কেবলা এরশাদ করলেন জাদুকর সাহেব এতক্ষণ তুমি তিন/চার কিলো পানি পরিপূর্ণ পাত্রকে কাঁচা তাগায় উঠায়ে মানুষদেরকে তোমার জাদু দেখাতেছিলে দেখি এখন আমার সামনে ঐ পাত্র জাদু দ্বারা উঠায়ে দেখাও। তখন জাদুকর অনেক চেষ্টা করেও তা দেখাতে অক্ষম হয়ে গেল। সুবহানাল্লাহ! আল্লাহর অলির কারামতের সামনে জাদুকরের জাদুকীরি কিছুনা। অবশেষে ঐ জাদুকর লোকটি আলা হযরতের এ জিন্দা কারামত দেখে আলা হযরতের কদম মোবারকের উপর শির নীচু করে পড়ে গেল এবং আলা হযরতের হাত মোবারকে ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে গেলেন। এরপর আলা হযরতের দরবার থেকে আধ্যাত্মিকতার দৌলতে উজমা গ্রহণ করে আপন নিবাসে ফিরে যান।

আলা হযরত কেবলা মৃতকে জীবিত করলেন ঃ

আলা হযরত কেবলা যাকে জীবিত করেছেন তার নাম হচ্ছে শেখ হাবিবুর রহমান। তিনি নিজেই তার মা-বাবা থেকে এবং স্বচক্ষে যারা ঘটনাটি দেখেছেন তাদের মুখ থেকে শুনে ঘটনাটি বর্ণন করেন। তিনি বলেন ছোট কালে তার নিমোনিয়া হয়েছিল এবং ঐ রোগে তার ইন্তেকাল হয়েছিল। তার ইন্তেকালে তার ঘরে শোকের ছায়া নেমে এসেছিল। সবাই কান্না-কাটি করতে লাগলেন। সে ছিল তার মা-বাবার একমাত্র আদরের দুলাল। তার মা-বাবা এ বলে কাঁদতে লাগল যে, আমাদের একমাত্র ছেলে তাও শেষ হয়ে গেল। এখন আমরা কি নিয়ে বাচবো। মৃত্যুর পর গোসল দেয়া ও কাফনের ব্যবস্থার এন্তেজাম শুরু হয়ে গেল। তিনি বলেন, আমার পিতা-মাতা ব্রেলী শরীফের মধ্যে আলা হযরত কেবলার পাশে একটি ঘরের মধ্যে থাকতেন। আমার শ্রদ্ধেয়া আম্মাজান কেঁদে কেঁদে আলা হযরত কেবলার খেদমতে উপস্থিত হলেন এবং কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলতে লাগলেন, হুজুর আমার ছেলে মারা গেছে। আমার একমাত্র ছেলে তাও আপনার দোয়ায় আল্লাহ তায়ালা আমাকে দান করেছিলেন। হুজুর আমি ছেলে চাই তাকে আপনি জিন্দা করেদিন। আলা হযরত কেবলা তাঁর আপন লাটি মোবারক উঠালেন এবং তার ঘরে তাশরীফ নিয়ে গেলেন। ওখানে আলা হযরতের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে সকলে দাঁড়িয়ে গেলেন। সকলে মনে করলেন আলা হযরত ও সমবেদনা প্রদর্শনের জন্য তাশরীফ এনেছেন। আলা হযরত কেবলা এরশাদ

করলেন পর্দা করুন, আমিও একটু তাকে দেখব। আলা হযরতের নির্দেশ মোতাবেক পর্দা দেয়া হলো, আলা হযরত কেবলা যখন মৃতের নিকট গেলেন তখন মৃতের আম্মাজান চিৎকার দিয়ে কান্না করে হুজুরকে বলতেছেন হজুর আমার ছেলেকে জীবিত করে দিন আমি আর কিছু চাইনা। আলা হযরত কেবলা মৃত ছেলেটির উপর থেকে কাপড় সরালেন এবং বিসমিল্লাহ শরীফ পাঠ করে বললেন হে বৎস্য! চোখ খুলতেছ না কেন? দেখ তোমার আম্মা কি বলতেছেন। আলা হযরত কেবলা নূরানী জবানে এ কথা বলার সাথে সাথে মৃত ছেলেটি চোখ খুললেন এবং কাঁদতে লাগলেন। আলা হযরত কেবলা বললেন এ ছেলেটিতো জীবিত। কে বলতেছে সে মারা গেছে। ইহা দেখে সকলের মধ্যে আনন্দের ঢেউ বইতে লাগল। আলা হযরত কেবলা এ ছেলেটির উপর স্নেহের হাত বুলায়ে দেয়ার পর তার কান্না বন্ধ হয়ে গেল এবং চেহারায় একটু মৃদু হাসির চিহ্ন দেখা গেল। সুবহানাল্লাহ। আলা হযরত কেবলা এভাবে নিমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত ছেলেটিকে জীবিত করলেন।

ব্রেলী শরীফের সুপ্রসিদ্ধ বুযুর্গ হযরত ধোকা শাহ্ আলা হযরতের দরবারে ঃ

ব্রেলী শরীফের প্রসিদ্ধ বুযুর্গ হযরত ধোকা শাহ সাহেব যিনি প্রায় সময় মাজযুব অবস্থায় থাকতেন। ১৩১৬ হিজরীর একটি ঘটনা-হযরত ধোকা শাহ্ সাহেব হুজুর পুরনূর আলা হযরত ইমামে ইশকো মুহাব্বতের দরবারে তাশরীফ আনলেন। তিনি আলা হযরতের সম্মুখে এসে বলতে লাগলেন, উভয় জাঁহানের মুক্তির কান্ডারী রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এর হুকুমত জমীনের উপর দেখা যাচ্ছে। আসমানের উপর দেখা যাচ্ছেনা। আলা হযরত কেবলা এরশাদ করলেন হুজুর পুরনূর শাহেন শাহে দো'আলম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হুকুমত যেভাবে জমিনের উপর রয়েছে ঐভাবে আসমানের উপরও রয়েছে। হযরত ধোকা শাহ পুনরায় বললেন, হুজুর পাক ছাহেবে লাওলাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লম এর হুকুমত জমিনের উপর দেখা যাচ্ছে, আসমানের উপর দেখা যাচ্ছে না। আলা হযরত পুনরায় এরশাদ করলেন কারো নজরে আসুক বা না আসুক আঁকা শাহেন শাহে দো'জাহান ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লম এর হুকুমত জলপথ, স্থলপথ, শুস্ক, আদ্র, ফল-মূল, গাছ-পালা, পাহাড়-পর্বত, নদী-সাগর, চন্দ্র-সূর্য আসমান ও জমীন প্রতিটি বস্তু ও প্রত্যেক জায়গায় বিদ্যমান ছিল আছে এবং থাকবে। আলা হযরত কেলার পক্ষ থেকে এ জবাব শুনে হযরত ধোকা শাহ আলা হযরত কেবলার হুজরা শরীফ থেকে চলে গেলেন। আর তখন আলা হযরত কেবলার ছোট ছেলে হুজুর মুফতীয়ে আজম হিন্দ হযরত মুস্তফা রেজা খান সাহেবের বয়স ৬ বৎসর হয়েছিল। তিনি ঐ সময়ে ঘরের ছাদে তাশরীফ নিয়েছিলেন এবং ঘরের ছাদে উঠার পর ছাদ থেকে পড়ে গেলেন। তাঁর শ্রদ্ধেয়া আম্মাজন আলা হযরত কেবলাকে আওয়াজ দিয়ে বললেন আপনি এখন একজন মাজযুব অলিকে বকেছেন আর সম্ভবত ঐ মাজযুব অলি আপনার উপর রাগ করে চলে গেছেন। এদিকে আপনার ছোট ছেলে মুস্তফা রেজা ঘরের ছাদে উঠে ওখান থেকে পড়ে গেছে। সুতরাং মাজযুব অলিকে ডেকে বকাবকি করা আপনার উচিত হয়নি। আলা হযরত কেবলা উত্তরে বললেন মুস্তফা রেজা ছাদ থেকে পড়লেও কোন ক্ষতি হবেনা এবং ব্যাথাও পাবে না। বাস্ত

বে দেখা গেল মুস্তফা রেজা ছাদ থেকে নীচে পড়ার পর হাসতেছেন। হাত পা কিছুই ভাঙ্গেনি আর কোন ব্যাথাও পায়নি। আল্লাহু আকবর। আলা হযরত কেবলার জিন্দা কারামত দেখুন। তাঁর ৬ বছরের ছোট ছেলে ছাদ থেকে পড়ে গেলেন এদিকে আলা হযরত কেবলা হুজরা শরীফে বসে বলে দিয়েছেন যে, ছাদ থেকে পড়লেও কোন ক্ষতি হবে না আর ব্যাথাও পাবে না। মনে হচ্ছে যেন মুস্তফা রেজা ছাদ থেকে পড়ার সময় আলা হযরত কেবলা হুজরায় বসে অদৃশ্যভাবে তাঁকে ছাদ থেকে নামিয়েছেন।

এরপর আলা হযরত কেবলা তাঁর স্ত্রীকে সম্বোধন করে বলেন যদি আল্লাহ্ তায়ালা এরকম হাজারো মুস্তফা রেজা দান করেন তাহলে খোদার কসম সবাইকে পুতঃপবিত্র শরীয়তের উপর কোরবানী করে দিতে পারি কিন্তু পবিত্র শরীয়তের উপর কোন আঘাত লাগতে দেবনা। তারপর বললেন এ মাজযুব অলিতো আমি অধমের নিকট নিজের সংশোধনের জন্য তাশরীফ এনেছিলেন। আর এ সংশোধনের কাজ করা তো আমি ফকীরের উপর ন্যস্ত। হযরত ধোকা শাহ্ সাহেব জমীনে ভ্রমণ করেছেন, এখন আসমানে ভ্রমনের জন্য যেতেছেন। আসমানে নজর করা তাঁর জন্য জরুরী ছিল যাতে হুজুর পুরনূর শাহেন শাহে কাউনাইনের আধিপত্য আসমানের উপরও বিদ্যমান ইহা দেখতে পান। এ কারণেই হযরত ধোকা শাহ্ সাহেব আমার দরবারে তাশরীফ এনেছিলেন। এখন তাঁকে আসমানে নজর ও বিচরণ করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। সুবহানাল্লাহ। সুপ্রসিদ্ধ ধোকা শাহ্ যিনি জমীনের সব খবর রাখেন কিন্তু আসমানে বিচরণ কিভাবে করা যায় সে ক্ষমতা হাসিলের জন্য আলা হযরতের দরবারে গেছেন এবং আলা হযরতও তাঁকে আল্লাহ্ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে তা দান করেছেন। হযরত ধোকা শাহ্ আলা হযরতের হুজরা শরীফ থেকে চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পর দেখা গেল তিনি দ্বিতীয়বার আলা হযরতের হুজরা শরীফে তাশরীফ এনেছেন এবং তাড়াহুড়া করে আলা হযরত কেবলার নিকট গিয়ে তাঁর সাথে কোলাকোলি করলেন এবং তাঁর কপালে চুমু দিয়ে বললেন, খোদার কসম! হুজুর পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এর হুকুমত যেভাবে ভূ-পৃষ্টের উপর রয়েছে সেভাবে আসমানের উপরও প্রতিটি স্থানে প্রতিটি বস্তুর উপর দেখতেছি। হুজুর আপনার ফয়েজো বরকতের বদৌলতে রাসুলে পাকের রাজত্ব আসমানের উপরও দেখতেছি। সুবহানাল্লাহ। আলা হযরত কেবলা এমন একজন অলিয়ে কামেল ছিলেন, যার দরবারে নাকাবেল গেলে কামেল হয়ে যেতেন আর কামেল গেলে যে উদ্দেশ্যে যেতেন সে উদ্দেশ্য হাসিল করতে পারতেন।

আলা হযরত কেবলা এক স্থানে বসে অন্য স্থানের খবর রাখতেন ঃ

ইমামে আহলে সুন্নাত মুজাদ্দেদে দ্বীনো মিল্লাত আলা হযরত কেবলার ছোট ছাহেবজাদা হুজুর মুফতীয়ে আজম হিন্দ হযরত মুস্তফা রেজা খাঁন সাহেবের ছাত্র ও খলিফা হযরত আল্লামা আলহাজ্ব আশ্ শাহ মুহাম্মদ রযব আলী রেজভী সাহেব বর্ণনা করেন। তিনি বলেন আমাকে হাজী হেমায়ত উল্লাহ ব্রেলী সাহেব এ ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ব্রেলী শরীফের প্রসিদ্ধ ও সুপরিচিতি বুযুর্গ সে সময়ের কুতুব হযরত ধোকা শাহ্ সাহেব (তালাইহির রাহমা) যখন কোন রাস্তায় তাশরীফ নিয়ে যেতেন তখন রাস্তার মধ্যে যে সমস্ত

ছেলে মেয়েরা তাঁকে দেখতে পেত সকলেই তাঁর কাছে দোয়ার জন্য এভাবে প্রার্থনা করত- হুজুর পরীক্ষায় পাশ করার জন্য দোয়া করুন। হযতর ধোকা শাহ দোয়া করতেন যাও পরীক্ষায় অকৃকার্য হবে। ইহা শুনে বাচ্চারা হতাশায় নিমজ্জিত হত এবং তাদের চেহেরা ফ্যাকাশে হয়ে যেত। তখন তিনি তাদেরকে তাঁর কাছে ডেকে বলতেন, আমার নাম ধোকা শাহ। আমি যাকে পাশ হবে বলেছি সে ফেইল হয়েছে, আর যাকে ফেইল হবে বলেছি সে পাশ হয়েছে। তাই তোমাদেরকে ফেইল হবে বলেছি যাতে তোমরা পাশ হতে পার।

হাজী হেমায়েত উল্লাহ সাহেব বলেন, হযরত ধোকা শাহ সাহেবের ইন্তেকালের অবস্থা এমন হয়ে গেল যে, তিনি ইন্তিকালের ঠিক একদিন আগে বস্তিবাসীগণের মাঝে টাকা বিতরণ করেছেন, কবর খননকীদেরকে কবর খননের জন্য টাকা দিয়েছেন, কাফনের কাপড়ের জন্য কাপড় ওয়ালাকে, লাশ ধৌতকারীকে, খাট বহনকারীকে এক কথায় মৃত ব্যক্তির জন্য যা-যা ক্রয় করার প্রয়োজন হয় ও খরচ করার প্রয়োজন হয় সব টাকা তিনি ইন্তেকালের আগেই দিয়ে গেছেন। তিনি আমার (হেমায়েত উল্লাহ) ঘরে থাকতেন। প্রায় রাত দু'টার সময় তিনি ইন্তেকাল করেন। তিনি যখন ইন্তেকাল করেন তখন ঘর ওয়ালারা সবাই ঘুম। কেউ ইন্তেকালের খবর জানেন না। এদিকে সকালে ফজরের নামাজের পূর্বে আলা হযরত কেবলা সওদাগরান মহল্লা থেকে পায়ে হেটে আমার (হেমায়ত উল্লাহ) ঘরের সামনে গিয়ে আমার ঘরের দ্বারের শিকলে করাঘাত করলেন। আলা হযরত কেবলা যখন আমার ঘরে তাশরীফ এনেছেন তখন আমি আলা হযরত কেবলার কদমবুছি করলাম এবং আমি তাঁর খেদমতে আরজ করলাম, হুজুর এ সময়ে কষ্ট করে আপনার আগমনের কারণ কি? আলা হযরত কেবলা এরশাদ করলেন আপনাদের কি খবর আছে? হযরত ধোকা শাহ সাহেব আপনাদের ঘরে দুনিয়া থেকে পর্দা করেছেন তথা ইন্তেকাল করেছেন। হাজী সাহেব বললেন নাতো। আমরা তো জানিনা। এ বলে হাজী সাহেব তৎক্ষনাত ঘরে গিয়ে দেখলেন সত্যিই হযরত ধোকা শাহ সাহেব ইন্তেকাল করেছেন। আল্লাহু আকবর! ইন্তেকাল করেছেন ধোকা শাহ্ সাহেব হাজী সাহেবের ঘরের মধ্যে এ ব্যাপারে ঘর ওয়ালারাও জানেন না। অথচ আলা হযরত কেবলা সওদাগরান মহল্লায় বসে সে জমানার কুতুব ইন্তেকাল করেছেন সে খবরও রেখেছেন। সুবহানাল্লাহ! ইহাইতো আল্লাহর অলিদের শান। যারা এক জায়গায় অবস্থান করে অন্য জায়গায় দেখেন ও খবর রাখেন।

আলা হযরত ২৬ দিন খাবার না খাওয়ার ঘটনা ঃ

একদা আলা হযরত কেবলা আউলিয়ায়ে কেরামের জীবনীর উপর লিখিত একটি কিতাব পড়লেন। যে কিতাবের মধ্যে আগের জমানার ইবাদতকারী ও কামেল অলিদের ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ ছিল। ঐ কিতাবের মধ্যে ঘটনার বিবরণ এ রকম ছিল যে, অমুক আবেদ এতদিন পর্যন্ত খাবার না খেয়ে আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করেছেন। অমুক অমুক অলিও এতদিন খাবার না খেয়ে আল্লাহ তায়ালার এবাদত করেছেন। ব্যস্ এতটুকু পড়ে আলা হযরত কেবলাও ঐ সময় থেকে খাবার খাওয়া বন্ধ করে দিলেন। তাঁর পরিবারের

সদস্যগণ এবং যে যে আত্মীয়-স্বজন, ভক্ত-অনুরক্তদের নিকট ঐ খবর পৌঁছল তাঁদের সকলের চিন্তা ও দুর্ভাবনা এ'মর্মে বেড়েগেল যে, কারণ কি? আলা হযরত কেবলা খাবার গ্রহণ করা ছেড়ে দিলেন কেন? পরিবারের সবাই, বন্ধু-বান্ধব, ভক্ত-অনুরক্ত, তাঁর খলিফারা ও ছাত্ররা অনেকবার তাঁর খেদমতে আরজ করলেন, হুজুর খাবার গ্রহণ করুন, কিন্তু আলা হযরত কেবলা উত্তরে বললেন, আপনারা খেয়ে নিন। ফকীর রোজা রেখেছে। সময় অতিবাহিত হচ্ছে, সকলের দূর্ভাবনাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিভাবে আলা হযরত কেবলাকে খাবার খাওয়ানো যায় এ চিন্তায় সকলেই অস্থির। আলা হযরত কেবলা যে ২৬ দিন খাবার না খেয়ে রইলেন ঐ ২৬ দিনের মধ্যে তিনি দিনে রোজা রাখতেন আর ইফতারের সময় কেবল কয়েক চুমুক পানি পান করে ইফতার করতেন। আর কোন খাবার খেতেন না এবং সেহেরীতে ও কয়েক চুমুক পানি পান করে রোজা রাখতেন। কথিত আছে যে, আলা হযরত কেবলা যে মাসে খাবার গ্রহণ ছেড়ে দিয়েছেন সে মাসটা ছিল আরবী রযব মাস। শত চেষ্টা করেও কেউ আলা হযরত কেবলার মুখে খাবার তুলে দিতে না পেরে আখের তাঁর কতিপয় ভক্ত-অনুরক্তরা আলা হযরতের পীরমুর্শিদের বাড়ী আস্তানায়ে আলীয়া মারেহারায়ে মুতাহারার সাজ্জাদনশীন পীরে তরীকত হযরত সৈয়্যদ মেহেদী মিয়াকে আলা হযরত কেবলার আহার ছেড়ে দেয়ার কথা বলার জন্য গেলেন, কিন্তু সে সময়ে সৈয়্যদ মেহেদী সাহেব কেবলা তাঁর হুজরা শরীফে ছিলেন না। সংবাদ বাহকরা তাঁকে না পেয়ে আলা হযরত কেবলার খলিফা শেরে বীশীয়া-ই- আহলে সুন্নাত হযরত মাওলানা শাহ মুহাম্মদ হেদায়ত রাসুল সাহেবকে এ ব্যাপারে জানাতে তাঁর দরবারে গেলেন। ভাগ্যক্রমে তাঁকেও তাঁর দরবারে না পেয়ে সংবাদ দাতারা তাঁকে এ সংবাদ দেয়ার দায়িত্ব তাঁর পরিবারের সদস্যদেরকে দিয়ে ব্রেলী শরীফের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেলেন। যখন হযরত হেদায়ত রাসুল ঘরে এসে এ সংবাদ পেলেন। তখন আর দেরী না করে সাথে সাথে ব্রেলী শরীফ যাওয়ার জন্য বের হলেন। মাগরিবের নামাজের পূর্বে তিনি ব্রেলী শরীফের সওদাগরান মহল্লায় এসে পৌঁছলেন। হযরত মওলানা হেদায়ত রাসুল ব্রেলী শরীফে পৌঁছার পর তাঁকে জানিয়ে দেয়া হল যে, আজ ২৬ দিন হয়ে গেছে আলা হযরত কেবলা কোন খাবার গ্রহণ করেননি। কিছু বুঝে আসতেছেনা, আলা হযরত কেবলা কেন খাবার গ্রহণ করতেছেন না। এ ঘটনা বুঝাতে বুঝাতে মাগরিবের নামাজের সময় হয়ে গেল। আজান হচ্ছে, লোকেরা মসজিদের দিকে চলতেছে। আলা হযরত কেবলা ও হুজরা শরীফ থেকে বের হয়ে মসজিদে গেলেন এবং মাগরিবের নামাজের ইমামতি করলেন। নামাজ শেষে মাওলানা হেদায়ত রাসুল সাহেব কিছু দূরে দাঁড়িয়ে ইমামে আহলে সুন্নাতকে সালাম দিলেন। আলা হযরত কেবলা সালামের উত্তর দিলেন। আর মাওলানা হেদায়ত রাসুল সাহেবকে সম্বোধন করে বললেন মাওলানা সাহেব কি ব্যাপার? আজ দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন কেন? আসুন করদমর্দন করি। এ বলে আলা হযরত কেবলা উপবেশন থেকে উঠে মাওলানা হেদায়ত রাসুলের দিকে এগিয়ে গেলেন। অন্য দিকে মাওলানা হেদায়ত রাসুল যে জায়গায় দাড়িয়ে ছিলেন ওখান থেকে পিছনে সরে গেলেন। আলা হযরত কেবলা তাঁকে বললেন কি ব্যাপার। আপনি

পিছনে সরে যাচ্ছেন কেন? তখন মাওলানা হেদায়ত রাসুল আরজ করলেন, হুজুর আমিতো শুধু মাত্র একটি কথা বলার জন্য এসেছি। আলা হযরত কেবলা এরশাদ করলেন বলুন- তখন মাওলানা হেদায়ত রাসুল আরজ করলেন, হুজুর আহলে সুন্নাতের পোষাক পরিধান করে ঘরে বসে থাকা আপনার উচিত। আলা হযরত কেবলা আশ্চর্য হয়ে বললেন, মাওলানা এরূপ বলতেছেন কেন? মাওলানা সাহেব আবেদন করলেন আহলে সুন্নাতের ইমাম যদি খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দেয় তাহলে তাঁর পার্থিব জীবনের নির্ভরতা কিভাবে করা যাবে? আলা হযরত কেবরা বললেন একটি কিতাব পড়ার সময় আগের যুগের আবেদীনদের অবস্থা আমার দৃষ্টি গোচর হয়েছিল। তাঁরা খাওয়া-দাওয়া ছাড়া আল্লাহর ইবাদত করতেন। আর আমিতো প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উম্মত। তাই আমিও খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিয়েছি। তবে প্রিয় নবীর দরবার থেকে আমাকে দেয়া হচ্ছে। মাওলানা সাহেব আরজ করলেন, হুজুর- আমার চোখেতো আপনি খাবার খাচ্ছেন তা দেখতেছিনা। আমি আপনার মেহমান, আর মেহমানের সাথে মেজবানের খাওয়াতো দরকার। আমার জিদ হলো যদি আপনি খাবার না খান তাহলে আজ থেকে আমিও খাবার খাবনা। আলা হযরত কেবলা মাওলানা হেদায়ত রাসুল সাহেবকে খুব সম্মান করতেন এবং তাঁর কথাকে খুব গুরুত্ব দিয়ে মানতেন। তাই আলা হযরত কেবলা তাঁর সাথে খানা খেতে রাজী হয়ে গেলেন। এ সংবাদ ঘরে পৌছলে তৎক্ষনাত মেহমান খানায় দস্তর খানা বিছানো হলো এবং দস্তরখানার উপর খাবার সাজানো হল, মাওলানা হেদায়ত রাসুল সাহেব হাত ধৌত করালেন। এভাবে দীর্ঘ ২৬ দিন পর আলা হযরত কেবলা মাওলানা হেদায়ত রাসুলের সাথে খাবার খেলেন। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর অলিরা এমনই হয়ে থাকেন যারা জাহেরীভাবে খাবার না খেলেও আল্লাহ ও রাসুল (জাল্লা ওয়ালা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর তরফ থেকে রূহানীভাবে তাদেরকে খাওয়ানো হয়।

আ'লা হযরত কেবলার অদৃশ্যের জ্ঞান ঃ

একদা আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা কিছু লিখতেছিলেন ঐ সময় আলা হযরত কেবলার একান্ত খাদেম হাজী কেফায়ত সাহেব সেখানে উপস্থিত হলেন। ইমাম আহমদ রেজা খান সাহেব কেবলা তাঁকে দেখে লেখা বন্ধ করে কাগজ-কলম রেখে দিলেন। হাজী সাহেব ইমামে ইশকো মুহাব্বতের খেদমতে আরজ করলেন; হুজুর আপনি কি লিখতেছিলেন? তখন হুজুর আলা হযরত কেবলা উক্ত কাগজ হাজী সাহেবকে দিলেন। হাজী সাহেব উক্ত কাগজে আলা হযরতের বড় সাহেবজাদা হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত হামেদ রেজা খানের নাম এভাবে লিখা পেলেন যে, এক লাইনের মধ্যে মুহাম্মদ ৯২ হিজরী আর দ্বিতীয় লাইনে হামেদ রেজা ১৩৬২ হিজরী, তৃতীয় লাইনে (আরবী হরফ আইন) আইন তার বরাবরে ৭০ অর্থাৎ এভাবে $\frac{৭০}{\text{আইন}}$ এবং চতুর্থ লাইনে মুহাম্মদ ৯২ হিজরী লিখা ছিল। হাজী সাহেব বলেন, আমার মনে হচ্ছিল আলা হযরত কেবলা আরো কিছু লিখতে চেয়েছিলেন। হাজী সাহেব মুজাদ্দেদে দ্বীনো মিল্লাতের খেদমতে আরজ করলেন, হুজুর এর মধ্যে কি লিখা

আছে। আলা হযরত উত্তর দিলেন পড়ে নিন। হাজী সাহেব পুনরায় আবেদন করলেন, হুজুর পড়েছি কিন্তু বুঝতে পারতেছি না। আলা হযরত কেবলা এরশাদ করলেন হামেদ মিয়া ও মুস্তফা মিয়ার নাম লিখা হয়েছে আর উহা থেকে সালও বের হয়। হাজী সাহেব আবারো আবেদন করলেন, হুজুর আরবী বর্ণমালার বিন্যাস প্রণালীর নিয়মানুসারে মুহাম্মদের সংখ্যা হল ৯২ হামেদ মিয়ার জন্ম সাল ও ১২৯২ হিজরী কিন্তু হামেদ রেজা থেকে কিভাবে সাল বের হয়? আর $\frac{৭০}{\text{আইন}}$ এর উদ্দেশ্য কি? তখন আলা হযরত কঠোর স্বরে বললেন সময় মতো বুঝে আসবে এবং আরো বললেন, হাজী সাহেব আম খেয়েছেন কিন্তু আম গাছের পাতার হিসাব করেননি। এরপর আলা হযরত কেবলা হাজী সাহেবের হাত থেকে উক্ত কাগজ নিয়ে নিলেন। যখন ১৩৬২ হিজরীতে আলা হযরতের বড় সাহেবজাদা হুজ্জাতুল ইসলাম মাওলানা আশ শেখ মুহাম্মদ হামেদ রেজা খান সাহেবের ইন্তেকাল হল তখন হাজী সাহেব মাশায়েখে কেরামের সামনে এ ঘটনা বর্ণনা করেন এবং বললেন আলা হযরত কেবলার লিখিত কাগজের মধ্যে হামেদ রেজা ১৩৬২ হিজরী লিখা ছিল আর এ সালও ১৩৬২ হিজরী কিন্তু হামেদ রেজার সংখ্যা তো আবজাদ হিসাব অনুসারে ১০৫৪ বের হয়। সে কাগজের মধ্যে আলা হযরত $\frac{৭০}{\text{আইন}}$ দ্বারা কি বুঝাতে চেয়েছিলেন। তখন আমার বুঝে আসেনি। কিন্তু এখন আমার সব বুঝে এসেছে। আলা হযরত কেবলা ১৩৬২ দ্বারা হামেদ রেজার ইন্তেকালের সাল লিখেছিলেন আর (আইন) দ্বারা ওমর তথা বয়স এবং ৭০ দ্বারা হামেদ রেজার বয়স ৭০ হবে তা বুঝায়েছেন।

আলেমকুল শিরমণি আল্লামা যাফরুদ্দীন বিহারী সাহেব নিরঙ্কুশ ভাবে যে হিসাব করেছেন সে অনুসারে হযরত হামেদ রেজা খানের পুরাপুরি সংখ্যা ১৩৬২ বের হয়েছে। তিনি বলেন খোদার কসম আমার আলা হযরত যা লিখেছেন তা সত্যই লিখেছেন। কারো বুঝে আসুক আর না আসুক উহা তারই অপরিপক্ষতা। অতএব, মুহাম্মদ থেকে জন্মসাল বের হয়। আর হামেদ রেজা থেকে ইন্তেকালের সংখ্যা বের হয় এবং আইন-৭০ দ্বারা ৭০ বছর বয়সের প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আমরা আল্লামা হামেদ রেজার বয়স হিসেব করলে জানতে পারি তিনি ৭০ বছর বয়স পেয়েছেন। আলা হযরত কেবলা চতুর্থ লাইনে তাজেদারে আহলে সুন্নাত হুজুর মুফতীয়ে আজম হিন্দ মুস্তফা রেজা খান সাহেবের জন্মসাল বের করেন। কেননা তিনি ১৮৯২ সালে জন্মগ্রহণ করেছেন। সুতরাং আলা হযরত কেবলা সবকিছু জানতেন, তাঁর বড় সাহেবজাদা কতবছর হায়াত পাবে কোন সালে ইন্তেকাল করবে। এরপর হাজী কেফায়ত উল্লাহ সাহেব বললেন আলা হযরত কেবলা যে সময় লিখতেছিলেন সে সময় যদি আমি তাঁর খেদমতে না পৌঁছতাম তাহলে তিনি আরো কিছু লিখতেন। আমার উপস্থিতির কারণে তিনি লেখা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। অর্থাৎ আলা হযরত কেবলা হযরত হামেদ রেজার ইন্তেকাল বয়স ইত্যাদি লিপিবদ্ধের পর হযরত মুফতীয়ে আজমের তারিখী নাম লিখেছেন। এরপর জানিনা তিনি আর কি কি লিখতেন। আল্লাহ

আকবর। প্রিয় নবীর গোলামদের অদৃশ্য জ্ঞানের যদি এ অবস্থা হয় তাহলে মাহবুব খোদার অদৃশ্য জ্ঞানের কি অবস্থা হতে পারে? নবী প্রেমিকেরা আপনারাই বলুন এবং চিন্তা করুন। আলা হযরত ছিলেন মুক্তির কান্ডারী প্রিয় রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের গোলাম। প্রিয় নবীর প্রিয় ব্যক্তি। তিনি নবীর গোলাম হয়ে যদি তাঁর বড় ছেলে হামেদ রেজা কতসালে ইন্তেকাল করবেন, কতবছর হায়াত পাবেন এ সব অদৃশ্য বিষয়ের উপর জ্ঞান রাখেন এবং বলতে পারেন। তাহলে প্রিয় নবীর এলমে গায়েবের কি শান হবে? অথচ আলা হযরতের প্রতি এ সবকিছু প্রিয় নবীর দরবারের গোলাম হিসাবে উপঢোকন। প্রিয় নবীর শানে গোস্তাখীকারীরা কোথায় যারা বলে বেড়ায় প্রিয় নবীর কাছে এলমে গায়েব নেই। এখন যারা প্রিয় নবীর এলমে গায়েবকে অস্বীকার কর তারা আস প্রিয় নবীর গোলাম আলা হযরতের এলমে গায়েব দেখ। আল্লাহ তায়ালা সবাইকে হেদায়ত করুন। অনুধাবন শক্তি প্রদান করুন। আমিন।

আলা হযরতের প্রেমাবেগের স্থান মজদুর শাহজাদার সম্মান ঃ

আলা হযরত আজীমুল বরকত শময়ে পরওয়ানায়ে রেসালত ইমামে এশকো মুহাব্বত শাহ ইমাম আমহদ রেজা খান এর এ ঈমান আফরোজ অলৌকিক ঘটনাটি কলমের অধিরাজ হযরত মাওলানা আলহাজ্ব আশ শাহ আরশাদুল কাদেরী আনচারী সাহেব বর্ণনা করেন। তিনি বলেন আলা হযরত কেবলার একজন অত্যাসক্ত ব্যক্তি একদা আলা হযরতকে ব্রেলী শরীফের এক মহল্লায় দাওয়াত করেন। কিন্তু বড়ই সম্মান ও সুশৃঙ্খলতার সাথে অলিন্দ ও অট্টালিকার দরজার সাজসজ্জা বাতিদ্বারা অলি-গলির উজ্জ্বলতা, যাত্রীদের জন্য রাস্তা-ঘাট পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা এবং দুর-দুরান্ত পর্যন্ত নানা রঙ্গের পতাকা দ্বারা এমনভাবে সজ্জিত করেছেন যা সত্যিই চিত্তচমৎকার,মনমুগ্ধকর, মনআকর্ষক, হৃদয়োম্মোদক। প্রতিটি পথ দর্শন করার পর উহার মনোরমতা উপভোগ করতেছে। আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজার আরোণের জন্য পাল্কীর ব্যবস্থা করা হয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ে পাল্কী আলা হযরত কেবলার হুজরা শরীফের দরজার সামনে নেয়া হল। আলা হযরতের লক্ষাধিক ভক্তরা তাঁকে এক নজর দেখার অপেক্ষায় রাস্তায় দাঁড়িয়ে রইলেন। এদিকে আলা হযরত অযু করার পর কাপড় পরিধান করে শিরে আমামা বেধে হুজরা শরীফ থেকে বের হলেন। তাঁর জ্যোতিময় চেহেরা থেকে ফজল ও খোদাভীতির কিরণ বিচ্ছুরিত হচ্ছে। চোখ-মুখে রাত জেগে এবাদত করার চিহ্ন পরিস্কারভাবে দেখা যাচ্ছে। বিশাল জনসমুদ্রের ভীড় থেকে অনেক কষ্টে পাল্কী পর্যন্ত পৌছলেন। অনেকে সুযোগমত তাঁর কদম মোবারক চুমু দেয়ার মর্যাদা হাসিল করেন। এরপর চারজন পাল্কী বাহক মজদুর নিজেদের কাঁদে পাল্কী উঠাল। পাল্কীর পিছনে ও ডানে বামে ভক্ত- অনুরক্তরা পায়ে হেটে চলছিল। পাল্কী বাহক মজদুরেরা পাল্কী নিয়ে কিছু দুর যেতে না যেতেই আলা হযরত কেবলা পাল্কীর ভিতর থেকে আওয়াজ দিলেন। পাল্কী থামাও! হুকুম মোতাবেক পাল্কী বাহকরা তাদের কাঁদ থেকে পাল্কী নামিয়ে নিচে রাখল। সাথে যারা যাচ্ছিল তারাও সমবেতভাবে সেখানে দাঁড়াল। আলা হযরত দুর্ভাবনাময় অবস্থায় পাল্কী থেকে বের হয়ে আসলেন। আর পাল্কী বাহক মজদুরদেরকে নিজের কাছে ডেকে সুন্দর ও বিনয়ী স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারদের মধ্যে সৈয়্যদজাদা তথা প্রিয়

নবীর আওলাদ কে আছেন? কারণ আমার ঈমানের অনুভূতি শক্তিতে আমি প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সুগন্ধি পাচ্ছি। পাল্কী বাহকরা সবাই চুপ করে রইলেন। কেউ স্বীকার করতে ছিলেন না। তখন আলা হযরত কেবলা বললেন, আপনাদের মধ্যে যিনি প্রিয় নবীর আওলাদ আমি তাঁকে তাঁর পিতামহ রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দোহাই দিয়ে বলতেছি। বের হয়ে আসুন এবং সত্য বলে স্বীকার করুন। আলা হযরত কেবলার প্রশ্নে হঠাৎ পাল্কী বাহক এক মজদুরের চেহেরার রং বিবর্ণ হয়ে গেল। চেহেরার উপর লজ্জা ও অনুতাপের সুক্ষ্ম মর্যাদাবোধের রেখা প্রকাশিত হয়ে গেল। কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর চক্ষু নীচু করে নম্র ভাষায় বললেন, মজদুরের প্রকৃতি জিজ্ঞেসিত হয় না। আপনি আমার জান্দে আলার দোহাই দিয়ে আমার জীবনের গোপন রহস্য ফাস করে দিয়েছেন। আমি প্রিয় নবীর ঐ বাগানের একটি ম্লানিত ফুল যার সুবাসে আপনার প্রাণের ঘ্রানিন্দ্রিয় সুরভিত সুবাসিত। রগের রক্ত পরিবর্তন হয়না। এ কারণে আমি নবীর আওলাদ ইহা অস্বীকার করছিনা। আমার জীবনের নাজুক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে ইহা বলতে লজ্জা লাগতেছে। তাঁর বক্তব্য এখনো শেষ হয়নি। লোকেরা এ প্রথম আশ্চর্যময় ঘটনা অবলোকন করতেছে যে, ইসলামী জগতের একজন সুপ্রসিদ্ধ ইমাম মুজাদ্দেদে ইসলাম আলা হযরত আপন পাগড়ি মোবারক মাথা থেকে খুলে মজদুর শাহজাদার কদমে রেখে দিলেন এবং আলা হযরত কাঁদতে লাগলেন এমন কান্না যা বুক পেটে যায়। তাঁর চোখের পানি চোখ থেকে টপকিয়ে দাঁড়ি মোবারকও বুক মোবারক ভিজে যাচ্ছিল। তিনি কেঁদে কেঁদে আবেদন করলেন, সম্মানিত শাহজাদা আপনি আমার গোস্তাখী ক্ষমা করে দিন। অজানা বশতঃ আমার ভূল হয়ে গেছে। হায়রে একি ঘটলো? যার পবিত্র জুতায় আমার সম্মানের মুকুট হওয়া উচিত তাঁরই কাঁদে আমি সওয়ার হয়ে গেলাম। ক্বিয়ামত দিবসে যদি রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাকে জিজ্ঞেস করে বলেন হে আহমদ রেজা আমার বংশের সন্তানের নরম কাঁদ কি এ জন্যই ছিল যে, তা তোমার আরোহণের বোঝা বহন করবে? তখন আমি প্রিয় নবীকে কি জবাব দেব। তখন হাশরের ময়দানে আমার কতই অবমাননার কারণ হবে। উপস্থিত দর্শকরা বর্ণনা করেন যে, সকলেই উম্মুক্ত চোখে আলা হযরতের প্রেমাবেগের হৃদয়োম্মোদক ঘটনা অবলোকন করতেছিল। শাহজাদা নিজ মুখে কয়েকবার ক্ষমা করে দিয়েছেন মর্মে স্বীকারোক্তি দেয়ার পরও আলা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত নিজের একটি ইচ্ছা পেশ করে আবেদন করলেন, সম্মানিত শাহজাদা এ অজানা বশতঃ হয়ে যাওয়া ভূলের কাফ্ফারা তখনই পরিশোধ হবে, যখন আপনি পাল্কীতে উঠে বসবেন আর আমি নিজ কাঁদে পাল্কীটি বহন করবো। এ অনুরোধ শুনে উপস্থিত সকলের হৃদয় ভেঙ্গে চুর্ণ-বিচুর্ণ হয়ে যাচ্ছিল। সকলের আঁখিতে অশ্রু ভাসছিল। সকলের কান্নার আওয়াজ মহাশূণ্যে উঠতেছিল। সকলের আবেগভরা বারণ ও শাহজাদার হাজার বার নিষেধের পরও শাহজাদাকে আলা হযরতের ইচ্ছা পুরণ করতে হলো। আহ! এ দৃশ্য কতইনা বিস্ময়কর, মর্মান্তিক হৃদয়গ্রাহী ছিল যখন আহলে সুন্নাতের মহা সম্মানিত সুপ্রসিদ্ধ ইমাম পাল্কী বাহক মজদুরের মধ্যে শামিল হয়ে খোদা প্রদত্ত ইলম, ফজল, বিশ্বব্যাপী সুপ্রসিদ্ধির, সুখ্যাতির সকল পদমর্যাদাকে মাহবুবে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষে

একজন নাম নিশানা শূন্য মজদুরের কদমে বিসর্জন করে দিলেন। প্রেমাবেগের আফরোজ দৃশ্য দেখে পাথর পর্যন্ত বিগলিত হচ্ছিল। দয়া শুন্য হৃদয়ে দয়া আসতেছিল। উদাসীনদের চোখ খুলে গেল। শত্রুদেরকেও মেনে নিতে হল যে, আলে রাসুলের প্রতি আলা হযরতের এ অকৃতিম প্রেম হলে খোদা রাসুলের প্রতি তাঁর প্রেম কতটুকু হতে পারে এর অনুমান কে করতে পারবে? আলহামদুলিল্লাহ। আলা হযরত পাল্কী বাহক মজদুর থেকে প্রিয় নবীর আওলাদের খুশবো পেয়ে তাঁকে সম্মান করে জগৎবাসীকে শিক্ষা দিলেন যে, নবী ও তাঁর আওলাদের প্রতি এশকো মুহাব্বত মুসলমানদের অন্তরে কতটুকু থাকতে হবে।

ট্রেন থেমে যাওয়ার আশ্চর্যজনক ঘটনা ঃ

খলিফায়ে মুফতীয়ে আজম হিন্দ হযরতুলহাজ্ব ক্বারী মুহাম্মদ আমানত রাসুল কাদেরী বারকাতী নূরী বর্ণনা করেন-একদা হযরত মুহাদ্দেস সুরুতীর দৌহিত্র হযরতুলহাজ্ব ফজলুস সামাদ শাহ মানা মিয়া সাহেব আমার গরিবালয়ে আসলেন এবং এরশাদ ফরমালেন আমানত তোমার পিতা হাজী হেদায়ত রাসুল ও আমি ১৩২৭ হিজরীতে একই দিনে জন্ম গ্রহণ করেছি। তোমার পিতার নাম হেদায়ত রাসুল কে রেখেছেন জান? তোমার পিতার জন্মের পর তোমার দাদা শ্রদ্ধাস্পদ জনাব নূর মুহাম্মদ সাহেব আমার দাদা হযরত মুহাদ্দেস সুরুতী সাহেবের খেদমতে আলীয়ায় উপস্থিত হলেন এবং তাঁর কাছে আবেদন করলেন হযরত এ বাচ্চার নাম রাখুন। (ঐ সময় হটাৎ) ঘটনাক্রমে আলা হযরত কেবলার খলিফা শেরে বীশীয়া-ই-আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ হেদায়ত রাসুল রামপুরী সাহেব ও আমার দাদার খেদমতে উপস্থিত হলেন আমার দাদা মুহাদ্দেস সুরুতী সাহেব খলিফায়ে আলা হযরতকে বললেন, নূর মুহাম্মদ সাহেব আমাদের এখানকার বাসিন্দা। হযরত আপনিই তাঁর ছেলের নাম রাখুন। খলিফায়ে আলা হযরত মুহাদ্দেস সুরুতী সাহেবের খেদমতে আবেদন করলেন হযরত আপনিই এর নাম রাখুন এদিকে তিনি আমার দাদাকে আর আমার দাদা তাঁকে নাম রাখার জন্য অনুরোধ করতে লাগলেন। অবশেষে আল্লামা রামপুরী সাহেব বললেন ঠিক আছে মুহাদ্দেস সাহেব যখন হুকুম করেছেন আমি তাঁর হুকুম পালনার্থে নাম রাখতেছি। তিনি নিজেকে ফকীর বলে বললেন আমি ফকীরের নাম হল হেদায়ত রাসুল সুতরাং এ বাচ্চার নামও হেদায়ত রাসুল রাখুন। এরপর তোমার পিতার নাম হেদায়ত রাসুল রাখা হল। ক্বারী আমানত রাসুল বলেন আমি হযরত মানা মিয়া সাহেবের খেদমতে আরজ করে একটা কথা জানতে চাইলাম, তা হল হযরত আপনি মাওলানা হেদায়ত রাসুল সাহেবকে শেরে বীশীয়া-ই- আহলে সুন্নাত বলেছেন। অথচ আমি শুনতেছি হযরত আল্লামা মাওলানা আলহাজ্ব আশ শাহ মুহাম্মদ হাশমত আলী খান সাহেবের উপাধি হল শেরে বীশীয়া-ই- আহলে সুন্নাত। তখন হযরত মানা মিয়া সাহেব আমাকে বললেন বৎস! শাহ হেদায়ত রাসুল রামপুরী সাহেবকে তো স্বয়ং আলা হযরত কেবলা একটি সমাবেশে বিশাল সমুদ্রে তাকরীর করার সময় শেরে বীশীয়া-ই-আহলে সুন্নাত উপাধিতে ভূষিত করেছেন। আর মাওলানা হাশমত আলী সাহেব তো আলা হযরত কেবলা (রাদিয়াল্লাহু আনহু)র ইন্তে-কালের পর ঐ উপাধি পেয়েছেন।

অতঃপর হযরত ফজলুস সামাদ মানা মিয়া সাহেব তাঁর নাম ফজলুস সামাদ রাখল। আলা হযরত কেবলা তাঁকে বায়'য়াত করার কথা বলতে গিয়ে আলা হযরত কেবলার এ আজীমুশশান কারামত ট্রেন থেমে যাওয়ার ঘটনাটি বর্ণনা করেন। তিনি বলেন আমার ছত্রীতে তথা আমার জন্মের ষষ্ট দিবসে সামাজিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে আলা হযরত কেবলা ফীলীভেতে আমাদের বাড়ীতে তাশরীফ আনলেন। আমার দাদা মুহাদ্দেস সুরুতী সাহেব আমি ছয়দিনের কোলের শিশুকে নিয়ে আলা হযরত কেবলার দস্তপাকে দিলেন এবং আবেদন করলেন, হযরত এ বাচ্চার নাম রাখুন। আলা হযরত কেবলা এরশাদ করলেন হযরত মাওলানা ফজলুর রহমানের সাথে এ বাচ্চার সম্পর্ক রয়েছে (অর্থাৎ এ বাচ্চার আম্মাজন হামিদা খাতুন হলেন হযরত ফজলে রহমান গঞ্জে মুরাদাবাদীর দৌহিত্রী) সুতরাং এ সম্বন্ধের কারণে আমি ফকীর তার নাম ফজলুস সামাদ রাখতেছি। নাম রাখার পর্ব সমাপনের পর আমার দাদা মুহাদ্দেস সাহেব পূনরায় আলা হযরত কেবলার খেদমতে আরজ করলেন, হুজুর এ বাচ্চাকে আপনি মুরীদ করে নিন। আলা হযরত কেবলা আমার দাদাকে বললেন, না। আপনি মুরীদ করে নিন। কিন্তু আমার দাদা বারবার অনুরোধ করে বললেন, হুজুর আপনিই মুরীদ করে নিন। অবশেষে আলা হযরত কেবলা আমাকে মুরীদ করে নিলেন।

হযরত ফজলুস সামাদ মানা মিয়া সাহেব নিজেই আলা হযরত কেবলার অনেক কারামত বর্ণনা করেন। আলা হযরত কেবলার এ আজীমুশশান কারামতটি বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, ১৩৩৭ হিজরীতে আমার বয়স যখন দশ বছর হয়েছিল তখন আলা হযরত কেবলা আমাদের বাড়ীতে তাশরীফ আনলেন। তিনি আমাদের বাড়ীতে অবস্থানের পর পূনরায় ব্রেলী শরীফ চলে যাওয়ার জন্য ষ্টেশনে গেলেন। ট্রেন প্রস্তুত ছিল, অগ্রীম টিকেটও নেয়া হয়েছিল। ট্রেন ছাড়ার মুহূর্তে মাগরিবের নামাজের ওয়াক্ত হয়ে গেল। আলা হযরত কেবলা যখন মাগরিবের নামাজ আদায় করার প্রস্তুতি নিলেন, তখন উপস্থিত মানুষদের কেউ হুজুরের খেদমতে আরজ করলেন হুজুর মাগরিবের নামাজ পড়তে গেলে ট্রেন চলে যাবে। আলা হযরত কেবলা বললেন যদি ট্রেন চলে যায় তাহলে যাক। এখন আমি মাগরিবের নামাজ পড়ব। আর ইনশা আল্লাহ তায়ালা আমি ফকীর ছাড়া ট্রেন যাবে না। এদিকে আলা হযরত কেবলা মাগরিবের নামাজ পড়তে শুরু করলেন। অন্যদিকে ট্রেন ছেড়ে দিল। যখন তিনি ফরজ আদায় করার পর সালাম ফিরালেন তখন ট্রেন ছেড়েদিয়ে কতদুর গেছে তার কোন পাত্তা ছিল না। আলা হযরত কেবলা সুন্নাত নফল ইত্যাদি আদায়ের পর অযিফা পড়তে শুরু করলেন। কয়েক মিনিট পর দেখা গেল অনেক মানুষসহ রেলওয়ে ষ্টেশনের কর্মচারীবৃন্দ ও অফিসারগণ আলা হযরতের দিকে আসতেছেন যখন তারা আলা হযরত কেবলার নিকট আসলেন তখন আলা হযরত কেবলার খাদেমরা জিজ্ঞাসা করলেন কী ব্যাপার? আপনারা সবাই কি সমস্যা নিয়ে এসেছেন। তারা উত্তরে বললেন কিছুক্ষণ পূর্বে যে ট্রেনটি ষ্টেশন ছেড়ে চলে গিয়েছিল সে ট্রেনটি সামনে একটি সেতুর উপর গিয়ে থেমে গেছে। এখন ট্রেনটি সামনেও যাচ্ছে না আর পিছনেও আসতেছে না। রাস্তাও বন্ধ হয়ে গেছে। সেতুর দুনো দিকে ট্রাফিকও থেমে গেছে। ট্রেনটি চেক করে দেখলাম

ইঞ্জিনের মধ্যে কোন প্রকার সমস্যা দেখা গেলনা লোকেরা বলেছেন, ব্রেলী শরীফের একজন অনেক বড় বুযুর্গ ষ্টেশনে নামাজ পড়তেছেন, তিনিই ট্রেন আটকিয়ে দিয়েছেন। তারা বিনয়ী-স্বরে আবেদন করলেন, হুজুর আপনি আমাদের ভূল মাফ করে দেন। আলা হযরত কেবলার রাগ এসে গেল। তিনি বললেন যদি কারো শক্তি থাকে তাহলে ট্রেন চালিয়ে দেখান। ট্রেনটি এ ফকীর থামায়নি বরং এ ফকীর যে আল্লাহর নামাজ পড়তেছেন সে অংশীদারবিহীন একক আল্লাহ তায়ালাই ট্রেন থামিয়ে দিয়েছেন। ষ্টেশনের অফিসারগণ আলা হযরতের পা মোবারক আকড়ে ধরে কেঁদে কেঁদে বললেন হুজুর! এখন আপনি আমাদের ভূল ক্ষমা করে দিন। তখন আলা হযরত কেবলা নূরানী জবানে এরশাদ করলেন যান-আল্লাহর ইচ্ছাই ট্রেন চলবে। ট্রেনকে ষ্টেশনে ফেরৎ নিয়ে আসুন। চালক ও অন্যান্যরা ট্রেনে চলে গেল এবং ট্রেনকে সামনের দিকে চালাতে চাইলেন কিন্তু ট্রেন সামনের দিকে চলেনি। যখন পিছনের দিকে চালালেন তখন ট্রেনটি পিছনের দিকে চলতে শুরু করল। তাই তারা ট্রেনটিকে পিছনের দিকে চালিয়ে পুনরায় ষ্টেশনে নিয়ে আসলেন। আলা হযরত কেবলা ট্রেনে আরোহণ করার পর ট্রেনটি ব্রেলী শরীফের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেল এবং সামনের দিকে যেতে আর কোনো বাঁধা রইল না। সুবাহানাল্লাহ! আলা হযরত কেবলা আধ্যাত্মিক জগতের এমন একজন প্রাণ পুরুষ ছিলেন যখন তাঁর নূরী জবান দিয়ে যা বের হত তখনই তা কাজে পরিণত হত।

অংক শাস্ত্রের ব্যাপারে এক আশ্চর্যজনক ঘটনা ঃ

আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ডঃ স্যার জিয়া উদ্দীন সাহেব যিনি হিন্দুস্থান ব্যতীত অন্যান্য দেশে বিশেষ করে ইউরোপে শিক্ষার্জন করেন। অংক শাস্ত্রে চরমোৎকর্ষ লাভ করেছিলেন। হিন্দুস্থানের মধ্যে যথেষ্ট পরিচিত ছিলেন। আর উপমহাদেশের প্রথম সারির অংক শাস্ত্রবিদদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। ঘটনাক্রমে তিনি গণিতের একটি মাসয়ালার ব্যাপারে সমস্যায় পড়েন। শত প্রচেষ্টার পরও সমাধান পেলেন না। যেহেতু তিনি জ্ঞান আহরণে খুবই উদগ্রীব ছিলেন। তাই তিনি জার্মানে গিয়ে এ অংকের সমাধান করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

হযরতুল আল্লামা সৈয়্যদ সোলায়মান আশরাফ সাহেব ক্বাদেরী রেজভী তখন আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বীনিয়াত বিভাগের প্রধান ছিলেন। তিনি আলা হযরত কেবলার মুরীদও খলিফা ছিলেন। ডঃ স্যার জিয়া উদ্দীন সাহেব সৈয়্যদ মাওলানা সোলায়মান আশরাফ সাহেবের কাছে বিষয়টি আলোচনা করলেন, আর জার্মান যাওয়ার কথাও বললেন। সৈয়্যদ সোলায়মান আশরাফ সাহেব ডক্টর সাহেবকে পরামর্শ দিলেন এবং বারবার জোর দিচ্ছিলেন ডক্টর সাহেব আপনি কষ্ট করে জার্মান যাবার পরিবর্তে এখান থেকে মাত্র কয়েক ঘন্টা সফর করে ব্রেলী শরীফে গিয়ে ইমামে আহলে সুন্নাত হযরত মাওলানা আহমদ রেজার কাছে গিয়ে তাঁর থেকে এ মাসয়ালার সমাধান নিয়ে আসুন। ডক্টর সাহেব অবাক হয়ে বললেন-মাওলানা সাহেব আপনি একি বলতেছেন আমি কোথা থেকে শিক্ষা অর্জন করেছি আপনিতো ভাল করে জানেন আর আমি উক্ত অংকের সমাধান করতে পারতেছিনা। অথচ আপনি এমন একজন মাওলানার কথা বলতেছেন, যিনি অন্যান্য দেশে

গিয়ে শিক্ষার্জন করাতো দুরের কথা নিজ দেশের কলেজের মুখও দেখেনি। না বাবা আমি ব্রেলী শরীফে গিয়ে আমার সময় নষ্ট করতে পারব না।

কয়েকদিন পর মাওলানা সোলায়মান সাহেব ডক্টর সাহেবকে চিন্তাগ্রস্থ দেকে পুনরায় ব্রেলী শরীফ যাওয়ার পরামর্শ দিলেন। ডঃ সাহেব একই উত্তর দিলেন এবং ইউরোপ যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন।

মাওলানা সোলায়মান সাহেব ডক্টর সাহেবকে আবার অনুরোধ করলেন। এতে ডক্টর সাহেব ক্ষুদ্ধ হয়ে গেলেন এবং বললেন মাওলানা সাহেব বিবেক বলতে একটি বিষয় আছে। আপনি আমাকে কি বলতেছেন? মাওলানা সাহেব বললেন ডক্টর সাহেব না হয় আপনার সামান্য সময় নষ্ট হবে। আপনি আমার পরামর্শ মত একবার গিয়ে দেখুন না তাতে খুব বেশী ক্ষতি হবে না। আপনি যে সফরে যাচ্ছেন সে সফরের তুলনায় এটি তো সামান্য মাত্র কয়েকঘন্টার ব্যাপার। ঠিক আছে আপনার ইচ্ছা হলে আসুন। শেষ পর্যন্ত ডক্টর সাহেব সম্মত হলেন ব্রেলী শরীফ যাওয়ার জন্য এবং মাওলানা সাহেবকে সাথে নিয়ে ব্রেলী শরীফ গেলেন। ডক্টর সাহেব এশিয়া বিখ্যাত গণিতবিদ হয়েও যে মাসয়ালা সমাধান করতে পারেননি, সে মাসায়ালা সমাধানের জন্য একজন অলির দরবারে গেলেন।

ডক্টর সাহেব আলা হযরত কেবলার দরবারে হাজির হলেন-আলা হযরত কেবলার শারীরিক অবস্থা তখন ভাল ছিল না। ডক্টর সাহেব আলা হযরত কেবলার খেদমতে আরজ করলেন মাওলানা সাহেব আমার মাসয়ালাটি খুবই জটিল। একবারে জিজ্ঞাসা করার মতো নয়। একটু শান্তিময় পরিবেশ পেলে আরজ করবো। আলা হযরত কেবলা এরশাদ করলেন আপনি বলুন, ডক্টর সাহেব মাসয়ালা পেশ করলেন মাসয়ালা শুনে আলা হযরত কেবলা তাৎক্ষনিকভাবে সেটার সমাধান বলে দিলেন। উত্তর শুনে ডক্টর সাহেব অবাক হয়ে গেলেন এবং বিস্মিত কণ্ঠে বললেন- এ যাবত ইলমে লাদুনীর (খোদাপ্রদত্ত জ্ঞানের) কথা শুনে আসতেছিলাম। কিন্তু আজ বাস্তবে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করলাম। অথচ আমি এ মাসায়ালা সমাধানের জন্য জার্মান যাচ্ছিলাম। কিন্তু মাওলানা সোলায়মান আশরাফ সাহেব আমাকে এখানে নিয়ে এসে বড়ই এহসান করেছেন।

এরপর আলা হযরত কেবলা তাঁর স্বহস্তে লিখিত একটি পুস্তিকা তলব করে আনালেন। তাতে অধিকাংশ ত্রিভূজ ও বৃত্তই অঙ্কিত (জ্যামিতির সমাধান) ছিলো। এগুলো দেখে ভাইস চ্যান্সেলর সাহেব আরো আশ্চর্য হয়ে গেলেন। পরিশেষে বললেন আমিতো এ জ্ঞান অর্জনের জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সফর করেছি। অনেক টাকা পয়সা খরচ করেছি। ইউরোপের শিক্ষকমন্ডলীর জুতা সোজা করেছি যার ফলে সামান্য কিছু শিখেছি। আর এ বিষয়গুলো কোথাও পাইনি। আর এ বিষয়ে আপনার জ্ঞানের সামনে আমিতো নিছক একজন মক্তবের শিশুই।

এরপর ডক্টর সাহেব আলা হযরত কেবলার খেদমতে আরজ করলেন হুজুর আপনি বলবেন, এ বিষয়ে আপনার শিক্ষক কে?

আলা হযরত কেবলা এরশাদ করলেন কোন শিক্ষক নেই। আমার সম্মানিত পিতার নিকট থেকে যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ এ চারটি নিয়ম শিখেছি মাত্র এ'জন্য যে,

ত্যাজ্য সম্পত্তির হিসাব নিকাশ করার প্রয়োজন হয়। আর গণিতের অন্যান্য নিয়ম শিখার জন্য মাত্র আরম্ভ করেছিলাম। তখন আমার সম্মানিত পিতা আমাকে বললেন কেন সময় নষ্ট করছো।? রাসুলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এর দরবার থেকে এ জ্ঞান এমনিতেই তোমাকে শিখিয়ে দেয়া হবে। সুতরাং এ যা কিছু আপনি দেখছেন সবই রাসুল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) সদকা।

ভাইস চ্যান্সেলর সাহেবের উপর আলা হযরত কেবলার জ্ঞানগত মহত্ত্বও চরিত্র মাধুর্যের এমন প্রভাব পড়েছিল যে, তিনি তখন থেকে নামাজ ও রোজা যথাযথভাবে পালন করতে লাগলেন আর চেহেরায় দাঁড়ি রেখে দিলেন। সুবহানাল্লাহ। এটাইতো আল্লাহর অলিদের শান যাদের দরবারে গেলে তকদীর পরিবর্তন হয়ে যায়।

আল্লাহ ওয়ালারাই আল্লাহর নুর দ্বারা দেখেন ঃ

সৈয়্যদুত তায়েফা ইমামুত তরীকত্ব সুলতানুল আউলিয়া হযরত সৈয়্যদেনা জুনাইদ বাগদাদী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর জমানায় ইরাকের জমীনে একজন খ্রীষ্টান বসবাস করত। একদিন সে নিজ গলায় পৈতা পরিধান করলো আর উহার উপর মুসলমানের পোষাক পরিধান করে ঐ সময়ের বড় বড় আউলিয়ায়ে কেরামের বারেগাহে পৌছেন আর যার যার সুখ্যাতি শুনেছেন তাঁদের সবার খানকায় হাজির হয়েছেন হাজির হয়ে বলেছেন আমি একটি হাদীসের উদ্দেশ্য বুঝার জন্য এসেছি। হাদীস শরীফে আছে রাসুলে পাক এরশাদ করেছেন যে-

اتقوا فراسة المومن فانه ينظر من نور الله

"ইত্তাকু ফিরাশাতাল মোমেনে ফাইন্নাহু ইয়ানজুরু মিন নূরীল্লাহ"

উহার উদ্দেশ্য কি? যে জায়গায় গিয়েছি সবখানে এ জবাব পেয়েছি যে, মোমিনদের অর্ন্তদৃষ্টিকে ভয় করো এ জন্য যে, তাঁরা আল্লাহর নূর দ্বারা দেখেন। সকলে তারজুমা করে দিয়েছেন। সে বললেন, তারজুমা তো আমিও করতে পারি যেখানে গিয়েছি সেখানে এ জবাবই পেয়েছি। সব জায়গায় ঘুরে ফিরে পরিশেষে সৈয়্যদুনা জুনাইদ বাগদাদী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর দরবারে পৌছেঁ তাঁর খেদমতে আরজ করেছি আমি একটি হাদীসের উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করার জন্য এসেছি। হযরত সৈয়্যদুনা জুনাইদ বাগদাদী বললেন জিজ্ঞাসা করুন। তখন সে বললেন হাদীসের মধ্যে এসেছে-

اتقوا فراسة المومن فانه ينظر من نور الله

"ইত্তাকু ফিরাশাতাল মোমেনে ফাইন্নাহু ইয়ানজুরু মিন নূরীল্লাহ"

এ হাদীসের উদ্দেশ্য কি? ইহা শুনে হযরত জুনাইদ বাগদাদী মুসকি হেসে বললেন, এ হাদীসের উদ্দেশ্য হলো তুমি তোমার গলা থেকে পৈতা খুলে ফেল কুফুরী ছেড়ে দাও এবং কলমা পড়ে মুসলমান হয়ে যায়। খ্রীষ্টান লোকটি যখন এ কথা শুনলেন তৎক্ষনাত বলে উঠলেন-

اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله

"আশহাদু আন লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াশহাদুআন্না মুহাম্মদান আবদুহু ওয়ারাসুলুহু" অর্থ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন প্রভু নেই আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়

মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসুল। এরপর লোকটি হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর খেদমদে আরজ করলেন, হুজুর আমাকে এ কথা বলুন যে, আমি বড় বড় খানেকা ও মাদরাসা সমূহে গিয়ে এ হাদীসের উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করেছি কিন্তু সকলেই উহার অর্থ করে দিয়েছেন। তাঁরা আমার সম্পর্কে জানেনি কেন? তখন হযরত জুনাইদ বাগদাদী বললেন, তুমি যেখানে যেখানে গিয়েছ সকলই জানত যে, তুমি মুসলমান নও। তবে যে নূর দ্বারা তাঁর ইহা দেখল যে, তুমি মুসলমান নও। ঐ নূর দ্বারা তাঁরা এটাও অবলোকন করলো যে, তোমার মুসলমান হওয়াটাতো জুনাইদ বাগদাদীর হাতেই রয়েছে তাই তারা খেয়াল করল মাঝখানে আমরা গোলমাল করব কেন। সুবহানাল্লাহ। এটা ছিল হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাদিয়াল্লাহুর শান।

এখন আলা হযরত কেবলার শানের কথা পর্যালোচনা করছি। একদা আলা হযরত কেবলা মসজিদ থেকে আপন বরকতময় ঘরে তাশরীফ নিচ্ছিলেন, এমন সময় এক ব্যক্তি বহুদুর থেকে সফর করে হুজুরের খেদমতে উপস্থিত হলেন আর আরজ করলেন, হুজুর- একটি মাসয়ালা জানার জন্য এসেছি। আলা হযরত কেবলা এরশাদ ফরমালেন বর্ণনা করুন। লোকটি আরজ করলেন, হুজুর আরামে তাশরীফ ফরমালে পেশ করব। হুজুর এরশাদ করলেন বর্ণনা করুন। তখন লোকটি আরজ করলেন হুজুর অযুর মধ্যে ফরজ হল চারটি যথা-কনুই পর্যন্ত হাত ধোয়া, মাথায় চুল গজাবার স্থান থেকে চিবুকের নীচে পর্যন্ত মুখ ধোয়া, চার ভাগের একভাগ মাথা মাছেহ করা, গোড়ালী পর্যন্ত পা ধোয়া। এগুলোর পূর্বে হাত ধোয়া, কুলি করা, নাকে পানি দেয়া এটার কারণ কি? আমি এ পর্যন্ত অনেক ওলামায়ে কেরামের নিকট গিয়েছি কিন্তু তারা প্রত্যেকেই এর জবাব দিয়েছেন যে, ইহা সুন্নাত। এটাতো আমিও জানি যে, ইহা সুন্নাত। আলা হযরত কেবলা এরশাদ ফরমালেন ওলামায়ে কেরামগণ এ মাসয়ালা জেনে শুনে মনোযোগ দেননি। আর তা জটিল কিছু নয়। লোকটি আবেদন করলেন হুজুর আপনি খোলাসা করে দেন। আলা হযরত কেবলা এরশাদ ফরমালেন, অযু কি দ্বারা হয়? আরজ করলেন পানি দ্বারা। এরশাদ ফরমালেন পানির শর্ত হল তিনটি যথা-১. রং ২. গন্ধ ৩. স্বাদ, অযুর ফরজ আদায় করার পূর্বে প্রথমে হাত ধোয়ার হেকমত হলো পানির রং টিক আছে কিনা দেখা। তারপর কুলি করার হেকমত হল পানির স্বাদ টিক আছে কিনা তা যাচাই করা। এরপর নাকে পানি দেয়ার কারণ হল পানির গন্ধ টিক আছে কিনা তা জেনে নেয়া। এ তিনটি সুন্নাত আদায় করার মধ্য দিয়ে যখন জানা হয়ে গেল যে, পানির তিনটি গুন ঠিক আছে। তখন ফরজ আদায় করা হয়। উল্লেখিত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয়ে গেল যে, আল্লাহর মকবুল বান্দারা মোমেন হয়ে থাকেন। হাদীস শরীফে বর্ণিত নূরে খোদা দ্বারা তাঁরা সব কিছু দেখেন। তাদের সামনে প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য এক। অতঃপর অনায়াশে বলা যায় যে, খোদ শাহেনশাহে আলম নুরে মুজাচ্ছাম সৈয়্যদে আকরাম রাসুলে মুকাররাম মাহবুবে রাব্বে আজম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যার ছদকায় এ আল্লাহ ওয়ালাদের এ বিস্তৃত নজর অর্জিত হয়েছে। তাঁর কাছে কায়েনাতের সবকিছু কিভাবে লুকায়িত থাকতে পারে। এ জন্য তো আলা হযরত কেবলা এরশাদ ফরমালেন-

سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر
ملکوت وملک میں کوئی شی نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں

"ছরে আরশ পর হ্যাঁ তেরে গুজর দিলে ফরশ পর হ্যাঁয় তেরে নজর
মালাকুত ওয়া মুলক মে কুয়ি শাই নেহি ওহ জু তুজ পে আয়া নেহি"

অর্থ-ইয়া রাসুলাল্লাহ আপনার অতিক্রম আরশের উপর আর ফরশের উপর আপনার আন্তরিক নজর। ফেরেস্তা জগত ও সার্বভৌমত্তে এমন কোন বস্তু নেই যা আপনার কাছে অপ্রকাশ্য।

আম খান পাতা গণনার প্রয়োজন নেই ঃ

হযরত হাজী কেফায়েত উল্লাহ সাহেব বর্ণনা করেন যে, আলা হযরত কেবলা বেনারস তাশরীফ নিয়েছেন। একদিন এক জায়গায় দুপুরের খাবারের দাওয়াত ছিল আমিও সাথে ছিলাম। দাওয়াত খেয়ে ফিরে আসার সময় আলা হযরত কেবলার সাথে শুধু আমিই ছিলাম আর কেউ ছিলনা। আমরা ঘোড়ার গাড়ী যোগে আসতেছিলাম। আলা হযরত কেবলা টাঙ্গা ওয়ালাকে বললেন এ পথ দিয়ে অমুক মন্দিরের সামনে দিয়ে যান। আমি অবাক হয়ে গেলাম এ জন্য যে, আলা হযরত কেবলা ইতিপূর্বে বেনারসে কবে তাশরীফ এনেছেন। এ রাস্তা কিভাবে ছিনেছেন? এ মন্দিরের নাম কখন শুনেছেন? আমি এ চিন্তায় বিমগ্ন ছিলেন এরই মধ্যে টাঙ্গা মন্দিরের সামনে এসে পৌঁছল। আমি দেখলাম মন্দির থেকে একজন সাধু (হিন্দু ধর্মের সাধুর মত ব্যক্তি) বের হলেন আর ঘোড়ার গাড়ীর দিকে দৌড়ে আসতেছেন আলা হযরত কেবলা ঘোড়ার গাড়ী থামালেন। সাধু লোকটি ভদ্রতার সাথে আলা হযরত কেবলাকে সালাম করলেন। আর কিছু কানে কানে কথা বললেন, যা আমার জানার বাহিরে ছিল। অনন্তর দেখলাম সাধু লোকটি মন্দিরে চলে গেল। এ দিকে টাঙ্গা চলতে লাগল। আমি বিনয়ের সাথে আবেদন করলাম এ লোকটা কে? তিনি এরশাদ ফরমালেন লোকটি এ সময়ের আবদাল। আমি পুনরায় আরজ করলাম মন্দিরের মধ্যে? তখন আলা হযরত কেবলা এরশাদ ফরমালেন হাজী সাহেব আম খেয়ে যান, পাতা গণনার দরকার নেই। অর্থাৎ এ ব্যাপারে দেখে যান রহস্য জানার দরকার কি? সুবহানাল্লাহ। এটাইতো আল্লাহর অলিদের শান যারা একে অপরকে চিনে। যাদের কতেক লোকচোখে অন্য বেশ ধারণ করে চলাফেরা করে যেমনটি ঐ সাধু ব্যক্তিটি একজন সে যুগের আবদাল হওয়া সত্ত্বেও মন্দিরে থাকে। যাদের শান সাধারণ মানুষ বুঝে না।

মেঝ সাহেবজাদীকে ইন্তেকালের সুসংবাদ ঃ

১৩৩৯ হিজরীতে রমজানুল মোবারক আলা হযরত কেবলা ভাওয়ালী শরীফ তাশরীফ ফরমালেন আর মেঝ সাহেবজাদী সাহেবা মরহুমা চিকিৎসার উদ্দেশ্যে নিনী তালে মুক্কীম ছিলেন। তিনি প্রায় তিন বছর ধরে অসুস্থ্য। তাঁর রোগ এতো মারাত্মক আকার ধারন করেছিল যে, বারবার চিকিৎসার পর জীবনের আশা থেকে নৈরাশ হয়ে পড়েছেন, ধরতে গেলে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা নড়তেছে। যখন আলা হযরত কেবলা ঈদের নামাজ পড়ানোর জন্য নিনীতালে তাশরীফ নিলেন তখন তাঁর মেঝ সাহেবজাদী পিতার সাথে দেখা করার

জন্য এসে তাঁর রোগের কথা ও মারাত্মক অসুস্থতার ধরণ বর্ণনা করলেন। আলা হযরত কেবলা তাঁর মেয়ের সব কথা শুনলেন। তারপর চলে যাওয়ার সময় এরশাদ করলেন ইনশাআল্লাহ্ আমি তোমার দাগ দেখবো না। অর্থাৎ আমি সন্তানহারা চোট দেখবো না। অথচ তিনি তথা আলা হযরতের মেঝ মেয়ে অধিকতর অসুস্থ ছিলেন। আর তিনি আলা হযরত কেবলা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ওফাত শরীফের পর মাত্র ২৭ দিন জীবিত ছিলেন। রবিউল আউয়াল শরীফের ২৩ তারিখ ১৩৪০ হিজরীতে ইহলোক ত্যাগ করে পরকালে চলে যান। ইন্না লিল্লাহে ওয়াইন্না ইলাহে রাজেউন। সুবহানাল্লাহে আজ্জা ওয়াজাল্লা আলা হযরত কেবলা কত বড় আল্লাহর মকবুল অলি ছিলেন। যার মেঝ সাহেবজাদী সাহেবা মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা নড়ছিলেন এবং জীবনের আশা ছেড়ে দিয়ে সম্মানিত পিতা আলা হযরত কেবলার খেদমতে আরজ করলেন। আলা হযরত কেবলা তাঁকে জানায়ে দিলেন যে, তুমিতো ইন্তেকাল করবে কিন্তু তোমাকে হারানোর দাগ আমি দেখবো না অর্থাৎ তোমার আগে আমি ইন্তেকাল করবো।

<u>না আমার প্লেগ রোগ হয়েছে না হবে ঃ</u>

হুজুর নবীয়ে করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এর অমীয় বাণীর উপর আলা হযরত কেবলার কতটুকু বিশ্বাস ছিল তা খোদ আলা হযরত কেবলার নূরানী জবান থেকে শুনুন-

আলা হযরত কেবলা এরশাদ করলেন-এক ব্যক্তি আমাকে বার বার চেষ্টা করে দাওয়াত দিলেন ঐ দিনে জনাব সৈয়্যদ হাবিব উল্লাহ্ দামেস্কী সাহেব আমার নিবাসে মেহমান ছিলেন তাকেও দাওয়াত দেয়া হল। তিনি আমার সাথে ঐ ব্যক্তির ঘরে তাশরীফ নিলেন। ঐ ঘরে পৌঁছে আমার নজরে পড়ল কয়েকজন মানুষ বড় গোস্তের কাবাব আর হালোয়া ও পুরী তৈরী করছেন। আর ইহাই ছিল দাওয়াতের সামান। সৈয়্যদ সাহেব আমাকে বললেন আপনি বড় মাংস খাওয়ার অভ্যস্থ নন আর এখানে উহা ছাড়া আর কোন কাবার ও তৈরী হতে দেখিনি। সুতরাং আমি সমোচিত মনে করতেছি যে, ছাহেবে দাওয়াতকে ডেকে এ কথা বলা হোক যে, আপনি বড় গোস্তের আদী নন। আলা হযরত কেবলা বললেন, আমি সৈয়্যদ সাহেবকে বললাম, আমি অভ্যস্ত নয় তাতে কোন অসুবিধা নেই ব্যস ঐ পুরী ও কাবাব চলবে। ইহা ঐ সময়ের ঘটনা যখন ব্রেলীর মধ্যে প্লেগ রোগের প্রভাব বেশী পড়েছিল। এ দিকে আমিও সৈয়্যদ সাহেব দাওয়াত খেয়ে ছাহেবে দাওয়াত থেকে বিদায় নিয়ে আমার ঘরে পৌঁছতে না পৌঁছতেই আমার দাঁতের মাড়ি ফুলে গেল। আর কণ্ঠনালী ও মুখ পুরাপুরি বন্ধ হয়ে গেল। জ্বরও বেশী ছিল। আর কানের পিছনে ফোঁড়া উঠে গেল। খাবার খেতে এতো অসুবিধা হলো যে, কোন মতে একটু দুধ পান করে উহার উপর নিজের জন্য যথেষ্ট মনে করতাম। কথা মোটেও বলতে পারছিলাম না। এমনকি নামাজ পড়ার সময় জোরে ক্বেরাত পড়াও কষ্টকর হয়ে পড়লো। প্রয়োজনে কারো সাথে কোন কথা বলতে হলে লিখে দিতাম। আমার মৃত মেঝো ভাই একজন ডাক্তার আনলেন। ডাক্তার সাহেব ভাল করে দেখে সাত-আট বার বললেন- ইহা উহাই, ইহা উহাই, ইহা উহাই, অর্থাৎ প্লেগ রোগ। আমি মোটেও কথা বলতে পারছিলাম না এ কারণে তাকে কোন উত্তর দিতে পারিনি। অথচ আমি

খুব ভালো করে জানি যে, ডাক্তার সাহেব ভূল বলতেছেন। না আমার প্লেগ রোগ হয়েছে না ইনশা আল্লাহ্‌ল আজিজ হবে। এ কারণে যে, আমি প্লেগ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিকে দেখে ঐ দোয়া পড়েছি যা হুজুর সরওয়ারে আলম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ফরমায়েছেন। যে ব্যক্তি কোন বিপদ গ্রস্থ লোককে দেখে এ দোয়া পড়বে সে ঐ বিপদ থেকে নিরাপদ থাকবে। ঐ দোয়াটি হল

الحمد لله الذى عافانى من ابتلاك به وفضلنى على كثير ممن خلق تفضيلا-

"আল হামদু লিল্লাহিল লাজি আফানি মিম্মা ইবতালাকা বিহি ওয়াফাদ্দালানি আলা কাছিরিম মিমমান খালাকা তাফদিলা"

যে যে রোগের রোগিকে যে যে বিপদে নিমজ্জিত ব্যক্তিদেরকে দেখে আমি এ দোয়া পড়েছি, আলহামদুলিল্লাহ আজ পর্যন্ত ঐ সব রোগও বিপদ থেকে আমি নিরাপদ রয়েছি। আর আল্লাহর সাহায্যে সর্বদা নিরাপদ থাকবো। প্রিয় নবীর হাদীসে পাকের উপর আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। যার ফলে আমি জোর কণ্ঠে বললাম যে, আমার কখনো প্লেগ রোগ হবে না। শেষ রাত্রে ব্যকুলতা বেড়ে গেল। আমি মনে মনে আল্লাহর দরবারে আরজ করলাম- "আল্লাহুম্মা ছাদ্দিকীল হাবিবা ওয়া কাজ্জিবিততাবিবা" অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি তোমার হাবীবকে সত্যায়িত করো আর ডাক্তার কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করো।

এরপর কেউ আমার ডান কানে মুখ রেখে বললেন মিসওয়াক ও কালো মরিচ। আমার অসুখে মানুষেরা পালা ক্রমে রাত জেগে থাকতো। ঐ সময় যে ব্যক্তি রাত জেগেছিল, আমি তাকে ইশারায় ডাকলাম আর তাকে ইশারা করে বললাম মিসওয়াক ও কালো মরিচ আনতে। সে মিসওয়াক বুঝে নিলো গোল মরিচ কিভাবে বুঝবে অনেক চিন্তা করার পর বুঝে নিল। যখন সে দুনোটি জিনিস আনলো তখন আমি মিসওয়াকের সাহায্যে আস্তে আস্তে সামান্য করে মুখ খুললাম আর দাঁতের উপর মিসওয়াক রেখে ছেড়ে দিলাম যা দাতঁ বন্ধ হয়ে দবায়ে নিলো। মিহি করা মরিচ ঐ পন্থায় দাঁতের মাড়ি পর্যন্ত পৌছালাম। কিছুক্ষণ কর একটি কুলি আসলো যা নিখাঁদ রক্তের ছিলো। কিন্তু কোন কষ্ট অনুভব হলোনা। এরপর আর একটি রক্তের কুলি আসলো। আর বেহামদিল্লাহে তায়ালা ঐ গলাগন্ড চলে গেল। মুখ খুলে গেলো। তারপর আমি আল্লাহ তায়ালার শোকরিয়া আদায় করলাম আর ডাক্তার সাহেবের কাছে খবর পৌঁছালাম যে, আপনার ঐ প্লেগ রোগ আল্লাহর বিশেষ অনুকম্পায় চলে গেলো।

চোখের ব্যথা চলে গেলো ঃ

আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা ফাযেলে ব্রেলভী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বেশী বেশী কিতাব অনুশীলন করতেন। একদা বেশী কিতাব অনুশীলনের কারণে তাঁর চোখ মোবারকে ব্যথা এসে গেলো। সে সময়ের একজন বড় ডাক্তার যার নাম ছিল ইন্ডরসন সে আলা হযরত কেবলাকে ভাল করে দেখে বললেন, বেশী কিতাব দেখার কারণে চোখের মধ্যে শুস্কতা এসেগেছে। সুতরাং আপনি পনের দিন পর্যন্ত কোন কিতাব দেখবেন না। আলা হযরত কেবলা লিখতেছেন-

আমি ডাক্তারের কথায় কান দিলাম না। আর একজন চোখের রোগীকে দেখে হাদীসে বর্ণিত ঐ দোয়াই পড়ে আপন মাহবুব ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এর এরশাদে পাকে আস্তাবান হয়ে গেলাম।

১৩১৬ হিজরীতে আরেকজন ডাক্তারের সামনে আলোচনাকালে সে বলল চার বছরের মধ্যে চোখের পানি নামবে। প্রিয় নবীর হাদীসে পাকের উপর আমার এতটুকু ভরসাও কি ছিল না যে, আমি ডাক্তারের কথায় মায়াজাল্লাহ দোদুল্যমান হবো। আলহামদু লিল্লাহ। ত্রিশ বছরেরও অধিক হয়েছে। না আমি কিতাব কম দেখেছি না কম দেখবো। এ কথা আমি এজন্য বর্ণনা করতেছি যে, রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের স্থায়ী মো'জেজা রয়েছে যা আজ অবধি চোখে অবলোকন করতেছি। আর কিয়ামত পর্যন্ত ঈমানদারেরা দেখতে থাকবে। সুবহানাল্লাহ! হাদীসে রাসুলের উপর দৃঢ় বিশ্বাসের কারণে বিনা অসুধে আলা হযরত কেবলার চোখের ব্যথা ভাল হয়ে গেল।

আশরফী মিয়া ও আলা হযরত কেবলার কাশ্‌ফ ঃ

হযরত আমানত রাসুল রেজভী বর্ণনা করেন, শাহজাদায়ে আলা হযরত হুজ্জাতুল ইসলাম মাওলানা হামেদ রেজা খান ব্রেলভীর মেয়ের স্বামী মাখদুমী হযরত আল্লামা মাওলানা আলহ্বাজ্ব আশ্ শাহ্ তাকাদ্দুস আলী খান সাহেব পাকিস্তানী জিদামাজদুহু ১৪০০ হিজরীতে হারামাইনে শরীফাইনে দ্বিতীয় বার হাজেরী দেয়ার সময় আমার সফর সঙ্গী ছিলেন। সাথে আমার ভাই হাফেজ মুহাম্মদ এনায়ত রাসুল সাহেব ও ছিলেন। তিনি মদীনায়ে তায়্যেবায় বলেন, হযরত মাওলানা শাহ সৈয়্যদ আলী হোছাইন আশরাফী মিয়া কুছুছী সাহেব যিনি হুজুর সর্কারে গাউছে আজম দস্তগীর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর আওলাদ ছিলেন। তিনি অধিকাংশ সময় ব্রেলী শরীফে আলা হযরত কেবলার সাথে দেখা করার জন্য তাশরীফ আনতেন। আলা হযরত কেবলা উনার আর উনি আলা হযরত কেবলার অনেক সম্মান করতেন। একে অপরের হাত মোবারকে চুমু দিতেন। আলা হযরত কেবলা যে আসনে বসতেন সে আসনে আর কাউকে বসাতেন না। কিন্তু একবার আমার উপস্থিতিতে হুজুর আশরফী মিয়া আলা হযরত কেবলার সাথে সাক্ষাত করার উদ্দেশ্যে ব্রেলী শরীফে আলা হযরত কেবলার বরকতময় নিবাসে তাশরীফ আনলেন তখন আমি দেখলাম আলা হযরত কেবলা যে আসনে তাশরীফ ফরমান সে আসনে হুজুর আশরফী মিয়া কেবলাকে বসায়েছেন। হুজুর আশরফী মিয়ারই ঘটনা তিনি যে ট্রেনে করে সফর করতেন এবং ঐ ট্রেন যদি ব্রেলী শরীফ দিয়ে অতিক্রম করতো তাহলে তিনি ট্রেনের মধ্যে দাঁড়ায়ে যেতেন। একবার ট্রেনে সফর করার সময় ব্রেলী শরীফ দিয়ে যাচ্ছিলেন সে সময় তাঁর সফর সঙ্গী হিসাবে তাঁর কিছু বন্ধুও ছিলেন। তাঁর অভ্যাস মোতাবেক তিনি ট্রেনের মধ্যে দাঁড়ায়ে গেলেন। তাঁর বন্ধুরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন হুজুর আপনি দাঁড়ায়লেন কেন? তখন তিনি উত্তর দিলেন কুতুবুল এরশাদ মাওলানা শাহ আহমদ রেজা খাঁন সাহেব স্বীয় বরকতময় নিবাসে আপন আসনে এ আলে রাসুলের তাজীমের জন্য দাঁড়ায়েছেন। তিনি আমার সম্মান প্রদর্শনার্থে দাঁড়ায়েছেন তাই আমি নায়েবে রাসুল আলা হযরত কেবলার তাজীমার্থে ট্রেনের মধ্যে দাঁড়িয়েছি। সুবহানাল্লাহ! এটাই আল্লাহর অলিদের শান যারা এক স্থানে অবস্থান করে

অপর স্থান দেখেন, খবর রাখেন। উল্লেখ্য যে, হুজুর আশরফী মিয়া সম্পর্কের দিক দিয়ে আলা হযরত কেবলার পীর ভাইও ছিলেন। অর্থাৎ হযরত আশরাফী মিয়া আলা হযরত কেবলার পীর ও মুর্শিদ ইমামুল আউলিয়া মাওলানা সৈয়্যদ শাহ্ আলে রাসুল মারেহারভী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর খলিফা ছিলেন। তিনি এমন খলীফা ছিলেন যার পরে আর কোন খলিফা হয়নি। অর্থাৎ তিনি হলেন খাতেমুল খোলাফা।

সৈয়্যদজাদার হুশ আসা ঃ

আলা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত মুজাদ্দেদে দ্বীন ও মিল্লাত শাহ আহমদ রেজা খাঁন ফাযেলে ব্রেলভী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সুপ্রতিষ্ঠিত সুন্নী দ্বীনি এদারা মনজারুল ইসলাম। যার মধ্যে বিভিন্ন দেশের অগণিত ছাত্র লেখা-পড়া করত। আওলাদে রাসুল সৈয়্যদ কানাআত আলী শাহ সাহেব ও সেখানের শিক্ষার্থী ছিলেন। তিনি খুব কোমল মনের মানুষ ছিলেন। একদা একজন রোগীর বিপজ্জনক অপারেশনের বিস্তারিত বিবরণ শুনে তিনি মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়লেন এবং বেহুশ হয়ে গেলেন। অনেক সেবা যত্ন করা সত্ত্বেও তাঁর হুশ ফিরে আসলোনা। এ ব্যাপারে আলা হযরত কেবলার দরবারে দরখাস্ত পেশ করা হলো। তিনি সৈয়্যদজাদার মাথার পাশে তাশরীফ আনলেন এবং অত্যন্ত স্নেহভরে তাঁর মাথা আপন কোলে নিলেন। আর স্বীয় রুমাল মোবারকটি তাঁর চেহেরার উপর মুড়িয়ে দিলেন। আলা হযরত কেবলা আপন রুমাল তাঁর চেহেরায় মুছে দেওয়ার সাথে সাথে তিনি জ্ঞান ফিরে পেলেন। চক্ষুদ্বয় খুললেন যুগ শ্রেষ্ঠ অলির কোলে নিজের মাথা দেখে খুশীতে আত্মহারা হয়ে গেলেন। সম্মানের জন্য উঠে দাঁড়াতে চাইলেন। কিন্তু দুর্বলতার কারণে উঠতে পারলেন না। দুর্বলতার কারণে শরীর দ্বারা না হলেও অন্ততঃপক্ষে মাথার ইশারায় এমন ভঙ্গি প্রদর্শন করলেন যে, তা দেখে মুনিব দয়াপরবশ হয়ে গেলেন। যার ফলে রোগীর অবস্থা যখন একেবারেই খারাপ হয়ে গেলো তখনই আলা হযরতের কৃপায় তার অবস্থা ভাল হয়ে গেলো।

গোলাম মহিউদ্দীনের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করা ঃ

ফখরে খান্দানে শে'রীয়া নবীরায়ে হযরত শাহজী মিয়া হযরত মাওলানা ক্বারী আলহাজ্ব গোলাম মহিউদ্দীন খান সাহেব এ ঘটনাটি বর্ণনা করেন- তিনি বলেন আমার পরম শ্রদ্ধেয় পিতা হযরত মুহাম্মদ শের খান সাহেবের ভাতিজা হযরত আলহাজ্ব মাওলানা শাহজী গোলাম জিলানী খান সাহেব কিছু মাসয়ালা জানার জন্য ব্রেলী শরীফে আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা খাঁন এর খেদমতে উপস্থিত হলেন। হযরত মাওলানা আবদুল বসির সাহেবও সাথে ছিলেন, আর আমিও আমার পিতার সাথে গেলাম। তখন আমার বয়স হলো মাত্র ১১ বছর। আমার সম্পূর্ণ স্বরণ আছে যে, হযরত কেবলা ফাটক বিশিষ্ট কক্ষের উপরের কামরায় আমাদেরকে বিশ্রাম করার ব্যবস্থা করে দিলেন। আমার পিতা আলা হযরত কেবলাকে কিছু প্রশ্ন করলেন, আলা হযরত কেবলা তৎক্ষনাত প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রদান করলেন। তারপর আমার পিতা ব্রেলী শরীফ পরিত্যাগের অনুমতি চাইলেন। আলা হযরত কেবলা বললেন আজকে নয় আগামী কাল যাবেন। সে'দিন আমাদেরকে আলা হযরত কেবলার ঘরে থাকতে হল। সন্ধ্যায় বিভিন্ন রকমের খাবারের ব্যবস্থা হল। তৎমধ্যে রাজকীয় এক প্রকার

খাবার ছিল (যাকে শাহী টুকরা বলা হয়)। গোলাম মহিউদ্দীন খান বর্ণনা করেন যখন আমি শাহী টুকরা খেলাম তখন আমার কাছে অনেক সুস্বাধু লাগল। তাই আমার মন চাইল যে, যদি আর একটি শাহী টুকরা পেতাম তাহলে আরো মজা হত। এদিকে আমি মনে মনে শাহী টুকরার কথা স্বরণ করতেছিলাম অন্যদিকে আলা হযরত তাঁর সম্মুখ ভাগ থেকে শাহী টুকরা উঠায়ে আমার দিকে দিলেন এবং হুকুম দিলেন ঘরের ভিতর থেকে আরো কিছু শাহী টুকরা নিয়ে আস। আমার শ্রদ্ধেয় আব্বা আবেদন করলেন হুজুর এ বাচ্চা মিষ্টি জাতীয় খাবার খুব কম খায়। সে এতবেশী খেতে পারবে না। তাই তাকে এর বেশী দেবেন না। তার প্রতি উত্তরে আলা হযরত কেবলা বললেন গোলাম মহিউদ্দীনের মন চাচ্ছে খেতে তাই তাকে খেতে দিন। এরপর তিনি আমাকে আরেক টুকরা দিয়ে বললেন, বৎস খুব ভাল করে মিষ্টি খাও। ক্বারী গোলাম মহি উদ্দীন বলতেছেন আলা হযরত কেবলার দরবারে আমার প্রথম হাজিরা ছিল। এ সময় আলা হযরত কেবলার দুটি কারামত প্রকাশিত হল। এক আলা হযরত কেবলা আমার মনের কথা জেনে তা পুর্ণ করলেন। দ্বিতীয় তিনি আমার নাম কি তা জানতে চাননি এবং আমার নাম কি তা তাঁকে বলেও দেয়া হয়নি এরপরও তিনি আমার নাম ধরে বললেন মহিউদ্দীনের মন চাচ্ছে। অতঃপর আমার পিতা আরজ করলেন হুজুর এ ছেলের জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য দোয়া করুন। আলা হযরত কেবলা বললেন এ বাচ্চা ভাল আলেম ও ক্বারী হবেন। ইহা ছিল আলা হযরত ক্বেবলার আর একটি কারামত। যা ১৩৪২ হিজরীতে প্রকাশিত হল। আলা হযরত কেবলার ওফাতের ২ বৎসর পর জামেয়া রেজভীয়া মানজারুল ইসলামে আমার দস্তারবন্ধী হল এবং ১৩৪২ হিজরীতে সনদ পেলাম। আমার সাথে শেরে বীশীয়া-ই-আহলে সুন্নাত জনাব মাওলানা হাশমত আলী ও মুহাদ্দেস মাওলানা এহছান আলীও দস্তারে ফজিলত লাভ করলেন। এরপর আমি যখন ঘরে গেলাম তখন আমার পিতা আমার কাছে জানতে চাইলেন যে, হে গোলাম মহি উদ্দীন সত্যি করে বলতো তুমি আলা হযরতের দরবারে খানা খাওয়ার সময় মনে মনে কি চিন্তা করেছিলে আমি উত্তরে বললাম আজ পর্যন্তও আমি এ ধরনের সুস্বাধু খাবার খাইনি। তাই আমি মনে মনে খেয়াল করলাম আহ্! যদি আমি আরেক টুকরা পেতাম তা হলে খুব খুশী হতাম। আমার পিতা আমার মুখ থেকে এ কথা শুনে অবাক হলেন এবং অনেকক্ষন পর্যন্ত কান্না করতে লাগলেন, আর বললেন- মানুষেরা আলা হযরত কেবলাকে কি মনে করে? তিনি তো একজন প্রথম শ্রেণীর অলিয়ে কামেল।

নাস্তা করে যান ট্রেন পাবেন ঃ

আলা হযরত শাহ ইমাম আহমদ রেজা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর খলিফা হযরত মাওলানা শাহ মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান মিরীঠি সাহেব বর্ণনা করেন যে, আমি একবার ব্রেলী শরীফ থেকে ফজরের নামাজের পর মিরীঠ যাওয়ার সংকল্প করলাম। ষ্টেশনে যাওয়ার জন্য ভাড়ার গাড়ী টিক করে উহাতে মালপত্র রাখলাম। সালাম করে ও অনুমতি নেওয়ার উদ্দেশ্যে আলা হযরত কেবলার খেদমতে উপস্থিত হলাম, আলা হযরত কেবলা আমার সালামের উত্তর প্রদানের পর বললেন নাস্তা করে যান। ইনশাল্লাহ ট্রেন পাবেন এদিকে আমার অস্থিরতা বেড়ে গেল এ কারণে যে, ট্রেন ছেড়ে দেওয়ার সময় একেবারে ঘনিয়ে

আসতেছে। কিন্তু কিছু করার উপায় নেই। কারণ পীর মুর্শিদের হুকুমতো মানতেই হবে। অতঃপর আমি হুজুরের খেদমতে বসলাম। কিছুক্ষণ পর নাস্তা আনা হল আমি নাস্তা খেয়ে ভাড়ার গাড়ীতে উঠে ষ্টেশনের উদ্দেশ্য রওয়ানা হয়ে গেলাম। যদিও ট্রেন ছেড়ে দেওয়ার সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে। তবুও আমার মনে সান্তনা ছিল এ কারণে যেহেতু আলা হযরত কেবলা ট্রেন পাব বলে ইশারা দিয়ে আমাকে আশ্বস্ত করেছেন। ভাড়ার গাড়ী যখন আমাকে ষ্টেশনে পৌছাল তখন কুলি গাড়ী থেকে মালামাল নামানোর পর বললেন হুজুর ট্রেন চলেগেছে প্রায় আধ ঘন্টা হয়ে গেলো আপনি দেরী করলেন কেন? তিনি বললেন আমি কারো দিকে ভ্রক্ষেপ না করে সোজা আমার পীরভাই সহকারী ষ্টেশন মাষ্টারের কার্যালয়ে গিয়ে বসলাম এবং তাকে বললাম আলা হযরত কেবলা আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, আমি ঐ ট্রেনই পাব, যা আধ ঘন্টা আগে ছেড়ে দিয়েছে সুতরাং আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমি ঐ ট্রেন পাব। আমি তার সাথে কথোপকথন করতেছিলাম ইতিমধ্যে ফোনের মাধ্যমে জানানো হল ট্রেনটির ইঞ্জিন নষ্ট হয়ে গেছে, তাই উক্ত ট্রেনটি পুনরায় ব্রেলী শরীফ আনা হচ্ছে। এ সংবাদ পেয়ে আমি খুব খুশী হলাম এ কারণে যে, আলা হযরত কেবলার নুরানী জবানে যে আশ্বাস দিয়েছিলেন তা সত্য হতে যাচ্ছে। ট্রেনটি ব্রেলী শরীফে পুনরায় আসল এবং কিছুক্ষণ ট্রেনটির ইঞ্জিন মেরামত করার পর আবার রওয়ানা হয়ে গেল। আর আমি খুশি মনে আরোহণ করে শান্তিপূর্ণভাবে মিরীঠে পৌঁছলাম। আল্লাহ্ আকবর। আলা হযরত কেবলা এমন অলিয়ে কামেল ছিলেন যাঁর নূরানী জবানে যখন যা বের হত আল্লাহ্ পাক তখন তা বাস্তবে পরিণত করতেন। এটাইতো আল্লাহর অলিদের শান। তাঁদের জবান দিয়ে যখন যা বের হয় তা সত্যিকারভাবে প্রমাণিত হয়।

মুজাদ্দেদে আজমের প্রতি অজগর সাপের সম্মান ঃ

একবার আলা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত ফীলীভেতে তাশরীফ নিলেন এবং হুজুর মুহাদ্দেসে সুরুতী আল্লামা মাওলানা আশ শাহ অসী আহমদ আলাইহে রিদুয়ানুস সামাদ এর ঘরে মেহমান হিসাবে তাশরীফ আনলেন। এরপর আলা হযরত কেবলা হযরত মুহাদ্দেস সুরুতী সাহেবকে বললেন-আমাকে সু-সংবাদ দেয়া হয়েছে কলিমুল্লা অলি প্রকাশ দাদা মিয়ার মাজারে যেতে। তিনি আমাকে বলেছেন তাঁর মাজারে পাকে তাশরীফ নিতে। এ ঘটনাটি ঐ সময় ঘটেছিল যখন হযরত মাওলানা হাকীম হাবিবুর রহমান ফীলীবেতী সাহেব হযরত মাওলানা আবদুল হক সাহেব হযমরত মাওলানা শাহ আবু সিরাজ সাহেব, হযরত মাওলানা আবদুল হক শামসী সাহেব এবং শাহজাদায়ে মুহাদ্দেস সুরুতী হযরত মাওলানা আবদুল আহাদ সহ আরো অনেক স্বনামধন্য ছাত্ররা মুহাদ্দেসী সুরুতী সাহেবের মাদরাসায় হাদীস বিভাগে অধ্যয়ন করত। আলা হযরত কেবলার সাথে হযরত মুহাদ্দেস সুরুতী সাহেব ও তাঁর মাদরাসার স্বনামধন্য ছাত্ররা সবাই সহযাত্রী হয়ে হযরত কলিমুল্লা শাহ প্রকাশ দাদা মিয়া (রাহমাতুল্লাহে আলাই) এর মাজারে তাশরীফ নিয়ে গেলেন। তারা যখন মাজার শরীফের নিকট পৌছলেন তখন দেখতে পেলেন দাদা মিয়ার মাজার শরীফের প্রবেশদ্বার খোলা এবং চৌকাঠের মধ্যভাগে একটি বড় অজগর সাপ শুয়ে রয়েছে। আলা হযরত কেবলা যখন মাজার শরীফের কাছে পৌছলেন তখন সে অজগর সাপটি মাজারের

ভিতরে চলে গেল। আলা হযরত কেবলাও মাজারের ভিতরে তাশরীফ নিলেন। হযরত মুহাদ্দেস সুরুতী ও অন্যান্যরা মাজারের ভিতর প্রবেশ করতে চাইলেন। কিন্তু মাজার শরীফের দরজা নিজে নিজে বন্ধ হয়ে গেল। হযরত মুহাদ্দেস সুরুতী সাহেব ও অন্যান্যরা মাজারে প্রবেশ করতে না পেরে মাজারের বাহিরে অবস্থান করলেন। এখন আলা হযরত ও অজগর সাপ মাজারের ভিতর রয়েছেন। মাজারের বাহিরে হযরত মুহাদ্দেস সুরুতী সাহেব ও ছাত্ররা এ ঘটনা দেখে চিন্তান্নিত হলেন। প্রায় ২ ঘন্টা পর হঠাৎ মাজার শরীফের দরজা খুলে গেল এবং আলা হযরত কেবলা মাজার শরীফ থেকে হাস্যোজ্জ্বল চেহেরায় তাশরীফ আনলেন। বের হয়ে তিনি এরশাদ ফরমালেন এখন থেকে ঐ অজগর সাপ আর দেখা যাবে না। আর এ মাজার শরীফে যিনি আরাম করতেছেন তিনি নক্শবন্ধী সিলসিলার সাথে সম্পৃক্ত। তিনি ফীলীভেত শহরের সুলতানুল আউলিয়া তথা এ শহরের অলিদের সর্দার এ মহান অলিয়ে কামেল আমার সাথে স্বশরীরে স্বাক্ষাৎ করেছেন এবং আমার সাথে আলাপ আলোচনা করেছেন। আলা হযরত কেবলার এ অলৌকিক ঘটনা স্বচক্ষে অবলোকন করে স্বনামধন্য অনলবর্ষী বক্তা শাহজাদায়ে মুহাদ্দেস সুরুতী হযরত আবদুল আহাদ সাহেব নবীরায়ে শাহজী মিয়া হযরত মাওলানা শাহ হাবিবুর রহমান সাহেব (প্রিন্সিপ্যাল আস্তানায়ে শেরিয়া মাদরাসা) শাহী জামে মসজিদের খতিব মাওলানা আবদুল ওয়াহাব সহ আরো অনেকে সে সময়ের কুতুব আরেফ বিল্লাহ সুলতানুল আউলিয়া হযরত শাহ কলিমুল্লাহ প্রকাশ দাদা মিয়া (রাহমাতুল্লাহে আলাইর) নূরানী মাজার পাকে আলা হযরত কেবলার হাত মোবারকে বায়'য়াত হয়ে কাদেরীয়া সিলসিলায় প্রবেশ করলেন। উল্লেখ্য যে, এ ঘটনার পর থেকে মাজারের প্রবেশদ্বারে যে অজগর সাপ থাকত সে অজগরকে আর কোন দিন দেখা যায় নি। জনসাধারণ এরপর থেকে মাজারে পাকে হাজিরা দিয়ে ছাহেবে মাজার থেকে ফুয়ুজো বরকত হাছেল করতে থাকেন। অথচ ঐ ঘটনার পুর্বে মাজারের প্রবেশদ্বারে যে অজগর সাপটি বসে থাকত সাপের কারণে কোন মানুষ মাজারের নিকট যেতে পারত না। মানুষেরা মাজারে পাকের অনেক দুরে অবস্থান করে যিয়ারত করত।

আলা হযরত কেবলার মাধ্যমে ভয়সলপুরের হযরত গাজী কামাল শাহ (আলাহির রাহমার পরিচিতি) ঃ

যথাসম্ভব ১৩২০ হিজরী হুজুর আলা হযরত কেবলা ভয়সলপূরে হযরত মাওলানা এরফান আলী সাহেবের ঘরে তাশরীফ নিলেন। তিনি মাওলানা এরফান আলী সাহেবকে বললেন এ বস্তীতে কী কোন আল্লাহর অলির মাজার শরীফ আছে? মাওলানা সাহেব আরজ করলেন এখানে কোন প্রসিদ্ধ মাজার আমার নজরে পড়েনি। আলা হযরত কেবলা বললেন আমার কাছে আল্লাহর অলির খুশবো আসতেছে। আমি তাঁর মাজারে ফাতেহা পাঠ করতে যাব। তখন মাওলানা এরফান আলী সাহেব আরজ করলেন হুজুর এ বস্তির এক পাশে একটি কবর রয়েছে, জঙ্গলী এলাকা, উহাতে জরাঝীর্ণ একটি প্রাসাদ রয়েছে যার মধ্যে ঐ কবরটি আছে। আলা হযরত কেবলা ফরমালেন চলুন তিনি ঐ নাম নিশানা শুন্য মাজারে তাশরীফ নিয়ে গেলেন এবং ঐ চার দেয়াল বিশিষ্ট কক্ষে প্রবেশ করার পর দরজা বন্ধ করে দিলেন। আলা হযরত কেবলা প্রায় পৌণে এক ঘন্টা পর্যন্ত মাজার শরীফের ভিতরে অবস্থান

করলেন। অনেক মানুষের সমাগম ছিল যারা স্ব-চক্ষে দেখতেছেন বিশেষত হযরত মাওলানা এরফান আলী সাহেব বর্ণনা করেন যে, আলা হযরত কেবলা যখন মাজারের ভিতরে প্রবেশ করলেন তখন মনে হচ্ছিল যেন দু' ব্যক্তি পরস্পরে কথোপকথন করতেছেন এবং এক অলি আরেক অলির সাথে সাক্ষাত করেছেন। তারা কি কি কথা বলেছেন কোন কোন রহস্য উদঘাটন করেছেন তা কারো জানা ছিলনা। তবে যখন আলা হযরত কেবলা মাজার শরীফ থেকে বাহিরে তাশরীফ আনলেন তখন তার চেহেরা মোবারকে আলো জলমল করছিল। তিনি ভীতি প্রদর্শন পূর্বক আওয়াজে বললেন ভয়সলপুরের বাসিন্দারা আপনারা এতদিন অন্ধকারে ছিলেন। মাজারে যিনি আরাম করতেছেন তিনি আল্লাহ তায়ালার ক্ষমতাবান অলি। তিনি গাজী ছিলেন। সরোয়ারদী সিলসিলার ছিলেন। তাঁর বংশ কবিলায়ে আনসারের সাথে সম্পৃক্ত। গাজী কামাল শাহ্ হল তাঁর নাম। তিনি চিরকুমার ছিলেন। আপনাদের উপর অপরিহার্য্য উনার থেকে ফয়জো বরকত হাছিল করা এবং উনার মাজার শরীফকে সুন্দরভাবে নির্মাণ করা।

আলা হযরত কেবলা ছাহেবে মাজারের পরিচয় প্রদানের পর থেকে লোকেরা তাঁর মাজার শরীফে দলে দলে যিয়ারতের উদ্দেশ্যে গমন করে তাঁর থেকে ফয়জো বরকত হাছিল করতে লাগল। আর কিছু দিনের মধ্যে ঐ বন অঞ্চল বাগানে পরিণত হল।

রামপুরের নবাব সাহেবের স্ত্রীর মৃত্যুবরণের ভবিষ্যৎবাণী ঃ

১৩২৮ হিজরীতে এক বিস্ময়কর কাহিনী সম্মুকে আসল। ঘটনার বিবরণ হল একদা রামপুরের নবাব সাহেবের স্ত্রী অসুস্থ হয়ে পড়ল। সে ছিল শিয়া মতাবলম্বী। তার রোগ থেকে আরোগ্যের ব্যাপারে আলা হযরতকে জিজ্ঞাসা করা হলে উত্তরে আলা হযরত বললেন যদি সে রাফেজী ফের্কা বর্জন করে তা হলে সে রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করবে। অন্যথায় রোগ নিরাময় হবে না। আলা হযরত কেবলার এ ভবিষ্যৎবাণী নবাব সাহেবের স্ত্রীকে দেয়া হলে সে সুন্নী হতে অস্বীকার করল। ফলে তার রোগ বেড়ে গেল। সে বৎসর শাওয়াল মাসের ৮ তারিখ নবাবের স্ত্রীর ব্যাপারে আলা হযরতকে ২য় বার জিজ্ঞাসা করা হল যে, তার মৃত্যু কখন হবে এবং কোথায় হবে। ঐ সময় নবাবের স্ত্রী আবহাওয়া পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে নিনীতালে মুকীম হল। আলা হযরত উত্তরে বললেন নবাবের স্ত্রীর মৃত্যু মহররম মাসে হবে। কিন্তু নিনীতালে হবে না। বরং তার শহর রামপুরের নিকট হবে। আলা হযরত কেবলার এ ভবিষ্যৎবাণী কিছু দ্রুতগামী মানুষের কানে পৌঁছলে তারা জিলহজ্ব মাস থেকে আলা হযরত কেবলার ভবিষ্যতবাণীর ব্যাপারে তার কাছে চিঠি লিখতে আরম্ভ করল। চিঠিতে তারা লিখল দেখুন নবাব সাহেবের স্ত্রী এখনো জীবিত রয়েছে। আলা হযরত তাদের চিঠির উত্তরে লিখলেন আমি মুহররম মাসের কথা বলেছি। প্রথমে মুহররম মাসতো আসুক আমার কথা অনুযায়ী যদি নবাবের স্ত্রী মুহররম মাসে মৃত্যু বরণ না করে তা হলে আমার উত্তর ভূল বলে প্রমাণিত হবে। নবাব সাহেব নিনী তালে স্থির ছিল। ঐ দিকে কানপুরের মসজিদে শহীদ গঞ্জের হাঙ্গামায় নিউটন মিষ্ট মসনের অস্তিরতা সীমা অতিক্রম করল। সে নবাব সাহেবকে টেলিগ্রামের মাধ্যমে জানাল আমি রামপুর আসতেছি। আপনি তাড়াতাড়ি এখানে এসে আমার সাথে দেখা করুন। তার সাথে সাক্ষাত করার জন্য নবাব সাহেব একা

রামপুর যেতে প্রস্তুতি নিল। কিন্তু তার স্ত্রী তা মানল না। অবশেষে নবাব ও তার স্ত্রী উভয়ে মুহররম মাসে রামপুর যাওয়ার উদ্দেশ্যে নিনী তাল থেকে রওয়ানা হয়ে গেল। যখন তারা রামপুরের নিকট পৌছল তখন নবাবের স্ত্রী মৃত্যু বরণ করল। আলহাম্‌দুলিল্লাহ। এ ভাবে ভবিষ্যৎবাণী সহীহ হল। এবং আলা হযরত কেবলার কারামত প্রকাশিত হল।

মুজাদ্দেদের সকল সময় কর্মে নিমগ্ন ঃ

১৩৩৭ হিজরী মোতাবেক ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে আলা হযরত কেবলা জবলপুর তাশরীফ নিয়ে যাচ্ছেন। হাজী কেফায়ত উল্লাহ সাহেবও সফর সঙ্গী ছিলেন। হাজী সাহেব বলেন, আমি মনে মনে ধারনা করলাম যে, মুজাদ্দেদের কোন সময় দ্বীনের খেদমত থেকে খালী থাকে না। সুতরাং আজ এ দীর্ঘ সফরের মধ্যে দ্বীনের কোন খেদমত হচ্ছে আমি এ কথা মনে মনে ধারণা করতেছিলাম। এদিকে আলা হযরত কেবলা আমার মনের খবর জেনে ফেললেন। যখন আলা হযরত কেবলা জবলপুরে পৌঁছলেন তখন হাজী কেফায়ত উল্লাহ তথা আমাকে লক্ষ্য করে বললেন এ ফকীর পথে তিনশত ষাইটটি কবিতা বলেছি যার মধ্যে পয়ত্রিশটি কবিতা ছিল নাতে পাক। বাকীগুলো সাধারণত ওহাবী বিশেষ করে দেওবন্দিদের বিরুদ্ধে। আপনি লিখে নেন হাজী সাহেব বলেন, আমি এ মোবারক কবিতা দেখে মনে মনে লজ্জিত হলাম এবং আলা হযরত কেবলার খেদমতে আবেদন করলাম। হুজুর আমার মনে এ ধারণা বিরাজ করছিল যে, এ দীর্ঘ সফরের মধ্যে আপনার থেকে দ্বীনের কোন খেদমত হচ্ছে কিন্তু খোদার কসম! আমার বিশ্বাস হয়ে গেল যে, আপনার কোন সময় দ্বীনের তাবলীগ থেকে মুক্ত থাকে না। কিছু তাত্ত্বিক জ্ঞানীই ওহার আন্দাজ করতে পারে যে, তিনশত ষাইটটি কবিতা বলা আবার তাও ট্রেন ইত্যাদির মধ্যে আর উহাকে ধারাবাহিকভাবে স্মরণ রেখে অবস্থান স্থলে ধারাবাহিকভাবে লিখানো। ইহা সাধারণ মানুষের কাজ নয়। ইহাতো আল্লাহর অলিদের কাজ এবং উনার একটি প্রকাশ্য কারামত। এ মোবারক কবিতা (আল এসতেমদাদ আলা আজ ইয়ালিল এরতেদাদ) তারিখিনামে ১৩৩৭ হিজরীতে প্রকাশ হয়েছে যার দু'টি লাইন নিম্নরূপ-

نعت اکرم سید عالم ☆ صلی اللہ علیہ وسلم

سیدھی بات سکھاتی یہ ہے ☆ سیدھی راہ چلاتی یہ ہے

মনের সন্দেহ দুরিভূত করলেন ঃ

এ ঘটনাটি খলিফায়ে আলা হযরত মালাকুল ওলামা আল্লামা যাফরুদ্দীন বিহারী সাহেব কেবলা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি আলা হযরত কেবলাকে দাওয়াত দিয়ে চলে গেলেন। পরের দিন তাঁর ঘরে দাওয়াতে যাওয়ার জন্য গাড়ী আসল। আলা হযরত কেবলা আমাকে বললেন, মাওলানা আপনিও চলেন। আলা হযরত কেবলা ও আমি গাড়ীতে আরোহণ করে ছাহেবে দাওয়াতের ঘরে পৌঁছলাম। ছাহেবে দাওয়াত অপেক্ষমান ছিলেন। ঘরে পৌঁছার পর ছাহেবে দাওয়াত আমাদেরকে সাদর সম্ভাষন জানিয়ে ঘরে নিয়ে একটি চৌকির উপর বসালেন। খাওয়ার জন্য আলা হযরত কেবলার হাত ধৌত

করানোর পর একটি থালে কয়েকটি রুটি আর কিছু গরুর মাংসের কিমা সামনে এনে দিলেন। আল্লামা যাফরুদ্দীন বিহারী বলেন এগুলো দেখে আমি মুশকিলে পড়ে গেলাম। কারণ আমার মনের ধারণা হল যে, আলা হযরত কেবলাতো গরুর মাংস খায় না। যদি মাংস ঝোল ওয়ালা হতো তাহলে তিনি শুধু ঝোল দিয়ে খেতে পারতেন। আমি মনে মনে এ ধরনের ধারণা করতে ছিলাম। আলা হযরত কেবলা এরশাদ ফরমালেন হাদীস শরীফের মধ্যে রয়েছে (বিছমিল্লাহিল লাজি লা ইয়াদুররু মা ইছমিহি শাইয়ুন ফিল আরদে ওয়ালা ফিছ ছামায়ে ওয়াহুয়াছ ছামিউল আলিম) পড়ে মুসলমান যা কিছু খাবে ইনশাল্লাহ কখনো ক্ষতি হবে না। আল্লামা যাফরুউদ্দীন সাহেব বলেন আমার বুঝে আসল যে, আলা হযরত কেবলা আমার মনের খবর জেনে ফেললেন এবং আমার মনের সম্পূর্ণ সন্দেহ দুর করতেছেন। অর্থাৎ আমি মনে মনে ভাবছিলাম আলা হযরত কেবলাতো গরুর মাংস খাননা। আলা হযরত কেবলা বললেন দোয়াটি পাঠ করলে কোন অসুবিধা হবে না। ছাহেবে মেজবান আলা হযরত কেবলার খেদমতে বিভোর। আলা হযরত যখন খানা শেষ করলেন তখন ছাহেবে দাওয়াত হাত ধুয়ে দেওয়ার জন্য তাঁর পাশে উপস্থিত হলেন। আলা হযরত কেবলা বললেন এ অভাবের সংসারে আলা হযরতকে দাওয়াত দেওয়া কি প্রয়োজন ছিল। ছাহেবে দাওয়াত বললেন, গরীব অবস্থায়তো আলা হযরত কেবলাকে দাওয়াত করেছি। যাতে আলা হযরত কেবলার কদম মোবারক এখানে পড়লে আমার সামর্থ অনুযায়ী রুটি লবন যথটুকু সম্ভব হুজুরের খেদমতে পেশ করব। হুজুর খাবার গ্রহণের পর দোয়া করলে ঘরের নিস্তি দুর হয়ে যাবে এবং খুশির অবস্থা আসবে আর দ্বীন ও দুনিয়ার বরকত হাছিল হবে।

হাজী আলী বখশ সাহেবকে আলা হযরত কেবলার ভবিষৎবাণী ঃ

জানশীনে হযরত আবুল মাছাকিন সিরাজুত তারেকীন হযরত আল্লামা আলহাজ্ব মুফতী শাহ মুহাম্মদ ওয়াজিহ উদ্দীন সাহেব কেবলা রেজবী গাজীপুরী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত শাহজী মিয়ার দরগাহে মকবুল ফীলীভেতের সু প্রসিদ্ধ নাত পড়ুয়া জনাব আলহাজ্ব আলী বখ্শ রেজবী সাহেব আলা হযরত কেবলা কাদ্দাছা ছিররুহুল আজীজ এর মুরীদ হওয়ার পর ব্রেলীতে থাকা শুরু করলেন। হাজী সাহেব কয়েকদিন পর আলা হযরতের খেদমতে আবেদন করলেন হুজুর আমার মন চায় যে, এখন থেকে বাকী সারা জীবন আপনার দরবারে খাটিয়ে দিই। আলা হযরত কেবলা এরশাদ ফরমালেন, আপনি আপনার পরিবার নিয়েই থাকুন। ওখান থেকে কোন কোন সময় এখানে আসবেন। হাজী সাহেব পুনরায় ব্রেলী শরীফে থাকার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। এবার আলা হযরত কেবলা তাকে লক্ষ্য করে বললেন। আচ্ছা ঠিক আছে আমি আপনাকে বলতেছি ফীলীভেতে আমার বন্ধু শাহজী মুহাম্মদ শের মিয়া সাহেব আছেন আপনি তার দরবারে যান। তাহলে আপনি আপনার পরিবারের পাশে থাকতে পারবেন। অতঃপর আলা হযরত কেবলা হাজী সাহেবকে তাঁর স্বলিখিত নাত শরীফের কিতাব হাদায়েকে বখ্শিশ শরীফ দান করলেন এবং উক্ত কিতাবে খোদ আলা হযরত কেবলা কিছু নাত নির্বাচন করে নিজ বরকতময় কলম দ্বারা এগুলো চিহ্ন দিয়ে দিলেন আর বললেন, আপনি এগুলো পড়বেন। উক্ত খাদায়েকে বক্শীশ

শরীফটি বর্তমানেও হাজী আলী বখ্শ সাহেবের পুত্র জনাব আমির হোসেন সাহেব ও গোলাম নবী হোসাইন সাহেবের কাছে রয়েছে। অনন্তর আলা হযরত কেবলা ভবিষ্যৎবাণী করলেন হাজী সাহেব আপনার বংশের মধ্যে রাসুলে পাকের মিলাদ শরীফ পাঠকারী হতে থাকবে। হাজী সাহেব আলা হযরত কেবলা থেকে বিদায় নিয়ে ফীলীভেত গিয়ে হযরত শাহজী মিয়ার দরবারে পৌঁছলেন। হযরত শাহজী মিয়া যখন জানতে পারলেন যে, হাজী সাহেবকে আলা হযরত বড় মৌলভী সাহেব তাঁর কাছে পাঠায়েছেন। তখন থেকে হযরত শাহজী মিয়া হাজী সাহেবের প্রতি বেশী খেয়াল ফরমাতে লাগলেন। আর তাঁর দরবারে পাকে তাঁকে বিশেষ স্থান দান করলেন। হযরত শাহজী মিয়া যতদিন দুনিয়াতে জীবিত ছিলেন ততদিন হাজী সাহেব মিলাদ শরীফ পড়তেন যিকির ও হালকা ইত্যাদি মজলিশের মধ্যেও হযরত শাহজী মিয়া হাজী সাহেবের মাধ্যমে মিলাদ পাঠ করাতেন। হযরত শাহজী মিয়া যখন বাহিরে কোথাও যেতেন তখন হাজী সাহেবকেও সাথে নিতেন। হযরত শাহজী মিয়ার ইন্তেকালের পর তার পবিত্র মাজার শরীফে প্রতি বৃহস্পতিবার হাজী সাহেব মিলাদ পাঠ করতেন (হযরত শাহজী মিয়া ১৩২৪ হিজরীতে ইন্তেকাল ফরমায়েছেন)। হাজী সাহেব হযরত শাহজী মিয়ার মাজার শরীফে ১৩৭৮ হিজরী পর্যন্ত মিলাদ শরীফ পড়তেছিলেন। ঠিক ইন্তেকালের পূর্বে অছিয়ত করলেন যে, আমার জানাযার নামাজ আমার পীর ও মুর্শিদ আলা হযলত ফাযেলে ব্রেলভী রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাহেবজাদা তাজেদারে আহলে সুন্নাত হুজুরপুরনুর মুফতীয়ে আজম হিন্দ পড়াবেন। যখন ১৩৭৮ হিজরীর ১৭ সফর রোজ-মঙ্গলবার ২৬ আগষ্ট ১৯৫৮ সালে হাজী সাহেব ইন্তেকাল ফরমালেন। তখন হাজী সাহেবের পৌত্র জনাব আমির হোছাইন সাহেব তাজেদারে আহলে সুন্নাত শাহজাদায়ে আলা হযরত সর্কারে মুফতীয়ে আজম হিন্দ কেবলাকে খবর জানালেন। সর্কারে মুফতীয়ে আজম হিন্দ কেবলাকে ফীলীভেতে আনলেন। হাজী সাহেবের নামাজে জানাযা হযরত কেবলা পড়ালেন। আলা হযরত কেবলার এ কারামত প্রকাশ পেতে লাগল যে, হাজী সাহেবের ইন্তেকালের পর থেকে তার আওলাদ ফীলীভেতের প্রসিদ্ধ নাত পড়ুয়া সায়ের জনাব গোলাম নবী হোসাইন সাহেব জনাব আমির হোছাইন সাহেব জনাব নন্না সাহেব এখনো পর্যন্ত তিনজন আর জনাব দুল্লা খান সাহেব ও মুনসী রেফায়তউল্লাহ সাহেব রেজবী নূরী হুজুর শাহজী মিয়া সাহেব কাদ্দাসিররুহুল আজীজের মাজার শরীফে প্রত্যেক বৃহস্পতিবার নিজের বিশেষ নিয়মে মিলাদে পাকে মোস্তফা (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) পড়ে আসতেছেন। আলহাম্দুলিল্লাহে আজ্জা ওয়াজাল্লা। আলা হযরত কেবলা এমন অলিয়ে কামেল ছিলেন তিনি কেবল হাজী সাহেবের জীবন নয় তার বংশধরদের জীবনের অবস্থাও জেনে ভবিষ্যৎবাণী করলেন। হাজী সাহেব আপনার বংশ থেকে হামেশা প্রিয় নবীর মিলাদ শরীফ পাঠকারী হতে থাকবে। আলা হযরত কেবলার ভবিষ্যৎবাণী অনুযায়ী হাজী সাহেবের বংশ থেকে বর্তমানেও শায়ের হতে চলছে। আল্লাহ তায়ালা কিয়ামত পর্যন্ত হাজী সাহেবের শায়েরের সিলসিলা জারী রেখে আলা হযরত কেবলার কারামতকে জিন্দা রাখুন। আমিন বেহুরমাতি সায়্যিদিল মুরসালিন।

স্বপ্নের খবর জানার আশ্চর্যজনক ঘটনা ঃ

সৈয়্যদ কানায়াত আলী সাহেব সৈয়্যদ আইয়ুব আলী সাহেব আলা হযরত কেবলা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর অনেক খেদমত করেছেন। সৈয়্যদ কানায়ত আলী সাহেব বিবাহ পর্যন্ত করেননি। সবসময় আলা হযরত কেবলার খেদমতে উপস্থিত থাকতেন। যখন আলা হযরত কেবলা তাকে যাওয়ার হুকুম করতেন তখন তিনি ঘরে যাওয়ার পরিবর্তে মসজিদে গিয়ে শুয়ে থাকতেন। যখন আলা হযরত কেবলা মসজিদে তাশরীফ আনতেন তখন তিনি শয়ন থেকে উঠে তার হাত মোবারকে চুমু দিতেন তারপর অযুকরে নামাজে শরীক হতেন। হযরত সৈয়্যদ কানায়াত আলী সাহেক কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন একদিন আমার স্বপ্নদোষ হলো জাগ্রত হওয়ার সাথে সাথে মসজিদ থেকে বের হয়ে তায়াম্মুম করলাম। তবে এখনো গোসল করিনি। মসজিদের বাহিরে আলা হযরত কেবলাকে দেখলাম প্রতিদিনের ন্যায় আমি তাঁর হাত মোবারকে চুমু দিতে চাইলাম কিন্তু আলা হযরত কেবলা হাত বাড়াননি এবং একথা বলে সামনে চলে গেলেন যে, মুসাফাহাতো (করদর্মন) নামাজের পরে করবেন। সৈয়্যদ সাহেব বলেন, আমি লজ্জা পেলাম। তাড়াতাড়ি গোসল করে নামাজে শরীক হলাম। সুবহানাল্লাহ। সৈয়্যদ সাহেবের স্বপ্নদোষ হল গোসল করেননি এ কথা আলা হযরত কেবলা জেনে চুমু দেয়ার জন্য হাত মোবারক পেশ না করে সামনে চলে গেলেন এবং ইশারা দিয়ে বললেন গোসল করে নামাজ পড়ুন এরপর করদমর্দন করবেন।

হযরত শাহজী মিয়া বলেছেন আপনার অংশ এখানে নয় আলা হযরতের নিকট ঃ

একদা কোরআনে হাফেজদের অহংকার হযরত হাফেজ ইয়াকুব আলী খান ফীলীভেতী সাহেব সু-প্রসিদ্ধ ও সু পরিচিত বুযুর্গ আরেফ বিল্লাহ হযরত আলহাজ্ব আশ্ শাহ আহমদ শের খান সাহেব প্রকাশ শাহজী মুহাম্মদ শের মিয়া আলাইহির রাহমাত ওয়ার রিদুয়ান এর দরবারে মুরিদ হওয়ার উদ্দেশ্যে তাশরীফ নিলেন। হযরত শাহজী মিয়া হাফেজ সাহেবকে বললেন মুরিদ হয়ে কি করবেন। আপনিতো জন্মলগ্ন হতেই অলি। হাফেজ সাহেব পুনরায় আবেদন করলেন হুজুর মুরিদ করে নেন। হযরত শাহজী মিয়া পুনরায় একই উত্তর দিলেন। হাফেজ সাহেব তৃতীয়বার আরজ করলেন-আমাকে মুরিদ করে নেন। এ বার হযরত শাহজী মিয়া সাহেব এরশাদ ফরমালেন দেখুন লাওহে মাহফুজে আপনার অংশ এখানে নেই। আপনি ব্রেলী যান। বড় মৌলভী সাহেব মাওলানা আহমদ রেজার ঐখানে আপনার অংশ রয়েছে। সুবহানাল্লাহ! আল্লাহর অলিদের শান যারা লাওহে মাহফুজে দেখে কথা বলেন। এটা হল হযরত শাহজী মিয়ার জিন্দা কারামত। এবার আসুন হযরত শাহজী মিয়া যখন হাফেজ সাহেবকে বললেন, আপনি ব্রেলী শরীফ গিয়ে হযরত ইমাম আহমদ রেজার হাত মোবারকে বায়য়াত গ্রহণ করুন। হযরত শাহজী মিয়ার একথা শুনে হাফেজ সাহেব ব্রেলী শরীফের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। ঐ সময় ফীলীভেত হতে কেবল একটি ট্রেন ব্রেলী শরীফ যাওয়া আসা করত। হাফেজ সাহেব ঐ ট্রেনে আরোহণ করে ব্রেলী শরীফের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। আলা হযরত কেবলা আপন বরকতময় নিবাসে তাঁর পীরোমুর্শিদ কেবলার ওরশে পাক ১৮ জিলহজ্ব শরীফ উদযাপন করতেন। ঐ দিন তারিখ

অনুযায়ী আলা হযরত কেবলা ওরশ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে কুল শরীফের পর মাওলানা আবদুল আহাদ সাহেব ফীলীভেতী ও মাওলানা হাবিবুর রহমান সাহেবকে আদেশ করলেন, আপনারা রেলওয়ে ষ্টেশন যান, এখন ফীলীভেত থেকে যে ট্রেনটি আসবে ঐ ট্রেন যোগে হাফেজ সাহেব তাশরীফ আনতেছেন, তাঁকে এখানে নিয়ে আসুন। আলা হযরত কেবলা হাফেজ সাহেবের নাম উল্লেখ করেননি, আর তাঁরাও হাফেজ সাহেবের নাম কী? সে ব্যাপারে আলা হযরত কেবলাকে জিজ্ঞাসা করেননি। নির্দেশ মোতাবেক তাঁরা ষ্টেশনে পৌঁছলেন। ষ্টেশনে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর ট্রেন আসল। ট্রেন থেকে হাফেজ ইয়াকুব আলী সাহেব যখন অবতরণ করলেন তখন তাঁরা তাঁকে চিনে ফেললেন এবং তাঁরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন আপনি কোথায় তাশরীফ নেবেন? হাফেজ সাহেব বললেন, আলা হযরত কেবলার দরবারে। তখন মাওলানা হাবিবুর রহমান খান সাহেব বললেন আলা হযরত কেবলাতো এ খবর প্রথমে দিয়েছেন এবং বলেছেন ষ্টেশনে যান, হাফেজ সাহেব এ ট্রেন যোগে আসতেছেন, তাঁকে নিয়ে আসুন। আলা হযরত কেবলার নির্দেশ মোতাবেক আমরা এখানে হাজির হয়েছি। এবার মাওলানা আবদুল আহাদ সাহেব ও মাওলানা হাবিবুর রহমান সাহেব হাফেজ সাহেবকে ষ্টেশন হতে সাথে নিয়ে সওদাগরান মহল্লার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। ঐ দিকে আলা হযরত কেবলা বরকতময় নিবাসে হাফেজ সাহেবের অভ্যর্থনার জন্য দরজায় অপেক্ষমান। এর মাঝে হাফেজ সাহেব তাশরীফ আনলেন। হাফেজ সাহেব ও আলা হযরত কেবলার মাঝে করদমর্দন ও কোলাকোলির পর হাফেজ সাহেবকে বিশেষ কক্ষে আরাম করার ব্যবস্থা করে দিলেন। এরপর হাফেজ সাহেব বায়'য়াত হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। এ বিষয়ে কিছুক্ষণ কথোপকথন হল। অতঃপর আলা হযরত কেবলা হাফেজ সাহেবের হাত আপন হাত মোবারকে নিয়ে কিছু এরশাদ ফরমালেন। তারপর বায়'য়াত করে নিলেন। সুবহানাল্লাহ! ইহা আলা হযরত কেবলার একটি উজ্জ্বল কারামত। যেহেতু হাফেজ সাহেব ফীলীভেত হতে আলা হযরত কেবলার খেদমতে আসার জন্য ব্রেলী শরীফের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন এদিকে আলা হযরত কেবলা কোন খবর ছাড়াই তাঁকে আনার জন্য দু'ব্যক্তিকে ষ্টেশনে পাঠায়েছিলেন। যখন হাফেজ ইয়াকুব আলী খান ইন্তেকাল ফরমালেন তখন হযরত শাহ আলী মিয়া খান সাহেবের নাথি মাওলানা শাহ হাবিবুর রহমান রেজভী সাহেব তার জানাজার নামাজ পড়ানোর পর হাফেজ সাহেবের উত্তরাধীকারীদেরকে এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন। উল্লেখ্য যে, হাফেজ ইয়াকুব আলী খান সাহেব ২৭ মহররম ১৩৫৬ হিজরী মোতাবেক ৩০ মার্চ ১৯৩৮ সাল রোজ-বুধবার সোবহে সাদেকের সময় ইন্তে কাল ফরমান। এ মহান বুযুর্গ ব্যক্তির মাজার শরীফ বুরিখান মহল্লার জামে মসজিদের পাশে অবস্থিত।

আমজাদ আলী ফাঁসি হতে মুক্ত হলেন ঃ

১৯০১ সালের ঘটনা হযরত আমজাদ আলী কাদেরী যিনি শিকার করার উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হলেন। অতঃপর তিনি শিকারের উপর গুলি চালালেন কিন্তু তা লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়ে গেল এবং গুলি একজন পথিকের গায়ে লাগল। ফলে সে পথচারীর মৃত্যু ঘটল। পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করল, পুলিশ তার উপর ইচ্ছাকৃত হত্যা প্রমাণ করল। যার ফলে তার ফাঁসির

হুকুম হয়ে গেল। তাঁর কিছু বন্ধু-বান্ধব আলা হযরত সর্কারের খেদমতে বা'বরকাতে গেলেন এবং তাঁর খেদমতে আরজ করলেন হুজুর! আমজাদ আলীর ফাসির হুকুম হয়ে গেছে। আপনি তাঁর জন্য দোয়া করুন। তৎক্ষনাত আলা হযরত কেবলা এরশাদ ফরমালেন আপনারা যান আমি আমজাদ আলীকে মুক্ত করে দিলাম। ফাঁসির তারিখ শুনিয়ে দেয়া হল। ফাঁসির নির্ধারিত তারিখের কিছু পূর্বে তার পরিবার পরিজন ও আত্মীয় স্বজন কাঁদতে কাঁদতে তাঁর সাক্ষাতের জন্য গেলেন। তখন আমজাদ আলী বলতে লাগলেন আপনারা সবাই নিশ্চিত মনে ঘরে গিয়ে আরাম করুন, আমার ফাঁসি হতে পারে না। উক্ত তারিখে আমি ঘরে এসে পৌঁছব। কারণ আমার পীরে মুর্শিদ সৈয়্যদী আলা হযরত কেবলা আমাকে স্বপ্নে এসে এ সুসংবাদ দিয়েছেন। আর এরশাদ করেছেন আমি আপনাকে রেহাই দান করলাম। যারা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করার জন্য গিয়েছিলেন তারা কান্নাকাটি করে চলে গেলেন। ফাঁসির নির্ধারিত তারিখে পুত্র শোকে মুহ্যমান মা কাঁদতে কাঁদতে আপন স্নেহের পুত্রের সাথে শেষ সাক্ষাতের জন্য আসলেন। আমজাদ আলী মাকে বললেন মা অহেতুক কাঁদতেছেন কেন? ঘরে যান ইনশাল্লাহ আমি ঘরে এসে নাস্তা করব। এর পর আমজাদ আলীকে ফাঁসিকাষ্টের উপর হাজির করা হল। গলায় ফাঁসির রশি রাখার পূর্বে নিয়ম অনুসারে যখন তার শেষ আশা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল তখন তিনি বলতে লাগলেন জিজ্ঞাসা করে কি করবেন। এখনতো আমার সময় আসেনি। সকলে হতভম্ব হয়ে গেল তারা মনে করল মৃত্যুর ভয়ে তার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। অতএব, ফাঁসিদাতা ফাঁসির রশি তাঁর গলায় পড়িয়ে দিল। তৎক্ষনাত তার যোগে খবর এসে গেল যে, মহারানী ভিক্টোরিয়ার ছেলের মুকুট পরিধানের খুশিতে কিছু হত্যাকারী ও কিছু কয়েদিকে ছেড়ে দেয়া হউক। এ খবর আসার সাথে সাথে ফাঁসির রশি খুলে তাকে ফাঁসিকাষ্ট থেকে নামিয়ে মুক্তি দেয়া হল। এদিকে ঘরের সবাই শোকাহত। সারা বাড়ীতে শোকের ছায়া নেমে আসল। ঘরের সবাই লাশ আনার ব্যবস্থাপনায় লিপ্ত ছিল। যখন সবাই আমজাদ আলীর লাশ আনার জন্য প্রস্তুত তখনই আমজাদ আলী সাহেব ফাঁসির ঘর থেকে সোজা আপন নিসাবে পৌঁছল। আর বলতে লাগল আমার জন্য নাস্তা আন। আমি বলেছিলাম না ইনশাল্লাহ! নাস্তা ঘরে এসে করব। তখন তাই হলো বাস্তবে। সুবহানাল্লাহ। এটাইতো মুজাদ্দেদে আজম আলা হযরত কেবলার জিন্দা কারামত তিনি মুখে বলেছিলেন আমি আমজাদ আলীকে মুক্ত করে দিলাম। আল্লাহ ওয়ালাদের জবান এমনই হয়ে থাকে যে, তারা নূরানী জবান দিয়ে যখন যা বলেন তখন তা বাস্তবে পরিণত হয়।

সংকট দুরকারী দর্শন ঃ

করাচীর একজন প্রবীণ লেখক আবদুল মাজেদ ইবনে আবদুল মালেক ফীলীভেতী এ ঈমান সতেজকারী ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, যখন এ ঘটনা ঘটেছিল তখন আমার বয়স মাত্র তের বছর ছিল। আমার মায়ের মানসিক অবস্থা খুব খারাপ হয়ে পড়েছিল তার বিষয়টা অত্যন্ত দুর্ধম হয়ে পড়েছিল। অবশেষে তাকে শিকলে বেধে ছাদের উপর রাখা হত। অনেক চিকিৎসা করা হল কিন্ত আরোগ্য লাভ হল না। বহু চেষ্টা করা হল কিন্তু সব চেষ্টা বিপল হলো। অনন্তর কিছু মানুষের পরামর্শক্রমে আমি ও আমার পিতা মহোদয়

আমার মাকে শিকলে বেঁধে অনেক কষ্টে ফীলীভেত থেকে ব্রেলী শরীফে আনলাম। মাতা সাহেবা অনবরত ভৎসনা করে যাচ্ছিল। আলা হযরত রাদিয়াল্লাহু আনহুকে গর্জে উটে বলল তুমি কে এবং এখানে কেন এসেছ। আলা হযরত কেবলা অত্যান্ত নম্র ভাষায় বললেন, মুহতরামা আপনার উপকারের জন্য এসেছি। মাতা সাহেবা পুনরায় গর্জে উটে বললেন খুব ভাল, উপকার করতে এসেছেন? আমি যে উপকার চাই আপনি তাই করতে পারবেন? আলা হযরত কেবলা এরশাদ করলেন ইনশাল্লাহু তায়ালা। মাতা সাহেবা বললেন, মাওলা আলী মুশকিল কুশা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর দীদার (দর্শন) করিয়ে দিন। এ কথা শুনা মাত্র আলা হযরত কেবলা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু স্বীয় কাঁদ মোবারক থেকে ছাদর শরীফ নামিয়ে আপন চেহারা মোবারকের উপর রেখে দিয়ে তৎপর পুনরায় সরিয়ে নিলেন। এখন আমাদের চোখের সামনে আলা হযরত কেবলা আর নেই। মাওলা আলী মুশকিল কোশা কাররমাল্লাহু ওয়াজহাহুলকারীম আপন নূরানী চেহেরার জ্যোতি নিয়ে আমাদের সামনে দন্ডায়মান। আমাদের বৃদ্ধা মা অত্যন্ত শান্ত ও ভদ্রভাবে সে নূরানী পরিবেশের জ্যোতিতে নিমজ্জিত ছিলেন। আমি ও আমার পিতা মহোদয় মনোভাব জাগ্রত চোখে হযরত মাওলা আলী মুশকিল কোশা রাদিয়াল্লাহু আনহুর দর্শনে ধন্য হলাম। তারপর মাওলা আলী মুশকিল কোশা আপন চাদর মোবারক স্বীয় চেহেরার উপর মুড়িয়ে সাথে সাথে সরিয়ে নিলেন। তখন আমরা দেখতে পেলাম আলা হযরত কেবলা আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। আর মৃদু হাসছিলেন এরপর আলা হযরত কেবলা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু একটি শিশিতে করে ঔষধ দিলেন আর এরশাদ ফরমালেন দু'মাত্রা ঔষধ দিলাম। এক মাত্রা ঔষধ রোগিনীকে খাওয়াবেন প্রয়োজন না হলে দ্বিতীয় মাত্রা ঔষধ মোটেও দিবেন না। আলহাম্দুলিল্লাহ জাল্লা মাযদুহু আমাদের মাতা একটি মাত্রা ঔষধে পূর্ণ আরোগ্য লাভ করলেন। তিনি যতদিন জীবদ্দশায় ছিলেন আর কখনো মানসিক রোগে ভোগেননি।

তৎক্ষনাত বৃষ্টিপাত হতে লাগল ঃ

একদা একজন গণক আলা হযরত রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর দরবারে উপস্থিত হল। আলা হযরত কেবলা গণককে উদ্দেশ্য করে বললেন, গণক সাহেব বলুনতো আপনার হিসাবে বৃষ্টি কবে আসতে পারে? সে গুনে পড়ে বলল, এ মাসে পানি নেই। অর্থাৎ এ মাসে বৃষ্টিপাত হবে না বরং আগামী মাসে হবে। আলা হযরত কেবলা তার গণনার নিয়মটা দেখার পর এরশাদ ফরমালেন, আল্লাহ তায়ালার কুদরতী হাতে সব ক্ষমতা তিনি যা চান সব কিছু করতে পারেন তিনি ইচ্ছা করলে আজও বৃষ্টি বর্ষণ করতে পারেন। গণক বলল, এটি কিভাবে সম্ভব আপনি তারকারাজির গণনার দিকে তাকাচ্ছেন না। আলা হযরত কেবলা বললেন, আপনি কেবল তারকারাজী দেখছেন আর আমি তারকারাজীতো দেখতেছি তার সাথে সাথে তারকারাজীর সৃষ্টিকর্তার কুদরতও দেখতেছি। অতঃপর আলা হযরত কেবলা উক্ত কঠিন মাসয়ালাকে খুব সহজভাবে বুঝিয়ে দিলেন। যার ধরন হল এরূপ দেয়ালের উপর একটি দিয়াল ঘড়ি শুভা পাচ্ছিল। আলা হযরত কেবলা গণককে বললেন, এখন কয়টা বেজেছে? সে আরজ করল সোয়া এগারটা। তিনি বললেন বারটা বাজতে আর কত দেরী। আরজ করল পৌনে এক ঘন্টা। তিনি বললেন পৌন এক ঘন্টার পূর্বে কি বারটা বাজতে

পারে? আরজ করল না। এটা শুনে আলা হযরত কেবলা উঠে দাড়ালেন এবং ঘড়ির কাটা ঘুরিয়ে বারটার ঘরে দিলেন। তৎক্ষনাত টন টন করে বারটা বাজতে আরম্ভ করল। এখন আলা হযরত কেবলা নজুমিকে বললেন আপনিতো বললেন পৌনে এক ঘন্টার পূর্বে বারটা বাজতে পারে না। এখন কিভাবে বারটা বাজল। সে আরজ করল আপনি কাটা গুরিয়ে দিয়েছেন তাই। নতুবা ঘড়ির কাঠা আপন গতিতে চলে এক ঘন্টার পরই বারাটা বাজত। আলা হযরত কেবলা এরশাদ ফরমালেন আল্লাহ তায়ালা সর্ব শক্তিমান তিনি যে তারকাকে যেখানে যখন ইচ্ছা করে পৌছে দিতে পারেন। আপনিতো আগামী মাসে বৃষ্টি হওয়ার কথা বললেন, এক মাস কেন এক সপ্তাহ কেন একদিন কেন এখই বৃষ্টি দিতে পারেন। আলা হযরত কেবলা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর মুখ মোবারক থেকে এতটুকু বের হতে না হতে চর্তুদিকে তাৎক্ষনিকভাবে মেঘে ছেয়ে ফেলল। আর বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ করল।

সুবহানাল্লাহ! আলা হযরত কেবলা আল্লাহ তায়ালার এমন একজন প্রিয় অলিয়ে কামেল ছিলেন যার মুখ মোবারক দিয়ে যখন যা বের হতো আল্লাহ তায়ালা তখনই তা পূরণ করে দিতেন।

একজন বৃদ্ধা মহিলার ফরিয়াদ কবুল করা ঃ

একজন বৃদ্ধা মহিলা আলা হযরত কেবলার মুরীদ ছিলেন। তার স্বামী পোষ্ট অফিসের কর্মকর্তা ছিল। ভূল মানিঅর্ডার করার কারণে লোকটিকে গ্রেপ্তার করা হলো। এলাহাবাদে আপীল দায়ের করা হলো। রায় প্রদান করার তারিখের কয়েকদিন আগে বৃদ্ধা মহিলা নিজেকে যথাযথভাবে পর্দাবৃত করে আলা হযরত কেবলার দরবারে ফরিয়াদ নিয়ে উপস্থিত হলেন। মহিলাটি আলা হযরতের খেদমতে সব ঘটনা খোলাসা করে বলে তার স্বামীর মুক্তির জন্য ফরিয়াদ করলেন। আলা হযরত কেবলা সব কথা শুনে বৃদ্ধা মহিলাটিকে লক্ষ্য করে এরশাদ ফরমালেন, আপনি বেশী পরিমানে (হাসবুনাল্লাহু ওয়ানিয়ামাল ওয়াকিল) পড়বেন।

অতঃপর বৃদ্ধা মহিলাটি চলে গেলেন। অবশ্য মধ্যবর্তী সময়ে আরো কয়েকবার হাজির হয়েছিলেন। আলা হযরত কেবলা তাকে একই দোয়া পড়ার নির্দেশ দিলেন। অবশেষে নির্ধারিত ফয়সালার তারিখ এসে গেল। বৃদ্ধা মহিলা পুনরায় আলা হযরত কেবলার দরবারে হাজির হয়ে আবেদন করলেন, হুজুর! আজ ফয়সালা হবার কথা। আলা হযরত এরশাদ ফরমালেন ঐ দোয়াই পড়ুন। বৃদ্ধা মহিলা আগের পুরানো জবাব শুনে একটু অসন্তুষ্ট হয়ে গেলেন, আর ফিরে যাচ্ছিলেন যাওয়ার সময় একথা বললেন যখন আপন পীরই শুনতে চাচ্ছেন না, তখন অন্য কেউ কি শুনবে?

আলা হযরত কেবলা বৃদ্ধা মহিলাটির এ অবস্থা দেখে তাৎক্ষনিকভাবে তাকে উচু আওয়াজে ডেকে এরশাদ করলেন, "পান খেয়ে নিন" বৃদ্ধা বলল "আমার মুখে পান আছে" আলা হযরত কেবলা! বারবার বলছিলেন, কিন্তু বৃদ্ধা কিছুটা অসন্তুষ্ট ছিলো। অতঃপর আলা হযরত কেবলা আপন হাত মোবারক বাড়িয়ে পান দিতে দিতে এরশাদ করলেন, "ছাড়াতো পেয়ে গেছেন, এখন পানটা খেয়ে নিন"।

আলা হযরত কেবলার নূরানী জবান থেকে একথা শুনার পর বৃদ্ধা খুশী হয়ে পান খেয়ে নিলেন এবং ঘরের দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন। বৃদ্ধা ঘরের নিকট পৌঁছতে না পৌঁছতেই তার ছেলেরা বলতে লাগলো এতক্ষণ আপনি কোথায় ছিলেন? তার বার্তাবাহক আপনাকে খুঁজছিলেন। তিনি খুশী হয়ে ঘরে গেলেন। তার বার্তাটি নিলেন এবং পড়লেন। জানতে পারলেন যে, তার স্বামী বেকসুর খালাস পেয়েছেন।

মনের কথা জেনে ফেললেন ঃ

ব্রেলী শরীফে এমন এক ব্যক্তি ছিল যে ওলামা ও বুযুর্গানেদীনের প্রতি গুরুত্বই দিত না। পীর মুরিদকে পেটের ধান্ধা বলে সমালোচনা করত। তার খান্দানের কিছু লোক আলা হযরত কেবলার হাত মোবারকে বায়য়াত গ্রহণ করে। একদিন তারা প্রত্যেকে তাকে বাধ্য করল এবং বলল চলো আলা হযরত কেবলার সাথে দেখা করি, তাহলে তোমার এ ভূল ধারণা মস্তিস্ক থেকে বের হয়ে যাবে। বাধ্যত সে তাদের সাথে চলল, প্রতি মধ্যে এক মিষ্টির দোকানে গরম গরম আমৃতি তৈরী করা হচ্ছিল। গরম আমৃতি দেখে লোকটার মুখে পানি এসে গেল। সে বলল এটা খাওয়ালে তোমাদের সাথে যাব। তার সফরসঙ্গী লোকেরা বলল ফেরার পথে খাওয়াব, প্রথমে চল। অবশেষে তারা আলা হযরত কেবলার দরবারে উপস্থিত হয়ে বসে পড়ল। কিছুক্ষণ পর এক ব্যক্তি বায়য়াত গ্রহণের জন্য হাজির হল এবং একটি পাত্রের মধ্যে গরম গরম আমৃতি এনে রাখল। ফাতিহা খানির পর তা সবার মাঝে বন্টন করা হল। আলা হযরত কেবলার দরবারের নিয়ম ছিল সম্মানিত সৈয়্যদজাদাকে চারগুন ও দাড়ী ওয়ালাকে কোনকিছুর দ্বিগুন দেয়া হত। আর যাদের দাড়ী নেই তাদেরকে ও বাচ্চাদেরকে একগুণ দেয়া হত। এ নিয়মানুসারে ঐ লোকটার যেহেতু দাড়ী নেই সেহেতু তাকেও একটি আমৃতি দেয়া হল। আলা হযরত কেবলা বললেন তাকে দু'টি দিন। বন্টনকারী আরজ করলেন হুজুর তার মুখেতো দাড়ী নেই। আলা হযরত কেবলা মুসকি হেসে বললেন তার মন চাচ্ছে তাকে আরো একটি দিন। লোকটি আলা হযরত কেবলার এ কারামত দেখে তার হাতে বায়য়াত গ্রহণ করল। এর পর থেকে ওলামায়ে কেরাম ও বুযুর্গানেদীনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে আরম্ভ করল।

আলা হযরতের কাশ্‌ফ এবং ইমামুল মুহাদ্দেসীনের বেছাল ঃ

শ্রদ্ধাস্পদ জনাব আবদুল আলী রেজভী সাহেব বর্ণনা করেন, আমার পিতা জনাব মৌলভী আবদুল হাই ইবনে হযরত মৌলভী আবদুল লতিফ সাহেব (যিনি হুজুর মুহাদ্দেসে সুরুতী সাহেবের ছোট ভাই) বলেন ৮ই জমাদিউল উখরা ১৩৩২ হিজরী রোজ সোমবার শেষ রাত তথা তাহাজ্জুদের নামাজের সময় ফীলীভেতের মধ্যে মুহাদ্দেস সুরুতী হযরত মাওলানা শাহ অছি আহমদ (রাহমতুল্লাহে আলাই) বেছাল (ইন্তেকাল হলেন) এদিকে ব্রেলী শরীফের মধ্যে ঐ সময় আলা হযরত কেবলা তাঁর সাহেবজাদাদ্বয় অর্থাৎ হুজ্জাতুল ইসলাম মাওলানা শাহ হামেদ রেজা খান সাহেব ও বদরুল ইসলাম হুজুর মুফতীয়ে আজম হিন্দ মুস্তফা রেজা খান সাহেবকে ফরমালেন আল আসদ আল আস্‌সাদ আল আশদ আল আরশাদ মাওলানা শাহ অসী আহমদ সাহেব (রাহমতুল্লাহে আলাই) এর এখন বেছাল (ইন্তেকাল হয়েছে)। এ সংবাদ তার সাহেবজাদাদ্বয়কে দিয়ে বললেন তিনি দুনিয়া থেকে কেন চলে

গেলেন। তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়া মানে আমার ডান হাত শরীর থেকে আলাদা হয়ে যাওয়া। তিনি দুনিয়া থেকে তাশরীফ নিয়ে আমার কোমর ভেঙ্গে দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ! আলা হযরত কেবলা রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাশফ কারামত দেখুন। শেষ রাতে ফীলীভেতে হযরত মুহাদ্দেস সুরুতী সাহেব তাঁর হুজরা শরীফে ইন্তেকাল ফরমালেন। ঐ দিকে ঐ সময় ব্রেলী শরীফে আলা হযরত কেবলা আপন হুজরা শরীফে বসে মুহাদ্দেস সাহেবের ইন্তে কালের খবর তাঁর সাহেবজাদাদ্বয়কে দিতেছেন এবং ফীলীভেতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিতে বলেছেন। আল হামদু লিল্লাহ এটাইতো আল্লাহর অলিদের শান। যারা এক স্থানে বসে কাশ্‌ফের মাধ্যমে অন্য স্থানের খবর রাখেন।

হে প্রিয় নবীর অদৃশ্য জ্ঞানের অস্বীকারকারীরা তোমরা আস এবং চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দেদে আজম হযরত ইমাম আহমদ রেজা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ইলমে গায়েব দেখ। যিনি ব্রেলী শরীফ অবস্থান করে ফীলীভেতের মধ্যে হযরত মুহাদ্দেস সুরুতী সাহেবের ইন্তেকালের সংবাদ দিয়েছেন। অথচ আলা হযরত কেবলাতো নবী ছিলেন না বরং প্রিয় নবীর গোলাম ছিলেন মাত্র। যদি প্রিয় নবীর গোলামের অদৃশ্য জ্ঞানের এ শান হয় তাহলে খোদ প্রিয় নবীর ইলমে গায়েবের কি শান হবে তোমরাই বল। আল্লাহ তায়ালা সবাইকে হেদায়ত নছিব করুন।

মায়া পরিবর্তন হয়ে গেল ঃ

তাত্ত্বিক জ্ঞানীদের দিশারী ওলমাকুল শিরমণি ফোকহাদের ছেরাগ হযরত মাওলানা শাহ সিরাজ আহমদ খান সাহেব খানপুরী যিনি তৎকালীন যুগের স্বনামধন্য আলেমদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তার পরিচয়ের ব্যাপারে কেবল এতটুকু বলাই যথেষ্ট যে, গোটা পাকিস্তানের আলেমেরা তাকে সিরাজুল ফোকাহা উপাধিতে সম্বোধন করতেন। যার মেহেরবানীর নজরে বড় বড় তাত্ত্বিক জ্ঞানী ও সুখ্যাতি সম্পন্ন আলেমেদ্বীন সৃষ্টি হয়েছেন। এ মহান ব্যক্তি বলেন, পড়া লেখার জীবনে আমাকে এ কথা বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, মাওলানা আহমদ রেজার কিতাবাদী পড়া জায়েজ নাই। এ কারণে আমি আলা হযরতের প্রতি মনোযোগ না দিয়ে তাঁর ব্যাপারে খারাপ ধারণা করতাম। সৌভাগ্যক্রমে আমি পৈত্রিক সম্পত্তির বিষয়ে একটি পুস্তক লিখার কাজ হাতে নিলাম। ঐ পুস্তকটি লিখার সময়ে একটি মাসয়ালার সমাধানে ফেঁসে গেলাম। তখন আমি উক্ত মাসয়ালা সমাধানের জন্য দেওবন্দ সাহারানপুর দিল্লী ও অপরাপর নামকরা ধর্মীয় গবেষণা কেন্দ্রে চিঠি দিলাম, কিন্তু কোন গবেষণা কেন্দ্র থেকে সান্তনামুলক কোন উত্তর না আসায় আমি বিপাকে পড়ে গেলাম। উপায়ান্তর না দেখে শেষ পর্যন্ত ইমাম আহমদ রেজার খেদমতে উক্ত মাসয়ালা সমাধান দেয়ার জন্য চিঠি দিলাম। আলা হযরত মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে মাসয়ালাটির সঠিক সমাধান দিয়ে আমার নিকট চিঠি প্রেরণ করলেন। তিনি এমনভাবে সমাধান দিলেন যে, যা দ্বারা সব কিতাবের দ্বিধা অবসান হয়ে গেল। আলা হযরতের সঠিক সমাধান দেয়ার পর তাঁর ব্যাপারে আমার চিন্তাধারণা সম্পুর্ণভাবে পাল্টে গেল। আর তাঁর ব্যাপারে আমার খারাপ আক্বীদার আমুল পরিবর্তন এসে গেল। অতঃপর আলা হযরতের কিতাবাদী সংগ্রহ করে পড়তে শুরু করলাম। আর পড়ার সময় আমার অনুভূতি হচ্ছিল যে, যেন আমি কেবল আলা

হযরতের কিতাব অনুশীলন করতেছিনা বরং ছাহেবে ব্রেলী তাজেদারে মিল্লাত আলা হযরত ব্রেলী থেকে অনুকম্পা বিতরণে আমার অন্তদর্পন থেকে দেওবন্দীয়্যত ও ওহাবীয়্যতের মরিচা বিদূরিত করে অন্তর থেকে ওহাবীদের মায়া মহাব্বত মুছে দিয়ে বাস্তব ইসলাম আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের জ্যোতি বিচ্ছুরণ করতেছেন। এখন আলা হযরতের কারামতের কথা বলতেছি। আমি আলা হযরতের নিকট পৈত্রিক সম্পত্তির যে মাসয়ালাটির সমাধান চেয়েছিলাম আলা হযরত কেবলা উহার উত্তর পাঠিয়ে লিখেছেন এভাবে "সায়েলে ফাদেল হাদাহুল্লাহ" অর্থাৎ সম্মানিত প্রশ্নকারী আল্লাহ তায়ালা তাকে হেদায়ত দান করুন। এ কথা লিখে সম্ভোধন করা ইহা তার একটি মহান কারামত। যেন তিনি অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা আমার সব কিছু দেখে নিলেন এবং খোদাদাত আধ্যাত্মিকতার ক্ষমতা বলে আমি যে ওহাবী তা জেনে নিলেন। তাই তিনি সামান্য কৃপা বিতরণে আমার জন্য এমন দোয়ার শব্দ ব্যবহার করলেন যা আমার হেদায়তের পাথেয় হয়ে গেল। আর ওহাবী দেওবন্দী শিক্ষকদের পক্ষ থেকে আমার যা হাছিল হয়েছিল সবগুলো আলা হযরত কেবলার নেগাহে করমে ও আল্লাহও তদ্বীয় রাসুলের অশেষ কৃপায় এ সময় হতে আমার অন্তর থেকে বিদূরীত হতে লাগল। শেষ পর্যন্ত আমি ওহাবী আক্বীকা পরিত্যাগ করে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মতাবলম্বী হয়ে গেলাম।

আলা হযরত কেবলা প্রতি বৃহস্পতিবার ব্রেলী শরীফের আপন নিবাস থেকে মদীনা মনোওয়ারা উপস্থিত হতেনঃ

করাচীর অন্তর্গত খারাদর এলাকায় অবস্থিত হযরত শেখ মোহাম্মদ শাহ বোখারী (রাহমতুল্লাহে আলাই) এর মাজার শরীফ সংলগ্ন হায়দরী জামে মসজিদে আলা হযরত আজিমুল বরকত দরিয়ায়ে রহমত শময়ে পরওয়ানায়ে রেসালত ইমামে আহলে সুন্নাত মুজাদ্দেদে দ্বীন ও মিল্লাত ওয়াক্বেফে আসরারে হাকিকত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রেজা খান রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বায়য়াত গ্রহণের অনুমতি প্রাপ্ত খলিফা হযরত মাওলানা জমিলুর রহমান কাদেরী রেজভীর সুযোগ্য সন্তান হযরত আল্লামা মাওলানা হামিদুর রহমান কাদেরী ইমামতি করতেন। তিনি মসজিদে খুব সুন্দর তাকরির করতেন। একদিন তাকরির পেশ করতে গিয়ে প্রসঙ্গতঃ আলা হযরতের শান বর্ণনায় আলা হযরত কেবলার একটি ঈমান তাজাকারী কারামত বর্ণনা করেন তিনি বলেন আমি ছোট ছিলাম, আমার ভালভাবে স্বরণ আছে যে, আলা হযরত কেবলা আমার সাথে ও অন্যান্য ছোট ছেলের সাথে আপনি বলে কথা-বার্তা বলতেন। কখনো ধমক দেয়া তিরস্কার করা ও বকাবকী করা তাঁর মেজাজ শরীফে ছিল না। এক বৃস্পতিবার আমি আলা হযরত কেবলায়ে আলমের পবিত্রময় বাস ভবনে উপস্থিত ছিলাম। ঐ সময়ে এক ব্যক্তি আলা হযরত কেবলার সাথে সাক্ষাত করার উদ্দেশ্যে আসল। তবে তখন সাধারণত সাক্ষাতের সময় ছিল না। এতদ্সত্বেও লোকটা হুজুর কেবলার সাথে দেখা করার জন্য পিড়াপিড়ি করছিল। অতএব আমি আলা হযরত কেবলার বিশেষ কক্ষে এ সংবাদ দেয়ার জন্য চলে গেলাম। ঐ দিকে নিজ কক্ষে নয় বরং সম্পূর্ণ বাড়ীতে আলা হযরত কেবলাকে দেখা যাচ্ছিল না। আমি হতভম্ব হয়ে ভাবতে লাগলাম যে, তিনি কোথায় গেলেন। উপস্থিত সবাই এ কথা ভাবতে লাগল। হঠাৎ দেখলাম আলা হযরত কেবলা আপন বিশেষ কামরা থেকে তাশরীফ নিয়ে আসলেন আমরা সবাই

অবাক হয়ে গেলাম। জিজ্ঞাসা করলাম আমরা যখন আপনাকে খুজতেছিলাম তখন কোথাও দেখা যায়নি। কিন্তু এখন আপনি আপন কক্ষ থেকে তাশরীফ নিয়ে আসতেছেন এতে রহস্য কি? উপস্থিত সবাই বারংবার জিজ্ঞাসা করার কারণে প্রতি উত্তরে তিনি এরশাদ করলেন আলহাম্‌দু লিল্লাহ আজ্জওয়ালা আমি তো প্রতি বৃহস্পতিবার আমার এ কামরা থেকে পবিত্র মদীনায়ে মোনাওয়ারা হাজির হয়ে থাকি। সুবহানাল্লাহ। আলা হযরত কেবলা এমন একজন আশেকে রাসুল ছিলেন যিনি প্রতি বৃহস্পতিবার ব্রেলী শরীফ থেকে পবিত্র মদীনায়ে মোনাওয়ারায় উপস্থিত হতেন।

আলা হযরত কেবলাকে প্রিয় নবীর রওজার সোনালী জালীর সামনে দেখার ব্যাপারে কুতবে মদীনা হযরত জিয়া উদ্দীন আহমদ আল মাদানী আল ক্বাদেরী রেজভীর সাক্ষ্য ঃ

এ ঘটনাটি আমিরে আহলে সুন্নাত আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলিয়াছ আত্তার ক্বাদেরী রেজভী সাহেব বর্ণনা করেন, তিনি বলেন-আমাকে আমার পীর যার নাম আলহাজ্ব মুহাম্মদ জিয়া উদ্দীন আল মাদানী যিনি অনেক বছর যাবত পবিত্র মদীনায়ে পাকে অবস্থানরত আছেন। তিনি মদীনায়ে পাকে একটি ঈমান তাজাকারী ঘটনা শুনালেন।

একদা হজুর মুর্শিদী হযরত জিয়া উদ্দীন মাদানী ক্বাদেরী রেজভী আমার উদ্দেশ্যে বললেন, এটা ঐ সময়ের কথা, যখন ইমামে আহলে সুন্নাত মুজাদ্দেদে আজম আলা হযরত কেবলা বরকতময় জীবদ্দশায় ছিলেন। আমি একদা হুজুরে দো জাঁহা নবীয়ে মুখতার ছাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহে ওয়াছাল্লাম এর নূরানী মাযার শরীফে হাজির হলাম, প্রিয় নবীর পাক চরণে সালাতো সালাম নিবেদন করার পর বাবুস সালামে পৌঁছলাম। সেখান থেকে হঠাৎ আমার নজর সোনালী জালির দিকে গেলো। তখন দেখতে পেলাম আলা হযরত রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু শাহেন শাহে রিসালত মাহবুবে কিবরিয়া ছাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহে ওয়াসাল্লাম এর রওজা শরীফের সামনে হাত বেঁধে সবিনয়ে দন্ডায়মান। এ ঘটনা অবলোকন করে আমি বিস্মিত হয়ে গেলাম এ কথা ভেবে যে, সর্কারে ব্রেলী আলা হযরত রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু মদীনায়ে তৈয়্যবায় উপস্থিত হলেন অথচ আমি খবরই পেলাম না। অতঃপর আমি বাবুস সালাম থেকে রওজা শরীফে হাজির হলাম আলা হযরত কেবলার সাথে দেখা করার উদ্দেশ্যে কিন্তু আমি যখন রওজা শরীফে হাজির হলাম তখন আলা হযরত কেবলা আমার নজরে আসলেন না। আমি বিলম্ব না করে পূনরায় বাবুস সালামের দিকে ফিরে গেলাম। আর বাবুস সালাম থেকে আবার রওজাহ শরীফের দিকে নজর দিলাম তখন দেখতে পেলাম আলা হযরত কেবলা রওজা শরীফে বিনম্রতার সাথে হাজির রয়েছেন। সুতরাং আমি পুনরায় সোনালী জালির সামনে উপস্থিত হলাম। তখনো আলা হযরত কেবলাকে দেখতে পেলাম না। তৃতীয় বারও একই ঘটনা ঘটলো। তখন আমি বুঝতে পারলাম যে, এটা প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের মধ্যকার ঘটনা। তাদের মধ্যখানে হস্তক্ষেপ করা আমার উচিৎ হবেনা।

আলহামদু লিল্লাহ। খুদবে মদীনা স্বাক্ষী দিলেন যে, আলা হযরত কেবলা ব্রেলী শরীফ অবস্থান করে তাজেদারে মদীনা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সোনালী জালির সামনে উপস্থিত হয়েছিলেন।

এটাইতো আশেকে রাসুলের শান, যাদের বুকে রাসুল পাকের প্রেমের ব্যাধী থাকবে তাঁরা যেখানেই থাকুক না কেন মদীনাতেই রয়েছেন।

নাম না জেনে নাম বলে দেয়ার ঘটনা ঃ

হাজী কেফায়ত উল্লাহ সাহেব বর্ণনা করেন যে, একবার আলা হযরত কেবলা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তাঁর এক মুরিদ হাজী খোদা বক্স সাহেবের ঘরে তাশরীফ নিলেন। যখন আলা হযরত কেবলা তাঁর ঘরে আসন গ্রহন করলেন, তখন হাজী সাহেবের ছেলে কিছু মিষ্টি এনে আলা হযরত কেবলার সামনে পেশ করে হুজুর কেবলার খেদমতে আরজ করলেন, হুজুর গিয়ারবী শরীফের ফাতিহা দেন। আলা হযরত কেবলা উহার উপর গিয়ারবী শরীফের ফাতিহা দিলেন আর মাথা মোবারক নিচু করে বসে রইলেন। এরপর হাজী সাহেবের ছেলের স্ত্রী মাথা হতে পা পর্যন্ত পর্দাবৃত করে আলা হযরত কেবলার সামনে এসে দাঁড়ালেন এ উদ্দেশ্যে যে, আলা হযরত কেবলা শির মোবারক উঠালে সালাম করবেন। যখন আলা হযরত কেবলা শির মোবারক উঠালেন তখন ঐ মহিলা তাঁকে সালাম করলেন আলা হযরত কেবলা তার নাম ধরে ডাকলেন এবং বললেন তুমি এখনতো বিবাহিতা। উল্লেখ্য যে, ঐ মহিলা হযরত সৈয়্যদানা শাহ আবুল হোসাইন আহমদ নূরী মিয়া মারেহারভী রাদিয়াল্লাহু আনহুর বায়য়াত ছিলেন। আশ্চর্য কথা হল ছাহেবে দাওয়াতের ছেলের স্ত্রীর মাথা থেকে পা পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে ঢেকে আলা হযরত কেবলার সামনে এসে সালাম করলেন। আলা হযরত কেবলাকে তার নামও বলেনি আর সে হাজী সাহেবের ছেলের স্ত্রী এ কথাও বলেনি। এতদ্সত্বেও আলা হযরত কেবলা তার নাম ধরে বলে দিলেন যে, তুমিতো এ ঘরের ছেলের বিবাহিতা স্ত্রী। সুবহানাল্লাহ! আল্লাহর অলিদের শান এ রকমই হয় যারা আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতা দ্বারা সব কিছু জানেন।

২৪ ঘন্টা পূর্বে না করায়ে ২ ঘন্টা পূর্বে ট্রেনের টিকেট রিজার্ভেশন করার ঘটনাঃ

১৩২৩ হিজরীতে ব্রেলী শরীফ থেকে শাহজাদায়ে আলা হযরত খলিফায়ে আকবর মাওলানা মোহাম্মদ হামেদ রেজা খাঁন তাঁর সফরসঙ্গীদেরকে সাথে নিয়ে হজ্ব করার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেলেন। আলা হযরত কেবলা বলেন আমি নিজে ওদেরকে লক্ষ্ণৌ পর্যন্ত পৌছায়ে দিয়ে ব্রেলীতে ফিরে আসলাম। কিন্তু মেজাজে এক ধরনের ইতস্ততার উদ্ভব হলো। এক সপ্তাহ কেটে গেল। মেজাজ ভারি চিন্তান্তিত রইল। এ এক সপ্তাহ পর্যন্ত মন অস্থির ছিল। মদীনার আকর্ষন আমার মনকে চাঞ্চল্য করে তুলল। মদীনা যাওয়ার ভাবনায় নিমগ্ন ছিলাম। একদিন আছরের নামাজের সময় আমার দূর্ভাবনা বেড়ে গেল। মন মদীনায় হাজেরী দেওয়ার উদ্দেশ্যে বেশী ব্যাকুল হয়ে পড়ল। পরিশেষে মাগরিবের নামাজের পর মৌলভী নজীর আহমদ সাহেবকে ট্রেন ষ্টেশনে পাঠালাম এবং তাকে বলেছিলাম বোম্বাই পর্যন্ত সেকেন্ড ক্লাসের রিজার্ভেশন কক্ষ নিতে। কারণ দ্বিতীয় স্থরে রিজার্ভেশন কক্ষে আরামে নামাজ পড়া যায়। তিনি ষ্টেশনে পৌছে ষ্টেশন মাষ্টারের কাছে সেকেন্ড ক্লাসের রিজার্ভেশন সিটের ব্যাপারে টিকেট চাইলেন। ষ্টেশন মাষ্টার জিজ্ঞেস করলেন কোন ট্রেনের ইচ্ছা করেন। তিনি বললেন আজ রাত ১০টায় যে ট্রেনটি যাবে সে ট্রেনে। ষ্টেশন মাষ্টার বললেন আপনি এ ট্রেন পাবেন না। কারণ এ ট্রেনে যেতে হলে ২৪ ঘন্টা পূর্বে অবহিত করার প্রয়োজন ছিল। আমি বেছারা হতাশ হয়ে ফিরতে ছিলাম। তবে মনে মনে চিন্তা করলাম আলা হযরত কেবলা যেহেতু পাঠিয়েছেন সেহেতু একটা ব্যবস্থাতো হবেই। এ চিন্তা করতেছিলাম এমতাবস্থায় একজন টিকেট কালেক্টর যিনি নিকটে থাকতেন তার সাথে আমার দেখা হয়ে গেছে। তিনি আমাকে ষ্টেশনে কেন আসলাম এ কথা জিজ্ঞাসা করলে আমি তাকে

ঘটনা খুলে বলি। তখন তিনি আমাকে বললেন চিন্তা করবেন না আমি ব্যবস্থা করতে যাচ্ছি। একথা বলে তিনি সোজা ষ্টেশন মাষ্টারের নিকট গিয়ে বললেন স্যার উনিতো আমাকে গতকাল বলে গেছেন কিন্তু আমি আপনাকে বলতে ভূলে গেছি। তখন তিনি ১৬৩ টাকা ৫ আনা নিয়ে সেকেন্ড ক্লাসের কামরা রিজার্ভ করে দিলেন। উল্লেখ্য যে, ভারতের মধ্যে দুরপাল্লার কোথাও যাওয়ার জন্য ট্রেনের কামরা রিজার্ভেশন করতে চাইলে ২৪ ঘন্টা আগে বুকিং দিতে হয়। কিন্তু আলা হযরত কেবলা ২৪ ঘন্টা পূর্বে বুকিং না দিয়ে ২ ঘন্টা পূর্বে টিকেটের জন্য পাঠানোর কারণ হল তিনি বেলায়তের নজরে দেখেছেন যে, টিকেটের ব্যবস্থা হয়ে যাবে। সুবহানাল্লাহ! এটাই আল্লাহর অলিদের শান যারা অসাধ্য সাধ্য করতে পারেন, অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারেন, যা সাধারণ মানুষেরা দেখেনা তা তাঁরা দেখেন।

দেরী হওয়া সত্বেও আপনজনদের সাথে হজ্বে যেতে পারার ঘটনা ঃ

ইমামু ইশকো মুহাব্বত আলা হযরত শাহ আহমদ রেজা খাঁন ব্রেলভী নিজেই বর্ণনা করেন-আমি রেল ষ্টেশনে পৌছে একটি টেলিগ্রামের মাধ্যমে বোম্বাইতে রওয়ানা হওয়ার কথা বললাম। টেলিগ্রাম পেয়ে ওখানকার সবাই ধারণা করল সম্ভবত হাসান মিয়া (আলা হযরত কেবলার) ভাই, তাশরীফ আনতেছেন ঐ ব্যাপারে যে তিনি আগামী বছর হজ্বে যাওয়ার উদ্দেশ্যে করেছেন। আমি (আলা হযরত) তো হজ্বে যাচ্ছি এ কথা কারো কল্পনাতে নাই। যাক আমি বোম্বাই পৌছা পর্যন্ত সকলে দোদল্যতার মধ্যে ছিল। এদিকে পথে আমার একদিন দেরী হয়ে গেল। অর্থাৎ আমি যে ট্রেনে আরোহণ করে যাচ্ছি উক্ত ট্রেনটি আঘাই গিয়ে থেমে গেল এবং আমাদের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিল আর যাত্রীর জন্য অপেক্ষা করতে লাগল আমার সাথে যিনি বোম্বে পর্যন্ত যাচ্ছেন তিনি হচ্ছেন মাওলানা নজীর আহমদ সাহেব তিনি ট্রেন থেকে অবতরণ করে ষ্টেশন মাষ্টারের নিকট গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আমরা যে ট্রেনে করে যাচ্ছি উহার সংযোগ বিচ্ছিন্ন করলেন কেন? তখন ষ্টেশন মাষ্টার উত্তর দিলেন, মেইল রিজার্ভেশন ছিলনা। আপনাদেরকে লোকেলে যেতে হবে। ইতিমধ্যে ঐদিন এসে গেল যেদিন হাজীদেরকে বোম্বাই করনতিনা অর্থাৎ ছোঁয়াছ রোগের কেন্দ্রে প্রবেশ করানো হয়। ছোঁয়াছ রোগ আছে কিনা ইহা পরীক্ষা করার জন্য। আমি এ চিন্তায় অস্থির যে আমার লোকেরা করনতিনায় প্রবেশ করবে আর আমি এখনো না পৌছে রয়ে গেছি। এখন ঠিক সময়ে না পৌঁছতে পারলে কি হবে এবং কিভাবে যাব। সেদিন ছিল বৃহস্পতিবার। টেলিগ্রাম এসেছে যে যাত্রীরা হজ্বে যাচ্ছেন আপনারা আজ তথা বৃহস্পতিবার ভপারা হয়ে তথা চেক দিয়ে করনতিনায় প্রবেশ করুন। গাড়ী সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে আমার দেরী হয়ে গেল এবং আমি বৃহস্পতিবা না পৌঁছে শুক্রবার সকাল ৮টায় পৌঁছলাম। ষ্টেশনে পৌঁছে দেখলাম মুম্বাইতে আমার যে বন্ধু-আত্মীয়-স্বজন আপনজন রয়েছেন তারা সবাই এসে ভিড় জমিয়েছেন। হাজী কাসেম ও আরো কয়েকজন গাড়ী নিয়ে উপস্থিত। তাদের সাথে সালাম, করমর্দন ও কুশল বিনিময় হওয়ার পর তারা আমাকে বললেন আপনি কোথাও যাবেন না সোজা করনতিনায় চলুন। এখনো আপনার লোকেরা প্রবেশ করেননি। এ কথা শুনে আমি আল্লাহ তায়ালার শোকর আদায় করলাম। কারণ একদিন দেরী হয়ে যাওয়ার পরও আমি আমার লোকদের সাথে করনতিনা প্রবেশ করতে পেরেছি। ইহা হাদীসে পাকের ঐ দোয়ার বরকত যা পড়লে উদ্দেশ্যে পূর্ণ হয়। অর্থাৎ আমি প্রিয় নবীর হাদীসে পাক থেকে ঐ সকল দোয়া পড়েছি যাতে আমি আমার লোক জনের সাথে হজ্বে যেতে

পারি। যাক এখন আমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলাম ব্যাপার কি? ভপারা পাবার কথাতো গতকাল তথা বৃহস্পতিবার ছিল। মানুষেরা বললেন, আশ্চর্য বিষয় খুব বিস্ময় এর ব্যাপার এ ধরণের ঘটনা আর কখনো হয়নি। এ বারই প্রথম হয়েছে। বৃহস্পতিবার নির্ধারিত সময়ে ডাক্তার এসেছেন এবং অর্ধেক মানুষকে চেক দিয়েছেন হঠাৎ তিনি কিংকর্তব্যবিমোড় হয়ে পড়লেন এবং বললেন বাকীদের চেক আগামীকাল হবে। এ-কারণে আপনার লোকেরা অবশিষ্ট রয়েছেন। আসলে এখানে মজার ব্যাপার হল আলা হযরত কেবলার ইচ্ছা ছিল তিনি তাঁর আপনজনদের সাথে হজ্বে যাবেন। তাই একদিন দেরী হওয়া সত্বেও আলা হযরত কেবলা তাঁর আপনজনদেরকে পেয়েছেন। এটা আল্লাহর মকবুল বান্দাদের শান। যারা যা ইচ্ছা করেন আল্লাহ তায়ালা তা পূরণ করেন।

আলা হযরতের জন্য কুপের পানি উপরে উঠে গেল ঃ

১৩২৩ হিজরীতে আলা হযরত কেবলা মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় হজের যাবতীয় কার্যাদী সমাপনের পর মদীনায়ে মোনাওয়ারায় প্রিয় নবীর দরবারে হাজিরা দেয়ার উদ্দেশ্যে কাফেলা সহকারে রওয়ানা হয়ে গেলেন। তৎকালীন সময়ে হাজী সাহেবানরা উট, খচ্চর ও গোড়ার উপর আরোহণ করে সফর করত। বর্তমানে যে আধুনিক যানবহণ রয়েছে তখনকার সময়ে তা ছিলনা। উট, ঘোড়া ও খচ্চরের মাধ্যমে মক্কা শরীফ থেকে মদীনা শরীফে পৌঁছতে তখন ১২/১৪দিন সময় লাগত। (কিন্তু বর্তমানে আধুনিক যানের মাধ্যমে ইচ্ছা করলে মক্কা শরীফ থেকে মদীনা শরীফে এক দিনেও যাওয়া যায়) যখন আলা হযরতের কাফেলা গন্তব্যস্থানে তথা মদীনা শরীফে পৌঁছল তখন জোহরের নামাজের ওয়াক্ত হল। সকলে পায়খানা প্রস্রাব সেরে অযু করে জোহরের নামাজ আদায় করার জন্য পানির খোজ করতে লাগলেন। স্বয়ং আলা হযরতও পানির সন্ধানে একদিকে চললেন। আমাদের মনে হচ্ছিল যে, এ রাস্তাটি আলা হযরতের পরিচিত। তিনি কিছু সামনে যাওয়ার পর একটি কুপ পেলেন যা অনেক গভীর ছিল সাথে তাঁর খাদেম হাজী কেফায়ত উল্লাহ সাহেব ছিলেন। তিনি বালতিতে রশি বেঁধে কুপে ফেললেন কিন্ত কুপটি বেশী গভীর হওয়ার কারণে বালতি কুপের পানি পর্যন্ত পৌঁছল না। হাজী কেফায়েত উল্লাহ সাহেব নিজ মাথার পাগড়ি খুলে বালতির রশির সাথে জোড়া লাগায়ে কুপের মধ্যে ফেলার পর কিছু পানি তুললেন। ঐ পানি কাফেলার অন্যান্য লোকেরা পায়খানা প্রস্রাব করার জন্য নিয়ে গেলেন। হাজী কেফায়েত উল্লাহ সাহেবও তাদের সাথে পস্রাব করতে গেলেন। হাজত সারার পর লোকেরা কুপের পাসে এসে দেখলেন আলা হযরত কুপ থেকে পানি তুলে অন্যান্য পাত্র পরিপূর্ণ করতেছেন। তিনি কুপের মধ্যে বালতিও ফেলতেছেন এবং রশি কয়েকহাত নিছে যেতে না যেতে টেনে তুলতেছেন আর বালতিও পানিতে পরিপূর্ণ উঠতেছিল। এ ঘটনা দেখে হাজী কেফায়ত উল্লাহ সাহেব আলা হযরত কেবলার খেদমতে আরজ করলেন হুজুর! কূপের পানি এত নিচে ছিল যে, আমি আমার মাথার পাগড়ি খুলে বালতির রশির সাথে বেঁধে পানি তুলেছিলাম। কিন্তু হুজুর! আপনি পাগড়ি ব্যতিত কয়েক হাত বালতির রশি কূপে ঢেলে এত তাড়াতাড়ি পানি তুললেন কিভাবে? আমাদের কারো বুঝতে অসুবিধা হলনা যে, ইহা ইমামে আহলে সুন্নাতের জিন্দা কারামত। কিন্তু আলা হযরত কেবলা তাঁর কারামত গোপন করে এরশাদ করলেন হাজী সাহেব আপনি যে দিক থেকে পানি তুলেছেন ঐ জায়গাটা একটু উচু ছিল,

আর আমি যে দিক থেকে পানি তুলতেছি এ জায়গাটা উহার তুলনায় একটু নিচু। তাই বালতির রশির কিছু পার্থক্যতো হবেই। বাস্তবিক পক্ষে ঐ কুপটার উচু নিচু কোন পার্থক্য ছিল না। আলা হযরত কেবলা যখন ঐ কুপে বালতি ফেললেন তখন ঐ গভীর কুপের পানি এমনিতেই নিচু থেকে উপরে উটে বালতি পরিপূর্ণ হয়ে গেল যাতে ইমামে আহলে সুন্নাতের কষ্ট না হয়। কিন্তু আলা হযরত কেবলা আপনা কারামতকে চুপায়ে রাখলেন। হ্যাঁ বিভিন্ন কিতাবে পাওয়া যায় আল্লাহর অলিরা কারামতকে জনচক্ষু থেকে এমনভাবে লুকাতে চায় যেমনিভাবে ঋতুশ্রাববর্তী মহিলারা তাদের ঋতুশ্রাবকে পুরুষ লোকের নিকট থেকে গোপন রাখে। তবে আল্লাহর অলিরা তাদের কারামতকে মানুষের নিকট গোপন রাখতে চাইলেও কখনো কখনো আল্লাহ তায়ালা তাদের পরিচিতির জন্য জনসম্মুখে তা জাহের করে দেয়। সম্ভবত আলা হযরতের জন্য কুপের পানি উপরে উঠার ঘটনাও সেরকম হবে।

একটি বরকতময় সিকি (২৫ পয়সা) ঃ

হজ্বের মৌসম ছিল পৃথিবীর বিভিন্ন দিক থেকে মুসলমান নরনারীরা পবিত্র মক্কায়ে মোয়াজ্জমার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেল। হিন্দুস্থানের শ্রেণী শরীফ থেকে হাজিরা হজ্ব পালনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হচ্ছিল। একদা আলা হযরত কেবলা হাজীদের অভ্যর্থন জানানোর জন্য বন্দর যাওয়ার কথা ছিল। বন্দর যাওয়ার জন্য প্রস্তাবিত যানবাহন আসতে দেরী হয়ে গেল। যানবাহন আসতে দেরী হওয়ায় আলা হযরত কেবলার একজন মুরিদ গোলাম নবী মিস্ত্রী কাউকে না জানায়ে টাঙ্গা (গোড়ার গাড়ী) আনার জন্য চলে গেলেন। গোলাম নবী সাহেব যখন টাঙ্গা নিয়ে ফিরে আসলেন তখন দুর থেকে দেখাগেল যে, ঐ যানবাহনটি এসেছে যা আসার কথা ছিল। কাজেই তিনি টাঙ্গা ওয়ালাকে একটা সিকি দিয়ে (২৫ পয়সা) বিদায় করে দিলেন। এ ঘটনা সম্পর্কে কেউ অবগত ছিল না। ৪ দিন পর গোলাম নবী মিস্ত্রী সাহেব যখন আলা হযরত কেবলার দরবারে হাজির হলেন তখন আলা হযরত কেবলা তাকে একটি সিকি দান করলেন। মিস্ত্রী সাহেব আরজ করলেন এটি কিসের? আলা হযরত কেবলা এরশাদ ফরমালেন ঐ দিন টাঙ্গা ওয়ালাকে আপনি যা দিয়েছিলেন। মিস্ত্রী সাহেব কিংকর্তব্যবিমোড় হয়ে গেলন। তিনি মনে মনে চিন্তা করলেন আমিতো এ কথা কারো নিকট কখনো মুখেও উল্লেখ করেনি। তবুও আলা হযরত কেবলার জানা হয়ে গেল। তাকে এভাবে চিন্তা ভাবনায় মগ্ন দেখে উপস্থিত লোকেরা বলল মিয়া সিকি কেন ছাড়ছ। তাবারুক হিসাবে রেখে দাও। মিস্ত্রী সাহেব তা রেখে দিলেন। কথিত আছে যে, যতদিন পর্যন্ত ঐ সিকি তার নিকট ছিল ততদিন পর্যন্ত তার টাকা পয়সার অভাব হয়নি। সুবহানাল্লাহ! এটাইতো আল্লাহর অলিদের শান। যারা তাই দেখতে পান যা অন্যান্যরা দেখেনা, তা জানতে পারেন যা অন্যান্য লোকেরা জানতে পারে না।

রাসুলে পাকের সরাসরি দর্শন লাভ ঃ

আলা হযরত আজিমুল বরকত ইমামে ইশকো মুহাব্বত শাহ ইমাম আহমদ রেজা ফাযেলে ব্রেলভী (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) যখন পবিত্র মক্কায়ে মোকাররমায় হজ্ব পালন শেষে পবিত্র মদীনায়ে মোনাওয়ারা তাশরীফ এনে রাসুলে পাকের রওজায়ে আকদসের পুতঃপবিত্র জালির সামনে দাঁড়ালেন। ইহা ঐ স্থান যেখানে প্রতিদিন ৭০ হাজার ফেরেস্তা দরুদ ও সালামের নজরানা পেশ করার জন্য এসে থাকেন। আরশ ওয়ালা সালাত ও সালাম

পড়েন। পরশ ওয়ালারাও সালাতো সালাম পড়তেছেন। আলা হযরত কেবলাও প্রেম সাগরে ডুব দিয়ে স্বীয় আকা ওয়ামাওলা আলাইহিস সালাতু ওয়াসাল্লামের বারেগাহে সালাত ও সালাম পড়া আরম্ভ করে দিলেন। প্রথমেতো মদীনায়ে মোনাওয়ারার হাজারো মাইল দুর থেকে প্রিয় নবীর ইশকে মুহাব্বতের আগুনে বিদগ্ধ হয়ে পড়তেন-

(১) "কাবে কে বদরুদ্দোজা তুমপে করোরো দরুদ
তায়্যেবা কে শামসুদ্দোহা তুমপে করোরো দরুদ,
(২) শাফেয়ে রোজে যজা তুমপে করোরো দরুদ
দাফেয়ে জুমলা বালা তুমপে করোরো দরুদ"

অর্থাৎ ১. কাবাতুল্লার কুফর ও শিরকের ঘোর অন্ধরাচ্ছন্নের পুর্ণিমার চাঁদ আপনার উপর কোটি কোটি দরুদ।

হে মদীনায়ে তায়্যেবার দ্বি-প্রহরের সময়ের সুর্য আপনি মুশরিক ইহুদী-নাসারা কুফরী ও বদ আক্বীদা সমূহকে শেষ করে ইসলামের আলো দ্বারা আলোকিত করেছেন আপনার উপর অগণিত অপরিসীম দরুদ ও সালাম।

২. ক্বিয়ামতের দিন ময়দানে হাশরে গুনাহগার উম্মতের সুপারিশকারী আপনার উপর কোটি কোটি দরুদ।

উম্মতের সকল বালা মছিবত বিদূরণকারী আপনার উপর কোটি কোটি দরুদ ও সালাম।

এ সত্যিকার আশেক হিন্দুস্থানের জমিনে নেই বরং তাজেদারে মদীনার দরবারে আকদসের সামনে দাড়িয়ে এভাবে সালাত ও সালামের নজরানা পেশ করতেছেন যথা-

مصطفے جان رحمت پہ لاکھوں سلام
شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام

১. মোস্তফা জানে রহমত পে লাখো সালাম
শময়ে বজমে হেদায়ত পে লাখো সালাম।

شہر یارارم تاج دار حرم
نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام

২. শেহরে ইয়ারে ইরম তাজেদারে হেরম
নোবাহারে শেফায়ত পে লাখো সালাম।

অর্থ- ১. মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সকল প্রাণের জন্য রহমত আপনার উপর লক্ষ সালাম।

আর পথ নির্দেশকদের অনুষ্ঠানের দীপ্তি আপনার উপর লাখো সালাম।

২. জান্নাতের বাদশা হেরেমের হাকেম, শাফায়াতের নতুন বসন্ত ও শাফায়াতের দ্বার উম্মোচনকারী আকা মাওলা শফীয়ে রোজে জাযার উপর লাখো সালাম।

আলা হযরত কেবলা প্রিয় মাহবুবের সোনালী জালির সামনে খুব বিনম্র ও শিষ্টাচারের সাথে দাঁড়িয়ে মোস্তফা জানে রহমত পে লাখো সালাম শময়ে বজমে হেদায়ত পে লাখো সালাম এ সালাত ও সালাম তার অধরোষ্ট মোবারক নাড়িয়ে উচ্চারণ করার সাথে সাথে মনও দোলতেছিল। আঁখি দিয়ে অশ্রু জ্বলের প্রসবণধারা প্রবাহিত হচ্ছিল। এভাবে সালাত ও

সালাম পেশ করার শেষ পর্যায়ে নবীকুল শিরমণি মহান আল্লাহ তায়ালার প্রিয় মাহবুব ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে আবেদন করলেন এভাবে, ইয়া রাসুলাল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমি আপনার আশেকে সাদেক্ব সুদুর হিন্দুস্থান থেকে এসে আপনার দরবারে আপনার নূরানী কদমেপাকে হাজির হয়েছি। হুজুর আমার ঈমান-আপনি হায়াতুন্নবী, জিন্দা নবী, আপনি রওজাপাকে জিন্দা অবস্থায় আরাম ফরমাচ্ছেন। সুতরাং আপনি রওজা শরীফ থেকে একটু তাশরীফ এনে (উঠে) আপনার খাটি আশেককে দীদার দান করুন (দেখা দিন) প্রিয় নবীর প্রেমের আগুনে বিদগ্ধ অকৃত্রিম আশেক আলা হযরত কেবলা এ আবেদনটুকু প্রিয় নবীর দরবারে পেশ করলেন। কিন্তু ঐ সময় তাঁর আবেদন কবুল হল না। এটাও মাহবুবানা একপ্রকার খেলা। প্রিয় নবীর দর্শন না পাওয়ার কারণে তিনি (আলা হযরত) খানা পিনা ছেড়ে দিয়ে অনশন করলেন। এভাবে একদিন অতিবাহিত হল, তারপর দিনও অতিবাহিত হয়ে গেল, কিন্তু তিনি প্রিয় নবীর দর্শন পেলেন না। এভাবে অনশনের মধ্যে দু'দিন অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর তৃতীয় দিন আলা হযরত কেবলা প্রিয় নবীর দর্শন লাভের জন্য একটি দীর্ঘ কবিতা রচনা করে তা প্রিয় নবীর দরবারে আবৃতি করতেছিলেন। এ কবিতার প্রথমের দু'টি ও শেষের একটি লাইন উল্লেখ করা গেল। যথা-

وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں ☆ تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں

(১) উয়ো ছোঁয়ে লালা জার ফেরতেহেঁ *তেরে দিন আই বাহারে ফেরতেহেঁ।

جو تیرے در سے پھر گئے ہیں ☆ در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں

(২) জু তেরে দরছে জু ইয়ার ফেরতেহেঁ *দরবদর ইয়োহি খারো ফেরতেহেঁ।

এ কবিতাটি অনেক লম্বা এটার শেষ পংক্তি যথা-

(৩) কুয়ি কিয়ঁও পুঁছে তেরে বাতে রেজা * তুজছে কুত্তে হাজারো ফেরতেহেঁ।

অর্থ- ১ ঃ লালা ফুলের বাগানের দিকে এখন তার গমন হয়েছে হে বসন্তের মৌসুম এখন তোমার কাছে বসন্ত আসার সময় এসেগেছে। তোমার দুর্ভাবনা বিদূরিত হয়ে গেছে। তোমার দিন ফিরে গেছে, তথা তোমার সৌভাগ্য এসেগেছে। কবিতার লাইনের মমার্থগত উদ্দেশ্য হল আলা হযরত নিজেকে সান্তনা দিয়ে বলতেছেন হে আহমদ রেজা তুমিতো আসল জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছ। এখন চিন্তা কিসের তোমার কোপালতো খুলে গেছে, তোমার ভাগ্যের তারা চমকায়েছে। এখন প্রিয় নবীর দর্শন পেয়ে মনের জ্বালা দুরিভূত হয়ে যাবে।

অর্থ- ২ ঃ এ আমার আকা মাওলা আপনার দরজা হতে যে নিরাশ হয়ে ফিরে যায় সে এগিক সেদিক যেখানে যায় সেখানে অপদস্থ এবং অপমানিত হয়, তার আশ্রয়ের কোন ঠিকানা থাকেনা। আর পৃথিবীতে সর্বোচ্চ আশ্রয়স্থল হল আপনার দরবার। সুতরাং আপনার দরবার থেকে যে অকৃতকার্য হয়ে ফিরবে সে আশ্রয়হীন হয়ে ভবঘুরে হয়ে যাবে। যেখানে যাবে সেখানে অপদস্থ হবে। অতএব হে আমার আকা আপনি আমাকে আপনার দরবার থেকে দীদার না দিয়ে নিরাশ করবেন না।

অর্থ- ৩ ঃ আলা হযরত কেবলা প্রিয় নবীর দর্শন লাভের জন্য দীর্ঘ কবিতা পড়তে পড়তে যখন নবীজির দেখা পাচ্ছিলেন না তখন শেষে নিজেকে সম্বোধন করে বললেন, হে আহমদ

রেজা! তোর অবস্থা তোর খবর নেয়ার আর তোর কথা চিন্তা করার কারো কি কোন প্রয়োজন আছে? তোর মত হাজার হাজার এ ধরনের আশেক এ দরবারে হাক মেরে মেরে ঘোরা ফিরা করে। অর্থাৎ সব শেষে আলা হযরত কেবলা নবিজীর দর্শন না পেয়ে নিজেকে সান্তনা দিয়ে বললেন, হে রেজা তুমি এত অস্থির হচ্ছ কেন? যে দরবারে তোমার মত হাজার হাজার আশেক্ব দিনরাত ঘুরাফেরা করে কার খবর কে নেবে।
তাই তোমার খবর নেয়ারকি কেউ আছে? তোমার খবর জানা কি কারো দরকার আছে।
এটা বলার সাথে সাথে পুনরায় প্রিয় নবীকে স্বশরীরে দেখার বাসনা পেশ করলেন। আবেদনও অনেক বড় ছিল আর আবেদনকারীও ছিলেন ওলমাকুল শিরমণি আধ্যাত্বিক জগতের নিপুণ অশ্বারোহী ইশক্বে মুহাব্বতের তাজেদার ঐদিকে আবেদনের দরবারও অনেক বড় দরবার যেখান থেকে আবেদনকারীকে ফেরৎ দেয়া হয়না। কবি বলতেছেন-

"ইয়ে দরবারে মুহাম্মদ হেঁ ইহা আপনোকা কিয়া কেহনা
ইহাছে হাত খালি গাইর বি জায়া নেহি করতে"।

অর্থ-এটাতো মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবার যেখানে নিজেদের তথা নবীকে যারা মানেন ভালবাসেন তাদের কথা কি বলব তারা হামেশা পেয়েই থাকেন। পক্ষান্তরে যারা নবীকে মানেনা ভালবাসেনা তারা যদি ফরিয়াদ করে তখন তারাও নৈরাশ হয়ে খালি হাতে ফিরেনা। অর্থাৎ প্রিয় নবী হচ্ছেন রাহমতুল্লিল আলামীন, তাঁর কাছে যে কেউ কিছু প্রার্থনা করুক না কেন তিনি তাকে অকাতরে রহমত বিতরণ করেন।
আলহামদু লিল্লাহ! এ কথা বলতে না বলতে আলা হযরত কেবলা প্রিয় নবীর দর্শন পেয়ে ধন্য হলেন। তিনি যখন প্রিয় নবীর দেখা পেলেন তখন প্রিয় রাসুলের খেদমতে আরজ করলেন ইয়া রাসুলাল্লাহ, আপনি আমাকে প্রথমে দেখা দেননি কেন? প্রিয় নবী উত্তর দিলেন হে আহমদ রেজা প্রথমে দেখাদিলে তুমি কি আর এখানে কান্নাকাঠি করতে? এদিকে আমার দীদারের জন্য তুমি কাঁদতেছ ঐ ভালবাসার কান্না আমার কাছে অনেক ভালা লাগতেছে। শেষে যখন তুমি নিজেকে নিরাশ মনে করলে তখন আমি তোমাকে দর্শন দিলাম। কারণ আমার দরবার থেকে কেউ খালি হাতে ফিরে যায় না। তাই তুমি কি ফিরে যাবে?
সুব্হানাল্লাহ! এ দ্বারা প্রমাণিত হলো প্রিয় নবী হচ্ছেন হায়াতুন্নবী তথা জিন্দা নবী। স্বশরীরে জাগ্রত অবস্থায় আলা হযরত কেবলা প্রিয় নবীকে দেখে বলে উঠলেন-

(১) তুজিন্দাহে ওয়াল্লা তুজিন্দাহে ওয়াল্লা * মেরে ছশমে আলম ছে ছুপ জানে ওয়ালে।
(২) মাই মুজরিম হো আখা মুজে ছাত লে লও * কে রাস্তে মে হেঁজা বজাতানে ওয়ালে।

অর্থ-১. খোদার কসম! আপনি জীবিত খোদার কসম! আপনি জীবিত আপনি আমার এ বাহ্যিক দৃষ্টি থেকে পর্দা করেছেন।

অর্থ-২. আলা হযরত কেবল দ্বিতীয় লাইনে বলেন, হে আমার আঁকা ওয়া মাওলা আমাকে আপনার আশ্রয়ে আপনার সাথে নিয়ে চলুন আমি বড়ই পাপি পথের মধ্যে ঘাটে ঘাটে ঈমান চোরেরা উৎপেতে বসেছে বিশেষ করে তাহানাবুন তথা আশ্রফ আলী থানবীর অনুসারীরা যারা মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে সরলপ্রাণ মুসলমানদের মুল্যবান সম্পদ ঈমান হরন করতেছে।
সুবহানাল্লাহ! আলা হযরত কেবলা প্রিয় নবীকে জাগ্রত অবস্থায় স্বশরীরে দেখে আল্লার হলফ করে বলতেছেন ইয়া রাসুলাল্লাহ আল্লার শপথ আপনি জিন্দা কিন্তু আমাদের দুনিয়াবী

জাহেরী দৃষ্টি থেকে গোপন রয়েছেন। উল্লেখ্য যে, আম্বিয়ায়ে কেরামগণ সাধারণ মানুষের মত মৃত্যুবরণ করেন না। তবে হ্যাঁ তাদেরও মৃত্যু আসে যা স্থান পরিবর্তন মাত্র। অর্থাৎ তারা নশ্বর পৃথিবী থেকে চিরস্থায়ী স্থানের দিকে স্থানান্তরিত হন। যা বিশুদ্ধ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। এ বিষয়ে অনেক হাদীস শরীফ রয়েছে যা হতে পাঠকদের উপকারান্তে নিম্নে ২/১টি হাদীস বর্ণনা করলাম।

হযরত ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম বায়হাকী হযরত আউশ বিন আউস শকফী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণনা করেন যে, হুজুর পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান-তোমাদের দিনসমূহের মধ্যে উত্তম দিন হচ্ছে জুমার দিন। সুতরাং তোমরা ঐ দিনে আমার উপর খুব বেশীকরে দরুদ প্রেরণ করবে। এজন্য যে, তোমাদের দরুদ আমার কাছে পেশ হয়ে থাকে। সাহাবায়ে কেরামগণ আবেদন করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদের দরুদ আপনার সমীপে কিভাবে পেশ হবে? যখন আপনার শরীর মোবারক অবশিষ্ট থাকবে না। উত্তরে প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমালেন-

ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء

"ইন্নাল্লাহা হাররামা আলাল আরদে আন তায়া'কুলা আজছাদাল আম্বিয়া"।

অর্থ- নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা আম্বিয়ায়ে কেরামের শরীর ভক্ষন করাকে জমিনের উপর হারাম করেদিয়েছেন। অর্থাৎ আম্বিয়ায়ে কেরাম স্বশরীরে কবর শরীফে জিন্দা থাকেন। হযরত ইমাম বায়হাকী স্বরচিত কিবাত হায়াতুল আম্বিয়ার মধ্যে আর ইমাম ইছবাহানী স্বীয় তারগীব কিতাবের মধ্যে হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণনা করেন-হুজুর আকদাস ছাল্লাল্লাহু আলহিহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান-

ان علمى بعد موتى كعلمى فى الحياة

"ইন্না এলমি বাদা মউতি, কা এলমী ফিল হায়াত"

অর্থ- নিশ্চয় ইন্তেকালের পর আমার জ্ঞান এমন থাকবে যেমন দুনিয়াবী হায়াতে রয়েছে। অর্থাৎ আমি দুনিয়াতে জাহেরী জীবনে যেমন সব কিছু জানি, সবকিছুর জ্ঞান আমার কাছে আছে আমি দুনিয়া থেকে পর্দা করার পরও তেমন জানব। সব কিছুর খবর রাখব। এ দ্বারা বুঝা গেল, প্রিয় নবী যেহেতু বেছালের পরও জানবে তাহলে অবশ্যই তিনি হায়াতুন্নবী।

দলায়েলুন নবুয়াতের মধ্যে হযরত আবু নাঈম হযরত সাঈদ ইবনে মুসায়েব রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণনা করেন, হযরত সাঈদ ইবনে মুসায়েব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ওয়াকিয়ায়ে হিররা তথা মদীনায়ে মোনাওয়ারায় ইয়াজিদের আক্রমন যে সময় হয়েছিল ঐ সময় মসজিদে নববী শরীফে কেবল আমি ছাড়া আর কেউ ছিলনা।

وما يأتى وقت الصلواة الا سمعت الاذان من القبر

"ওয়ামা ইয়াতি ওয়াক্তুসসালাতে ইল্লা ছামিতুল আজানা মিনাল কবরে"

অর্থ-প্রত্যেক নামাজের ওয়াক্তে আমি প্রিয় নবীর মাজারে আনওয়ার থেকে আজানের আওয়াজ শুনতাম অর্থাৎ এজিদের ভয়ে কেউ মসজিদে নববী শরীফে আসতেছিলনা। শুধুমাত্র আমিই ছিলাম প্রকাশ্য আজান হচ্ছিলনা। কিন্তু আজান না হলেও আমি নামাজের ওয়াক্তে ওয়াক্তে আজানের আওয়াজ শুনেছি। এ দ্বারা বুঝা গেল প্রিয় নবী জীবিত এবং স্বশরীরে মাজারে পাকে আরাম ফরমাচ্ছেন।

সুবহানাল্লাহ! আলা হযরত কেবলা প্রিয় নবীর দর্শন পেয়ে দীদারের তৃষ্ণা নিবারণ করলেন। এটা এমন দরবার যেখানে বাদশারা বাদশাহী ছেড়ে দিয়ে গোলাম বনে যায়। আর দুশমনেরা তো দুশমনি করতেই থাকবে। যেমন নিম্নোক্ত ঘটনা থেকে আমরা জানতে পারি ৫৫৭ হিজরীতে সুলতান নুর উদ্দীন মাহমুদ শহীদ বিন এমাদুদ্দিন জঙ্গী আকাঁয়ে দোঁ'জাহা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে এক রাতে তিন বার স্বপ্ন দেখলেন। রাসুলে পাক তাকে দু'ব্যক্তির প্রতি ইশারা করে এরশাদ ফরমালেন যে, তাড়াতাড়ি আস এ দু'ব্যক্তি যারা দাঁড়িয়ে আছে তাদের অন্যায় অত্যচার থেকে আমাকে রক্ষা কর। সুলতান নুরুদ্দীন জঙ্গী জাগ্রত হওয়ার পর স্বীয় অভিজ্ঞতার আলোকে চিন্তা করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, নিশ্চয় মদীনায়ে মোনাওয়ারায় বিস্ময়কর বিরল কোন ঘটনা সংঘঠিত হয়েছে। এ জন্য অতি দ্রুত মদীনা শরীফে পৌঁছা প্রয়োজন। উল্লেখ্য যে, সুলতান যখন স্বপ্ন থেকে জাগ্রত হলেন তখন ছিল রাত্রের শেষ ভাগ। সুলতান ঐ সময় তার বিশজন খাদেমকে সাথে নিয়ে দ্রুতগামী উষ্টের উপর আরোহণ করে মদীনায়ে পাকের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেলেন সাথে প্রচুর পরিমান ধন সম্পদ নিয়ে গেলেন। তিনি একটানা ১৬ দিন সফর করার পর পরিশেষে পবিত্র মদীনায়ে মোনাওয়ারায় প্রবেশ করলেন। মদীনায়ে পাকে পৌঁছার সাথে সাথে ঐ দুজন অভিশপ্ত ব্যক্তির উপস্থিতি এবং তাদের পরিচয়ের কৌশল বের করলেন। এর ভিত্তিতে সুলতান নুরউদ্দীন ঘোষণা করলেন মদীনা শরীফের প্রত্যেক বাসিন্দা যাতে আমার কাছে উপস্থিত হয়ে সুলতানি দান হতে নিজের ভাগ নিয়ে যায়। এ শাহী ঘোষণার পর পর প্রত্যেক বাসিন্দা সুলতানের কাছে এসে সাক্ষাত করতে লাগলেন এবং সুলতানও ধন-সম্পদ দিয়ে মালামাল করতে লাগলেন। কিন্ত ঐ সমস্ত মানুষের মাঝে ঐ দু'ব্যক্তির চেহারা দেখা গেলনা, যাদের আকৃতি প্রিয় নবী স্বপ্নের মধ্যে দেখায়েছেন। আখের সুলতান মানুষদেরকে জিজ্ঞেস করলেন যে, তোমাদের শহরে কি এমন কোন মানুষ রয়ে গেছে যারা উপস্থিত হয়নি। মানুষেরা আবেদন করলেন সুলতান- মদীনাবাসীদের মানুষ বাকী নাই যারা আপনার খেদমতে উপস্থিত হয়নি। তবে হ্যাঁ এমন দু'ব্যক্তি অবশিষ্ট রয়েছে, যারা ধর্ম নিষ্ঠা এবাদতকারী। তারা পশ্চিমা দেশের অধিবাসী। তারা রাতদিন আল্লাহর এবাদতে মগ্ন থাকে। কোন মানুষের সাথেও কথাবার্তা বলেনা। দুনিয়ার সম্পদের সাথে কোন প্রকার সম্পর্কও রাখে না। ঐ কারণে তারা আপনার এখানে উপস্থিত হয়নি। এ কথা শুনার পর সুলতান নুরউদ্দীন হুকুম করলেন তাদেরকে এখানে উপস্থিত করা হউক। যখন তারা সুলতানের সামনে আসল তখন সুলতান তাদের প্রতি প্রথম দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেই চমকে উঠেন এবং তাদের চিনে ফেললেন যে, এরা তো ঐ দু'জন যাদের প্রতি হুজুর আকরম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম স্বপ্নের মাধ্যমে ইশারা করেছেন। এখন সুলতান তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন তোমরা কোথায় অবস্থান করেছ? তারা উত্তর দিল আমরা হুজরা শরীফের গুম্বজে হাজেরার পশ্চিম পাশে একটি ঘরে অবস্থান করেছি। সুলতান তাদের মুখ থেকে এ কথা শুনার পর আর কোন কথা না বাড়িয়ে তাদেরকে ঐখানে রেখে নিজেই একাকীভাবে ঐ ঘরে পৌঁছে গেলেন যে ঘরে ঐ দু'জন থাকে। তিনি দেখলেন ঐ ঘরের একটি জানালা মসজিদে নববীর দেয়ালের সাথে সংযুক্ত। সুলতান ঐ ঘরে অনুসন্ধান করে দেখতে পেলেন যে, ঐ ঘরে একটি তাকে দু'কপি কোরআনুল করিম, কিছু ওয়াজ নছিহতের কিতাব রাখা হয়েছে। আর ঘরের এক পাশে মিসকিনদের জন্য কিছু পানাহার রাখা হয়েছে। তাদের

স্বয়নের জন্য একটি জায়গায় একটি ছাটাই পড়ে রয়েছে। সুলতান ছাড়াইটি উঠালেন, ছাড়াই উঠানের সাথে সাথে ছাড়াইয়ের নিচে দেখতে পেলেন একটি গভীর গর্ত যা হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসালামের মাজার শরীফের দিকে খনন করা হয়েছে। ঐ ঘরের একটি কর্ণারে একটি কুপ রয়েছে যাতে গহবরের মাটি (নিক্ষেপ করা হয়) ফেলা হয়। অন্য এক বিবরনে রয়েছে সেখানে একটি চামড়ার থলেও পাওয়া গিয়েছিল যার মধ্যে মাটি ভরে রাত্রে জান্নাতুল বাকী কবর স্থানে ফেলে দিয়ে আসত। সুলতান নুর উদ্দীন ঘরটি পুঙ্খানো পুঙ্খানোভাবে নিরীক্ষণ করে স্বীয় আসনে ফিরে আসলেন। ফিরে এসে ঐ দু'ব্যক্তিকে ভয় লাগালেন, ধমক দিলেন এবং তাদেরকে আঘাত করে জিজ্ঞেস করলেন তোমরা ঐ কাজ করেছ কেন? প্রতি উত্তরে তারা মনের কথা প্রকাশ করে বলল আমরা হলাম খ্রীষ্টান। খ্রীষ্টানেরা আমাদেরকে অনেক সম্পদ দিয়ে পশ্চিমা দেশের হাজীদের পোষাক পরিধান করায়ে ঐ উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছে যাতে আমরা যে কোন মূল্যে যে কোন উপায়ে যে কোন কৌশলে হুজরা শরীফে প্রবেশ করে ইসলামের পয়গমবরের তথা হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শরীর মোবারকের সাথে বিয়াদবী করি। যে রাত্রে মাটির নিচে সরুপথটি কবর শরীফ পর্যন্ত পৌঁছতে ছিল ঐ রাত্রে আকাশ অনেক বেশাবেশি মেঘাচ্ছন্ন হল বৃষ্টি হতে লাগল। আর বজ্রপাথ ও বিদ্যুৎ চমক এমন ভাবে হতে লাগল এক পর্যায়ে ভুমিকম্প শুরু হয়ে গেল এবং ঐ রাত্রের প্রত্যুষে সুলতান নুরুদ্দীন জঙ্গী মদীনায়ে মোনাওয়ারায় পৌঁছে গেছেন। প্রিয় নবীর দুশমন ইসলামের শত্রুদ্বয়ের কথাগুনে সুলতানের রাগ আগুনের ন্যায় জ্বলে উঠল। আর অকস্মাৎ রোদন এসে গেল সুলতান অনেক কাঁদলেন। এরপর ঐ দু'অপবিত্র শয়তানের গর্দান কেটে ফেললেন এবং তাদের লাশকে আগুনে জ্বালিয়ে দিলেন। তারপর সুলতান নুরুদ্দীন হুজরায়ে মোকাদ্দসার তথা প্রিয় নবীর রওজার চর্তুদিকে এত গভীর খন্দক খনন করলেন যাতে পানি বের হয়ে আসল। অতঃপর শীশা ব্যবহার করে ঐ গর্তকে ভরাট করে দিলেন। যাতে ভবিষ্যতে কোন বিভ্রট অভিশপ্ত ব্যক্তি যেন কবর শরীফ পর্যন্ত পৌঁছতে কষ্টকর হয়।

উদ্বৃতিঃ হযরত শেখ আবদুল হক মুহাদ্দেস দেহলভী কর্তৃক রচিত কিতাব। জজবুল কুলুব ইলা দিয়ারিল মাহ্বুব)।

উর্দু তরজুমা প্রথম খন্ড ১২৭ পৃষ্টা।

খোঁদার কসম জাহাজ ডুববে না ঃ

১২৯৫ হিজরী মোতাবেক ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে আলা হযরত কেবলা পিতা-মাতার সাথে প্রথমবার যিয়ারতে হারামাইনে শরীফাইনের জন্য উপস্থিত হন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ২৩ বছর। আরবের বড় বড় আলেমেরা বিশেষ করে শাফেয়ী মাজহাবের ফকিহ সৈয়্যদ আহমদ দাহলান, হানাফী মাজহাবের ফকীহ শেখ আবদুর রহমান সিরাজ প্রমুখ থেকে তাফসির, হাদীস, ফিকহ, উসুলে ফিকহ ও অন্যান্য বিষয়ে সনদ হাছিল করেন। এ পবিত্রময় সফরে একদিন তিনি মকামে ইব্রাহীমে মাগরিবের নামাজ হতে অবসর হতে না হতে শাফেয়ী মাজহাবের ইমাম হযরত হোসাইন বিন সালেহ আলা হযরত কেবলার হাত মোবারক ছেপে ধরে সোজা তার ঘরে নিয়ে গেলেন। ইতিপূর্বে আলা হযরত কেবলার সাথে তার কোন পরিচয় ছিল না। হযরত হোসাইন বিন ছালেহ প্রেমাবেগে দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত আলা হযরত কেবলার ললাটের দিকে তাকিয়ে রইলেন এবং বললেন-

انى لاجد نور الله من هذا الجبين

"ইন্নি লা আজিদু নূরাল্লাহে মিন হাজাল জাবিন"

অর্থাৎ-নিশ্চয় আমি এ কপাল হতে আল্লার নূর দেখতেছি। এরপর তিনি আলা হযরত কেবলাকে ছিহাহ ছিত্তার সনদ ও সিলসিলায়ে আলীয়ায়ে কাদেরীয়ার এজাজত স্বীয় দস্তখত সহকারে দান করলেন। প্রদত্ত এ সনদের মধ্যে ইমাম বোখারী পর্যন্ত মাত্র ১১জন মাধ্যম ছিল। হযরত শেখ হোসাইন বিন সালেহ স্বীয় লিখিত কিতাব "আল জাওহারাতুল মাদিয়া" আলা হযরত কেবলার কাছে পেশ করে উহার ব্যাখ্যা লিখার জন্য অনুরোধ করলেন। আলা হযরত কেবলা দু দিনের মধ্যে উহার ব্যাখ্যা আন নিরাতুল ওয়াদিয়া ফি শারহিল আল জাওহারাতুল মাদিয়া" উর্দু ভাষায় লিখে তার সমীপে পেশ করলেন। হযরত শেখ হোসাইন বিন সালেহ উহাকে অনেক পছন্দ করেছেন। এ সফর থেকে ফেরার পথে সমুদ্রের মধ্যে ধারাবাহিক তিন দিন মারাত্মক তুফান হয়েছিল। খোদ আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা ব্রেলভী বলেন মারাত্মক তুফানের কারণে লোকেরা সবাই কাফন পরিধান করে ফেলল। আমি আমার শ্রদ্ধেয়া মাতার অস্থিরতা দেখে তার সান্তনার জন্য সে সময়ে আমার মন থেকে বের হল আম্মাজান আপনি শান্ত হোন, আর আস্তা রাখুন। খোদার কসম এ জাহাজ ডুববে না। আমি এ শপথ হাদীসের প্রতি আস্তা রেখে করেছি। যেহেতু হাদীসের মধ্যে জাহাজে উঠার সময়ে ডুবে যাওয়া থেকে নিরাপদ থাকার যে দোয়া বর্ণিত আছে আমি জাহাজে উঠার সময় ঐ দোয়া পড়েছি। যা হল

بسم الله مجريها ومرساها ان ربى لغفور رحيم- وما قدروا الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون-

-"বিছমিল্লাহে মাজরিহা ওয়ামুরছাহা ইন্না রাব্বি লাগফুরুর রহিম। ওয়ামা কাদারুল্লাহা হাক্কা কাদরিহি ওয়াল আরদু জমিয়া কাবদাতুহু ইয়াওমাল কিয়ামতে ওয়াসসামাওয়াতে মাতবিয়াত বিইয়েমিনিহি সুবহানা ওয়াতায়ালা আম্মা ইয়ুশরিকুন" হাদীসে পাকের সত্য ওয়াদার প্রতি আমার পূর্ণ আস্তাশিলতা থাকা সত্বেও আমার মুখ থেকে শপথ বের হয়ে যাওয়ার কারণে খোদ আমারও একটু আশঙ্কা হলো তৎক্ষনাত আর একটি হাদীস শরীফ আমার স্বরণ পড়ল যা হলো-

من يتال على الله يكذبه

"মাইইয়াতায়াল্লা আলাল্লাহে ইয়ুকাজ্জিবুহু"

অর্থাৎ বিপদে যে আল্লাহ থেকে বিমুখ হবে তিনি তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবেন। আমি আল্লার দিকে মনোযোগ দিলাম আর রাসুলের থেকে সাহায্য চাইলাম। (জাল্লা মাজদুহু ওয়াছাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহে ওয়াসাল্লাম) আলহামদু লিল্লাহ যে বাতাস তিনদিন পর্যন্ত একটানা প্রবাহিত হচ্ছিল উহা এক ঘন্টার মধ্যে বন্ধ হয়ে গেল। আর জাহাজ ডুবা থেকে নাজাত পেল।

ইন্তেকালের ছয় বছর পূর্বে ইশারায় এবং চার মাস ২২ দিন পূর্বে সরাসরি ইন্তেকালের সংবাদ দিলেন ঃ

আলা হযরত কেবলা ঐ সমস্ত কামেল অলিদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন যাদের অন্তকরণে আল্লাহর হুকুম পালনের কঠোরত্ব অপ্রকাশ্য রয়েছে।

১৩৩৯ হিজরী মোতাবেক ১৯২১ সালে মাহে রমজানুল মোবারক মে ও জুন মাসে পড়ল। বুড়ো ও শক্তিহীনতার কারণে আলা হযরত কেবলা নিজের মধ্যে বাৎসরিক মৌসুমী প্রচন্ড গরম সহ্য করে রোজা রাখা তাঁর সামর্থের বাহিরে উপলব্ধি করলেন। তাই তিনি নিজের ব্যাপারে ফতোয়া দিলেন। পাহাড়ে ঠান্ডা থাকে ওখানে রোজা রাখা সম্ভব। সুতরাং রোজা রাখার জন্য ওখানে যাওয়া সামর্থের কারণে ফরয হয়ে গেল। অতঃপর তিনি রোজা রাখার উদ্দেশ্যে নিলীতাল জেলার ভাওয়ালীর পাহাড়ে তাশরীফ নিয়ে গেলেন। তিনি সব কিছু জানতা উভয় জাহানের রাজমুকুটধারী পেয়ারা রাসুলের দানকৃত জ্ঞান দ্বারা জেনে গেছেন যে, ১৩৪০ হিজরীতে তিনি দুনিয়ার মায়া ত্যাগ করে পরপারে আল্লাহ ও রাসুলের খেদমতে হাজির হবেন। ১৩৩৪ হিজরীতে আলা হযরত কেবলা স্বীয় বন্ধু ইমামুল মুহাদ্দেসীন মাওলানা শাহ অছি আহমদ হানাফী আনছারী মুহাদ্দেসে সুরুতী ফীলীভেতী সাহেবের ইন্তেকালের সাল কোরআনে কারিমের-

يطاف عليهم بانية من فضة واكواب

"ইয়ুতাফু আলাইহিম বি আনিয়াতিম মিন ফিদ্দতেওঁ ওয়াআকওয়াবিন" এ আয়াতে কারিমার মাধ্যমে বের করেছেন। আর তখন তথা ১৩৩৪ হিজরীতে এরশাদ ফরমায়েছেন যখন ঐ আয়াতে কারিমার সাথে একটি আরবি অব্যয় و (ওয়াও) মিলানো হয় তখন বন্ধু বন্ধুর সাথে মিলে যাবে। অর্থাৎ বন্ধুর ইন্তেকালের সাল বের হবে (১৩৩৪ হিজরী যাতে আলা হযরত কেবলার বন্ধু মুহাদ্দেসে সুরুতী ইন্তেকাল করেছেন। আর আলা হযরত কেবলা ইন্তেকাল করেছেন ১৩৪০ হিজরীতে)। উপস্থিতিদের মধ্যে থেকে কেউ উক্ত বক্তেব্যের ব্যাপারে চিন্তা করেননি এবং বুঝতেও পারেননি। আর উহা দ্বারা কি বুঝাতে চাচ্ছেন সেটাও জিজ্ঞাসা করেননি। আলা হযরত কেবলা ভাওয়ালীর পাহাড়ে ৩ রমজানুল মোবারক ১৩৩৯ হিজরীতে নিজের ইন্তেকালের তারিখের খবর প্রদান পূর্বক স্বীয় বরকতময় কলমে-

ويطاف عليهم بانية من فضة واكواب

"ওয়া ইয়ুতাফু আলাইহিম বে-আনিয়াতিম মিন ফিদ্দতেওঁ ওয়াআকওয়াবিন" এ আয়াতে কারিমাটি লিখেন। যখন আলা হযরত কেবলা ১৩৪০ হিজরীতে ইন্তেকাল ফরমান তখন ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের স্মরণ পড়ল যে, আলা হযরত কেবলাতো ১৩৩৪ হিজরীতে অর্থাৎ ইন্তেকালের ৬ বছর পূর্বে নিজের ইন্তেকালের সাল ইশারায় বলে দিয়েছেন। তিনি বলেছিলেন এ আয়াতে কারিমার শব্দ 'ইয়ুতায়াফু' এর শুরুতে যখন ওয়াও অব্যয় মিলানো হবে তখন বন্ধুর সাথে বন্ধুর দেখা হবে। আবজাদ এর হিসাব অনুসারে ওয়াও এর সংখ্যা হল ৬। ওয়াও ব্যতিত আয়াতে কারিমার আবজাদ হিসাবে সংখ্যা ১৩৩৪ হিজরী বের হয়। যা আমার বন্ধু মুহাদ্দেসে সুরুতীর ইন্তেকালের সাল। আর ওয়াও মিলানো হলে সংখ্যা হবে ১৩৪০ হিজরী যা আমার ইন্তেকালের সাল বের হবে। আল্লাহু আকবর শাহেন শাহে কাউনাইন ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দানকৃত জ্ঞানের বাহক আলা হযরত কেবলা স্বীয় বেছাল শরীফের ৪ মাস ২২ দিন পূর্বে নিজের ইন্তেকালের খবর প্রদান করেছেন। শুধু তাই নয় ছয় বছর পূর্বে ইশারায় বলে দিয়েছেন এমনকি নিজেই দুনিয়াবী জীবনে ঐ আয়াতে কারিমা লিখে দিয়েছেন। যা তার ইন্তেকালের তারিখের উপর বিঘোষিত।

আলা হযরত কেবলা কখন ইন্তেকাল ফরমাবেন তা তিনি জানতেন

মানুষ মরণশীল এ কথা দিবালোকের ন্যায় সত্য। মৃত্যু আসার আছে আসবে কিন্তু যখন অবগত হবে যে, পৃথিবীর মায়া মমতা সুখ পাখী হরণকারী জমদূত এসে গেছে তখন আত্মা বিচলিত হয়, অনুভুতিতে ভাটা পড়ে, জ্ঞানের ক্রটি বিকশিত হয়। অক্ষিকোনে কালো রং উদ্ভাসিত হয়। পরপারের যাত্রী ব্যক্তি এমনভাবে হাত গুজায় যেমন সে নির্বাপিত হচ্ছে। কিন্তু পৃথিবীতে এমন কিছু মানুষ রয়েছে যারা আনন্দঘন মুহূর্তে আসে আর সানন্দে চলে যায়। ঐ সৌভাগ্যবান মহান মনীষীদের মাঝে অন্যতম একজন হচ্ছেন চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দেদ ইমামে ইশকো মুহাব্বত ওয়ারেছুন্নবী নায়েবে গাউছুল ওয়ারা শাইখুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমীন, হুজ্জাতুললাহিল আলামীন আশ শাহ ইমাম আহমদ রেজা খান ফাযেলে ব্রেলভী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু। আল্লাহ! আল্লাহ! আলা হযরত কেবলা এমন জাতে পাক যিনি তাঁর ইন্তেকালের কথা নিজেই জানতেন। অর্থাৎ তিনি কোন মাসে কোন তারিখে কি বারে কত ঘন্টায় কত মিনিটে ইন্তেকাল করবেন তা তিনি নিজেই জানতেন।

ওফাতের দু'দিন পূর্বে তিনি (আলা হযরত) জিজ্ঞাসা করলেন আজ কোন দিন? প্রতি উত্তরে বলা হল আজ বুধবার তখন তিনি বললেন জুমার দিন আগামী পরশু তথা জুমার দিনে আমাকে সফর করতে হবে। এ কথা বলে তিনি হাসবুনাল্লাহ ওয়ানিয়ামাল ওয়াকিল পড়তেছিলেন। সুবহানাল্লাহ জুমার দিন যে আলা হযরত কেবলা ইন্তেকাল ফরমাবেন তা তিনি জানতেন। তাই তিনি ওফাতের দু'দিন পূর্ব থেকে প্রস্তুতি শুরু করেছেন। ঘড়ির কাঠা চলতেছিল, রবি অস্তমিত হচ্ছিল, সুর্য উদিত হচ্ছিল এভাবে দু'দিন অতিবাহিত হওয়ার পর জুমার দিন এসে গেল আলা হযরত কেবলা জিজ্ঞাসা করলেন আজ সে জুমার দিন তাই না? উত্তর দেয়া হল হা, তিনি বললেন আজকে জুমার দিন, আজকে জুমার দিন আজকে ওফাতের দিন (ইন্তেকালের দিন)। আজ মাওলায়ে হাকীকির ডাকে সাড়া দেয়ার দিন। আজকে মাহবুবে এলাহীর সাথে সাক্ষাত করার দিন। আজকে দুনিয়ার মায়া পরিত্যাগ করার দিন। আজকে বন্ধু, আত্মীয়-স্বজন ও আপনজনদের প্রেম-প্রীতি ভালবাসাকে ক্ষনিকের জন্য পরিত্যাগ করার দিন। ক্ষণস্থায়ী জীবন ত্যাগ করে চিরস্থায়ী জীবনের দিকে পাড়ি দেয়ার দিন। আজকেই আমার শেষ দিন। আলা হযরত কেবলা এ কথা যখন বলতেছিলেন তখন সকলে-তো কাঁদতেছিল সম্ভবত আরশ-কুরছি লাওহে-কলম আকাশ-বাতাস, চন্দ্র-সুর্য, পশু-পাখি, তরু-লতা, তথা খোদার খোদায়িত্ব পর্যন্ত এ বলে কাঁদতেছিল যে, আহ্! আজকে পৃথিবী থেকে একজন আল্লাহ তায়ালার মাহবুব অলিয়ে কামেল পেয়ারা রাসুলের সাচ্ছা আশেক মাহবুবে এলাহীর সুন্নাত কায়েমকারী পেয়ারা মাহবুবের শান ও মান বুলন্দকারী নবী অলির দুশমনের জন্য শানিত তরবারী সুন্নিয়তের ত্বরী তটস্থকারী, দুস্থ মানুষের কান্ডারী, কলমের অধিরাজ জ্ঞানের জাহাজ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ইমাম চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দেদে আজম মুহিউচ্ছুন্নাহ আল মোখতার আব্দুল মুস্তফা মুহাম্মদ আহমদ রেজা খান ফাযেলে ব্রেলভী দুনিয়া থেকে চির বিদায় নিতেছেন। আহ পৃথিবীর আকাশ থেকে একটি নক্ষত্র খসে পড়তেছে। আলা হযরত কেবলা এরশাদ করতেছেন পূর্বের জুমায় চেয়ারে বসার সুযোগ ছিল। আহ্! কিন্তু আজ চার পায়াখাটে যেতে হবে। এ বলে পরপাড়ে পাড়ি দেয়ার প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন। সম্পদের ব্যাপারে ওয়াক্ফ নামা পরিপূর্ণ করলেন, মোট সম্পদের

এক চতুর্থাংশ ভাল কাজের জন্য ওয়াক্‌ফ করে দিলেন। শরীয়ত মোতাবেক দুনিয়া থেকে সফরকারী ব্যক্তি নিজের সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় যেটুকু ব্যয় করার নির্দেশ রয়েছে, যদি শরীয়তের পক্ষ থেকে মোট সম্পদের এক চর্তুথাংশ আল্লাহর রাস্তায় ওয়াক্‌ফ করার শর্তারোপ না হত তাহলে ইমাম আহমদ রেজা খান ফাযেলে ব্রেলী রাদিয়াল্লাহ তা'য়ালা আনহু তাঁর সমস্ত সম্পদ আল্লার রাস্তায় নিঃস্বার্থে ব্যয় করে দিতেন।

আল্লাহ! আল্লাহ! সে সমাগতের ক্ষন এসে গেছে শুধু আড়াই ঘন্টার ব্যাপার অছিয়ত নামা লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে। এ অছিয়ত নামায় কিছু সম্পদের জন্য অছিয়ত রয়েছে। বংশের জন্য কিছু উপদেশাবলী রয়েছে। নিঃস্বদের জন্য কিছু দিক নির্দেশনা রয়েছে। হ্যাঁ অসহায়দের জন্য রয়েছে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তাক্বীদ। অসহায়দেরকে সবাই ভুলে যায় কিন্তু আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা সারা জীবন তাদেরকে স্বরণ করেছেন এমনকি মৃত্যু শয্যায়ও তাদেরকে ভূলেননি। একটু চিন্তা করুন একটু বুকে হাত দিয়ে দেখুন যার বংশধররা বাদশাহি ষ্টাইলে জীবন যাপন করছে আজ তার ঘরে অসহায়দের জন্য রাজকীয় দস্তরখানা বা উন্নত মানের টেবিল ক্লথ বিছায়ে অসহায়দের উন্নতমানের খাবার পরিবেশন করা হচ্ছে। আলা হযরত কেবলা ইন্তেকালের পূর্বে যে অছিয়ত নামা লিপিবদ্ধ করায়ে নিজেই সাক্ষর করেছেন তা আমার অনুবাদিত অসহায়দের সহায় নামক পুস্তিকাটিতে দেখুন। আলা হযরত কেবলার ইন্তেকালের সময় ঘনিয়ে আসতেছে, প্রিয়ভাজনদের উপর কি আলোয় থাকবে, সহচরদের জন্য কি পথ থাকবে, দ্বীনদারদের কি অবস্থা হবে, আল্লাহু আকবর। ওফাত পর্যন্ত সমস্ত কাজ ঘড়ি দেখে ঠিক সময়ে এরশাদ হচ্ছে এরকম জাঁকজমকের সাথে যাওয়া কি কেউ দেখেছে। যখন দু'টা বাজার চার মিনিট বাকীছিল তখন তিনি সময় জিজ্ঞেস করলেন সময় বলে দেয়া হল। এরপর তিনি এরশাদ করলেন ঘড়ি খুলে সামনে রেখে দাও। আল্লাহ! আল্লাহ! এরকম মনে হয় যেন অদৃশ্যের মালিক তাকে সময় বলেদিয়েছেন। আ'লা হযরত কেবলার বড় সাহেবজাদা তাঁর বড় ছেলে হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত মাওলানা মুহাম্মদ হামেদ' রেজা খাঁন তার ওফাত শয্যার পাশে উপস্থিত হলেন। আলা হযরত কেবলা তাকে বললেন অযু করে আস এবং কোরআন শরীফ নাও। তিনি অযু করে আসতে একটু বিলম্ব হওয়ার কারণে ইতিমধ্যে আলা হযরত কেবলার ছোট সাহেবজাদা তথা মুফতীয়ে আজম হিন্দ হযরত মাওলানা মুস্তফা রেজা খাঁন উপস্থিত। আলা হযরত কেবলা তাকে লক্ষ্য করে বললেন বসে কি করতেছ? তাড়াতাড়ি কোরআন শরীফ নাও এবং সুরা ইয়াছিন শরীফ ও সুরা বায়াদ শরীফ তেলাওয়াত কর। কোরআন তেলাওয়াত চলতেছে শরীয়তের রবি কিরণ বিতরণ করে অস্তমিত হচ্ছে। মাত্র কয়েক মিনিট অবশিষ্ট পরপারে পাড়ি দেয়ার দোয়া পড়তেছেন আর বার বার বলতেছেন আজ এমন সফরে যেতে হবে যেখান থেকে আর ফিরে আসার অবকাশ নেই।ঠিক যখন জুমার আযান হচ্ছিল তখন দু'টা ৩৮ মিনিট হয়েছিল মুয়াজ্জিন যখন حی علی الفلاح বললেন তখন আলা হযরত কেবলা কালিমায়ে তৈয়্যেবা পড়লেন لا اله الا الله محمد رسول الله লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রাসুলাল্লাহ মুহূর্তের মধ্যে নিঃশ্বাস বুকে এসে গেল। যখন নিঃশ্বাস বুক থেকে বের হল তখন তার চেহেরায় একটু আলোকচ্ছটা উদ্ভাসিত হল এবং উহার আলো ছড়িয়ে পড়ল। অর্থাৎ তিনি ইন্তেকাল ফরমালেন। ইন্না লিল্লাহে ওয়াইন্না ইলাইহে রাজেউন।

তিনি এমনভাবে বিদায় নিয়েছেন যেভাবে বাগান থেকে ফুলের সুবাস চলে যায়। আলা হযরত নিজেই খুব সুন্দরভাবে বলেছেন

যাকে একঝলক দেখা দেয় সাক্ষাতের উৎসাহ
আমি এমন যেতেছি যে, যাওয়া জানাও হয় না।

নিঃসন্দেহে তিনি এমন গিয়েছেন যে, যাওয়াটা অনুভবও হয়নি। সফর মাসের ২৫ তারিখ ১৩৪০ হিজরী জুমার দিন ২.৩৮ মিনিটের সময় আলা হযরত কেবলা ইন্তেকাল ফরমায়েছেন। সুবহানাল্লাহ! আলা হযরত কেবলা কি বারে কোন তারিখে কয়টায় কত মিনিটের সময়ে ইন্তেকাল ফরমাবেন তা তিনি নিজেই জানতেন। যা উপরোক্ত ঘটনা থেকে স্পষ্ট জানা যায়। হে ইমাম আহমদ রেজা, হে অসহায়দের সহায়, হে মিসকিনদের প্রিয়, হে অভাবীদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণকারী আপনার উপর হাজারবার সালাম। হ্যাঁ মানুষের আত্মা, চক্ষু, অশ্রুসিক্ত চোখ, ব্যাকুল প্রাণ, উদ্বিগ্ন আত্মা, অত্যাচারিতের স্বর, মাসের উজ্জ্বলতা, রবির দীপ্ততা, বর্ষণকারী বাদল, আপনাকে সালাম করতেছে। আপনার উপর হাজারবার সালাম।

কুতুবুল এরশাদ আলা হযরতের ইন্তেকালের পর তার লাশ মোবারক ফেরেস্তাদের কাঁদে দেখার সু-সংবাদ

মুহাদ্দেসে আজম হিন্দ হযরত মাওলানা শাহ সৈয়দ মুহাম্মদ আশরফ আশরাফী জিলানী কুসুসী বলেন, আমি আমার ঘরে ছিলাম এবং ব্রেলী শরীফের অবস্থার ব্যাপারে অনবগত ছিলাম। আমার হুজুর শাইখুল মাশায়েখ সৈয়দ শাহ আলী হুসাইন আশরাফী মিয়া অযু করতেছিলেন। হঠাৎ তিনি কেঁদে উঠলেন। কাঁদার কারণ কারো বুঝে আসল না। সকলে অবাক হয়ে তার দিকে তাকাচ্ছিলেন। কেউ কেউ মনে করলেন কোন পোকা-মাকড় তাঁকে কামড় দিল কিনা। কিন্তু কেউ সাহস করে তাঁর কাছে জিজ্ঞাসা করতে পারতেছিলেন না। এমতাবস্থায় আমি সামনে এগিয়ে গেলাম এবং বিনীতভাবে কাঁদার কারণ জানতে আবেদন করলাম- তখন তিনি উত্তর দিলেন বৎস! আমি ফেরেস্তাদের কাঁদে কুতুবুল এরশাদের লাশ মোবারক দেখে কাঁদতেছি। কয়েক ঘন্টাপর ব্রেলী শরীফ থেকে টেলিগ্রাম আসল আলা হযরত আজ জোহরের সময় ইন্তেকাল ফরমায়েছেন। এ খবর শুনে আমাদের ঘরে সকলে ক্রন্দন করতে লাগল। এ সময় আমার শ্রদ্ধেয় পিতা হযরত মাওলানা নজর আশরাফ সাহেবের জবানে তাৎক্ষনিক উচ্চারিত হল রাহমাতুল্লাহে তায়ালা আলাই সুবহানাল্লাহ! আলা হযরত রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এমন বুযুর্গ ব্যক্তি ছিলেন যার বেছালে তাঁর লাশ মোবারক ফেরেস্তারা কাঁদে নিয়ে ঘুরতেছিলেন। যার সুসংবাদ আধ্যাত্মিক জগতের প্রাণ পুরুষ হযরত সৈয়দ শাহ আলী হোসাইন আশরাফী মিয়া দিয়েছেন। এবং তিনি আলা হযরতকে কুতুবুল এরশাদ বলেছেন।

এ হাজ্জী আমি মরার পরও আমার পশ্চাদদেশ ছাড়বে না

আলা হযরত কেবলার খলিফায়ে আজম হযরত মাওলানা আবদুছ সালাম সাহেব কয়েক বছর ধরে আলা হযরত কেবলাকে জবলপুর তাশরীফ আনার জন্য দাওয়াত দিয়ে আসতেছেন। প্রত্যেক বছর সফরের তাগিদ বাড়তেছে। ১৩৩৬ হিজরীতে প্রথম চিঠি তাঁর পক্ষ থেকে আলা হযরত কেবলার খেদমতে প্রেরণ করেছেন। এর পর তারবার্তা এসেছে। অবশেষে আবদুছ সালাম সাহেব তাঁর সাহেবজাদা মাওলানা বোরহানুল হক

সাহেবকে ব্রেলী শরীফ প্রেরণ করেন। যাতে তিনি আলা হযরত কেবলাকে তার সাথে জবলপুর নিয়ে আসেন। এ দিকে আলা হযরত কেবলা ধর্মীয় ও মাযহাবী কর্মে লিপ্ত থাকার কারণে হামেশা সফর করা থেকে বিরত থাকতেন। কিন্তু এবার মাওলানা আবদুছালাম সাহেব আলা হযরত কেবলাকে জবলপুরে নিয়ে যাওয়ার জন্য এমনভাবে জেদ ধরলেন যার পরিপ্রেক্ষিতে আলা হযরত কেবলা জবপুরের উদ্দেশ্যে সফর করলেন। আলা হযরত কেবলার সাথে অনেক মানুষ ছিলেন বিশেষত তাঁর ঘরের সবাই, সকল খাদেম, দারুল ইফতার (ফতোয়াদান বিভাগ) সকল কর্মচারী সবাই নিমন্ত্রীত ছিলেন। হযরত আবদুছ সালাম সাহেব অনেক খুশি, কারণ তার অনেক দিনের সাধনা যে, জবলপুরবাসীদেরকে স্বীয় শেখ আলা হযরত কেবলার দৈনন্দিন জীবন যাপন ও তার কর্মনীতি ও নূরানী চেহেরায়ে পাক দেখানের সুযোগ হবে আল্লাহ তায়ালা তাঁর এ মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করলেন। হযরত আবদুছ সালাম সাহেব ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা আলা হযরত কেবলা ও তাঁর সফর সঙ্গীদেরকে এক মাস পর্যন্ত রেখে দিলেন, এবং এমন বাদশাহী মেহমানদারী করলেন যা জীবনেও ভুলার নয়। আলা হযরত কেবলা জবলপুরে অবস্থানকালে যখন প্রথম জুমারদিন আসল তখন আলা হযরত কেবলার গোসলের জন্য একটি কক্ষে পানি রাখা হয়েছে। আলা হযরত কেবলার খাদেম হাজী কেফায়তুল্লাহ সাহেব একজোড়া কাপড় এনে দিলেন। আলা হযলত কেবলা পাঞ্জাবী খুলে দেখলেন উহার কোন একদিকে ছেড়া রয়েছে। আলা হযরত কেবলা উক্ত ছেড়া পাঞ্জাবী দেখে হাজী সাহেবকে ডেকে বললেন, আজ জুমার দিন এ ছেড়া পাঞ্জাবী পড়াবে? হাজী সাহেব তৎক্ষনাত উক্ত পাঞ্জাবী নিয়ে গেলেন এবং দ্বিতীয় আরেকটি পাঞ্জাবী এনে দিলেন। আলা হযরত কেবলা উক্ত পাঞ্জাবী দেখলেন উহা ছেড়া ছিলনা। তবে উহা বোতমছাড়া ছিল। ইহা দেখে আলা হযরত কেবলার রাগ এসে গেল। এমতাবস্থায় আলা হযরত কেবলা এরশাদ ফরমালেন হে হাজী হে হাজী আমি মরার পরও কি আমার পিছন ছাড়বে না? আলা হযরত কেবলার আওয়াজ এত উচু হয়েছিল যে, যা অন্যান্য কক্ষেও শুনা গিয়েছিল। যারা যারা হুজুর কেবলার কথা শুনেছে তারা আলা হযরত কেবলার উক্ত বাক্যের ব্যাখ্যা শুরু করেদিলেন। কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করলেন হুজুর কেবলার এ এরশাদের উদ্দেশ্যে কি? কেউ কেউ উত্তর দিলেন ইহা রাগের কথা। যা কোন উদ্দেশ্যে বলেননি। আর কোন আগত ঘটনার প্রতিও ইঙ্গিত করেননি। হযরত আবদুছ সালাম সাহেব বলেন, আমি পূর্ব থেকে আমার শেখ আলা হযরত কেবলার রাগ ও ফেরেশানির অবস্থা সম্পর্কে কিছু কিছু বুঝাতাম। আর ঐ অবস্থায় যা কথা বলতেন তা সম্পর্কেও আমার মোটামুটি ধারণা ছিল। এ কারণে আমি হুজুর কেবলার এ বাক্যের অর্থ ইহাই বুঝেছি, যা আমি বলেই দিয়েছি যে, আমার হুজুরের উচ্চ কথার অর্থ হচ্ছে তিনি (আলা হযরত) আগেই ইন্তেকাল ফরমাবেন। আর হাজী সাহেব মাজারের খাদেম হয়ে থাকবেন এবং এরপর ইন্তেকাল ফরমাবেন, আমি হুজুর কেবলার উক্ত কথার ব্যাখ্যা এরূপ করেছি কারণ আমার হুজুর কেবলা কোন কথা অনর্থক বলতেন না। অতঃপর বাস্তব ঘটনা তাই হল। আলা হযরত কেবলা ১৩৪০ হিজরীতে ইন্তেকাল ফরমালেন হাজী সাহেব জিন্দা ছিলেন এবং খাদেম বনে মাজারের খেদমতে লিপ্ত রইলেন। জবলপুরে আলা হযরত কেবলার কথার উদ্দেশ্যে এখনো প্রকাশ পায়নি। তবে হ্যাঁ কয়েক বছর পর তা প্রকাশ পেয়েছে এভাবে যে, হাজী সাহেব তার ইন্তে-কালের কিছুদিন পূর্বে তিনি আলা হযরতের সাহেবজাদা খলিফা ও একনিষ্ট কিছু মানুষের

কাছে তার মৃত্যুর পর তার দাফন দরগাহে রেজভীয়ার সীমানার মধ্যে দেয়ার জন্য লিখিত এজাজত চাইলেন। বিরোধীতা একদিকে রেখে তারা তাকে এজাজত না দিয়ে লিখিত কিছু কথা লিখে দিলেন। যা হাজী সাহেব পুস্তকাকারে ছাপায়ে বন্টন করে দিলেন। শহরের মধ্যে দাফন করার জন্য চেয়ারম্যানের অনুমতি প্রয়োজন, হাজী সাহেব চেয়ারম্যানের কাছে দরখাস্ত করলেন। চেয়ারম্যান সাহেব দেরী না করে অনুমতি দিয়ে দিলেন। আলা হযরত কেবলার পায়ের সোজা একটি হুজরায় হাজী সাহেব কবর খনন করালেন এ সব কাজ যখন পরিপূর্ণ হল তখন মৃত্যু দূত আজরাইল আলাইহিস্‌সালাম হাজী সাহেবের রুহ মাজার শরীফের দু আড়াই গজ ব্যবধানের মধ্যে কব্‌জ করে নিলেন। হাজী সাহেব নিজের তৈরীকৃত কবর শরীফে আরামে শুয়ে রইলেন। এ সব কাজ সহজভাবে হয়ে গেল। কোন প্রতিবন্ধকতা ছিল না। হযরত আবদুছ সালাম সাহেব বলেন হাজী সাহেবের দাফনের পর আমার স্মরণে আসল আলা হযরত কেবলা জবলপুরে আমার ঘরে উত্তেজিত অবস্থায় বলেছিলেন হে হাজী আমার মৃত্যুরপরও তুমি আমার পশ্চাদদেশ ছাড়বে না। এখন আলা হযরত কেবলার সে রাগের কথা ও হাজী সাহেবের কবরতো দেখুন। হাজী সাহেব প্রথমে মাজারে নিজের দাফনের খেয়াল করেছিলেন। সাহেবজাদারা অনুমতি দিলেন না। চেয়ারম্যান সাহেব বিনা চিন্তায় কবর খননের অনুমতি দিয়ে দিলেন। এ সব কাজ অনায়েসে হয়ে যাওয়ার পর আজরাইল আলাইহিস্‌সালাম হাজী সাহেবের রূহ আলা হযরত কেবলার মাজার পাকে কবজ করেছেন। যা দ্বারা আলা হযরত কেবলার জবলপুরের সে রাগের কথার কারামত প্রকাশিত হয়ে গেল।

অযিফার সিন্দুক থেকে টাকা ও স্বর্নালংকার দিতেন

হযরত সৈয়দ আইয়ুব আলী সাহেব বর্ণনা করেন-একবার আলা হযরত কেবলা জবলপুর গিয়েছেন। এখানে আলা হযরত কেবলার খলিফা মৌলভী আবদুছ সালাম সাহেব (মাদ্দাজিল্লুহুল আলী) প্রায় এক হাজারের মত টাকা একটি সাদা চিনির পাত্রের মধ্যে রেখে আলা হযরত কেবলার খেদমতে উপহার স্বরূপ পেশ করলেন। আলা হযরত কেবলা উহাকে গ্রহণ করে এরশাদ ফরমালেন মাওলানা ইহাকি কম ছিল যা আপনি এ পর্যন্ত খরচ করেছেন। অর্থাৎ আমি আপনার মেহমান হয়েছি আমার আপ্যায়নের জন্য যা কিছু ব্যয় করেছেন এটা কি কম ছিল? এরপর হাজী কেফায়ত উল্লাহ সাহেবকে বললেন এগুলো রেখে দাও আর আমার অযিফার সিন্ধুকটি নিয়ে আস। হাজী সাহেব এ টাকাগুলো সামনের কক্ষে রেখেদিলেন এবং অযিফার বাক্সটি পেশ করলেন। যে বক্সের মধ্যে সাদা কাপড়ে কালো কালির লেখা কিছু শব্দাবলীও ছিল। আর এ অযিফা আলা হযরত কেবলা তাঁর মুর্শিদ কেবলা থেকে উপহার পেয়েছেন যা তিনি ফজরের নামাজের পর তেলাওয়াত করতেন আর এ অযিফার বাক্সটি তালা মারা থাকত। যার চাবী আলা হযরত কেবলা নিজের কাছেই রাখতেন। আর ঐ বাক্সের মধ্যে অযিফা ছাড়া আর কিছু থাকত না। অযিফার বাক্সটি এত ছোটছিল যার মধ্যে অযিফার কিতাব ছাড়া আর কিছু রাখার অবকাশ ছিলনা। উক্ত অযিফার বাক্সটি আলা হযরত কেবলা সামনে রাখলেন, এবং উহার ডাক্‌না সম্পূর্ণভাবে না খুলে বাম হাতে সামান্য করে খুলে ডান হাত না দেখে বক্সের মধ্যে ডুকালেন এবং উহার থেকে টাকা বের করে মাওলানা সাহেবের চাকর-বাকর ও পরিবারের সকল সদস্যদেরকে খুশী মনে বন্টন করে দিতে লাগলেন। আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে অযিফার সিন্দুকের মধ্যে এতো টাকা কোথা থেকে আসল আর আলা হযরত কেবলা শুধু টাকা দিয়েই সমাপ্ত করেন নি বরং মাওলানা আবদুছ সালাম সাহেবের পুত্র বধু তথা রোবহান মিয়ার স্ত্রী ও তাঁর বাচ্চাদেরকে

স্বর্নালংকার দিলেন শুধু তাই নয় তার ছোট বাচ্চাকে সেলাই করা জামা ও টুপি ঐ সিন্দুক থেকে বের করে দিলেন অথচ ঐ সফরে অযিফার বক্সে বেশীর ভাগ সময়ে অযিফার কিতাবই পড়তে দেখা গিয়েছে। অযিফার কিতাব ছাড়া আর কিছু দেখা যায়নি। হযরত মাওলানা হোসাইন রেজা সাহেব বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন যে, আলা হযরত কেবলা শুধু মাওলানা আসদুছ সালাম সাহেবের পরিবারের সদস্যদেরকে ঐ অযিফার সিন্ধুক থেকে টাকা ও অলংকার দেননি বরং তিনি ছাড়া ও আরো খাস-খাস কিছু ভক্ত অনুরক্তদের বাচ্চাদেরও পুত্রবধুদেরকে ঐ বক্স থেকে স্বর্ণালংকার দিতেন। তারা বলতেন আমরা আলা হযরত কেবলার জন্য কিছু খবচ করেছি যা খরচ করেছি তার চেয়ে বেশী তো তিনি আমাদের বাচ্চাদের অলংকার দান করেছেন। মাওলানা হোসাইন রেজা খান সাহেব আরো তাজ্জোবের সাথে বললেন, আমাদের বুঝে আসতনা যে, আলা হযরত কেবলা এ সমস্ত অলংকার কখন কিনে এ বক্সে রেখেছেন। অথচ উক্ত বক্সে অযিফার কিতাব ছাড়া আর কিছু রাখার সুযোগও ছিলনা। এর দ্বারা বুঝা গেল এটা আলা হযরত কেবলার গোপন রহস্য। এটা তাঁর প্রকাশ্য একটি কারামত।

পঞ্চম অধ্যায়

শাজরায়ে ক্বাদেরীয়া রেজভীয়া

শাজরায়ে আলীয়া হযরাতে আলীয়া কাদেরীয়া বারকাতিয়া রিদুয়ানিল্লাহ তায়ালা আলাইহিম আজমাইন ইলা ইয়াউমিদ্দীন

ইয়া ইলাহি রহম ফরমা মোস্তফা কে ওয়াস্তে
ইয়া রাসুলাল্লাহ করম কিজিয়ে খোদাকে ওয়াস্তে।
মশকিলে হল কর শাহে মশকিল কোশাকে ওয়াস্তে
কর বলায়ে রদ শহীদে কারবালাকে ওয়াস্তে।
সৈয়্যদে সাজ্জাদকে সদকে মে সাজেদ রাখ মুজে
ইলমে হক দে বাকেরে ইলমে হুদা কে ওয়াস্তে।
ছিদকো ছাদেক কা তাছাদ্দুক ছাদেকুল ইসলাম কর
বে-গজব রাজী হো কাজেম আউর রেজাকে ওয়াস্তে।
বাহরে মারুপে সরি মারুপে দে-বে-খোদ সরি
জুনদে হক মে গিন জুনাইদে বা ছাপাকে ওয়াস্তে।
বাহরে শীবলি শেরে হক দুনিয়াকে কুত্তুছে বাচা
একে কা রাখ আবদে ওয়াহেদ বে-রিয়াকে ওয়াস্তে।
বুল ফরাকো ছদকা কর গম কো পরাদে হোসনো ছায়াদ
বুল হাসন আউর বু সায়িদে সা'দজাকে ওয়াস্তে।
কাদেরী কর কাদেরী রাখ কাদেরী য়ো মে উঠা
কদরে আবদুল কাদেরে কুদরত নমাকে ওয়াস্তে।
আহছানুল্লাহ লাহু রিজকান চে দে রিজকে হাসান
বন্দায়ে রাজ্জাকো তাজুল আছফিয়াকে ওয়াস্তে।
নসরাবী ছালেহ কা ছদকা ছালেহো মনছুর রাখ

দে হায়াতে দ্বী মুহিয়ে জা ফাযাকে ওয়াস্তে।
তুর এরফানো উলুভু হামদু হোছনু ওয়াবাহা
দে আলী মুছা হাসন আহমদ বাহাকে ওয়াস্তে।
বাহরে ইব্রাহিমু মুজ পর নারে গম গোলজার কর
বিখো দে দাতা ভিখারী বাদশাকে ওয়াস্তে।
খানায়ে দিল কো দিয়া দে রোয়ে ঈমা কো জামাল
শাহ দিয়া মাওলা জামালুল আউলিয়াকে ওয়াস্তে।
দে মুহাম্মদ কেলিয়ে রোজি কর আহমদ কেলিয়ে
খানে ফজলুল্লাহ ছে হিসসা গাদা কে ওয়াস্তে।
দিন ও দুনিয়া কে মুজে বরকাত দে বরকাত ছে
এশকে হক দে এশকিয়ে ইস্তোমাকে ওয়াস্তে।
হুব্বে আহলে বাইয়াত দে আলে মুহাম্মদ কে লিয়ে
কর শহীদে এশকে হামজা গেশোয়াকে ওয়াস্তে।
দিল কো আচ্ছা তন কো ছোতরা জান কো পুরনূর কর
আচ্ছে পিয়ারে শমছে দি বদরুল উলাকে ওয়াস্তে।
দো জাঁহামে খাদেমে আলে রসুলাল্লাহ কর
হযরতে আলে রসুলে মুক্তদাকে ওয়াস্তে।
নূরে জানো নূরে ঈমা নূরে কবর ও হাশর দে
বুল হোছাইনে আহমদে নূরী লকা কে ওয়াস্তে।
কর আতা আহমদ রেজায়ে আহমদে মুরসাল মুজে
মেরে মওলা হযরতে আহমদ রেজাকে ওয়াস্তে।
হামেদো মাহমুদো আওর হাম্মাদ আহমদ কর মুজে
মেরে মাওলা হযরতে হামেদ রেজাকে ওয়াস্তে।
ছাইয়ায়ে জুমলা মাশায়েখ ইয়া খোদা হাম পর রহে
রহম ফরমা আলে রহমা মোস্তফাকে ওয়াস্তে।
বাহুরে ইব্রাহীম বি লুৎফু আতায়ে খাস হো
নূরকি ছরকার ছে হিচ্ছা গদা কে ওয়াস্তে।
আয় খোদা রায়হাঁ রেজা কো গুলশনে ইসলাম মে
কর শেগপ্তা হার ঘড়ি আপনি রেজাকে ওয়াস্তে।
ওয়াছফে করতে হে তেরা আক্বায়ে তাওছিফে রেজা
দে মুজে তাওফীকে উস যিকরে ছফাকে ওয়াস্তে।
ছদকায়ে উন আঁয়া কা দে চে আইন ইজ্জো ইলমো আমল
আফ ও ইরফা আ ফিয়ত উছ বেনওয়াকে ওয়াস্তে।

শাজরায়ে মোবারকা চিশতিয়া নেজামিয়া বরকাতিয়া রেজভীয়াহ মুস্তফাভীয়্যাহ

ইয়া ইলাহি রহম ফরমা মোস্তফাকে ওয়াস্তে
ইয়া রাসূলাল্লাহ করম কি জিয়ে খোদাকে ওয়াস্তে
মুশকিলে হল কর শাহে মুশকিল কোশাকে ওয়াস্তে
হযরত মাওলা আলী মরতুজা কে ওয়াস্তে
ফায়রভী খাজা হাসান বছরী কী করমুজকো আতা
ইয়া ইলাহী মুরশেদানে সিলসিলা কে ওয়াস্তে
এক নেগাহে লুৎফ রহমতকা হোঁ মওলা মুলতজা
একে কারাখ আবদে ওয়াহেদ বে-রিয়াকে ওয়াস্তে।
ইয়া এলাহী ফজল ফরমা আবকায়ে খাজা ফুজাইল
বখ্শে ইব্রাহীম আদহাম বাদেশাহ-কে ওয়াস্তে।
দু-জাহা মে আজ পায়ে খাজা হুজাইফা মির আশী
ছর খর ও করদ বু- হুরাইরা পারেছাকে ওয়াস্তে।
দ্বীন ও দুনিয়া মে ইলাহে শাদ আওর আবাদ রাখ
হযরতে মুমশাদে সুলতানে খোদা কে ওয়াস্তে।
মেরে মাওলা জিকরে মাওলা বিরদে লব হু সবহো শাম
শাহ আবু ইছহাকে শামী মুকতাদা কে ওয়াস্তে।
বাহরে বু-আহমদ জনাবে শাহ মুহাম্মদ কে তুফায়েল
বখশ দে-বু-ইউসুফে-ইউসুফ নমাকে ওয়াস্তে।
কুতবে দ্বী মাওদুদে চিশতী কা তাসাদ্দুক আয় খোদা
রহমতী হাসিল হু তেরী মুজ গদাকে ওয়াস্তে।
ইয়া ইলাহী হজ্জ ও জিয়ারতচে মুশাররফ কর মুজে
হযরত হাজী শরীফে হক নমা কে ওয়াস্তে।
ইয়া খোদা দারাইনকে বরকাতছে মুজকো নওয়াজ
খাজায়ে ওসমানে ফখরুল আউলিয়াকে ওয়াস্তে।
মুরশেদানে চিশতি কি সাচ্চি গোলামী কর নছিব
শাহ মঈন উদ্দীন চিশতী বা খোদাকে ওয়াস্তে।
বখত কাবেদা কো কর বেদারে করদে বখতিয়ার
বখতেয়ারে কাকী কুতুবুল আউলিয়াকে ওয়াস্তে।
লজ্জতো জওকে এবাদত কর আতা গঞ্জে শকর
শাহ ফরিদুদ্দীন বাবা আউলিয়াকে ওয়াস্তে।
এত্তেবায়ে সুন্নতে খায়রুল ওয়ারা করদে আতা
শাহ নেজামুদ্দীনে মাহবুবে খোদাকে ওয়াস্তে।
নাছিরু মানছুরে আওর মাহমুদে হামেদ কর মুজে

শাহ নাছিরুদ্দীনে মাহমুদুছছনা কে ওয়াস্তে।
দোঁজাহাকি নিয়ামতোছে বান্দায়ে দরকো নওয়াজ
খাজায়ে বন্দা নওয়াজে আহলে ছাপাকে ওয়াস্তে।
ইয়া খোদা বাহরে জালালুদ্দীনে মাখদুমে জাহা
দ্বীন কা খাদেম বানাদে আউলিয়াকে ওয়াস্তে।
সৈয়্যদী রাজুয়ে কাত্তাল ওয়াশাহে শাহ রঙ্গ কে
রঙ্গ মে রঙ্গ দে মুজে আপনি রেজা কে ওয়াস্তে।
শাহে মিনা লক্ষৌভী আওর সাদে আসয়াদ কে তোফাইল
বখশ দে খাজা ছফীয়ে বা ছাপাকে ওয়াস্তে।
রহম ফরমা ফজলে রহমা আজ পায়ে খাজা হোছাইন
মেরে ছৈয়্যদ আবদে ওয়াহেদ বে-রিয়াকে ওয়াস্তে।
সৈয়্যদে আবদুল জলিল ও শাহে ওয়াইছে বাছাপা
কর আতা আপনি রেজাউল আউলিয়াকে ওয়াস্তে।
দ্বীন ও দুনিয়া কি মুজে বরকাত দে বরকাত ছে
এশকে হক্ব দে এশক্বীয়ে এনতোমা কে ওয়াস্তে।
হুব্বে আহলে বাইত দে আলে মুহাম্মদ কেলিয়ে
কর শহীদে এশকে হামজা পেশোয়াকে ওয়াস্তে।
দ্বীনকো আচ্ছা তনকো সুতরা জান কো পুরনূর কর
আচ্ছে পেয়ারে শমসে দ্বীন বদরুদ্দোজাকে ওয়াস্তে।
দো জাঁহামে খাদেমে আলে রাসুলুল্লাহ কর
হযরত আলে রাসুলে মোক্তদাকে ওয়াস্তে।
নূরে জানো নূরে ঈমা নূরে কাবরো হাশর দে
বুল হোসাইনে আহমদ নূরী লক্বাকে ওয়াস্তে।
কর আতা আহমদ রেজায়ে আহমদে মুরসাল মুজে
মেরে আকা হযরতে আহমদ রেজা কে ওয়াস্তে।
হামকো আবদে মুস্তফা কর বাহরে শেখে মোস্তফা
মুফতিয়ে আজম রেজায়ে মুস্তফাকে ওয়াস্তে।
ছদকায়ে উন আঁয়া কা দে আইন ইজ্জো এলমো আমল
আফ ও ইরফা আ ফিয়াত উছ বেনওয়াকে ওয়াস্তে।

দো'য়ায়ে আলা হযরত

ইয়া ইলাহী হার জাগা তেরী আতা কা সাথ্ হো,
জব পড়ে মুশকিল শাহে মুশকিল কোশা কা সাথ্ হো।

ইয়া ইলাহী ভূল জায়ো নাজা কী তকলীফ কো,
শাদীয়ে দীদারে হোসনে মোস্তফা কা সাথ্ হো।

ইয়া ইলাহী গোরো তেরা কী জব আয়ে সখত রাত,
উনকে পেয়ারে মুহ কী সোবহে জা ফাযা কা সাথ্ হো।
ইয়া ইলাহী জব জবানে বাহের আয়ে পেয়াস ছে,
ছাহেবে কাউসার শাহে জুদ ও আতা কা সাথ্ হো।

ইয়া ইলাহী সরদে মোহরী পর হো জব খোরশীদে হাশর,
সৈয়্যদে বে সায়া কে যিল্লে লিওয়া কা সাথ্ হো।

ইয়া ইলাহী গরমী এ মাহশরছে জব ভড়ঁকে বদন,
দামনে মাহবুব কী ঠান্ডী হাওয়া কা সাথ্ হো।

ইয়া ইলাহী নামায়ে আমাল জব খোলনে লাগে
আয়ব পোশে খলকে সাত্তারে খাতা কা সাথ্ হো।

ইয়া ইলাহী জব বহে আঁখি হেসাবে জোরমে মে,
উন তাবাস্সুম রেজু হোটু কী দোয়া কা সাথ্ হো।

ইয়া ইলাহী জব হেসাবে খানদায়ে বে জারে লায়ে,
চশমে গিরিয়া শফীই মুরতাজা কা সাথ্ হো।

ইয়া ইলাহী রঙ্গ লায়ে জব মেরী বে বাকিয়া
উনকী নীচী নীচী নজরো কী হায়া কা সাথ্ হো।

ইয়া ইলাহী জব চলো তারিকে রাহে পুল সিরাত
আফতাবে হাশেমী নুরুল হুদা কা সাথ হো।

ইয়া ইলাহী জব সরে শমশীর পর চলনা পড়ে
রব্বি সাল্লিম কাহনে ওয়ালে গম জাদাহ কা সাথ্ হো।

ইয়া ইলাহী জো দো'য়ায়ে নেক হাম তুজছে করে,

কুদসিয়োকে লবসে আমীন রাব্বনা কা সাথ্ হো।

ইয়া ইলাহী জব রেজা খাবে গেরাসে সর উঠায়ে,
দৌলতে বেদারে এশকে মোস্তফা কা সাথ হো।

ইয়া ইলাহী লে চলে জব দাফন করনে কবর মে
গাউছে আজম পেশওয়ায়ে আউলিয়া কা সাথ্ হো।

পরিশিষ্ট

সিলসিলায়ে কাদেরীয়া বারকাতিয়া রেজভীয়া নূরিয়ার মাশায়েখদের নাম, ওফাতের তারিখ ও দাফনের স্থান

নাম মোবারক	ওরশ ও ফাতিহার তারিখ	দাফন স্থান
❖ রাসূলে আকরম হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)	১২ রবিউল আউয়াল	মদিনা শরীফ
❖ সৈয়্যদানা সিদ্দিকে আকবর (রদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)	২২জমাদিউল আখির	মদিনা শরীফ
❖ হযরত ওসমান গণি (রদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)	১৮ জিলহজ্ব	মদিনা শরীফ
❖ হযরত আলী মরতুজা (রদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)	২১ রমজান	নজফে আশরফ
❖ হযরত ইমাম হাসান (রদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)	৫ রবিউল আউয়াল	মদিনা শরীফ
❖ হযরত ইমাম হোসাইন (রদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)	১০ মহররম	কারবালার ময়দান
❖ হযরত জয়নাল আবেদীন (রদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)	১৮ মহররম	মদিনা শরীফ
❖ হযরত ইমাম জাফর সাদেক (রদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)	১৫ রজব	মদিনা শরীফ
❖ হযরত ইমাম মুহাম্মদ বাকের (রদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)	৭ জিলহজ্ব	মদিনা শরীফ
❖ হযরত ইমাম মুছা কাজেম (রদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)	৫ রজব	বাগদাদ শরীফ
❖ হযরত মারূফ কারখী (রদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)	২ মহররম	বাগদাদ শরীফ
❖ হযরত সিররী সেক্বতী (রদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)	১৩ রমজান	বাগদাদ শরীফ
❖ হযরত জুনায়েদ বাগদাদী(রদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)	২৭ রজব	বাগদাদ শরীফ
❖ হযরত আবু বকর শিবলী(রদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)	২৭ জিলহজ্ব	বাগদাদ শরীফ
❖ হযরত আবুল ফজল আবদুল ওয়াহেদ (রদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)	২৬ জমাদিউল আখের	বাগদাদ শরীফ
❖ হযরত আবুল ফরাহ তুরতুশি (রদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)	৩ সাবান	বাগদাদ শরীফ
❖ হযরত আবুল হোসাইন খোরাইশী (রদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)	১ মহররম	বাগদাদ শরীফ
❖ হযরত আবু সাঈদ মাখজুমী (রদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)	৭ সাবান	বাগদাদ শরীফ
❖ হযরত আবদুল কাদের জীলানী (রদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)	১১ রবিউস সানী	বাগদাদ শরীফ
❖ হযরত আবু ছালেহ নাসির (রদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)	২৭ রজব	বাগদাদ শরীফ
❖ হযরত আবদুর রজব (রদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)	৬ সাওয়াল	বাগদাদ শরীফ

❖ হযরত মহি উদ্দীন আবু নসর (রদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)	২২ রবিউল আউয়াল	বাগদাদ শরীফ
❖ হযরত আলী জিলানী (রদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)	২৩ সাওয়াল	বাগদাদ শরীফ
❖ হযরত মুছা (রদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)	১৩ রজব	বাগদাদ শরীফ
❖ হযরত হাসান (রদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)	২৬ সফর	বাগদাদ শরীফ
❖ হযরত আহমদ জিলানী (রদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)	১৯ মহররম	বাগদাদ শরীফ
❖ হযরত বাহা উদ্দীন (রদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)	১১ জিলহজ্ব	দৌলত আবাদ
❖ হযরত ইব্রাহীম ইরজি (রদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)	৫ রবিউল আখের	দিল্লী দরগাহ।
❖ হযরত মুহাম্মদ বাহকারী (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)	৯ জিলকদ	কাকুরী ইউপি।
❖ হযরত জিয়া উদ্দীন ওরফে জিয়া(রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)	১২রজব	কসবারে নিয়তনী লক্ষৌ
❖ হযরত জামালুল আউলিয়া (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)	ঈদুর ফিতরের রাত	ফতেপুর।
❖ হযরত মুহাম্মদ কালকুফি (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)	৬ সাবান	কালফী শরিফ।
❖ হযরত আহমদ (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)	১১ সফর	কালফী শরিফ।
❖ হযরত ফজলুলল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)	১৪ জিলহ্জ	কালফী শরিফ।
❖ হযরত বরকাতুল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)	১০ মহররম	মারহেরা শরিফ।
❖ হযরত আলে মুহাম্মদ	১৬ রমজান	মারেহেরা শরীফ
❖ হযরত হামজা	১৪ রমজান	মারেহেরা শরীফ
❖ হযরত আলে আহমদ আচ্ছা মিয়া	১৭ রবিউল আউয়াল	মারেহেরা শরীফ
❖ হযরত আলে রাসূল	১৮ জিলহজ্ব	মারেহেরা শরীফ
❖ হযরত আবুল হোসাইন আহমদ নুরী মিয়া	১১ রজব	মারে হের শরীফ
❖ মুজাদ্দেদে দীন ও মিল্লাত ইমাম হযরত আহমদ রেজা খান ফাযেলে ব্রেলভী	২৫ সফর	ব্রেলী শরীফ
❖ হুজ্জাতুল ইসলাম.হযরত হামেদ রেজা খান	১৭ জমাদিউল উলা	ব্রেলী শরীফ
❖ হযরত মুফতীয়ে আজম হিন্দ মুস্তফা রেজা খান	১৪ মহররম	ব্রেলী শরীফ
❖ হযরত নাছির উদ্দীন	১৪ রমজান	ব্রেলী শরীফ
❖ হযরত ইব্রাহীম রেজা খান	১১ সফর	ব্রেলী শরীফ
❖ হযরত রায়হান রেজা খান	১৮ রমজান	ব্রেলী শরীফ
❖ হযরত নঈম উদ্দীন মোরাদবাদী	১৮ জিলহজ্ব	মোরাদাবাদ
❖ হযরত জাফরুদ্দীন বিহারী	১৯ জমাদিউল আখের	পাটনা
❖ হযরত আশরফী মিয়া কুচুসী	১২ জমাদিউল উলা	কুচুসা শরীফ
❖ মোহাদ্দেসে আজম হিন্দ হযরত সৈয়দ মুহাম্মদ	১৬ রজব	কুচুসা শরীফ
❖ হযরত হাশমত আলী লক্ষৌভী	৮ই মহররম	ফীলীভেত
❖ হযরত আমজাদ আলী আজমী	২ জিলক্বাদাহ	গোসী
❖ হযরত আজমল শাহ	২৮ রবিউস সানী	সানবল

❖ হযরত আব্দুছ সালাম জবলপরী
❖ হযরত আব্দুর রহমান জয়পুরী
❖ হযরত সরদর আহমদ লায়েলপুরী
❖ হযরত আব্দুল আলীম মিরিঠী
❖ হযরত আব্দুল আজিজ মোবারক পুরী
❖ হযরত জিয়া উদ্দীন আহমদ মদনী

রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম আজমাইন।

১২ই জমাদিউল উলা জবলপুর
১১ জমাদিউল আখের জয়পুর
১লা শাবান লায়েলপুর
২২ আগস্ট মদীনায়ে মোনাওয়ারা
১লা জমাদিউল আখেল মোবরকপুর।
৩রা জিলহজ্ব মদীনা মোনাওয়ারা

গ্রন্থপঞ্জী

১. তজল্লীয়াতে ইমাম আহমদ রেজা
কৃতঃ হযরতুলহাজ মাওলানা ক্বারী মুহাম্মদ আমানত রাসূল কাদেরী বারকাতী রেজভী।

২. সিরাতে আলা হযরত মায়া কারামাত
কৃতঃ সৈয়দ মুহাম্মদ মাজাহার কায়্যুম।

৩. যিকরে রেজা
কৃতঃ মুহাম্মদ নুর মোস্তফা।

৪. কারামাতে আলা হযরত মায়া কারামাতে মুফতীয়ে আজম
কৃতঃ মাওলানা আবদুন নঈম আজিজী বালরামপুরী।

৫. হায়াতে আলা হযরত
কৃতঃ আল্লামা জাফর উদ্দীন ফাযেলে বিহারী।

৬. ইমাম আহমদ রেজাকী ফিকহী বসিরত
কৃতঃ মুহাম্মদ ইয়াছ আক্তার মিছবাহী।

৭. মায়ারেফে রেজা মাতবুয়া করাচী নম্বর ২৫
কৃতঃ এদারায়ে তাহকীকাতে ইমাম আহমদ রেজা ইন্টারন্যাশনাল ।

৮. তাজকারা-এ-আকাবেরে আহলে সুন্নাত
কৃতঃ মাওলানা মুফতী শফীক আহমদ শরীফী।

৯. আল মালফুজ (কামেল)
সংকলক ঃ শাহজাদায়ে আলা হযরত মুফতীয়ে আজম হিন্দ মাওলানা মুস্তফা রেজা নূরী কাদেরী।

১০. ইমাম আহমদ রেজা আওর ইলমে হাদীস
কৃতঃ মুহাম্মদ ঈসা রেজভী কাদেরী।

১১. ইরফানে রেজা
কৃতঃ আল্লামা আবদুস ছাত্তার হামদানী।

১২. দীল বুস্তানে রেজা
কৃতঃ মাওলানা ইয়াছ আক্তার মিছবাহী।

১৩. ইয়াদগারে রেজা
কৃতঃ রেজা একাডেমী বোম্বাই

১৪. ব্রেলী ছে মদীনা
কৃতঃ আমীর-এ-আহলে সুন্নাত মাওলানা ইলিয়াছ আত্তার কাদেরী রেজভী।

১৫. বাহরুল উলুম
কৃতঃ মাওলানা ডঃ সৈয়্যদ এরশাদ আহমদ আল বুখারী ।

১৬. সুখনে রেজা
কৃতঃ মাওলানা সূফী মুহাম্মদ আওয়াল কাদেরী রেজভী।

১৭. খোলাফায়ে মুফতীয়ে আজম
কৃতঃ মাওলানা শাহাব উদ্দীন রেজভী বারায়াতী।

১৮. কানযুল ঈমান (বাংলা অনুবাদ)
কৃতঃ মাওলানা এম,এ মান্নান।

১৯. আল এজাজাতুল মাতীনাহ
কৃতঃ হুজ্জাতুল ইসলাম মাওলানা হামেদ রেজা খান কাদেরী নূরী রেজভী।

২০. এরশাদাতে আলা হযরত
কৃতঃ মাওলানা আবদুল মুবিন নোমানী কাদেরী রেজভী।

২১. ওসায়া শরীফ
কৃতঃ মাওলানা ইয়াছ আক্তার বিছবাহী।

২২. পাঞ্জে সূরায়ে রেজভীয়্যাহ মায়া আল অযিফাতুল কারীমাহ।
কৃতঃ মাওলানা আবদুল মুবিন নোমানী কাদেরী রেজভী।

২৩. আল মিনহাতুল ওহাবিয়্যা ফী রাদ্দিল ওহাবীয়্যাহ
কৃতঃ শেখ দাউদ ইবনে সৈয়্যদ সোলায়মান বাগদাদী নকশবন্দী।

২৪. আল মুতাকেদুল মুনতাক্বাদ
কৃতঃ হযরত মাওলানা সৈয়্যদ ফজলে রাসূল কাদেরী বারকাতী বদায়ুনী।

২৫. আল ফাজ্জুস ছাদেক
কৃতঃ শেখ জমীল আফিন্দী ছিদ্দীকী আযযেহাবী।

২৬. নঈমী খুতবাত
কৃতঃ আল্লামা মূফর্তী ইয়ার খাঁন নঈমী

২৭. হাদায়েক্বে বখশীষ
কৃতঃ ইমামে আহলে সুন্নাত আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা খান ব্রেলভী।

২৮. নজদী পরিচয়
কৃতঃ মাওলানা রেদওয়ানুল হক ইসলামাবাদী

২৯. ইতিহাসের দর্পনে সায়্যিদ আহমদ ব্রেলভী
কৃতঃ অধ্যক্ষ গাজী মফজল আহমদ নঈমী।

৩০. সৈয়্যদ আহমদ ব্রেলভীকে জানা উচিত।
কৃতঃ অধ্যক্ষ আলহাজ মুফতী মুহাম্মদ ইদ্রিস রেজভী।